৫২—৫৩ রক্ষিত,
৫৩ সাল হইতে সংগ্রহ
আছে।
১৮৫২—৫৩

Registered No 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫২ম ভাগ। ১লা বৈশাখ রবিবার, ১৩৩৬, ১৮৫১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

১ম সংখ্যা। 14th April, 1929. অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে বিশ্ববিধাতা, তুমি চির পুরাতন হইয়াও নিত্য নবীন; তাই তোমার এই বিশ্বকে তুমি প্রতিমুহূর্ত্তেই নূতন সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়া নূতন উন্নতি ও বিকাশের পথে লইয়া চলিয়াছ। তুমি আমাদেরও জন্য নিত্য নূতন জীবনের ব্যবস্থা করিয়াছ,—পুরাতনের মৃত্যুর মধ্যে তুমি আমাদিগকে পড়িয়া থাকিতে দেও না। আমরা অধিকাংশ সময় চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা-বিহীন হইয়া পুরাতনের মধ্যেই পড়িয়া থাকিতে চাই,; কিন্তু তাহাতে তুমি তৃপ্তি ও কল্যাণ রাখ নাই। তাই আমাদিগকে তুমি ব্যর্থতা ও দুঃখ বেদনার আঘাত দিয়া নিয়ত জাগাইয়া দাও। জীবন্ত মঙ্গলকর্ম্মা পুরুষ তুমি; তাই নিয়তই তুমি আমাদের মঙ্গল-সাধনে নিযুক্ত থাকিয়া আমাদিগকে মিথ্যা আরামে মজিয়া থাকিতে দেও না। তোমার পুরাতন প্রকাশেও সন্তুষ্ট থাকিতে দেও না। তুমি আমাদের নিকট নিত্য নূতন ভাবেই প্রকাশিত হও। আমরা সকল সময় তাহা দেখি না বলিয়াই আমাদের জীবন তেমন সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে গড়িয়া উঠিতেছে না, আনন্দে ও তৃপ্তিতে পূর্ণ হইতেছে না। তথাপি আমরা যে একেবারে মোহে ডুবিয়া থাকিতে পারিতেছি না, বিশেষ বিশেষ সময়েও প্রাণে একটু নূতন আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা জাগে, ইহাতেও তোমারই করুণা। তুমিই কৃপা করিয়া নববর্ষের আগমনে প্রাণে নূতন আকাঙ্ক্ষা ও আশা জাগাইতেছ। আমরা আর এই ভাবে মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিতে পারি না। তুমি আমাদের সকল অবসন্নতা ও উদাসীনতা দূর করিয়া দেও। আমাদিগকে নূতন উৎসাহ ও উদ্যম লইয়া জীবনপথে চলিতে সমর্থ কর। প্রতিদিন জীবনে তোমার নিত্য নূতন প্রকাশ দেখিবার জন্য, নিত্য নূতন বাণী শুনিবার জন্য, আমাদের সকলকে ব্যাকুল কর; এবং বাধ্য সন্তানের ন্যায় তোমার ইচ্ছা অনুসরণ করিয়া চলিতে সমর্থ কর। সত্যই নূতন বর্ষে যাহাতে আমরা নূতন জীবন লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারি, তুমি আমাদিগকে সে কৃপা কর। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

নিবেদন।

নববর্ষের ব্রত—মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন—সূর্য্যের আলোক সম্যক্ প্রকাশ পায় না; রাত্রিতে চন্দ্র তারাও নিষ্প্রভ। বৃষ্টিবর্ষণে আকাশ মেঘনির্ম্মুক্ত হলো, দেশ জনপদ পরিষ্কার হ'য়ে গেল, চারিদিক সুন্দর শোভাময় হলো। সূর্য্যের কিরণ, চন্দ্রের জ্যোৎস্নালোক, ধরা উজ্জ্বল করে। আজ আমি অনুতাপের অশ্রুতে বক্ষ ভাসাব। কত কলঙ্ক কালিমা প্রাণে! কত অপরাধ হয়েছে! আজ অশ্রুজলে সব ধৌত করব; হৃদয়-আকাশ মেঘমুক্ত হবে, সূর্য্যের উদয় হবে; প্রাণের দেবতা প্রাণ এসে পূর্ণ করবেন! কতদিন তিনি ডেকেছেন, তাঁর ডাক শু'নে ছুটে এসেছি। তোমরাও তাঁর বাণী শুনে এসেছিলে—সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, সেবা ল'য়ে এসেছিলে। হৃদয়ে মেঘের উদয় হলো। চারিদিক নিবিড় অন্ধকারে ঢাক্‌লো। কোথায় প্রেম, কোথায় পুণ্য, কোথায় তপস্যা, কোথায় সেবা! আর জীবনদেবতা—প্রাণের সূর্য্য? তিনি কোথায়! সব ভুল্‌লাম! কোথায় চল্‌ছি! কোন্ পথে যাচ্ছি! না, আজ এই নব বর্ষের নূতন দিনে, নূতন ব্রত লই। "ক্রন্দন কর" "ক্রন্দন কর" এই ধ্বনি উঠ্‌ছে। অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাই, অন্তর ধৌত হোক। আজ হৃদয় শুদ্ধ করি। সত্যে প্রতিষ্ঠিত হই; প্রেমে ভেসে যাই। অশুদ্ধ ভাব, অশুদ্ধ চিন্তা, অপ্রেম, অসত্য, অলসতা সব দূর হোক,—অনুতাপের জলে সব ভেসে যাক্। প্রেমের দেবতা প্রাণে প্রকাশিত হউন, তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করি।

ওদের ডেকে আন—যারা দূরে চ'লে গেছে, যাও, তাদের স্নেহভরে হাত ধ'রে ডেকে আন; যারা প'ড়ে গেছে, তাদের হাত ধ'রে তোল। প্রাণটা একটু বড় কর; হৃদয়টা একটু প্রশস্ত কর। একটু গায়ে কালি মেখেছে? দুর্ব্বল মন একবার পদস্খলন হয়েছে? তাই ব'লে তাকে ডাক্‌বে না? তাকে ভাল বাস্‌বে না, তাকে দূর ক'রে দিবে? তাকে মরণের পথ দেখিয়ে দিবে? না, তা ক'রো না। তাকে ডাক, নিকটে ডাক, তাকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধ। ছুটে আর যেতে না পারে, শক্ত বাঁধনে বেঁধে রাখ। সে ত পর নয়। সে যে তোমার আপনার জন। হয় ত অন্যের প্ররোচনায় সে একটু দূরে চ'লে গেছে, হয় ত চারিদিকের দূষিত হাওয়া তাকে কলুষিত করেছে, হয় ত দশজনের সঙ্গে প'ড়ে তার মতি একটু বিগ্‌ড়িয়ে গেছে। তাই এখন তাকে সকলেই ছেড়ে দিয়েছে। সে যে আরও দূরে চ'লে যাবে! সকলে ছেড়েছে ব'লে তুমিও কি ছাড়বে? তুমি কি তাকে একটু প্রেমে আলিঙ্গন করবে না? তুমিও কি তারে হাত ধ'রে তুলবে না। তুমিও কি তাকে একটা আশার বাণী শুনাবে না? তুমিও কি স্নেহভরে বলবে না—"ও ভাই, ও আমার বোন, দূরে যেও না। ভয় কি? ভগবানের নাম কর, সব দুঃখ কালিমা ঘুচে যাবে।" তুমি তাকে তু'লে ধর, স্নেহে তাকে ডেকে আন।

বনের ফুল—পৃথিবীতে কত ফুল ফোটে! লোকালয়ে, উদ্যানে, কত ফুল ফু'টে উঠে—মানুষ কত যত্ন করে! সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধে মানুষ মুগ্ধ হয়। বনে জঙ্গলে—লোকসমাগমের দূরে কত রকমের ফুল বিনা যত্নে ফুটে উঠে! কেহ তাহা দেখে না, কোনও মানুষ তার সুগন্ধে মোহিত হয় না। তবুও সে ফোটে; তবুও সে চারিদিকে সৌন্দর্য্য ছড়ায়; তবুও সে সুগন্ধ বিস্তার করে। কেহ তাকে দেখ্‌ল কি না দেখ্‌ল, তা সে জানে না। সে ফুটে উঠে; আপনার বিকাশ করে; কার্য্যশেষে সে ঢ'লে পড়ে। আমিও সেইরূপ ফুটে উঠ্‌তে চাই। আমিও সেইরূপ প্রেম বিলিয়ে যাব। আমিও সেইরূপ সেবা ক'রে যাব, মিষ্ট কথায় তুষ্ট ক'রে যাব। কেহ দেখ্‌বে না, কেহ একটু "বেশ হয়েছে" বল্‌বে না; কেহ আমার কাজ বুঝ্‌বে না, কেহ আমার প্রেমের প্রতিধ্বনি করবে না। তবুও প্রভুর মুখের দিকে চেয়ে প্রেম বিলাব, সেবা বিলাব, ফুটে উঠ্‌ব। কাজ যখন শেষ হবে, লোকের অগোচরে ফুলের মত ঝ'রে পড়্‌ব, প্রভুর ক্রোড়ে ঘুমিয়ে পড়্‌ব। ইহাই আমার ব্রত, ইহাতেই আমার কৃতার্থতা।

সম্পাদকীয়

পুরাতন ও নূতন—সংসারে পুরাতনে ও নূতনে একটা চিরন্তন দ্বন্দ্ব চলিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। একদল রক্ষণশীল লোক পুরাতনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, নূতনকে সর্ব্বপ্রযত্নে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে চেষ্টা পায়; উহারা কিছুতেই বরণ করিয়া লইতে ইচ্ছা করে না। অপর দিকে আর এক দল উন্নতিকামী বিপ্লবপ্রয়াসী লোক কেবল নূতনের পশ্চাতেই ছুটিয়া বেড়ায়, পুরাতনের মধ্যে গ্রহণীয় ও রক্ষণীয় কিছু খুঁজিয়া পায় না, উন্নতিপথে অগ্রসর হইবার মহা প্রতিবন্ধক মনে করিয়া সর্ব্বপ্রকারে উহাকে বর্জ্জন করিতেই সচেষ্ট হয়। একদল মনে করে পুরাতনকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ না করিলে উন্নতি হইতে পারে না, অপর দল ভাবে নূতনকে গ্রহণ করিতে গেলে নিশ্চিত ধ্বংসের পথেই উপনীত হইতে হয়, সারবস্তু কিছুই থাকে না, দাঁড়ায় না, সবই একেবারে চলিয়া যায়। উভয়েই নানা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া আপনাদের মত সমর্থন করেন। উভয়েই উভয়কে প্রকৃত কল্যাণ ও উন্নতির বিরোধী শত্রু বলিয়াও অভিহিত করেন। ইহাদের কথা শুনিলে মনে হয় পুরাতনে ও নূতনে এমন একটা স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব বা বিরোধিতা আছে যে উহাদের মধ্যে আর কোনও মিলনভূমি থাকিতে পারে না—যাহা কিছু পুরাতন তাহা কিছুতেই নূতন নয়, আর যাহা নূতন তাহা কোনও প্রকারেই পুরাতন নয় সুতরাং ইহারা পরস্পরবিরোধী। আপাত দৃষ্টিতে এরূপ বোধ হইলেও, ইহা যে পূর্ণ সত্য নয়, একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। যদিও কল্পনার দ্বারা একটা সীমারেখা টানিয়া নূতন ও পুরাতনকে আমাদের চিন্তার মধ্যে পরস্পর হইতে পৃথক করিতে পারি, বাস্তব জগতে কিন্তু তাহা কোনও প্রকারেই সম্ভবপর নয়। নূতন ও পুরাতন এমনই অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত যে কোথায় একের শেষ আর অপরের আরম্ভ তাহা কিছুতেই স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। অবস্থা ঘটনা সময় সকল বিষয় সম্বন্ধেই এই কথা সত্য। এই যে আমরা বলিয়া থাকি পুরাতন বর্ষ চলিয়া গেল ও নূতন বর্ষ আরম্ভ হইল, ইহার মধ্যে কোন মুহূর্ত্তে পুরাতন শেষ হইয়া গেল আর নূতন আরম্ভ হইল, তাহা কি নির্ণয় করা সম্ভবপর? অবশ্য আমরা এরূপ একটা সময়ের বিভাগ করি বটে; কিন্তু আমরা যাহা করিয়া থাকি তাহার পরিবর্ত্তে অপর যে কোনও দিন বা মুহূর্ত্তে কি সীমা-রেখা টানা যায় না? শুধু যে বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন শ্রেণীর গণনাপদ্ধতি অনুসারে বিভিন্ন দিবসেই পুরাতন বৎসর শেষ ও নূতন বর্ষ আরম্ভ হয়, তাহা নহে। কোন্ সময়ে একের শেষ ও অপরের আরম্ভ করিতে হইবে, সেবিষয়েও মতভেদ রহিয়াছে—কাহারও মতে সে সময় মধ্য রাত্রি, অপরের হিসাবে তাহা উষা বা অরুণোদয়। সুতরাং এরূপ বিভাগ যে নিতান্তই কৃত্রিম ও কাল্পনিক, উহার যে কোনও বাস্তব সত্তা নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আবার আরও একটু গভীরভাবে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে প্রত্যেকটী মুহূর্ত্তই নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থল, একদিক দিয়া দেখিলে যেখানে পুরাতনের শেষ অপর দিক দিয়া দেখিলে সেখানেই নূতনের আরম্ভ। চিন্তার দ্বারা পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত ও পর মুহূর্ত্ত বলিয়া দুইটি পৃথক মুহূর্ত্ত আমরা কল্পনা করিতে পারি বটে, কিন্তু অনন্ত প্রবহমান কালস্রোতের মধ্যে কোথাও একের বিরাম ও অপরের নূতন আরম্ভ নাই—দুইয়ের মধ্যে কোনও ফাঁক বা শূন্যতা নাই। প্রকৃত পক্ষেও আমরা একটা মুহূর্ত্তকেই পুরাতন বর্ষের শেষ ও নূতন বর্ষের আরম্ভ বলিয়া গণনা করি। আবার, দিন মাস বর্ষই হউক আর যাহাই হউক, সম্পূর্ণ পুরাতননিরপেক্ষ হইয়া নূতন দাঁড়াইতে

পারে না,—পুরাতনই নূতনের জনক। অন্য দিকে এই মুহূর্ত্তে যাহা নূতন পর মুহূর্ত্তেই তাহা পুরাতন। এই মুহূর্ত্ত যে প্রকৃত পক্ষে কতটুকু সময় তাহা আমরা বলিতে পারি না, বুঝিতেও পারি না—আমাদের চিন্তার সাহায্যের জন্য প্রয়োজন অনুসারে আমরা ইহাকে ইচ্ছামত ছোট বড় করিয়া থাকি মাত্র। সুতরাং যখন আমরা নূতন ও পুরাতন বর্ষ বা দিনের কথা বলি তখন এই মুহূর্ত্তটাকেই বড় করিয়া বৎসর অথবা দিবস বলিয়া ধরি। আমরা যতই আগ্রহ ও আশার সঙ্গে নূতন বর্ষকে অথবা নূতন বস্তু বা ঘটনাকে অভ্যর্থনা করি না কেন, তাহা যে বাস্তবিক পক্ষে কতটুকু সময় নূতন থাকিবে তাহা জানি না। কিন্তু তাহাতে দুঃখের কোনও কারণ নাই। পুরাতনই যেমন আমাদিগকে নূতনে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে, তেমনি এই নূতনও পুরাতন হইয়া আবার অন্য নূতনে লইয়া যাইবে। সুতরাং নববর্ষ-দিনটাকে আমরা সাধারণতঃ যে চক্ষে দেখি, যে ভাবে যাপন করিতে চেষ্টা করি, তাহা যদি সত্য গভীর ও স্বাভাবিক হয়, তবে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তই নূতন প্রতীয়মান হইতে পারে, নূতন আশা উৎসাহের সহিত বরণীয়, চেষ্টা যত্নের সহিত যাপনীয় বলিয়া গণ্য হইতে পাবে। আমরা একটা দিনকে যে কাল্পনিক বিশেষত্ব প্রদান করিয়া থাকি তাহা সত্য ভাবেই প্রতিদিনকে, প্রতি মুহূর্ত্তকে দিতে পারি এবং সকল দিন সকল মুহূর্ত্তই আমাদের নিকট সমান আদরণীয়, সমান পবিত্র, তুল্যভাবে যাপনীয় হইয়া উঠিতে পারে। সময়ের উপযুক্ত ব্যবহারের উপরই, প্রতি মুহূর্ত্তের কর্ত্তব্যপালনের উপরই যে সময়ের মূল্য এবং জীবনের উন্নতি ও কল্যাণ নির্ভর করে, তাহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলিবে। সুতরাং এরূপ হইলে জীবন যে সহজেই নিত্য নূতন আশা উদ্যমের সহিত নূতন হইতে নূতনতর উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। প্রকৃত পক্ষে এই অনন্ত প্রবাহমান কালস্রোতের প্রতিমুহূর্ত্তই আমাদের নিকট একটা নূতনত্ব, একটা বিশেষত্ব লইয়া উপস্থিত হয়। অথচ ইহার কোনটা পুরাতননিরপেক্ষ হইয়া আকস্মিক ভাবে আসে না। আমরা চিন্তাহীন হইয়া অন্ধভাবে স্রোতে ভাসিয়া চলি বলিয়াই নূতনত্বটা দেখিতে পাই না, সবই আমাদের নিকট বিশেষত্বহীন, আকর্ষণহীন, অতি পুরাতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আমাদের একদিনের কৃত্রিম চেষ্টা যত্ন অবসন্নতাতে ডুবিয়া যায়, আমরা চির মোহনিদ্রায় নিমগ্ন হই। নূতনের প্রতি মানব প্রাণের আকর্ষণ স্বাভাবিক। কিন্তু উন্নতির জন্য উহা একান্ত আবশ্যক হইলেও, এই দৃষ্টিহীনতাবশতঃ অধিকাংশ লোকের মধ্যে প্রধানতঃ উহার বিকৃতিটাই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা নূতনত্বের মোহে নানা মিথ্যার পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়ায়, একটা কিছু নূতন করিবার জন্যই ব্যস্ত হয়, পুরাতনকে সর্ব্ব প্রকারে বর্জ্জন করিয়া চলিতেই সচেষ্ট হয়। ইহাতে যে প্রকৃত কল্যাণ নাই তাহা ইহারা ভাবিয়া দেখে না। পুরাতনকে আশ্রয় না করিলে, পুরাতনের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার না করিলে যে নূতনে যাওয়া যায় না, নূতনকে উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করা যায় না, পুরাতনের উপরই যে নূতন প্রতিষ্ঠিত, অথবা যাহা একদিকে পুরাতন তাহাই অন্যদিকে নূতন, পরস্পর অভিন্ন ভাবে যুক্ত, এই কথা ভুলিয়া চলিতে গেলে জীবন কিছুতেই গড়িয়া উঠিতে পারে না, ভিত্তিহীন কাল্পনিক অট্টালিকা, আকাশ-কুসুম, ভিন্ন আর কিছুই রচিত হইতে পারে না। অনেকে বুঝিতে পারে না যে সত্য কল্যাণকর নূতন সুদূর ভবিষ্যতের বস্তু নয়, উহা সম্পূর্ণরূপেই বর্ত্তমানের জিনিষ। অতীতকে আশ্রয় করিয়া যখন আমরা বর্ত্তমানে উপনীত হই, তখনই সত্য ভাবে পুরাতনকে ছাড়িয়া নূতনে উপস্থিত হই। একমাত্র সেই নূতনই আমার আয়ত্তাধীন, তাহার উপযুক্ত ব্যবহারেই আমার উন্নতি ও কল্যাণ। তাহাকে যদি নূতন বলিয়া না দেখিতে পারি, শুধু পুরাতনই ভাবি, তবে উহার সম্যক মর্য্যাদা করিতে পারিব না, উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা উহা হইতে প্রকৃত উন্নতি ও কল্যাণ লাভ করিতে পারিব না। উহাকে যদি পুরাতন বলিয়া অবহেলা করি এবং নূতনের মোহে অনাগত ভবিষ্যতে হাত বাড়াই, তবে তাহা যে সর্ব্ব প্রকারেই নিস্ফল হইবে তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। সম্যক দৃষ্টি ও চিন্তার অভাবেই আমরা এই প্রত্যেক বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের মধ্যে যে নূতনত্ব রহিয়াছে, তাহা ধরিতে পারি না, দেখিতে পাই না। তাই সবই আমাদের নিকট নিতান্ত পুরাতন, আকর্ষণহীন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। আমরা সাধারণতঃ বড় বড় বিষয় বা ঘটনার দ্বারাই নূতনত্বের বিচার করি। তাহার মধ্যে যে নূতনত্ব আছে, এবং সেই নূতনত্বটা যে সহজেই আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে পারে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা ত সকল সময় সম্ভবপর হয় না। সর্ব্বদাই যে বড় বড় ঘটনা ঘটিবে, এরূপ কোনই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ছোট বড় সকল ঘটনারই একটা বিশেষত্ব আছে, নূতনত্ব আছে এবং প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা রহিয়াছে। তাহা দেখিবার ও বুঝিবার মত শক্তি এবং চেষ্টা যত্ন যাহার নাই, সে যে নিত্য নূতনত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারে না, চির উন্নতি ও কল্যাণের পথে চলিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। ক্ষুদ্র বস্তু দর্শনের শক্তিতে যেমন দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা প্রমাণিত হয়, তেমনি ক্ষুদ্র বিষয়ের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বিশেষত্ব বুঝিবার ক্ষমতাতেই চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সকল মুহূর্ত্তের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত ঘটনা ও অবস্থা লইয়াই মানবজীবন এবং তাহার প্রত্যেকটীর উপযুক্ত ব্যবহারেই জীবনের পূর্ণতা উন্নতি, কল্যাণ ও সার্থকতা। আমাদিগকে এই নিত্য নূতনের সেবক হইয়া চিরবর্ত্তমানে বাস করিতে হইবে, পুরাতনকে বর্জ্জন করিতে হইলেও একান্ত ভুলিতে হইবে না, অগ্রাহ্য করিতে হইবে না, নূতনত্বের মোহে মোহনবেশধারী কাল্পনিক ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া থাকিলেও চলিবে না। অনন্ত প্রবহমান নিত্য কালের সঙ্গে আমাদিগকে নিত্য সজাগ, নিত্য কর্ম্মনিষ্ঠ ক্রম-উন্নতিশীল জীবন যাপন করিতে হইবে, নিত্য নূতন আশা উদ্যম উৎসাহের সহিত নিত্য নূতন উন্নতি ও কল্যাণে বর্দ্ধিত হইতে হইবে। তাহা হইলেই জীবনে পুরাতন ও নূতনের সকল দ্বন্দ্ব বিদূরিত হইয়া তাহাদের মহা-মিলন সাধিত হইবে। সমস্ত কৃত্রিমতা হইতে মুক্ত হইয়া আমরা সত্য জীবন লাভে সমর্থ হইব। করুণাময় পিতা আমাদিগকে সে আশীর্ব্বাদ করুন। আমাদের সকলের জীবনে তাঁহার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক।

কোন্ দিকে ঝুঁকিব ?

ভদ্র রীতি নীতি।

যদি দেখিতে পাই যে কোনও সমাজের অধিকাংশ মানুষ নীতিমান ও নির্দ্দোষচরিত্র, তাঁহারা অসত্য কথা বলেন না, ভদ্রভাবে পরিবার প্রতিপালন ও অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, তবে কি বলিতে পারি যে সেই সমাজটি ধর্ম্মজীবনে সজীব? তাহা নহে; কারণ, মানুষ নীতিমান্ নানা কারণে হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ বোধ হয় লোক-ভয়ে কিংবা স্বার্থের খাতিরে নীতিমান্ হয়। প্রত্যেক ভদ্র সমাজ, প্রত্যেক সভ্য সমাজ, প্রত্যেক শিক্ষিত সমাজ, তাহার অন্তর্গত লোক-গুলিকে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে বাধ্য করে। এই বাধ্যতা হইতে যে নীতি উৎপন্ন হয়, ধর্ম্মসমাজেও তাহা বর্ত্তমান থাকে। এই নীতির একটি সাধারণ ও একটি বিশেষ দিক আছে। সাধুতা, সত্যপরায়ণতা, স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধের পবিত্রতা, প্রভৃতি কতকগুলি দিক্ সাধারণ। এইগুলি ভদ্রসমাজের সামাজিক জীবনকে রক্ষা করে; এইগুলি না থাকিলে সমাজ আর সমাজ থাকে না, সমাজ ভাঙ্গিয়া যায়। আবার সৌজন্য, শিষ্টাচার, মার্জ্জিত রুচি, সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতিতে অনুরাগ,—এই সকল লক্ষণ ভদ্রসমাজের সামাজিক জীবনের ঈষৎ উচ্চতর অঙ্গ। এ সকলের দ্বারা ভদ্রসমাজের সামাজিক জীবন রক্ষা হয় না বটে, কিন্তু সে জীবনের স্বাদ বৃদ্ধি হয়। শিষ্ট সমাজে এই সকল উচ্চতর লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। এক সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজ এইরূপ শিষ্ট সমাজ বলিয়া দেশের মানুষের প্রশংসার দৃষ্টি লাভ করিয়াছিল।

এই সকল উচ্চাঙ্গের লক্ষণের দ্বারা কোনও দলের সামাজিক জীবন মধুর ও আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিলেই কি আমরা তাহাকে একটি সজীব ধর্ম্মসমাজ বলিতে পারি? নিশ্চয়ই নয়। সে সমাজ জীবনহীন হইয়াও ভদ্র রীতি নীতি রক্ষা করিতে পারে, এবং সৌজন্য শিল্প সাহিত্য প্রভৃতির দ্বারা সুন্দর ও আনন্দময় হইতে পারে। চন্দ্রে জীবন নাই, কিন্তু তথাপি চন্দ্র কেমন সুন্দর! চন্দ্রে জীব নাই, উদ্ভিদ নাই, উত্তাপ নাই, বায়ুমণ্ডল নাই, জল নাই; তথাপি তাহার কিরণ কেমন স্নিগ্ধ, কেমন আরামপ্রদ! চন্দ্র দেখিলেই মানুষের মন আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়। লোকের এত প্রিয় এত আনন্দদায়ক বলিয়া যেমন প্রমাণ হয় না যে চন্দ্র জীবিত, তেমনি সুনীতি, সুরীতি, মার্জ্জিত রুচি, শিল্প সাহিত্যের চর্চ্চা প্রভৃতির দ্বারা জগতের আনন্দ ও প্রশংসা উৎপন্ন করিলেও বলা যায় না যে কোন সমাজ ধর্ম্মে জীবিত। 'উন্নত' সমাজ মাত্রই ধর্ম্মে জীবিত সমাজ নহে।

এখানে এ কথা বলা আবশ্যক যে প্রকৃত ধর্ম্মজীবনে নীতি থাকিবেই। কিন্তু তাহা সামাজিক সুরীতির খাতিরে, লোক-মতের চাপে, কিংবা শাসনের ভয়ে উৎপন্ন নীতি নহে। সে নীতির মূল মানব অন্তরে। তাহার কথা পরে বলা হইবে। এখানে "লৌকিক নীতির" কথাই বলা হইতেছে।

সদনুষ্ঠান।

জনহিতকর সদনুষ্ঠান কি ধর্ম্মসমাজের জীবনের পরিচায়ক? প্রকৃত ধর্ম্মজীবন হইতে নানা প্রকার সদনুষ্ঠান প্রসূত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সদনুষ্ঠান মাত্রই ধর্ম্মের পরিচায়ক নহে। আজকাল বড় বড় সহরে কত বড় বড় সদনুষ্ঠান, চলিতেছে। দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবনে বিপন্নের সহায়তামূলক অনুষ্ঠান, অনাথা-শ্রম, আতুরাশ্রম, অবৈতনিক শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি কত ভাল ভাল কাজ চলিতেছে। সুসভ্য দেশসকলে এই শ্রেণীর নানা প্রকার সদনুষ্ঠান, প্রায় গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের ন্যায় সুশৃঙ্খল ও সুপ্রতিষ্ঠিত। একবার টাকার যোগাড় হইয়া গেলে তাহার পর অবাধ গতিতে এই সকল সদনুষ্ঠান চলিতে থাকে। এ দেশের অবস্থাও একদিন সেইরূপ হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। কিন্তু অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, এইরূপ জনহিতকর অনুষ্ঠানটি কিছুকাল পরে একটি যন্ত্রের মত হইয়া দাঁড়ায়; তাহাতে মানুষের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠভাবের কার্য্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সদনুষ্ঠানটির জন্য চাঁদা সংগ্রহ, তাহার আফিসের কাজ কর্ম্ম, প্রত্যেক দুঃখীকে ভিক্ষা দান বা সাহায্য দান, এমন কি রোগী ও আতুরের পরিচর্য্যা পর্য্যন্ত, যেন যন্ত্রে চালিত হইয়া মানুষ করিয়া যাইতেছে। হাঁসপাতালের একজন নর্স (nurse) রোগীর নিকটে আসিলেন। যে নভেল খানা তিনি পড়িতে-ছিলেন, রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিবার সময় তাহার পাতা মুড়িয়া রাখিয়া আসিলেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর উঠিয়া গিয়া পুনরায় সেই স্থান হইতে পড়িতে আরম্ভ করিবেন। তাঁহার দৃষ্টি যে স্নিগ্ধ, তাঁহার পদচালনা যে নিঃশব্দ, তাঁহার স্বর যে মৃদু, তাঁহার স্পর্শ যে কোমল, রোগীর অভাব রোগী স্বয়ং প্রকাশ করিতে না করিতেই তিনি যে তাহা বুঝিয়া ফেলেন, তাঁহার এই সকল গুণ তাঁহার সুশিক্ষার ফল। এই শিক্ষার ফলে তাঁহার পরিচর্য্যায় সেই রোগী আরাম পাইতেছে বটে। কিন্তু সেই সেবকের বা সেবিকার পক্ষে পরিচর্য্যার কার্য্যটি একটি কার্য্য মাত্র; তাহাতে তাঁহার হৃদয় নাই। রোগীর সহিত তাঁহার একটি স্নেহের বা করুণার সম্বন্ধ নাই। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই হাঁসপাতালে যত চিকিৎসা, যত শুশ্রূষা, যত ব্যবস্থা চলিতেছে, সবই যেন একটা বড় কলের চাকা ঘোরানোর মতন। কত সময়ে ধর্ম্মমন্দিরের উপাসনার কার্য্যও এমনই হইয়া দাঁড়ায়। উপাসকগণ সকলে আসিয়া বসিলেন, গায়ক এবং আচার্য্য নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করিলেন; কল ঘুরিল, উপাসনা চলিল; শেষ হইলে সকলে প্রস্থান করিলেন।

তবে কি সদনুষ্ঠান অবজ্ঞার বস্তু? তাহা নহে। যত ভাল কাজ, যত সদনুষ্ঠান, সবই রাখিতে হইবে, সবই চালাইতে হইবে; এবং তাহা ভাল করিয়াই চালাইতে হইবে। কিন্তু ধর্ম্ম সমাজের প্রাণ রক্ষা কেবল সদনুষ্ঠানের দ্বারা হয় না।

সমাজ সংস্কার।

সংস্কারোৎসাহকে কি ধর্ম্মসমাজের প্রাণবত্তার পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? সমাজসংস্কারের কার্য্য দুই প্রকার। প্রথমতঃ, যাহাতে নীতি কলুষিত হয়, তাহার সহিত সংগ্রাম। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবার বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্য্য, চরিত্র-

স্খলনস্থলে নারীকে দণ্ড দিয়া পুরুষকে অব্যাহতি দান, রঙ্গালয়ে ও বিবাহাদির নাচে পতিতা নারীর সংশ্রব, প্রভৃতি, যে সকল প্রথার দ্বারা জনসমাজের নীতি কলুষিত হইয়া যায়, তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। দ্বিতীয়তঃ, অন্যায় ও বৈষম্য দূরীভূত করা। বর্ণভেদ, স্ত্রী পুরুষের সামাজিক মর্য্যাদার ভিন্নতা, প্রভৃতি যে সকল প্রথা দ্বারা মানুষের ভগবদ্দত্ত অধিকারকে অন্যায়রূপে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মের আদেশে উভয়বিধ সংস্কারের কাজকে আপনার কাজ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল দেখা যাইতেছে যে সমাজসংস্কারের কাজটি ধর্ম্মের প্রেরণা বিনাও চলিতে পারে। য়ুরোপে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মসমাজ (church) সংস্কারের কাজে বহুকাল বাধা দিয়া আসিতেছিলেন। বরং যাঁহারা নাস্তিক ও অধার্ম্মিক বলিয়া নিন্দিত ছিলেন, তাঁহারাই সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে অগ্রণী হইয়াছিলেন। এই জন্য ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের প্রথম অর্দ্ধশতাব্দীতে সমাজসংস্কার সূত্রে তাঁহাকে বহুল পরিমাণে য়ুরোপের অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লব-বাদী নাস্তিকগণের চিন্তা ও ভাব বহুল পরিমাণে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাঁহাদিগের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। এখন এই বিংশ শতাব্দীতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, কি এ দেশে, কি বিদেশে, সমাজসংস্কারের কাজটি অতঃপর একেবারে ধর্ম্মের সহিত সংস্পর্শবিহীন হইয়াই চলিবে। এদেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে একত্রে আহার, অসবর্ণ বিবাহ, এবং নারীকে অবরোধ হইতে মুক্ত করিয়া শিক্ষালাভ ও অর্থোপার্জ্জনের অধিকার দান, এই তিনটি বিষয়ে ভারতের শিক্ষিত সমাজ ক্রমে ক্রমে সচেতন হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা এই সকল সমাজসংস্কারের কার্য্যে ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ হইয়া অগ্রসর হইতেছেন। খ্রীষ্টিয় কি ব্রাহ্ম কোনও সংস্কারপ্রিয় ধর্ম্মসমাজের দিকে না তাকাইয়া, কেবল অন্যায় ও বৈষম্য দূর করিবার বার্ত্ত লইয়াই তাঁহারা সমাজসংস্কারে অগ্রসর হইতেছেন।

সংস্কার, বিপ্লব, ও সংরক্ষণ।

শুধু তাহাই নহে। ভারতের সমাজ-আকাশে নব মেঘ পুঞ্জীভূত হইতেছে। অচিরে প্রবল ঝটিকাবর্ত্ত সৃষ্টি হইতে পারে। সমাজসংস্কারের পূর্ব্বোক্ত তিনটি প্রশ্ন তো কেবল শিক্ষিত সমাজের ভিতরে, অর্থাৎ দেশের শতকরা পাঁচজন লোকের ভিতরে, সীমাবদ্ধ। কিন্তু উন্নত ও অবনত শ্রেণীর মধ্যে, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে, মহাজন ও মজুরের মধ্যে, জমিদার ও প্রজার মধ্যে, যে বিপুল সংগ্রামের আয়োজন দেখা যাইতেছে, তাহা ব্যাপক আকার ধারণ করিতে অধিক বিলম্ব নাই। সে ঝটিকা যখন আসিবে তখন ব্রাহ্মসমাজকে বিপ্লববাদিগণ কি চক্ষে দর্শন করিবে? তাহাদের উদ্দাম গতি তো ব্রাহ্মসমাজ সমর্থন করিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মসমাজকে সমাজসংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহাই ব্রাহ্মসমাজের চিরন্তন অথবা একমাত্র অথবা মুখ্য কার্য্য নহে। সমাজ সম্বন্ধে ধর্ম্মের চিরন্তন কাজ কি? সমাজকে নাড়া দেওয়া নয়, সমাজকে ভাঙ্গা নয়। সমাজকে সংস্কার করাও নয়। সমাজকে রক্ষা করা, ও সমাজের মানুষগুলিকে মনুষ্যত্বে বিকশিত করিয়া তোলাই তাহার কাজ। মানুষের চরিত্রে ন্যায়ের পবিত্রতার ও মঙ্গলের প্রতি সেই আনুগত্যের ভাব জাগরিত করা, যাহাতে সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে ব্যক্তিগত জীবন সামাজিক কল্যাণের অনুকূল হয়। সমাজকে শুধু ব্যক্তিগত জীবনের সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্র অথবা সমবেতভাবে মানুষের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্র বলিয়া দর্শন করা, এবং সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বের কল্পনা করিয়া ব্যক্তিকে সমগ্র সমাজ সম্বন্ধে নিয়ত সন্দিহান ও সতর্ক করিয়া রাখা, এই দুইটি ভাব আজকাল প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার কোনও বাধা সমাজে থাকিবে না, এই বিষময় মত আজকাল সাহিত্যের মধ্য দিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করা হইতেছে। এমন কি, "পরিবার ও সমাজ, এই উভয়ের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ সাময়িক সম্বন্ধ মাত্র হউক, যতদিন তাহার ব্যক্তিত্বের প্রসারের সুবিধা সেখানে হয়, ততদিন মাত্র সে সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকুক, তাহার পর প্রয়োজন হইলে মানুষ যেমন নিজের পুরাতন club ছাড়িয়া দিয়া নূতন club এ ভর্ত্তি হয়, তেমনি পুরাতন দাম্পত্য সম্বন্ধ অথবা পুরাতন সমাজের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া সে নূতন সম্বন্ধ গ্রহণ করিবার অধিকারী হউক," ইহাই যেন কোন কোন শ্রেণীর মানুষের মনের কথা। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ, এই তিনেরই জন্য যে 'আদর্শ' বলিয়া একটি বস্তু আছে, এবং সেই আদর্শের আনুগত্য বিনা যে কাহারও কল্যাণ নাই, স্বাধীনতাই যে চরম কল্যাণ নহে, এ সকল সত্য তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। তাই, সংস্কার ও বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না।

ব্রাহ্মসমাজের অতীত ইতিহাসে সমাজসংস্কারের অধ্যায়টি যতই গৌরবময় হউক না কেন, আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, সমাজের প্রতি ধর্ম্মের চিরন্তন ভাব (permanent attitude) হইবে তাহাকে রক্ষা করা, দৃঢ় করা, উন্নত করা। এবং ব্যক্তিকে সমাজ ভাঙ্গিতে শিখানো নয়, বরং সহজে সমাজশাসনের অধীন হইতে শিখানো। প্রাচীন সমাজে সমাজশাসনের নিয়ম-গুলিতে যে ভুল ছিল, তাহার সংস্কার করা অবশ্যই প্রয়োজন। প্রাচীন সমাজের শাসনে ও বন্ধনে শাস্ত্রের ব্রাহ্মণের বা দেশাচারের যে দোহাই ছিল, তাহা তুলিয়া দিয়া, তাহার স্থানে ব্যক্তিগত বিবেকের, ন্যায়ের, পবিত্রতার দোহাই আনা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু তদপেক্ষাও অধিক প্রয়োজন ব্যক্তিকে সমাজের কল্যাণের কাছে নত হইতে শিক্ষাদান করা। এইজন্য, সমাজসংস্কারকে অবিচারে ধর্ম্মসমাজের জীবনী-শক্তির লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

সাধন নিষ্ঠা।

ভদ্র রীতি নীতি, জনহিত সাধন, সমাজসংস্কার, এ সকলের পরে সাধননিষ্ঠার দিকে আমাদিগের দৃষ্টি পতিত হয়। এদেশ সাধনে নিষ্ঠার সনাতন আদর্শটির জন্য জগতের প্রশংসা দাবী করিয়া থাকেন। তাহাই কি ধর্ম্ম-সমাজের প্রাণবত্তার পরিচায়ক? এদেশে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধন-নিষ্ঠার ভাবটি এখনও প্রবল রহিয়াছে। যাহার মানুষগুলি নিয়মিতরূপে জপ-তপ পাঠ পূজা অর্চ্চনা করে, কখনও সে সকলের নিয়ম লঙ্ঘন করে না, এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলী

দেশের নানাস্থানে এখনও রহিয়াছে। ইহার মধ্যে আধুনিকতম কোন কোনটিতে এক এক জন ব্যক্তিবিশেষকে আদর্শ-রূপে দণ্ডায়মান করা হইয়াছে, ও তাঁহাকে অবতার গুরু বা কেন্দ্ররূপে দর্শন করিতে বলা হইয়াছে। একজন মানুষকে কেন্দ্রস্থলে রাখিলে ধর্ম্মসাধন কোনও কোনও বিষয়ে সহজ বোধ হয়। ধর্ম্মের অন্ততঃ একটি আদর্শ, সেই মানুষটিকে দেখিয়া মনের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সে আদর্শ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও সহজ বলিয়া মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে। একটি বা দুটি মাত্র সত্যকে মনের সম্মুখে রাখা সহজ। যে কয়টি চরিত্রগুণ কেন্দ্রস্থিত মানুষটিতে দৃষ্ট হয়, শুধু সেই কয়টির অনুসরণ করা সহজ। এবং সেই এক জনের প্রতি অনুরাগে মিলিত সমসাধকগণের সঙ্গের দ্বারা এরূপ মণ্ডলীতে একরূপ গাঢ়তাও উৎপন্ন হয়। ধর্ম্মসাধনে নিষ্ঠা, কেন্দ্রস্থ মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ অনুরাগ, ও মণ্ডলীর গাঢ়তা,—এই সকল লক্ষণকেই কি ধর্ম্মসমাজের জীবনীশক্তির পরিচায়ক লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিব? একবার ঐ সকল মণ্ডলীর মানুষগুলির দৈনিক জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখি। তাহাতে কি সাধননিষ্ঠার অনুরূপ চরিত্রের উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়? তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত চরিত্রে কি সাধুতায় ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় দৃঢ়তা আছে? ব্যবসায়ক্ষেত্রে নীচতার বা ক্ষুদ্রাশয়তার পথে কখনও যাইব না, সাধারণের চক্ষে ধূলা দিয়া ব্যবসায়ে লাভ কখনও করিব না, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কি তাহাদের জীবনে আছে? তাহাদের গৃহ পরিবারে গিয়া কি মনে হয় যে এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে নিত্য স্বর্গের বাতাস বহিতেছে? এ সকলের কোন চিহ্ন নাই, এ সকলের দিকে দৃষ্টিও নাই। যে ধর্ম্মসাধন মানুষের চরিত্রকে মহৎ করে না, কার্য্যগত জীবনকে উচ্চস্তরে তুলিয়া লইয়া যায় না, তাহা যত ঘনিষ্ঠ সাধকমণ্ডলী প্রস্তুত করুক না কেন, তাহা নিষ্ফল। সজীব ধর্ম্মসমাজের ছবি মনে মনে অঙ্কিত করিতে গেলে যাঁহাদের মনে কেবলমাত্র যীশুর দ্বাদশ জন শিষ্য, কিংবা চৈতন্যদেবের সাঙ্গোপাঙ্গ, কিংবা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যদল, প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক কয়েকটি সাধননিষ্ঠ মণ্ডলীর ছবিই আসে, আর কিছু আসে না, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা একমত হইতে পারি না। ঐ সকল দলের লোকেরা বৈরাগ্য, সাধননিষ্ঠা এবং কেন্দ্রস্থিত মানুষটির প্রতি বিশ্বস্ততা খুব প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু আমাদের এই যুগে চারিদিককার যে সকল দায়িত্ব ও সংগ্রামের মধ্যে ঈশ্বর আমাদিগকে স্থাপন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে থাকিয়া কিরূপে আমরা আমাদের অন্তরের পবিত্র ও উন্নত আদর্শ সকলকে রক্ষা করিব, এ জগতে কিরূপে মানুষের মত দাঁড়াইতে পারিব,—এই বিষয়ে তাঁহাদের ঐ সাধননিষ্ঠার দৃষ্টান্ত হইতে আমরা উপযুক্ত বল ও আলোক লাভ করি না।

সেই ধর্ম্মসমাজ জীবিত, যাহার মানুষগুলি নিজ জীবনে, অর্থাৎ ব্যক্তিগত চরিত্রে ও আচরণে এবং পারিবারিক সকল ব্যবস্থায়, ঈশ্বরের নির্দ্দেশে ঈশ্বরের ইঙ্গিতে চলিবার জন্য ব্যাকুলতায় প্রদীপ্ত। যাহার মানুষগুলি প্রতিদিন অন্তরের ইচ্ছা রুচি কামনা, জীবনের সুখ দুঃখ কর্ত্তব্য দায়িত্ব, ঈশ্বরের সম্মুখে রাখে; রাখিয়া সেই সকলের মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা বুঝিবার জন্য ব্যাকুল হয়, ও তাঁহার ইচ্ছা পালন করিবার জন্য প্রাণপণ করে। "ঈশ্বরের সম্মুখে নিয়ত নিজ ইচ্ছা রুচি কামনা কল্পনা এবং জীবনের ঘটনা অবস্থা কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সকলকে স্থাপন করা, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার ও অনুসরণ করিবার জন্য নিয়ত প্রাণপণ করা,"—ইহাই ধর্ম্মসাধনের প্রকৃত আদর্শ। ঝুঁকিতে হয়, তো এই দিকেই ঝুঁকিতে হইবে। ইহার পরিবর্ত্তে, এই আদর্শের স্থলে, কোনও পূজা অর্চ্চনা স্তব ধ্যান ধারণা নাম-জপ তপস্যা শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতির প্রতি নিষ্ঠাকে স্থাপন করা চলিতে পারে না। এই সকলের কোন কোনটি অবস্থানুসারে উপায় বলিয়া গৃহীত হইতে পারে; জীবনকে ঈশ্বরানুগত করিবার যে বিশালতর চেষ্টা, তাহার অন্তর্গত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবনে সাধননিষ্ঠাই একমাত্র লক্ষ্য, ইহা বলিলে অতি গুরুতর ও মারাত্মক ভ্রম করা হয়।

"ধর্ম্ম সাধনের লক্ষ্য কি," এ বিষয়ে রামমোহন রায়ের একটি উত্তর ছিল,—ঈশ্বরকে জগতের কারণ ও নিয়ন্তারূপে অনুভব করিয়া তাঁহার চিন্তা করা, এবং লোকহিতে আত্মনিয়োগ করা। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং প্রীত্যনুকূল কার্য্য, অর্থাৎ তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন, ইহাই মুখ্য উপাসনা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন, এ উভয়ই তাঁহার উপাসনা। কেবল ঈশ্বরের অর্চ্চনা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাপালনই যে ধর্ম্মজীবনের প্রধান কথা, এই সত্যকে আচার্য্য কেশবচন্দ্র ১৮৬৮ সালে নূতন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় আরও স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" মন্ত্রে "উপাসনা" কথাটিকে একটি নূতন ও বিশালতর অর্থ দিতে চাহিয়াছিলেন। পূজা অর্চ্চনা ধ্যান ধারণা প্রভৃতি প্রাচীন সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া, ব্রাহ্মের ভাষায় ইহা সমগ্র জীবনের ঈশ্বরমুখীনতা ও ঈশ্বরানুগত্য বুঝাইতে ব্যবহৃত হইবে, তাঁহার এইরূপ আকাঙ্ক্ষা ছিল। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, ইঁহারা কেহই প্রাচীন সাধননিষ্ঠামাত্রকে ধর্ম্মজীবনের প্রধান লক্ষণ বলিয়া মনে করেন নাই কিংবা শিক্ষা দেন নাই। দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে হিন্দু প্রকৃতির সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ব্রাহ্মের শাস্ত্রে এ কথা আছে বটে যে সমগ্র জীবনকে ঈশ্বরানুগত করাই উপাসনা। কিন্তু ব্রাহ্মদের ধর্ম্মালাপে ধর্ম্মব্যবস্থায় ক্রমশঃ সেই সঙ্কীর্ণতর অর্থের উপাসনা, অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপচিন্তা অর্চ্চনা ধ্যান, ও সেই সময়ের সেই চিন্তাধারা হইতে উদ্ভূত প্রার্থনা, (যাহার সঙ্গে সেই মানুষটির সত্য জীবনের যোগ হয়তো কিছুই নাই) প্রধান হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই সঙ্কীর্ণতর আদর্শটির উপরে বিগত দুই পুরুষের ব্রাহ্ম নেতাগণ এত অধিক ঝোঁক দিয়াছেন, শুধু এইটুকু দেখিয়া এত সন্তোষ, এবং এই টুকুর অভাব দেখিয়া এত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, যে তাহার তুলনায় চরিত্র-

গত প্রশ্নের আদর্শটি অত্যন্ত ম্লান হইয়া পড়িয়াছে
১৮৬৫ সালের সন্নিহিত যুগে এমন দিন গিয়াছে, যখন ব্রাহ্ম জীবন বলিলেই সত্যপরায়ণতা সাধুতা ও সচ্চরিত্রতা বুঝাইত। তখন বিবেকানুগত্যই ধর্ম্মজীবনের প্রধান বস্তু ছিল, কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। ধর্ম্মসাধনে তখন আত্মদৃষ্টি ও প্রার্থনা প্রধান স্থানে ছিল। তখন কোনও ব্রাহ্মকে 'সাধক' নামে অভিহিত করিতে না পারিলেও তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে 'সাধু' বলা যাইত, এবং 'সাধু' নাম তখন ব্রাহ্মের পক্ষে বড়ই আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল। কিন্তু আমাদের হিন্দু রক্তই ক্রমশঃ জয়ী হইল। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে এই বিবেকানুগত্যের দিকে ঝোঁকটি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে, যেন মনকে বুঝাইবার জন্য, যেন মনের দাঁড়ি পাল্লায় ওজন সমান রাখিবার জন্য, জটিল দীর্ঘ উপাসনা-প্রণালীর মূল্য বৃদ্ধি করা হইল, তাহার উপরে আস্থা বাড়াইয়া তোলা হইল। "চরিত্র খাঁটি কি না, কর্ত্তব্যপালন ঠিক হইতেছে কি না," এই প্রশ্ন ক্ষীণ, ও ইহার জবাব অস্পষ্ট; উপাসনা কতক্ষণ করিতেছ, এবং তাহা ভাব ও চিন্তা দ্বারা সরস হইতেছে কি না" এই প্রশ্ন প্রধান হইয়া দাঁড়াইল। পঞ্চাশ বৎসর পরে আমরা আজ (১৯২০) চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে এই যুগের ফল আহরণ করিতেছি, এই যুগের ফসল কাটিতেছি। যে দেশে মানুষের চরিত্রে মেরুদণ্ড ছিল না, যে দেশে মানুষকে ভাল করিবার আদর্শ ছিল তাহাকে শাস্ত্রের গুরুর অভিভাবকের দেশাচারের পুরোহিতের দশটা ঠেকা দিয়া রাখা, যে দেশে মানুষকে নিজ অন্তরের আলোকের নিকটে বিশ্বস্ত থাকিবার মহত্ত্ব কখনও শিখান হয় নাই, যে দেশে মানুষকে নিজ বিবেকের অনুমোদন লইয়া সংসারে সহস্রের সমুখে একাকী বীরের মতন দণ্ডায়মান হইতে কখনও শিখান হয় নাই, সেই দেশে ব্রাহ্মসমাজের মতন এমন একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়, যদি পঞ্চাশ বৎসরে একটা মহৎ চরিত্রের tradition, মানুষের মত মানুষ হইবার tradition গড়িয়া তুলিতে পারিত, তবে কত বড় কাজ হইত! ইংরেজের কাছে নেল্‌সনের যুগে duty কথাটি যেমন অগ্নিময় ছিল, সেইরূপ একটি মাত্র অগ্নিময় আদর্শ ব্রাহ্ম পরিবারে সঞ্চার করিতে পারিলে বড় কাজ হইত! তাহা না করিয়া আমরা কি তৈয়ারী করিলাম? তৈয়ারী করিলাম, সেই বিবেকবিহীন আদর্শবিহীন মেরুদণ্ডবিহীন তেজোবীর্য্যবিহীন মানুষ ও পরিবার, এবং তাহাতে দিয়া দিলাম শুধু একটু উপাসনার গন্ধ। দ্বিতীয় পুরুষে তো সেই উপাসনার গন্ধটুকুও রহিল না।

ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আনুগত্য, অন্তরের মহৎ আদর্শ সকলের কাছে আনুগত্য, উন্নত চরিত্র, মহামনা ব্যবহার, পুণ্যের তেজ, এবং সমাজ মধ্যে এইরূপ মনুষ্যত্ব-সম্পন্ন মহামনা জীবনসকলের উত্তাপ ও প্রভাব, তাঁহাদের প্রভাবে বিদ্যুন্ময় একটি হাওয়া,—ইহাই হইল ধর্ম্ম সমাজের প্রাণ। আমরা বিগত যুগের ভ্রম সংশোধন করি; কূলে নৌকা বাঁধিয়া দাঁড় টানার মতন যে সাধন তাহাতে আস্থা ত্যাগ করিয়া চরিত্রগত ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হই; এই দিন ফিরিয়া যাইবে।

সার কথা সরল ভাবে বলা।

ধর্ম্মজীবনের সার কথা কি? মূল কথা কি? ঈশ্বরের ইচ্ছার আনুগত্য ও ঈশ্বরের ইচ্ছায় নির্ভর। ইহার চাইতে বেশী লম্বা চওড়া কথা, জটিল কথা যত আছে, সে সকল ইহার অলঙ্কার মাত্র, ইহার উপরের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি মাত্র। মূল কথাটাকে বেশী জটিল করিয়া ভাবিলে বলিলে প্রচার করিলে তাহার শাস্তি পাইতে হয়। সে শাস্তি,—জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতা।

ভক্তিভাজন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার নয়নতারা উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদে বলিতেছেন, এক দিন ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক মহেন্দ্র বাবুর সহিত আলাপপ্রসঙ্গে নয়নতারা বলিলেন, "লোকে বলে অনেক তপস্যা না হ'লে ঈশ্বরে ভক্তি হয় না। আমি বলি, হৃদয় মনকে পবিত্র রাখা ও জীবনের কর্ত্তব্যগুলো ভাল ক'রে করাই প্রধান তপস্যা।" শাস্ত্রী মহাশয় নয়নতারাকে তাঁহার নিজের এই বাক্যেরই প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ করিয়া গড়িয়াছেন। প্রচারক মহাশয় সেই দিন বিদায় লইয়া যাইবার সময় পথে চলিতে চলিতে নয়নতারার কথাগুলি ভাবিতে লাগিলেন। মনে মনে বার বার বলিতে লাগিলেন, "হৃদয় মনকে পবিত্র রাখা ও জীবনের কর্ত্তব্যগুলি সুন্দররূপে সম্পাদন করাই প্রধান তপস্যা,—কি কথা-গুলিই শুনলাম!" নয়নতারার প্রণয়ী হরেন্দ্র, মহেন্দ্র বাবুর সঙ্গে নয়নতারার ঐ কথোপকথন শুনিয়াছিলেন। যখন ক্ষণকাল পরে নয়নতারার সহিত হরেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল, তখনও হরেন্দ্রের মনে সেই কথাগুলি ঘুরিতেছে, ও প্রাণে এই উচ্চ আদর্শের উপযুক্ত হইবার জন্য দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা উঠিতেছে। সেদিন উভয়ের আলাপ ঐ কথা লইয়াই আরম্ভ হইল।

আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নয়নতারার মুখ দিয়া ধর্ম্মের যে সরল অথচ ঐকান্তিক আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজেরই মনের কথা। কিন্তু আমরা জানি, ধর্ম্মের আদর্শ এত সরল করিয়া বলাতে ইহা অনেকের নিকটে তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে।

কোন্ দিকে ঝুঁকিব?

এক দিকে কেবল সমাজসংস্কারের প্রতি ও কর্ম্মবহুলতার প্রতি ঝোঁক, এবং অপর দিকে কেবল উপাসনা ধ্যান ধারণার প্রতি ঝোঁক, উভয়ই অপূর্ণ আদর্শের ফল। ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার ইচ্ছা পালনই পূর্ণ আদর্শ। শুধু তাহাই নহে। সাধন নামে চিহ্নিত কার্য্যসকলের দ্বারা আপনার তৃপ্তি অন্বেষণ, অথবা সে সকলের দ্বারা ঈশ্বরকে খুসী করা যায় এই বিশ্বাস, ধর্ম্মরাজ্যের নিম্ন স্তরে অবস্থিতির পরিচায়ক। "আমি উন্নত চরিত্র ও মহৎ জীবনের দ্বারা ঈশ্বরকে খুসী করিব," এই আকাঙ্ক্ষা তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্তরের বস্তু।

'ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন' এই পবিত্র বাক্যটি ব্রাহ্মসমাজে আজকাল প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। অন্তর্দৃষ্টি, আত্ম-পরীক্ষা, অনুতাপ, আত্মসংশোধন, মানুষের প্রতি কৃত অপরাধের জন্য নম্রভাবে ক্ষমা ভিক্ষা, অপরের উন্নত ভাবের প্রতি শ্রদ্ধা দান, সাধুভক্তি,—ইচ্ছা-সমর্পণ মূলক সাধনের এই সকল লক্ষণ এখন লুপ্তপ্রায়। এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ধর্ম্ম মহৎ হয়। এই সকল লক্ষণ নিস্তেজ হইয়া গেলে, একমাত্র

নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনামূলক উদার ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মও নীচু দরের ধর্ম্ম হইয়া যায়। এই দিকে ঝোঁক কমিয়া যাওয়ার যে ফল ব্রাহ্মসমাজে তাহা ফলিতেছে। উপাসনা বাক্য-বহুল, দীর্ঘ, ও শুষ্ক হইতেছে; কর্ম্ম প্রাণস্পর্শ-বিহীন হইয়া উত্তাপ উদ্গিরণ করিতেছে। যে উপাসনার পশ্চাতে ঈশ্বরের ইচ্ছার হস্তে আত্মসমর্পণের ভাবটি থাকে, তাহাই অনুপ্রাণনময়; তদভাবে তাহা অসার ও অকিঞ্চিৎকর। কর্ম্মের পশ্চাতে ঐ ভাবটি থাকিলেই কর্ম্ম ধর্ম্মের অঙ্গ; নতুবা তাহা শক্তির খেলা মাত্র।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ,
কলিকাতা। শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
রবিবার, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯২০

প্রচার ব্যবস্থা

(কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এক বিশেষ অধিবেশনে পঠিত)

প্রচারকার্য্যে লিপ্ত হ'য়ে, একদিকে নিজের অযোগ্যতা এবং শিক্ষার অভাব পদে পদে অনুভব করেছি, এবং অন্য দিকে সমাজশক্তির উদাসীনতা এবং কাজের অব্যবস্থা দেখে মর্ম্মাহত হয়েছি। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণকে নূতন কোন তত্ত্ব আমি জানাব, এ ধৃষ্টতা আমার নাই। সকলের জানা কথাই, আমি আমার ভাষা এবং চিন্তার আকারে প্রকাশ করিব। অতি সংক্ষেপে কয়েকটা কাজের কথাই বলা আমার উদ্দেশ্য। আশা এই, যদি অবস্থার কিছু উন্নতি হয়।

গাছ-পাকা ফজলী আম ইচ্ছামত গাছ হ'তে পেড়ে নিজেরা খাব এবং আর দশজনকে খাওয়াব ব'লে, ফজলী আমের কলম আনিয়ে বাড়ীতে লাগালাম। কলমটাকে লাগিয়ে দিলেই কি পাকা আম পাওয়া সম্ভব? ঐ চারার কত তদ্বির করলে তবে ওটা বাড়বে, বড় হবে, এবং শেষে ফল ফলবে। কত সার, কত জল দিতে হবে, পোকা মাকড় হ'তে বাঁচাতে হবে, তবে উদ্দেশ্য সফল হবে। এ যেমন সোজা কথা, এও তেমনি সোজা কথা যে, ২।৪ জন যুবককে প্রচারার্থী ব'লে এনে, স্থান-বিশেষে কিছুদিন রেখে দিলেই তারা আচার্য্য বা প্রচারক হ'তে পারে না। ফজলী আমের চারা অস্থানে কোন রকমে বেঁচে থেকে যে আম জন্মায় তা আকারে প্রকারে ফজলীর কলঙ্ক—ফজলীর রূপ এবং রস তাতে থাকে না।

ব্রাহ্মধর্মের মধুর রস ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আস্বাদন পাওয়া এবং দেওয়াই ব্রাহ্মসমাজের কাজ। এ বিষয়ে নিজের নিজের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য অনেক। কিন্তু আমরা দুর্ব্বল, একা পারি না; তাই, সকলকে এ বিষয়ে সাহায্য করবার জন্যেই আচার্য্য ও প্রচারকের প্রয়োজন। সমাজের **সমবেত শক্তি ও সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল** হবেন আচার্য্য ও প্রচারকগণ। সমাজের রসে পরিপুষ্ট হ'লেই, তাঁরা আশানুরূপ বৃহৎ এবং মধুর ফল দান করতে পারেন। এ বিষয়ে সমাজে একটা অতৃপ্তির ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেই অতৃপ্তির ইতিহাসই সমাজের জীবনীশক্তির পরিচায়ক। কেন না, সকল উন্নতির মূলে অতৃপ্তি, অভাববোধ। জড়ের অতৃপ্তি নাই। প্রাণীমাত্রেরই অতৃপ্তি আছে। অতৃপ্তি আছে বলেই প্রাণক্রিয়া আছে। যে তৃপ্ত সে মৃত। যে অতৃপ্ত, সে জীবিত। চারিদিকে ময়লা দুর্গন্ধ, মশা মাছি, রোগ অকাল মৃত্যু, অজ্ঞতা দুর্নীতি, তার মধ্যে বাস ক'রেও যে চুপ চাপ রয়েছে, গল্প করছে, খাচ্ছে বেড়াচ্ছে, কোন উৎকণ্ঠা নাই, সে মৃত। আর, এসব দেখে যে যে পরিমাণ অতৃপ্ত, এসব দূর করতে ব্যস্ত, সে সেই পরিমাণে জীবিত।

ব্রাহ্মসমাজের প্রচারব্যবস্থায় অতৃপ্তি বার বার প্রকাশিত হয়েছে। তার গোড়ার কথা এই যে, এ সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যে অমৃতময় আস্বাদন কিছু পরিমাণে পেয়েছিলেন এবং কখনও কখনও পেয়েছিলেন, তা যথেষ্ট পরিমাণে পাচ্ছিলেন না, অপরকে ভাল ক'রে দিতেও পাচ্ছিলেন না।

১। এই অতৃপ্তি হ'তে সাধনাশ্রমের জন্ম। ২। এই অতৃপ্তি হ'তে ১৮৯৮—৯৯ সালে শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক বিস্তৃত প্রবন্ধ পাঠ। তাতে বলেছিলেন যে আমাদের এই সব অভাব (১) সাধন-প্রণালী, (২) স্থায়ী প্রচারকেন্দ্র ও প্রচারক, (৩) প্রচারের সমস্ত কাজ ও দায়িত্ব একত্র করা, ও প্রচারপ্রণালী নির্দ্ধারণ, (৪) কলিকাতার ব্রাহ্মগণের ধর্ম্মজীবনের সহায়তা করা।

৩। এই অতৃপ্তি হ'তে ১৯০৪-৫ সালে Dr. P K Rayএর বিশেষ অভিভাষণ, ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থার কথা। ৪। এই অতৃপ্তির কথা History of the B. S এ (১) গৃহে সাধনের অভাব, (২) দায়ী আচার্য্য (৩) প্রচারকার্য্যপরিচালনে দায়িত্বের অভাব, ব্যক্তিগত সহায়তার অভাব।

৫। ১৯১৭ সালে প্রচারকার্য্যের উন্নতির উপায় বিষয়ে আলোচনা। ৬। ১৯২৪ সালে গুরুদাস বাবুর পত্র। ৭। ১৯২৫ সালে সভাপতির অভিভাষণ ৮। ১৯২৬-২৭ সালে সভাপতির অভিভাষণ।

উক্ত বিভিন্ন সময়ের আন্দোলনের মধ্যে একই অতৃপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সে অতৃপ্তির কারণ এখনও আছে।

কোন ধর্ম্মসমাজের সব লোকই সমান ধর্ম্মপ্রাণ হ'তে পারে না। কিন্তু ধর্ম্মাচার্য্যগণও যদি ধর্ম্মজীবনের উন্নত আদর্শস্থল না হ'ন, শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র না হ'তে পারেন, তা হ'লে সে সমাজের অবস্থা বড়ই খারাপ। আমাদের এই চিন্তার কারণ উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে সমাজের জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠগণের দৃষ্টিপাত আবশ্যক। প্রচারকার্য্য কিরূপে সুপরিচালিত হয়, সে বিষয়ে চিন্তা করতে গেলে, উদ্দেশ্য হ'তে কার্য্য ব্যবস্থা পর্য্যন্ত সব বিষয়েই মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। ব্রাহ্মসমাজের এক-মাত্র উদ্দেশ্যই ধর্ম্ম প্রচার বা বিস্তার। আর সব উপলক্ষ্য।

ব্রাহ্মদিগকে ধর্ম্মজীবনের গভীরতালাভে সহায়তা করা, ব্রাহ্মপরিবারগুলিতে ধর্ম্মসাধন জীবন্ত রাখিতে চেষ্টা করা, ব্রাহ্ম বালক বালিকাগণের অন্তরে নীতিজ্ঞান ও ধর্ম্মবোধ বিকশিত করা, ব্রাহ্মসমাজের সকল বিভাগে গভীর জ্ঞান, বিশাল প্রেম ও বিশুদ্ধ সেবাতৎপরতার আদর্শকে উজ্জ্বল রাখা, এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বাণী চতুর্দ্দিকে বিস্তারের জন্য বিধিমতে চেষ্টা করা, ব্রাহ্মসমাজের মুখ্য কর্ত্তব্য। ইহাকেই এক কথায় বলা যায় ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার।

২। যিনি এই সকল কাজে ব্রতী তিনিই আচার্য্য, তিনিই প্রচারক। ব্যক্তি বিশেষের স্বাভাবিক শক্তি, গভীর সাধন এবং সুশিক্ষার উপর একদিকে এই সকল গুরুতর কার্য্যের সফলতা নির্ভর করে, অপর পক্ষে শিক্ষা-ব্যবস্থা, সাধনপ্রণালী এবং প্রচারপ্রণালীও একার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করে। প্রত্যেক কাজেরই সু-প্রণালী আছে। সেই প্রণালী অবলম্বনে কাজ সহজসাধ্য হয়। অন্যান্য বিষয়ের মত কার্য্যপ্রণালীরও ক্রম-বিকাশ আছে; তা অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ।

৩। শিক্ষাপ্রণালী, সাধনপ্রণালী, এবং সেই শিক্ষা ও সাধনলব্ধ শক্তিকে কাজে প্রয়োগ করবার প্রণালী, নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। বিশেষ লক্ষ্যসাধনের জন্য বিশেষ প্রণালী ও ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজনীয়, নতুবা কোন কাজ সুসম্পন্ন হয় না। সকল বিষয়েই সুচিন্তিত সুনির্দ্দিষ্ট বিধি ব্যবস্থা আবশ্যক।

৪। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে যাঁরা ব্রতী হবেন, তাঁদের ব্রত যেমন গুরুতর, তাঁদের শিক্ষা ও কার্য্যব্যবস্থাও তেমনি শ্রেষ্ঠতর হওয়া আবশ্যক। বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম কোথায় প্রচারিত হবে, কোথায় সফল হবে? যে জীবনে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং পবিত্র চরিত্র কিছু পরিমাণে বিকশিত হয়েছে, সেই জীবনেই ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থান পেতে পারে। অতএব জন সমাজের মধ্যে যাতে শ্রেষ্ঠতর ভাব ও চরিত্রের বিকাশ হয়, তার জন্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের ভিত্তিভূমিরূপে বহু কাজ করতে হবে। যেমন শিক্ষা-বিস্তার, নীতিজ্ঞান ও ধর্ম্মবোধের বিকাশ, নিম্নশ্রেণীর সকলের উন্নতি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাববৃদ্ধি, এবং সর্ব্ব সাধারণের কল্যাণসাধন ও সেবা।

৫। প্রচার বিভাগ—এই সকল উপায়ের দ্বারা নরনারীকে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের উপযোগী করা, এবং বিধিমতে তাঁদের জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করাকেই যাঁহারা জীবনের প্রধান ব্রতরূপে অনুভব করেন, এরূপ অনুরাগী ব্যক্তিগণকে তাঁদের কাজের উপযোগী শিক্ষাদান এবং কাজের ব্যবস্থা করা, সমাজের প্রচার-বিভাগের কর্ত্তব্য। এই ব্যবস্থা এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, শিক্ষান্তে প্রচারকগণ গভীর জ্ঞান, বিশাল প্রেম, দৃঢ় বিশ্বাস এবং জ্বলন্ত সেবানুরাগে ভূষিত হ'য়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হ'তে পারেন; যেন তাঁরা জনসমাজের শিক্ষিত অথচ কুসংস্কারের অধীন উপধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের তুলনায়, জ্ঞানে প্রেমে ও সেবায় শ্রেষ্ঠতর আদর্শ দেখাতে পারেন।

৬। সুতরাং প্রচারবিভাগের কর্ত্তব্য দুই প্রকার ১ম—প্রচারকগণকে বিধিমতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা, ২য় শিক্ষিত প্রচারকগণের কাজের ব্যবস্থা করা, এবং উভয় প্রকার কাজই সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে করা (as an organised body)।

৭। প্রচার সভা—প্রচারার্থীনির্ব্বাচন, নির্ব্বাচিত প্রচারার্থি-গণের শিক্ষা সাধন ও বাসাদির ব্যবস্থা, নিয়মিত পরীক্ষার ব্যবস্থা, এবং যথাকালে তাঁহাদের কাজের ব্যবস্থা, এবং সর্ব্বতোভাবে প্রচারকার্য্য পরিচালনের জন্য একটি সভা থাকিবে।

৮। প্রচার সভা গঠন—প্রচার সভা ৫ বছরের জন্য গঠিত হবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার পর এক সপ্তাহ মধ্যে পরিচারক ও প্রচারকগণ ৪ জন প্রচারককে এই সভার সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদককে জানাবেন। এই নির্ব্বাচন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমোদনসাপেক্ষ। উক্ত নির্ব্বাচনের পর এক সপ্তাহ মধ্যে অথবা অধ্যক্ষ সভার প্রথম অধিবেশনে অধ্যক্ষ সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অপর সভ্যগণের মধ্য হ'তে আরও দুইজন সভ্যকে নির্ব্বাচন করিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ও সম্পাদক স্বতঃই এই সভার সভ্যরূপে গণ্য হবেন। যদি কখনও প্রচারকের সংখ্যা চারিজনের কম হয়, অথবা যদি প্রচারকগণের মধ্যে চারিজন প্রচারসভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে স্বীকৃত না হন, তবে যত জনের অভাব হইবে, "অধ্যক্ষ সভা" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের মধ্য হইতে ততজন নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৯। প্রচার সভা—নিজ কার্য্য সম্পাদনার্থ একজনকে সভাপতি এবং একজনকে আপনাদের সম্পাদকরূপে নিয়োগ করিবেন। সভাপতির নির্ব্বাচন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমোদনসাপেক্ষ। সভাপতির সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক হওয়া চাই।

প্রচার সভার কর্ত্তব্য—প্রচারার্থীনির্ব্বাচন, তাঁহাদের শিক্ষা, সাধন, পরীক্ষা, ও বাসের ব্যবস্থা করা; পরিচারক ও প্রচারক নিয়োগ এবং তাঁহাদের কার্য্য ও বাসাদির ব্যবস্থা করা; উপাসক-মণ্ডলী গঠন ও আচার্য্য নিয়োগ; মফঃস্বলের মণ্ডলীগুলির সহিত যোগরক্ষা, ও তাঁহাদের সহায়তা করা; পরিবারে ধর্ম্মসাধন ও সন্তানগণের ধর্ম্মশিক্ষার সহায়তা করা; সাধনাশ্রমকে বা প্রচারকনিবাসকে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের ও শিক্ষার সুব্যবস্থায় পূর্ণ অনুকূল স্থানরূপে রক্ষা করা। এবং সাধন ভজনে ব্রাহ্মগণের মধ্যে গভীর মিলন সাধনের চেষ্টা করা, প্রচার বিভাগ সংক্রান্ত আয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করা এবং ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় প্রেরণ করা।

১০। কার্য্য প্রণালী—প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার প্রচার-সভার অধিবেশন হইবে। সম্পাদক, সভা আহ্বান কার্য্য-বিবরণ রক্ষা এবং সভার নির্দ্দেশ অনুসারে সমুদয় কার্য্যের ব্যবস্থা করিবেন। তিন জন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই সভার কার্য্য হইবে। সভ্যগণ সর্ব্বদা প্রার্থনাশীল অন্তরে একমত হইয়া কার্য্য করিবেন। কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে, সেই প্রশ্নের বিচার কিছুকাল স্থগিত রাখিয়া, ভগবানের আলোক-লাভের জন্য বিশেষ প্রার্থনা ও চিন্তা করিবেন। প্রচারার্থী গ্রহণ এবং পরিচারক ও প্রচারক নিয়োগ বা বর্জ্জন অথবা কোন নিয়মপ্রণয়ন যে অধিবেশনে হইবে, তাহাতে অন্ততঃ ৬ জন সভ্যের উপস্থিত থাকা আবশ্যক, এবং পরিচারক ও প্রচারক গ্রহণ ও বর্জ্জনে। প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইলে, অন্ততঃ সভার ⅔ অংশ সভ্যের তৎপক্ষে মত হওয়া আবশ্যক, এবং উক্ত প্রস্তাব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমোদন-সাপেক্ষ থাকিবে।

১১। সভাপতির কার্য—প্রচারসভার নির্দ্দেশ অনুসারে প্রচারার্থিগণের শিক্ষা সাধন পরীক্ষা ও বাসাদির ব্যবস্থা, এবং প্রচারকগণের কার্য্যব্যবস্থা সংক্রান্ত সমুদয় কাজ পরিচালনের ভার সভাপতির উপর থাকবে। এই সকল কার্য্যে সম্পাদক তাঁহার সহায়তা করবেন।

১২। প্রচারপ্রার্থী এবং প্রচারকার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তিগণ চার শ্রেণীতে বিভক্ত থাকিবেন:—

(১) প্রচারার্থী (বা সংকল্পাধীন পরিচারক ২। বছর। (২) পরিচারক—২ বছর। (৩) সেবক বা গৃহী প্রচারক (৪) প্রচারক।

ক্রমশঃ

সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

ব্রাহ্মসমাজ।

নারায়ণগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজ—নারায়ণগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের সপ্তত্রিংশৎ সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্ন লিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে—৬ই মার্চ্চ, উৎসবের উদ্বোধন। অপরাহ্ণে কীর্ত্তন ও সন্ধ্যায় উপাসনা। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশে, তিনি শুদ্ধচিত্ত হইয়া উৎসবের জন্ম প্রস্তুত হইতে বলেন এবং সুন্দর একটি আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া কিরূপে মানুষের জীবন বদলাইয়া যায় তাহা দেখান। ৭ই প্রাতে উষাকীর্ত্তন করিতে করিতে গায়কদল মন্দিরে সমবেত হইলে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি "মাহং ব্রহ্ম নিরাকূর্য্যাম্" শ্লোকটি বিবৃত করিয়া উপদেশ দেন। অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্রের স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতি উপলক্ষে তাঁহার কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্রের বাসায় শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত আচার্য্যের কাজ করেন। পরে দীনবন্ধু বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কয়েকটি শ্লোক পাঠ করিয়া প্রার্থনা করেন। প্রীতিজলযোগে অদ্যকার কার্য্য শেষ হয়। ৮ই প্রাতে সংকীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এই—জগতে প্রেমই সর্ব্বপ্রধান শক্তি, মিলনই বিধাতার মঙ্গল বিধান। অপ্রেম ও বিদ্বেষ মানুষকে মৃত্যুর পথে লইয়া যায়। এই প্রেমের জন্ম আমাদিগকে পরমেশ্বরের শরণাগত হইতে হইবে। অপরাহ্ণে কীর্ত্তন, পরে শ্রীযুক্ত যোগজীবন পাল উপাসনার কার্য্য করেন। উপদেশে তিনি বলেন, পরমেশ্বরই মানব-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বস্তু। মানুষের যে পরিমাণে ঈশ্বর লাভ হয় সেই পরিমাণে তাহার মনুষ্যত্ব, অন্যথা জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। ৯ই প্রাতে শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উপাসনা করেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এই—প্রণালীতে সামান্য মতভেদ সত্ত্বেও সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্মবিশ্বাস একমেবাদ্বিতীয়মে প্রতিষ্ঠিত। বিগত ২০শে জানুয়ারীর কলিকাতার ধর্ম্ম মহাসম্মিলনের কার্য্যবিবরণ ইহাই প্রকাশ করিতেছে। মধ্যাহ্নে মহিলা-উৎসব। শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন ও উপাসনা ও উপদেশ দ্বারা মহিলা উৎসব সম্পন্ন করেন। মহিলা ও বালিকাতে ৩০।৪০টি উপস্থিত ছিলেন। প্রীতিজলযোগে এই বেলার কাজ শেষ হয়। ৪ টায় নগর সঙ্কীর্ত্তন। সংক্ষিপ্ত প্রার্থনান্তে গায়কদল বহুদূর ব্যাপিয়া নগরের দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন করতঃ মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। সেখানে কিছুকাল প্রমত্তভাবে কীর্ত্তনের পর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত "ধর্ম্ম কি?" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন ধর্ম্মকে তিন শ্রেণীতে ধরা যাইতে পারে। প্রথমতঃ ধর্ম্মমত, দ্বিতীয় ধর্ম্মের সাধন, তৃতীয় ধর্ম্মজীবন। ১০ই সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে কীর্ত্তনের পর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনার পর প্রীতি-ভোজনান্তে এবেলার কার্য্য শেষ হয়। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় পাঠ ব্যাখ্যা ও আলোচনা। কীর্ত্তন ও সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু সংক্ষিপ্ত উপাসনা এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ করেন। সন্ধ্যায় পুনরায় প্রমত্তভাবে কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত আচার্য্যের কাজ করেন।

ব্রিষ্টল নগরীতে রামমোহন-সমাধি-মন্দির—ব্রীষ্টল নগরীতে রাজর্ষি রামমোহন রায়ের সমাধির উপর যে স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা নিতান্ত জীর্ণ দশায় উপনীত হইয়াছে। তাহার সংস্কারের জন্য ৬০০০ হাজার হইতে ৫০০০ টাকার প্রয়োজন। ভবিষ্যতে যাহাতে তাহা আর এইরূপ অবস্থায় উপনীত না হইতে পারে, তদনুরূপ সাময়িক সংস্কারাদি নির্ব্বাহের জন্য আরও ১০০০ হাজার পাউণ্ডের একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডার স্থাপনও একান্ত আবশ্যক। এই বিষয়ে আমরা এতদিন আমাদের কর্ত্তব্য যথেষ্টই অবহেলা করিয়াছি। এতদিন পরেও যে আমাদের কিছু চৈতন্যোদয় হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। এতদর্থে পিতাপুরমের মহারাজা সাহেব অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ (৫০০০ হাজার) টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অন্যান্যের নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত দুই তিন হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। আশা করা যায় অবিলম্বে এই টাকা সংগৃহীত হইবে। এ সম্বন্ধে আমাদের যে গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে তাহা যেন কেহ না ভুলি।

সিটিকলেজের সাহায্যার্থ দান—সিটি কলেজের বিল্ডিং ফণ্ডে বিগত সেপ্টেম্বর মাস হইতে নিম্নলিখিত দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে:—(সেপ্টেম্বর) মেসার্স এ পি সেন ২০০৲, গিরীন্দ্রনাথ রায় ৫৲, এস সি রায় ৮০৲, হিরণকুমার সান্যাল ২৫৲, শ্রীমতী পূর্ণিমা বসাক ৬০৲, মেসার্স মোহিনীমোহন হাজরা ১০৲, সর্ব্বরীকান্ত ধর ৫৲, জে এন সিংহ ২০৲, মথুরানাথ নন্দী ১০৲, বিপিনবিহারী বসু ১০৲, (অক্টোবর) হিরণকুমার সান্যাল ২৫৲, জে এন সিংহ ২০৲, মোহিনীমোহন হাজরা ১০৲, শ্রীমতী কাশি বাঈ নাওরজি ১০০৲, কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী ১০৲, মেসার্স গিরীন্দ্রনাথ রায় ৫৲, (নভেম্বর) মোহিনী মোহন হাজরা ১০৲, জে এন সিংহ ২০৲, (ডিসেম্বর) সুধীর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২০৲ মোহিনীমোহন হাজরা ১০৲, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী ২৫৲, পরলোকগত রাজচন্দ্র চৌধুরীর পুত্রগণ ২০০৲, মেসার্স বিপিনবিহারী বসু ১০৲, জে এন সিংহ ২০৲, ভি বি ভেলিঙ্কার ১০৲, (জানুয়ারী) কুমারী হেমপ্রভা মজুমদার ২৫৲, মেসার্স ভি বি ভেলিঙ্কার ৫৲, মোহিনীমোহন হাজরা ১২৲, কুমারী শান্তিময়ী দাস ৫৲, (ফেব্রুয়ারী) কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী ১০৲, শ্রীমতী কাশিবাই নাওরজী ১০০৲, মেসার্স মোহিনী মোহন হাজরা ১২৲, শশিভূষণ দত্ত ১০৲,

গিরীন্দ্রনাথ রায় ৫৲, পরলোকগত মতিলাল হালদারের ট্রাষ্টফণ্ড হইতে ৩০০০৲ টাকা। পূর্ব্ব স্বীকৃত ২,৫০০৸৴০ সহ ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত মোট ৬৬০৪৸৴০।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

রামায়ণের কথা ও অন্যপূর্ব্বা-বিবাহ— মহারাজকুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। "রামায়ণের কথা"তে বিবিধ পুরাণাদি হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকারের গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সংগৃহীত বিষয়গুলির তুলনামূলক সমালোচনা দ্বারায় কোনও একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোনও প্রকার চেষ্টা নাই। তাই সাধারণ পাঠকের মনের উপর উহা কোনও ছাপ রাখিয়া যাইতে সমর্থ নহে। তবে সংক্ষেপে বহু বিষয় একত্র সংগৃহীত হওয়াতে, যাঁহারা ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইবেন তাঁহারা ইহা হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। এই হিসাবে ইহার একটা বিশেষ মূল্য আছে। "অন্যপূর্ব্বা-বিবাহের" দুই খণ্ডে শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা বিধবা বিবাহ সমর্থিত হইয়াছে এবং বিধবা বিবাহ বিষয়ক আইনের ধারাগুলি প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতেও তাঁহার অধ্যয়ন ও গবেষণার এবং সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। আইনের যে কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহাও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা আশা করি পুস্তকখানা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে।

(২) **কল্যাণ প্রদীপ—**শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী প্রণীত। মূল্য ৩৲। ইহা বঙ্গমাতার বীর পুত্র পরলোকগত কাপ্তান কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবনী। তাহা ব্যতীত বাঙ্গালার জাতীয় সভ্যতার ইতিহাস ও নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নের আলোচনা এবং ইরাকে তুরস্ক-ব্রিটিশ সমরের সংক্ষিপ্ত বিবরণও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী অশীতিবর্ষের বৃদ্ধা হইয়াও দৌহিত্রের প্রতি স্নেহের টানে ও অসাধারণ মানসিক শক্তি বলে ৪০০ শত পৃষ্ঠার অধিক এই বৃহৎ গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। ইহাতে যেমন তাঁহার অপূর্ব্ব লিপিচাতুর্য্য তেমনি গভীর চিন্তাশীলতারও যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। কেবল একটি বিষয়ে তাঁহার একটু ভ্রান্ত সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অপর সকল বিষয়ই বিশেষ উদারতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। সকলেরই, বিশেষভাবে যুবকদিগের, ইহা পাঠ করা উচিত। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

৩। A Report of the proceedings of the Brahmo Samaj centenary celebration in Calcutta, August, 1928, Part I মূল্য ১৲। বিগত শতবার্ষিক উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ ও বক্তৃতাদির মর্ম্ম ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা এখানে উৎসবে উপস্থিত হইতে পারেন নাই তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত বোধ করিবেন। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাও পুস্তকাকারে প্রাপ্ত হইয়া, ইহাকে আদরের সহিত রক্ষা করিবেন। আশা করি সর্ব্বত্র ইহার সমাদর হইবে।

৪। The Appeal of a Hindu to critics of Jesus Christ—by Rai sahib Upendranath De, with a foreword by Rai Bahadur Chunilal Bose মূল্য ॥০। শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার প্রণীত "The Cross in the crucible" নামক গ্রন্থের কোনও কোনও অংশের প্রতিবাদস্বরূপ ইহা লিখিত হইয়াছে। যেরূপ ধীরতা, উদারতা ও সত্যানুরাগের সহিত ইহা লিখিত হইয়াছে তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার উদ্দেশ্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ দ্বারা বহু পরিমাণে সুসিদ্ধ হইয়াছে। যাহা বিতর্কের বিষয় তাহাতে মতভেদ অনিবার্য্য। কিন্তু কোনও দিকে একটা অতিরিক্ত ঝোঁক লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সত্য নির্দ্ধারণ যেমন কঠিন হয়, তেমন হৃদয়ের সাধুভাবগুলিও অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হয়। আমরা ইহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। এবং ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

৫। **শ্রীভগবদ্গীতা—**দেবনাগরী অক্ষরে মূল ও সরল সংস্কৃত টীকা এবং ইংরাজী অনুবাদ সহ পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য কাপড়ে বাঁধান ২৷০। ভূমিকাতে বিস্তারিত ঐতিহাসিক ও দার্শনিক আলোচনা ব্যতীত আবশ্যকীয় মন্তব্য ও সমালোচনা-সহ প্রত্যেক অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার প্রদত্ত হইয়াছে। উহা পাঠে সহজেই গীতার শিক্ষা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। ব্যাখ্যার সঙ্গেও টীকা টিপ্পনী এবং উপনিষদ্ ও বাইবল গ্রন্থের কোন কোন অংশের সঙ্গে সাদৃশ্যের উল্লেখ আছে। আমরা যতদূর জানি এরূপ আর কোনও ইংরাজী বা বাঙ্গলা সংস্করণ নাই। টীকা ও অনুবাদ উভয়ই বেশ সরল হইয়াছে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। ইহা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। ছাপা এবং কাগজও বেশ সুন্দর হইয়াছে।

৬। **বৈষ্ণব সাহিত্য—**শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য কাপড়ে বাঁধান ২৲ টাকা। বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ব গভীর, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় একটু অত্যধিক, শ্রদ্ধার সহিত ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। সকল বিষয়েই উহাদিগকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতে গেলে তাহাকে অতিসয়োক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। তান্ত্রিক ধর্ম্মের বিকৃতি বেশ তীব্রতার সহিতই উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু উহার যে একটা ভাল দিকও আছে সে বিষয়ে একটি কথাও নাই; অথচ বৈষ্ণব ধর্ম্মের উচ্চতা ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে কেবল শত মুখে প্রশংসাই আছে, তাহার বিকৃতি হইতে যে মহা অনিষ্টও সাধিত হইয়াছে তাহার একটু ইঙ্গিতও নাই। শাক্তদের মধ্যে যে ভক্তির বিকাশ হইয়াছে তাহাও বৈষ্ণবী ভক্তিই; বৈষ্ণব ধর্ম্ম ব্যতীত আর কোথাও যেন ভক্তি জন্মিতে পারে না। ইহাকে নিতান্ত একদেশদর্শিতা ও পক্ষপাতিতা ভিন্ন অপর কোনও নামে অভিহিত করা যায় না। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সাহিত্যের ভাল

দিকটা প্রদর্শন করিতে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা প্রশংসনীয়। কিন্তু মন্দ দিকটাও নিন্দা করা নিরপেক্ষ সমালোচকের কর্ত্তব্য। অশ্লীলতা ও মানবীয় শারীরিক ভাব কোনও কোনও স্থানে অপরের ন্যায় সমর্থন করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে তেমন কিছুই বলেন নাই। বরং বৈষ্ণব সাধুরা তাহা হইতে তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের খোরাক সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া প্রকারান্তরে দোষক্ষালনেরই চেষ্টা করিয়াছেন। অন্য স্থান হইতে পরবর্ত্তীকালে প্রাপ্ত কোন কোন তত্ত্ব আরোপণ দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে একটা আদর্শ উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা বেশ উচ্চ ও সকলের গ্রহণীয়, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। আরও একটু নিরপক্ষ সমালোচনার সহিত লিখিত হইলে গ্রন্থখানা অধিকতর আদরণীয় হইত বলিয়া আমরা এত কথা বলিলাম। গ্রন্থকার ইহাতে যে শ্রম, অনুশীলন ও পাঠানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসা ও অনুকরণের যোগ্য।

৭। **বন্ধুমিলন** বা ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন—শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাস কর্ত্তৃক বিবৃত ও সংগৃহীত। মূল্য ।•। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে এবং নানা শাস্ত্রবাক্যাদিও সংগৃহীত হইয়াছে। যে উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে তাহা ইহার দ্বারা সুসিদ্ধ হইবে বলিয়াই মনে হয়। আমাদের বিবেচনায় দুই এক স্থানের ভাষাতে যে একটু তীব্রতা লক্ষিত হইল তাহা পরিহার করিলেই আরও ভাল হইত। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

অনাথ ব্রাহ্মপরিবার সংস্থান ধনভাণ্ডার।

প্রার্থনা পত্র।

অনাথ ব্রাহ্মপরিবারের সাহায্যের জন্য ঢাকাতে বহুদিন যাবৎ এই ফণ্ডের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পরলোকগত ভক্তিভাজন চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয় এই ফণ্ডের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। ফণ্ডের মূলধন ব্যয় হয় না, সুদের টাকা মাত্র ব্যয় হয়। সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমোদন অনুসারে সাতজন ট্রাষ্টীর সম্মতি লইয়া সাহায্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার একটি পয়সাও অপব্যয়িত হয় না। ইহার কার্য্যক্ষেত্র কেবল বঙ্গদেশ নয়, ভারতবর্ষ। এপর্য্যন্ত ভারতের নানা প্রদেশের অনেক অনাথ ব্রাহ্মপরিবার এই ফণ্ড হইতে মাসিক ও এককালীন অর্থ সাহায্য পাইয়াছেন এবং এখনও পাইতেছেন। সহৃদয় মহোদয়গণের নিকট আমরা বিনীতভাবে এই ফণ্ডের জন্য মাসিক ও এককালীন সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে সকলেই কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিলে এই ফণ্ডের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আপনি মাসিক কি এককালীন আনুষ্ঠানিক সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বিনীত
শ্রীবঙ্কবিহারী কর
সম্পাদক
অনাথ ব্রাহ্মপরিবার সংস্থান ধনভাণ্ডার।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ
ঢাকা।

স্থায়ী শতবার্ষিক উৎসব ফণ্ড

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু :—

সবিনয় নিবেদন

ভগবানের কৃপায় ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসব এক প্রকার সুসম্পন্ন হইল। ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে আগত একেশ্বরবাদী প্রচারকগণের সাহায্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের বাণী ঘোষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ এখনও নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। শতবার্ষিক উৎসব কমিটির উদ্যোগে বিগত কয়েক মাস প্রবল উদ্যমে প্রচার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। বৎসর বৎসর এই ভাবে কাজ হইলে ভাল হয়। কিন্তু ইহার জন্য অর্থ আবশ্যক। এতদুদ্দেশ্যে শতবার্ষিক উৎসব কমিটি একটি স্থায়ী শতবার্ষিক উৎসব ফণ্ড স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইতি মধ্যেই তাঁহারা ইহার জন্য সাত হাজার টাকা জমা দিয়াছেন। শতবার্ষিক ফণ্ডে প্রতিশ্রুত সমুদয় চাঁদা সংগৃহীত হইলে এই ফণ্ড নিতান্ত কম হইবে না। এতভিন্ন এখনও অনেকে শতবার্ষিক উৎসব-ফণ্ডে কিছু দেন নাই। আশা করা যায় এখনও তাঁহারা স্ব স্ব দেয় চাঁদা দিবেন। আগামী কয় মাস এই স্থায়ী ফণ্ড গঠনের জন্য শতবার্ষিক উৎসব-কমিটি বিশেষ চেষ্টা করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং এই কার্য্যে ব্রাহ্মবন্ধুগণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। একটি স্থায়ী ফাণ্ড গঠিত হইলে শতবার্ষিক উৎসবের কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। আমরা আশা করি সকলে এই কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। নিবেদন ইতি

বিনীত
শ্রীহেমচন্দ্র সরকার
সাধন-আশ্রম।

২১০।৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

আগামী ৪ঠা মে, শনিবার, সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সমাজের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

আলোচ্য বিষয় :—(১) গত বৎসরের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের হিসাব। (২) ১৩৩৬ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্য নির্ব্বাচন। (৩) বিবিধ।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ।
২৮শে মার্চ্চ, ১৯২৯।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন,
সম্পাদক।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৮ই বৈশাখ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি, এ

Registered No 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫২শ ভাগ। ২য় সংখ্যা। ১৬ই বৈশাখ, সোমবার, ১৩৩৬, ১৮৫১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০০ 29th April, 1929. প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে প্রেমময় জীবনবিধাতা, তুমি যে আমাদিগকে শুধু সৃষ্টি করিয়াছ এবং এই সংসারে রাখিয়াছ তাহা নহে, তোমার অসীম স্নেহে ও প্রেমে তুমি আমাদিগকে নিয়ত তোমার কল্যাণের পথে অগ্রসর করিবারও নানা ব্যবস্থা করিতেছ। তুমি সর্ব্বদা সকল স্থানে ও অবস্থাতে আমাদের সঙ্গে থাকিয়া পদে পদে আমাদিগকে পথ দেখাইতেছ, সে পথে চলিতে উৎসাহিত ও আগ্রহান্বিত করিতেছ, এবং নানা বাধা বিঘ্ন দুঃখ বেদনা উপস্থিত করিয়া বিরুদ্ধগমনকে কঠিন করিতেছ। মোহ বশতঃ তোমার নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া বিপথে চলিয়া গেলেও, হে প্রেমস্বরূপ, তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ না করিয়া অসীম প্রেম ও ধৈর্য্যের সহিত তোমার পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সতত নিযুক্ত থাক। তোমার এই জীবন্ত মঙ্গল-বিধাতৃত্ব না থাকিলে যে আমরা কোন্ আবর্ত্তে যাইয়া পড়িতাম জানি না। বার বার ইহার কত পরিচয় পাইয়াও কেন যে এখন পর্য্যন্ত আমরা তোমার অনুগত হইয়া তোমার পথে চলিতে পারিতেছি না, তাহা তুমিই ভাল জান। হৃদয়দর্শী দেবতা তুমি, আমাদের সকল ত্রুটি দুর্ব্বলতা তুমিই নিশ্চিতরূপে জান; তুমি কৃপা করিয়া সে সকল দূর না করিলে আর উপায় নাই। তুমি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান কর, তোমার বলে বলীয়ান্ কর। আমরা সকল অবস্থাতে একমাত্র তোমাকেই অনুসরণ করি, তোমারই দ্বারা চালিত হই। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদিগের সকল জীবনে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য—কেবল কর্ম্ম, কেবল কর্ম্ম! চারিদিক হ'তে কর্ম্মের আহ্বান। লোকে বলে, কি ব'সে ব'সে নাম কর? কত দুঃখ দৈন্য দেখ না? কাজে এস। আমি কি করি? কাজ ত কর্‌তে হবে। কিন্তু কাজ যদি তাঁর প্রিয়কাজ না হয়, তাঁর প্রেমানুমোদিত না হয়, তবে সব কাজই যে বৃথা! তবে কাজ যে বন্ধন হ'য়ে পড়ে! আবার লোকে বলে, কাজ ক'রে কি হবে? সবই ত প'ড়ে থাক্‌বে; কেবল নাম কর, নামে ডুবে থাক; তাঁর সঙ্গ লাভ কর। নামে সুখ আছে, নামে আনন্দ আছে, নামে সব ভু'লে থাকা যায়। কিন্তু তাঁর দাস হয়েছে যে, তাঁর প্রিয় হয়েছে যে, সে কি কেবল সঙ্গসুখটুকুই চাইবে? কেবল তাঁর কাছে ব'সে তাঁর বাণী শু'নে আনন্দ উপভোগ কর্‌বে! তাঁর আদেশ পালন কর্‌বে না? তাঁর জন্য দুঃখ বরণ কর্‌বে না? তাঁর রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় আত্মসমর্পণ কর্‌বে না? তাঁর চরণে বস, তাঁতে প্রীতি ঢেলে দাও; আর সেই প্রেমের জন্য সেবাব্রত গ্রহণ কর। প্রেমশূন্য কাজ শুষ্ক—বন্ধনের হেতু। সেবাশূন্য প্রেম ভাবুকতা।

সত্য পালন—কেবল মিথ্যা হইতে বিরত থাক্‌লেই সত্য পালন করা হ'লো না—ভাবে চিন্তায়, কথায় কার্য্যে, সর্ব্ববিষয়ে সত্য রক্ষা ক'রে চল্‌তে হবে। মিথ্যা কথা বলা হ'তে মুক্ত থাকা ত সহজ। কিন্তু তোমার মনে যদি এই ভাব জাগে যে, সত্যটা লোকে না জানুক, তা হ'লেও তুমি সত্যের অপলাপ কর্‌লে। তুমি যাহা, তাহার ভিন্নরূপ লোকে তোমাকে দেখুক, সেরূপ যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তা হ'লেও সত্যের অপলাপ হ'লো। তোমার চিন্তাতে যা সত্য মনে কর, ভাবে বাক্যে কার্য্যে যদি তাঁর ব্যতিক্রম কর, তা হ'লেও মিথ্যার প্রশ্রয় দিলে। সত্য কি, তাহা জান্‌বার জন্য যদি তোমার আগ্রহ না থাকে, চেষ্টা না থাকে, তা হ'লেও তুমি মিথ্যারই আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লে। সত্য মানুষের চিত্ত দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ করে, মানুষের ব্যবহার স্নিগ্ধ করে; সত্য মানুষের মনে তেজের সঞ্চার করে; সত্য মানুষের মুখে উজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাশ করে। সত্যসন্ধ পুরুষ যে, তাঁর সম্মুখে মিথ্যা কপটাচার ভয় পায়। সত্য

সত্যস্বরূপের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে। তবে চিন্তা সত্য হউক, বাক্য সত্য হউক, ভাব সত্য হউক, কার্য্য সত্য হউক, আশা আকাঙ্ক্ষা সত্য হউক। দৃষ্টি সত্য দেখুক, শ্রুতি সত্য শুনুক, মন সত্য চিন্তা করুক। সত্যস্বরূপ হৃদয়ে প্রকাশিত হউন।

সত্য প্রতিষ্ঠায়—সত্য যদি প্রাণে জেগে থাকে, নূতন আদর্শ যদি পেয়ে থাক, তবে তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সত্য-লাভের দায়িত্ব আছে। যে আলোক পেয়েছে, তাকে আলোক ধরতে হবে—অন্ধকারে যারা প'ড়ে আছে, তাদের হাত ধ'রে আলোকের পথে আনতে হবে। যে সত্য পেয়ে কৃতার্থ হয়েছে, তাকে সকল মানুষকে ডেকে সত্যের পথে আনতে হবে; ধরায় সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এ জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করতে হবে। তুমি ঘরে ব'সে সত্য পালন করবে, সুখে আরামে থাকবে, আর, কোটি কোটি লোক অসত্যের পথে চলবে, তা হবে না। ঐ কোটি লোক যদি অসত্যের পথে চলে, একটি লোকও যদি অসত্যের পথে চলে, আর তুমি যদি তাদের না ডাক, তাদের সত্য পথে আনবার চেষ্টা না কর, তোমার অধর্ম হবে; তোমার ঘরে অসত্য প্রবেশ করবে। এই সত্যপ্রতিষ্ঠায় তোমাকে হয় ত জীবন দিতে হবে, তোমার সব বিষয় সম্পত্তি পদ মান দিতে হবে, তোমাকে হয় ত ফকির হ'তে হবে। আপত্তি করতে পারবে না। সত্য পেয়েছ, সত্যস্বরূপের ডাক এসেছে; তাঁর হুকুম পালন করতে হবে। যে পথে এসেছ তাতে কেবল মিষ্ট সম্ভোগ করলে চলে না, তিক্ততাও আদরে নিতে হবে। সব দিয়ে ভগবানের আদেশে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সম্পাদকীয়

কোথায় নিবদ্ধ রাখিতে হইবে—
সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়, দূরদৃষ্টি ও উচ্চলক্ষ্য না থাকিলে কোনও বিষয়েই জীবনে যথোচিত সাফল্য ও উন্নতি লাভ করা সম্ভবপর নহে। আমাদের চেষ্টা যত্ন যে লক্ষ্যেরই অনুরূপ হইয়া থাকে এবং অতর্কিত বাধা বিঘ্ন আসিয়া যাহাতে আমাদের চেষ্টা যত্নকে ব্যর্থ করিয়া না দিতে পারে, সেরূপ জ্ঞান ও আয়োজনের উপর যে সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই হেতু নিশ্চয়ই উহাদের একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহাদের উপর একটু অতিরিক্ত মূল্য প্রদান করা হয় বলিয়াই অনুমিত হয়। একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইব, বিষয়টা ভাল করিয়া চিন্তা না করাতে এবং উহাদের উপর অতিরিক্ত দৃষ্টি প্রদান করাতেই আমরা অনেক সময় সফলতা লাভ করিতে পারি না। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে, পথনির্ণয়ের সময়ে, উহাদের যেমন একটা বিশেষ উপকারিতা আছে, পরে পথ চলিবার বা কার্য্য করিবার সময়ে, সর্ব্বদা তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখিবার যে শুধু তেমন কোনও আবশ্যকতা নাই তাহা নহে, বরং কিছু অপকারিতাই আছে। আমরা চিন্তা ও পরীক্ষা করিয়া দেখি না বলিয়াই তাহা ধরিতে পারি না এবং আমাদের ব্যর্থতার জন্য যে উহা কতটা দায়ী সে কথা বুঝিতে পারি না। সাধারণ পথচলা সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই, কোনও দূর প্রদেশে যাইতে অথবা উচ্চ পর্ব্বত-শিখরে উঠিতে হইলে, দূর-দৃষ্টির দ্বারা গন্তব্য স্থান ও পথ নির্ণয় করিয়া লইতে হয় এবং তাহার জন্য কিরূপ আয়োজন উদ্যোগ প্রয়োজন হইবে তাহার একটা সূক্ষ্ম না হউক স্থূল ধারণা লইয়া ও যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়, পথ চলিতে আরম্ভ করিতে হয়। তাহা না করিলে কোনও প্রকারেই গন্তব্য স্থানে পৌছা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া দূরস্থিত পথসীমায় বা পর্ব্বত-শিখরের উচ্চ চূড়ায়, অথবা—আমরা যতটা চাই কার্য্যতঃ ততটা করিতে পারি না, তাহার কতক অংশমাত্র করিতে সমর্থ হই বিধায়, লক্ষ্যটা একটু বেশী বড় করা উচিত, যাহাতে অন্ততঃ ঈপ্সিত স্থানের অনেকটা নিকটবর্ত্তী হইতে পারি, এরূপ বিচার করিয়া—দৃষ্টিসীমার বাহিরে বা আকাশে, দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া পথ চলিতে হইবে, এরূপ কথা বোধ হয় কেহ বলিবে না। তাহা করিতে গেলে যে অনেক সময় পদস্খলিত হইয়া বা ধাক্কা খাইয়া ভূপতিত হইতে হয়, এমন কি সময় সময় হাত পা ভাঙ্গিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে বা প্রাণ হারাইতেও হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে আকাশে নিবদ্ধদৃষ্টি নক্ষত্রদর্শনকারী পণ্ডিতের কৌতুকাবহ গল্প অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। গল্প হইলেও উহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর ব্যাপারই; এরূপ যে না ঘটে তাহাও নয়। সে যাহা হউক, একথার সত্যতা স্বীকার করিয়াও অনেকে হয় ত বলিবেন যে, বৈষয়িক বা মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ইহা খাটে না, সেখানে উক্ত প্রকার বিপদের আশঙ্কা নাই, বরং উহার অভাবে শিথিলতা ও নিরুদ্যম জন্মিবারই পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই এ কথার অসারতা সহজে প্রতিপন্ন হইবে। পথ চলিতে হইলে যেমন প্রধানতঃ পদতলস্থিত ভূমির উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে, নিকটস্থ স্থানসমূহ নিরীক্ষণ করিয়া সুদৃঢ় ভূমির উপর পদ স্থাপন করিতে হইবে, সম্মুখস্থ সকল বাধা বিঘ্ন দেখিয়া তাহা পরিত্যাগ বা অতি-ক্রম করিয়াই পথ চলিতে হইবে, নতুবা কিছুতেই অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইবে না, ব্যর্থতা ও পতন নিবারিত হইবে না, এ ক্ষেত্রেও তেমন প্রধানতঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে, বর্ত্তমান অনুকূলতা প্রতিকূলতার দিকে, বাধা বিঘ্নের দিকে এবং তদুপযোগী উপায় অবলম্বনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা ব্যতীত সফলতা লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই, বিফলতা একেবারেই অনিবার্য্য। শুধু বিফলতা নহে, ইহাতে মহা অনিষ্টপাতেরও পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে, পরে দেখিতে পাইব। সকলেই জানে, এক লম্ফে যেমন পথের শেষ সীমায় বা পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় উপনীত হওয়া যায় না, ধীরে ধীরে পা পা করিয়াই পথ চলিতে হয়, তেমন এ ক্ষেত্রেও হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে লক্ষ্যস্থানে পৌছা যায় না,, ঈপ্সিত উন্নতি লাভ করা যায় না,—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কিছু কিছু করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হয়, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের প্রতি অবস্থার যথোচিত ব্যবহার দ্বারা আপনাকে উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হয়, গড়িয়া উঠাইতে

হয়। ইহার মধ্যে প্রতি মুহূর্ত্তেরই যে একটা কর্ত্তব্য আছে, অনুকূলতা প্রতিকূলতা আছে এবং নানা বাধা বিঘ্ন আপদ বিপদ আছে, সে সকল জানিয়া বুঝিয়া ঠিক ভাবে কার্য্য না করিলে, যথাযথভাবে বহন পালন ও অতিক্রম করিবার উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন না করিলে যে কিছুতেই চলে না, তাহাও সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এখন এ সকল বর্ত্তমান কর্ত্তব্য ও অবস্থার কথা ভুলিয়া, তদুপযোগী কার্য্যসকল অবহেলা করিয়া, যদি শুধু লক্ষ্যের কথাই সর্ব্বদা চিন্তা করা যায়, সুদূর ভবিষ্যতের কল্পনাময় রাজ্যেই বাস করা যায়, তবে যে কোনও প্রকারেই লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিতে পারা যাবে না, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। সর্ব্বদা লক্ষ্যের কথা, বড় বড় কথা ভাবিতে গেলে, দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে গেলে, বর্ত্তমানের কথা, নিকটের অত্যাবশ্যকীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় যে ভুলিয়া যাইতে হয়, তাহাতে যে মন দিতে ইচ্ছা হয় না, এ সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার ব্যস্ততাবশতঃ অনেক কর্ত্তব্য যে লঙ্ঘিত হয়, বহু প্রয়োজনীয় উপায় যে পরিত্যক্ত হয়, নানা বাধা বিঘ্নের নিকট যে পরাজিত হইতে হয়, তাহা একটু চিন্তা ও অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আবার, ওরূপ ভাবিতে ভাবিতে লক্ষ্যটা যে অনেক নিকট-বর্ত্তী—প্রায় আয়ত্তাধীনই—বলিয়া ভ্রম জন্মে এবং সেই হেতু চেষ্টা উদ্যমও কমিয়া যায়, একটা শিথিলতা ও শ্রমকাতরতা উপস্থিত হয়, পদে পদে প্রত্যেক বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার ধৈর্য্য ও উৎসাহ থাকে না, তাহার অনেক প্রমাণও একটু খুঁজিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহা যে কি প্রকার অনিষ্টকর, বিশেষতঃ ভাবপ্রবণ কল্পনাপ্রিয় লোকের জীবনে ইহা যে কি মহা অনর্থ উৎপাদন করে, তাহা বিস্তারিত করিয়া বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। বাস্তবতা হইতে দৃষ্টিকে সরাইয়া, কাল্পনিক সিদ্ধিলাভকে ইহা এমনই সহজসাধ্য বলিয়া মোহ জন্মায় যে, সমস্ত কর্ম্মচেষ্টার মূল একেবারে উৎপাটিত হইয়া যায়, জীবন নিতান্ত অসার হইয়া পড়ে—বিনা শ্রমে ও কষ্টে ফাঁকি দিয়া সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য, রাতারাতি বড় হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা জন্মে, চরিত্রের মেরুদণ্ড চিরতরে ভাঙ্গিয়া যায়, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লুপ্ত হয়। আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে—স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ যুবা, ছাত্র ব্যবসায়ী চাকরিয়া, শিল্পী সাহিত্যিক ধর্ম্মসেবী প্রভৃতি সকল প্রকার মানুষের মধ্যেই—ইহার বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সকল ক্ষেত্রেই, এমন কি ধর্ম্মসাধন ক্ষেত্রেও, আমরা যেরূপ নানা কৃত্রিম "সহজ পন্থা" অবলম্বন দ্বারা তাড়াতাড়ি সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হই, তাহাতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সত্য স্বাভাবিক সাধনের কষ্টটুকু স্বীকার করিতে আমরা মোটেই প্রস্তুত নই। এরূপ আরামপ্রিয় অলস প্রকৃতির লোক বোধ হয় জগতে আর কোথাও নাই। আমরা যে ক্ষুদ্র হইয়াই পড়িয়া থাকিতে চাই, নিজেদের অবস্থায় বেশ তৃপ্ত ও সন্তুষ্টই আছি, কোনও প্রকার উন্নতি চাই না, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য আমাদের মোটেই নাই, তাহা নহে। আমাদের আরামপ্রিয়তা ও নিশ্চেষ্টতা কোনও ক্রমেই এই প্রকার ত্রুটি হইতে উৎপন্ন নহে। বরং অপরের তুলনায় আমাদের আকাঙ্ক্ষা অধিকতর উচ্চ লক্ষ্যেই নিবদ্ধ, আমাদের দৃষ্টি দূরতর দেশেই প্রসারিত। আমরা ক্ষুদ্র ও বর্ত্তমান লইয়া কিছুতেই যেন ক্ষণকালের জন্যও আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারি না, কেবলই ঊর্দ্ধে ও সুদূরে ছুটিয়া যাইতে ব্যস্ত হই—প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে, বিধাতার অমোঘ বিধানে, তাহা যে কোনও প্রকারেই সম্ভবপর নয়, সেকথা চিন্তা করিয়া দেখিবার একটু প্রবৃত্তি বা অবসরও আমাদের হয় না। যদি বর্ত্তমানে ও বাস্তবে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত, তবে নিশ্চয়ই সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিলে তিলে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে, উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে, মহাসংগ্রাম অদম্য চেষ্টা ও যত্ন দেখা যাইত। তাহাতে আমাদের চরিত্র ও জীবন যেমন সুন্দর ও মহৎ হইয়া গড়িয়া উঠিত, তেমন উপাসনা প্রার্থনা প্রভৃতি ধর্ম্মসাধনও অধিকতর সত্য সরল ও প্রাণপ্রদ হইত এবং প্রচারকার্য্যও অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইত। এতদ্ব্যতীত, চারিদিকে যে ধর্ম্মের প্রতি উদাসীনতা ও অবহেলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও আপনা হইতেই বিদূরিত হইত। মানুষ যদি কল্পনার রাজ্য ছাড়িয়া সত্যভাবে জীবন যাপন করিতে চেষ্টিত হয়, প্রতিমুহূর্ত্তের সত্য অবস্থার মধ্য দিয়া গন্তব্য পথে চলিতে যত্নশীল হয়, সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, প্রত্যেকটি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া, আপনাকে সুস্থ সবল সুন্দর ও মহৎ করিয়া গড়িয়া তুলিতে চায়, সর্ব্বপ্রকারের উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে প্রয়াসী হয়, তবে সে নিশ্চয়ই পদে পদে আপনার দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা অনুভব করিবে, এবং সেই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয় হইতে সত্য সত্য আকুল প্রার্থনাও উত্থিত না হইয়া পারিবে না। আর, এরূপ প্রার্থনার ফলে প্রাণে করুণাময় পিতার যে পরিচয় পাওয়া যাইবে, যে বিশ্বাস ও নির্ভর জন্মিবে, তাহা কিছুতেই কোনও বিরুদ্ধ যুক্তি বা সংসর্গেই বিচলিত হইবে না। তখন উপাসনাদি উচ্চাঙ্গের সাধনও স্বভাবতঃই সত্য ও সরস হইবে। সাময়িক শুষ্কতা ও জীবনের নানা বিফলতা এবং কদর্য্যতাও এ বিষয়ে শিথিলতা ও স্থায়ী সন্দেহ জন্মাইতে পারিবে না। তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি, দৃষ্টিটা প্রধান ভাবে নিম্নভূমিতেই—জীবনের বর্ত্তমান সত্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই—নিবদ্ধ রাখিতে হইবে, সর্ব্বদা সুদূর ভবিষ্যৎ গন্তব্যের কাল্পনিক রাজ্যে, শুধু উচ্চ লক্ষ্যের দিকে মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকিলে চলিবে না। কিন্তু ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, কোনও কারণে পথভ্রান্তি ঘটিলে অথবা বার বার পরাজিত হইয়া নিরুৎসাহ ও নিরাশাগ্রস্ত হইয়া পড়িলে, মাঝে মাঝে সুদূর লক্ষ্যের দিকে, উচ্চ আদর্শের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পথ নির্ণয় করিয়া লইতে, অথবা প্রাণে নূতন আকাঙ্ক্ষা উদ্যম আশা ও বল সংগ্রহ করিতে হইবে না, জীবনের আরম্ভে একবার মাত্রই সেই দিকে চাহিতে হইবে এবং তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। হৃদয়ের অভ্যন্তরে সে ভাব ও আকাঙ্ক্ষা যে সর্ব্বদাই পোষণ করিতে হইবে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু কল্পনা ছাড়িয়া সত্যেই, সুদূর ভবিষ্যৎ ছাড়িয়া বর্ত্তমানেই, প্রধান ভাবে আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বদা নিবদ্ধ রাখিতে হইবে এবং প্রতি মুহূর্ত্তের সকল

অবস্থা ও কর্ত্তব্যের মধ্যে ধাপে ধাপে সত্য ভাবে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সুস্থ সুন্দর সবল চরিত্র লাভ করিতে হইবে, সাক্ষাৎ যোগের সরল খাঁটি ব্রহ্মানুগত জীবন অর্জ্জন করিতে হইবে, উপাসনা প্রার্থনাদি সরল সহজ প্রাণপ্রদ ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই যে আমাদের মূল কথা, আশা করি তাহা বুঝিতে কেহই ভুল করিবেন না। তাহা যে বিনা আয়াসে, বিনা সাধনায়, শুধু ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার দ্বারা হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে কিছুতেই লাভ করা যায় না, বিশ্ববিধাতার এই অলঙ্ঘ্য নিয়মটা ভুলিয়া যেন আমরা কেহ আর মিথ্যা মোহের কুহকে মুগ্ধ হইয়া আত্মপ্রতারিত না হই। করুণাময় পিতা কৃপা করুন, আমরা সকলে এইভাবে জীবনপথে চলি এবং তাঁহার ইচ্ছানুগত সত্য জীবন লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক।

শতবার্ষিক ব্রহ্মোৎসব—কি হইয়াছে ও কি বাকী?

ব্রাহ্মধর্ম্ম মুক্তিপ্রদ ধর্ম্ম। ইহা আমাদিগকে অনেক বিষয়ে মুক্তি দিয়াছে; এবং অপর অনেক বিষয়ে আমাদের সম্মুখে পথ খুলিয়া দিয়াছে।

প্রথমতঃ, এই ধর্ম্মের শিক্ষায় আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি মুক্তি পাইয়াছে। আমরা শাস্ত্রের বন্ধন অতিক্রম করিয়া স্বাধীন ভাবে সত্য নির্ণয় করিতে শিখিয়াছি; এবং যাহা কিছু যুক্তি-সঙ্গত ও কল্যাণজনক তাহা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিতেছি।

দ্বিতীয়তঃ, এই ধর্ম্মের শিক্ষায় আমাদের হৃদয়বৃত্তি মুক্তি পাইয়াছে। আমরা জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িক গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সকল জাতির ও সকল দেশের সাধুসজ্জনদিগকে কেবলমাত্র যোগ্যতার গুণে, শ্রদ্ধা ভক্তি দান করিতে শিখিয়াছি। জগতের কোনও জ্ঞানী, কোনও ভক্ত, কোনও কর্ম্মী আর আমাদের পর নাই।

তৃতীয়তঃ, এই ধর্ম্মের শিক্ষায় আমাদের কর্ম্মশক্তিও মুক্তি পাইয়াছে। আমরা মিথ্যা দেশাচার, অসার কৌলিক রীতি নীতি অতিক্রম করিয়া, যাহা কিছুতে ব্যক্তিগত জাতিগত ও বিশ্বজনীন মঙ্গল, তাহা করিতে সক্ষম হইতেছি।

সকল দিক দিয়া আমরা ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিশাল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছি। ইহা যে কত বড় মুক্তি, সকল সময়ে আমরা তাহা অনুভব করি না; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে এই মুক্তি আমরা সর্ব্বদাই উপভোগ করিতেছি। ইহার ফলে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সকল প্রকার উন্নতি বাধাহীন হইয়াছে।

এ সকল অপেক্ষাও গভীরতর বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের জন্য মুক্তির দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। সকল প্রকার সঙ্কীর্ণ ভাব দূর হওয়াতে সত্য আমাদের আত্মাতে বাধামুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। এ কথা বলিতে আর সঙ্কোচ হয় না, যে, আত্মার প্রকৃত কল্যাণের পথ কোন্ দিকে, তাহা আমরা জানিয়াছি। ধর্ম্ম যে কোনও মতবিশেষে মৌখিক বিশ্বাসজ্ঞাপন নয়, বা কোনও নির্দিষ্ট পূজা-অর্চ্চনার বিধিপালন নয়, ইহা যে আত্মার বিশুদ্ধতা, চরিত্রের নির্ম্মলতা, হৃদয়ের প্রসার, সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান, তাহা আমরা জানিয়াছি। একমাত্র আত্মার বিশুদ্ধতা, চরিত্রের নির্ম্মলতা, হৃদয়ের প্রসার ও সাধু-কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই যে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, শান্তির রাজ্যে, আনন্দের অবস্থায়, পৌঁছা যায়, তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আমরা জানিয়াছি যে, অহংভাব হইতে বাহির না হইলে সত্যেতে প্রবেশ করা যায় না; হিংসা দ্বেষ হইতে মুক্ত না হইলে, প্রেমের তত্ত্ব প্রকাশ হয় না; প্রবৃত্তির অনুগমন পরিত্যাগ না করিলে, আনন্দের আস্বাদন পাওয়া যায় না; সাংসারিকতাকে অস্বীকার না করিলে, জীবনের যাহা একমাত্র লভনীয় বস্তু তাহা লাভ হয় না। দুঃখ হইতে পরিত্রাণ কিসে হয়? পাপ পরিত্যাগে ও দিব্যজ্ঞানলাভে। পাপ পরিত্যাগ কিসে হয়? দিব্যজ্ঞান কিরূপে পাওয়া যায়? প্রাণগত যত্নে ও প্রাণগত প্রার্থনায়। পরিবারের কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ, কিসে হয়? আপনাকে সংশোধন করিলে; নিজে মানুষ হইলে। ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষায় এ সকল জানিয়া আমরা পথ পাইয়াছি। এখন আর দ্বিধা নাই, সংশয় নাই, সঙ্কোচ নাই। আমাদের মন স্থিরভূমি লাভ করিয়াছে। এখন যদি চারিদিকে অন্যায় অধর্ম্মের উল্লাস দেখি, তাহাতে আমাদের চিত্ত বিচলিত হয় না; জানি যে, যাহারা অধর্ম্মে উল্লসিত হইতেছে, তাহাদেরই অন্তরে ধর্ম্মের সনাতন শাসন প্রতিষ্ঠিত আছে; দু'দিন পরে, তাহাদিগকে সেই শাসনের নিকট পরাজয় মানিতে হইবে। যদি মিথ্যা যুক্তিতর্কের ধূমরাশি উদ্গীরণ করিয়া কেহ সত্যের আলোককে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তথাপি আমরা ভীত হই না; জানি যে ক্ষণকাল পরে ধূমরাশি সরিয়া গিয়া সত্যালোক পুনরায় প্রকাশিত হইবে। দুঃখ পাইলে, প্রতিকূলতা দেখিলে, আমরা আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, এবং আপনাকে সংশোধন করিয়া তাহা হইতে ত্রাণ পাইবার চেষ্টা করি। এইরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের নিকট সত্য পথ প্রকাশ করিয়াছে: শান্তিনিকেতনের গুপ্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। আমরা ইচ্ছা করিলে সংসারের দিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, সংসারসুখকে অস্বীকার করিয়া, সেই স্নিগ্ধ মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক সকল জ্বালা জুড়াইতে পারি।

যে উদার মুক্তিপ্রদ ধর্ম্মের শিক্ষায় এ সকল হইল, তাহার জন্য আমরা কি করিলাম? নব বর্ষের প্রথম দিনে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য। আমরা কি এই ধর্ম্মের হাতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ দিলাম? যে আলোক প্রকাশিত হইল, তদ্দ্বারা কি আত্মাকে সর্ব্বক্ষণ আলোকিত রাখিলাম? যেখানে যাই, যাহা করি, সকল আচরণের মধ্য দিয়া কি সেই আলোককে চারিদিকে বিকীর্ণ করিলাম?

আজ নববর্ষের উৎসব। আমাদের পক্ষে এবারকার এই উৎসবের একটু বিশেষত্ব আছে। গত ভাদ্র মাসে ব্রাহ্মসমাজের জীবনের একশত বৎসর পূর্ণ হইয়াছে; সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের

(১লা বৈশাখ, প্রাতঃকালে, ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত।)

দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই প্রথম নববর্ষোৎসব। আমরা শতবার্ষিক ব্রহ্মোৎসবে প্রবৃত্ত। গত ভাদ্রমাসে শততম ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে; আগামী মাঘ মাসে শততম মাঘোৎসব সম্পন্ন হইবে। এই দুই পুণ্যোৎসবের মধ্যবর্ত্তী দেড় বৎসর সময় আমরা শত-বার্ষিক-ব্রহ্মোৎসব-রূপ মহা-সাধনায় নিযুক্ত আছি। আজ আমরা এই সাধনার আট মাস অতিক্রম করিয়া নবম মাসে প্রবেশ করিতেছি। সুতরাং আজ আমাদের ভাবা উচিত, যে ধর্ম্মের জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের উদ্দেশ্যে আমাদের এই দেড় বৎসর-ব্যাপী মহোৎসব, সেই ধর্ম্মকে কি আমরা যথোচিত গৌরবান্বিত করিলাম? অন্ততঃ এই দেড় বৎসরকাল কি আমরা এই স্বর্গীয় আলোককে জীবনে পরিবারে ও সমাজে উজ্জ্বল করিয়া ধরিলাম? করুণাময় পরমেশ্বরের যে দানের জন্য কৃতজ্ঞতা, সেই দানকে কি সর্ব্ব প্রকারে আমরা মাথায় তুলিয়া ধরিয়াছি? ইহার জন্য ত্যাগস্বীকার ও শ্রমস্বীকার করিয়া কি আমরা পরমেশ্বরকে ও দেশবাসী জনসাধারণকে দেখাইতেছি, যে, ইহাকে আমরা কত বড় দান বলিয়া অনুভব করি?

কেহ কেহ ত্যাগস্বীকার ও শ্রমস্বীকারের দ্বারা তাঁহাদের কৃতজ্ঞতার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। অনেক আচার্য্য, অনেক বক্তা, অনেক সঙ্কীর্ত্তনকারী প্রভৃতি ক্লেশ স্বীকার করিয়া সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন ও করিতেছেন। অনেক দাতা অর্থ দিয়া এ সকল কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন। গ্রামে গ্রামে উৎসব করিতে বাহির হইয়া একজন বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তি এমন উৎসাহ দেখাইয়াছেন ও এমন ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, যে, দেখিয়া মনে হইয়াছে, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরবের জন্য প্রাণ দান করিতে প্রস্তুত। কিন্তু এইরূপ লোকের সংখ্যা কত? ব্রাহ্মসমাজের আশ্রিত ও অনুরাগী প্রত্যেক নরনারী কি বলিতে পারেন, তাঁহার যাহা করিবার ছিল করিয়াছেন, যাহা দিবার ছিল দিয়াছেন? আমরা কি বলিতে পারি, যথোচিত করিয়াছি ও দিয়াছি? নিজের অন্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি, এ পর্য্যন্ত আমার কিছুই করা হয় নাই, কিছুই দেওয়া হয় নাই। যখন তাহা করা হয় নাই ও দেওয়া হয় নাই, তখন শতবার্ষিক উৎসব আমার এখনও হয় নাই। ভাদ্র মাসে কলিকাতায় দশদিনব্যাপী উৎসব সম্ভোগ করিলাম, কার্ত্তিক মাসে এখানে পাঁচদিন উৎসব সম্ভোগ করিলাম; তাহাতে অনেক জ্ঞান-ভক্তি লাভ হইল, অনেক আনন্দ পাইলাম। কিন্তু শতবার্ষিক উৎসব ত পাওয়ার উৎসব নয়; এ যে দেওয়ার উৎসব! শত বৎসর ধরিয়া যত করুণা পাইয়াছি, কিছু দিয়া ও করিয়া তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, এই ত ছিল উৎসবের উদ্দেশ্য!

শতবার্ষিক ব্রহ্মোৎসব একটি সমবেত সাধনা। মন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনা আমাদের একটি সমবেত সাধনা। স্থানীয় সমাজের বাৎসরিক উৎসব তাহা অপেক্ষা বড় সমবেত সাধনা; কেন না, তাহা কয়েকদিন ধরিয়া চলিতে থাকে। ভাদ্রোৎসব ও মাঘোৎসব তদপেক্ষাও বড় সমবেত সাধনা; কেন না, তখন দেশের সকল ব্রহ্মোপাসকমণ্ডলী এক সময়ে এবং আকাঙ্ক্ষায় পরম পিতাকে ডাকেন। তেমনি, শতবার্ষিক ব্রহ্মোৎসব কালের দীর্ঘতায়, স্থানের বিস্তারে, আকাঙ্ক্ষার উচ্চতায় ও প্রণালীর বিচিত্রতায় আমাদের বৃহত্তম সমবেত সাধনা। ইহার মত বড় সাধনা ব্রাহ্মসমাজে আর আসে নাই; আমাদের জীবিতকালে আর আসিবে না। এই দেড় বৎসর কালের মধ্যে যেখানে যত উৎসব হইতেছে সকলই এই মহাসাধনার অন্তর্গত। এমন কি, যেখানে যত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক উপাসনা প্রার্থনা হইতেছে, তাহাও ইহার অন্তর্গত। এমন সাধনায় আমরা আমাদের হৃদয় মন ভক্তদের সঙ্গে, ত্যাগীদের সঙ্গে, সংগ্রাম-শীলদের সঙ্গে, প্রার্থনাপরায়ণদের সঙ্গে মিলাইয়া দিলাম না, এ অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

এই মহোৎসবকে সাধনার দৃষ্টিতে না দেখিয়া, প্রচারের সুযোগরূপে দেখিলে, অথবা ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টিতে না দেখিয়া রস-সম্ভোগের আয়োজনরূপে দেখিলে, ইহাকে অত্যন্ত হীন করা হয়। এইরূপে ইহার ব্যবহার নিতান্তই অপব্যবহার।

এই উৎসবকে ঠিক ভাবে দেখা ও ইহার যথোচিত সম্পাদনের উপর দ্বিতীয় শতাব্দীতে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সফলতা বহু পরিমাণে নির্ভর করে। ইহাকে যদি আমরা অল্প কয়েক জনের প্রচার, ও অবশিষ্ট সকলের শ্রবণরূপে দেখি, এবং কয়েক-দল লোক সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলেন ও হাজার হাজার লোক তাহা শ্রবণ করিল, এই দেখিয়াই সন্তুষ্ট হই, তবে আগামী শত বৎসর যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রধানতঃ বলা ও শুনার ধর্ম্মই থাকিবে, তাহা একরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। পক্ষান্তরে, ইহাকে যদি আমরা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, মণ্ডলীগত ও সম্প্রদায়গত সাধনারূপে দেখি, এবং এই চারি ভাবে ত্যাগ-স্বীকার দ্বারা ইহা সম্পাদন করি, তবেই আশা করা যাইতে পারে যে, নূতন শতাব্দীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনার ধর্ম্ম হইবে, এবং ইহা ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, মণ্ডলীর জীবনে ও সম্প্রদায়ের জীবনে বদ্ধমূল হইবে।

যে ধর্ম্ম বক্তৃতার উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে, তাহার স্থায়িত্বের ভিত্তি বড় দুর্ব্বল; কেন না বাগ্মী লোকের অভাব হইলে অল্প কালের মধ্যেই তাহার প্রভাব ম্লান হইয়া পড়িবে; এবং ক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যাওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু যে ধর্ম্ম আশ্রিত নরনারীর জীবনে ও পরিবারে বদ্ধমূল, তাহার উচ্ছেদ করে কাহার সাধ্য?

পাশ্চাত্য দেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের রক্ষা ও বিস্তার প্রধানতঃ বক্তৃতা ও উপদেশের উপর নির্ভর করে। প্রতি সপ্তাহে শত শত গির্জ্জায় উপদেশ দিয়া আচার্য্যেরা লোকের ধর্ম্ম-বিশ্বাস রক্ষা করিবার যত্ন করেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের এমন একটি ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহাতে উপযুক্ত আচার্য্যের অভাব হয় না। কোনও গৃহস্থের পাঁচটি পুত্রসন্তান থাকিলে, চারটিকে যেমন তিনি নানা প্রকার ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তুত করেন, একটিকে তেমনি ধর্ম্মাচার্য্যের কাজের জন্য প্রস্তুত করাও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। ইহাতেই সেই দেশে ধর্ম্মাচার্য্যের অভাব হইতেছে না।

আমাদের দেশের ব্যবস্থা অন্যরূপ। এ দেশে ধর্ম্মকে

ব্যক্তিগত জীবনে ও পারিবারিক ব্যবস্থার মধ্যে এমন করিয়া প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যে, আর বক্তৃতা ও উপদেশের প্রয়োজন হয় না। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের যত কেন দোষ থাকুক না, ইহার এই একটি মহৎ গুণ, যে, ইহা আপনার বিশ্বাসানুযায়ী ধর্ম্মানুষ্ঠানকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। এই ধর্ম্ম যে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এতকাল বাঁচিয়া আছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, ইহা অনুষ্ঠান-প্রধান, এবং ইহার অনুষ্ঠানসকল পারিবারিক ও সামাজিক গঠনের সহিত জড়িত।

ব্রাহ্মধর্ম্মকেও যদি এ দেশে স্থায়ী ও স্থায়ী হইতে হয়, তবে ইহার জীবনে ও পরিবারে বদ্ধমূল হওয়া চাই। অবশ্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠানসকল বর্ত্তমানে বহুপরিমাণে অর্থহীন ও প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে; আমরা সেরূপ প্রাণহীন ক্রিয়াবহুলতা চাই না। কিন্তু জীবন্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্ম্মকে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলা ত চাই?

পরিবারে জীবন্ত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা বড়ই কঠিন; এবং আমাদিগকে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমরা এ বিষয়ে হারিয়া গিয়াছি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও আচার্য্য শিবনাথ কত দুঃখ করিয়া গিয়াছেন যে, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি গৃহে দৈনিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইল না। আচার্য্য নবদ্বীপচন্দ্র দেহত্যাগের দুই তিন দিন পূর্ব্বে কলিকাতার উপাসকমণ্ডলীর জন্য যে উপদেশ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যাহা শেষ করিয়া উপাসকমণ্ডলীকে শুনাইবার সময় তিনি পাইলেন না, পরিবারে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাই সেই উপদেশের বিষয় ছিল। তাঁহার অন্তিম আক্ষেপ এই ছিল, যে, আমাদের মধ্যে আদর্শ পরিবার তিনি অল্পই দেখিলেন। অতএব নূতন শতাব্দীতে ব্রাহ্মসমাজের যদি কিছু অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য থাকে, তবে তাহা পরিবারে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য যে সম্পন্ন হইবে, তাহা আমরা কি হইলে আশা করিতে পারি? যদি শতবার্ষিক ব্রহ্মোৎসবে তাহার পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাই। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, শতবার্ষিক উৎসব মন্দিরে মন্দিরে হইতেছে, সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে বেড়াইতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত পরিবারে পরিবারে ফুটিয়া উঠিল না! পরিবারে পরিবারে উৎসব করাও ত আমাদের কার্য্য-প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পারিবারিক উৎসব করিতে হইলে, ঘরে ঘরে যে পরিমাণ প্রাণশক্তির দরকার, তাহা আমাদের মধ্যে নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের পারিবারিক সুখ সুবিধা বাড়াইয়াছে। ইহা পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মিক উন্নতিকে বাধামুক্ত করিয়াছে। সুতরাং এই ধর্ম্মের শতবর্ষ পূর্ণ হওয়াতে আমাদের পারিবারিক কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশের যথেষ্ট কারণ আছে। প্রত্যেক পরিবারের উচিত ছিল, একটি আনন্দোৎসব করিয়া সর্ব্বসাধারণকে জানান, যে, আমরা এই মহৎ ধর্ম্ম পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

নিজের অক্ষমতা স্মরণ করিয়া এ বিষয়ে আমার নীরব থাকাই উচিত ছিল; কিন্তু সকল কথা বলিয়া, আসল কথাটি না বলিলে অপরাধ হয়, এই কারণে নিতান্ত কর্ত্তব্যবোধে বলিতে হইল।

ব্রাহ্মসমাজের গঠন এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই; ইহা আজও গড়িয়া উঠিবার পথে। একশত বৎসরে ইহার উপাসনা-প্রণালী, উৎসবাদির প্রকৃতি, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, রীতি-নীতি, কিয়ৎ পরিমাণে গড়িয়া উঠিয়াছে বটে; কিন্তু এখনও গঠনকার্য্য অনেক বাকী। এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া আমাদের সকল বিষয়ে চিন্তা করা ও প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা আবশ্যক। আমাদের মাঘোৎসবটিকে শুধু মন্দিরের উপাসনা-বক্তৃতায় ও সঙ্গীত-সঙ্কীর্ত্তনে না রাখিয়া, কিরূপে গৃহে গৃহে মূর্ত্তিমান করা যায়, এ বিষয়ে একজন চিন্তাশীলা ও ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা গত ১লা মাঘের তত্ত্বকৌমুদীতে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

"উৎসব জিনিসটা কি শুধু সামাজিক? প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব জিনিষ নয়? উৎসবটাকে এমন কোনও রূপ দেওয়া যায় না কি, যাতে পরিবারের প্রত্যেকটি শিশু পর্য্যন্ত অনুভব করে যে এটা আমাদের পারিবারিক ব্যাপার?"

মাঘোৎসবকে পারিবারিক উৎসবরূপে গ্রহণ করিবার কয়েকটি উপায়ের উল্লেখ করিয়া, তিনি লিখিয়াছিলেন—

"যাঁরা সামাজিক উৎসবের আয়োজনে যোগ দিতে পারছেন, তাঁরাও পরিবারে যদি আরও প্রসারিত করে' ইহার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, তবে নিশ্চয়ই আরও সুন্দর, আরও সার্থক, আরও পূর্ণরূপে ইহার ফল পাবেন; এবং সন্তানেরাও আর ধর্ম্মানুষ্ঠানে এত উদাসীন থাকতে পারবে না।"

বাস্তবিক, আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে, যতদিন মাঘোৎসবটি কেবল মন্দিরের উৎসব থাকিবে, ততদিন ইহা হইতে আমরা ষোল আনা কল্যাণ পাইব না। সামাজিক উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক উৎসব হইয়া উঠিলেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও অধিক মধুর হইবে।

শতবার্ষিক মহোৎসবের সম্বন্ধেও এই কথাই সত্য। ইহা শত শত পারিবারিক উৎসবের আকারে প্রকাশ পাইলেই আমরা ইহার যথার্থ শোভন ও কল্যাণপ্রদ রূপ দেখিতে পাইতাম। মন্দিরে মন্দিরে যাহা হইয়াছে ও হইবে তাহারও প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে; কিন্তু গৃহে গৃহে হওয়ার প্রয়োজনীয়তাও অল্প নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মন্দিরে উপাসনা বক্তৃতাদির দ্বারা ধর্ম্মের রক্ষা ও বিস্তার প্রধানতঃ পাশ্চাত্য রীতি; গৃহে অনুষ্ঠানই দেশীয় রীতি। আমাদিগকে উভয় রীতির মিলনসাধন করিতে হইবে।

এখনও দশ মাস সময় বাকী আছে। আমাদের প্রাণ কি এখনও এমন ভাবে জাগিবে, যে, শতবার্ষিক ব্রহ্মোৎসবকে আমরা যথার্থ দৃষ্টিতে দেখিব ও যথোচিতরূপে সম্পন্ন করিব? যিনি এই মহাসাধনার লক্ষ্য, তিনি উপযুক্তভাবে আমাদের দ্বারা ইহা সম্পন্ন করাইয়া লউন; এবং ভারতক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাঁহার মহৎ অভিপ্রায় পূর্ণ করুন—এই প্রার্থনা। নূতন বৎসরের প্রথম দিনে সকলে মিলিয়া তাঁহার চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করি।

বর্ষশেষ ও নববর্ষ উৎসব।

বর্ষশেষ ও নববর্ষ উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রণালীতে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে :—

৩০শে চৈত্র (১৩ই এপ্রিল) শনিবার— প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল—

আজ বৎসরের শেষ দিন। এই দিনে আমাদের দেশের ব্যবসায়িগণ তাহাদের সমগ্র বৎসরের লাভ ও ক্ষতির হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করে। আজ লাভবান ব্যবসায়ীর মুখকান্তিদর্শনে আত্মীয় স্বজন কতই প্রীতিলাভ করিতেছেন! ব্যবসায়ীর মনে আজ নূতন উৎসাহের ফোয়ারা ফুটে উঠেছে—প্রাণে কতই আনন্দ, হৃদয়ে কত নব নব সঙ্কল্প ফুটিয়া উঠেছে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীর প্রাণ ফাটিয়া ক্রন্দন বাহির হইতেছে—নিরুৎসাহে, নিরাশায় সে যেন মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। সাধনার্থীর পক্ষেও আজ নূতন রকমের হিসাব নিকাশের দিন। আজ তাঁহারও নিবিষ্টচিত্তে লাভ ও ক্ষতি গণনা করিবার দিন। বৎসরের এই শেষ দিনটীতে আমরা প্রত্যেক হৃদয়কে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি—তপস্যার কুশল তো? জীবনবিধাতার চরণতলে কি বসিতে শিখেছি? বস্তুতে কি প্রাণ সত্য সত্যই ব্যগ্র? আমাদের বিশ্বাস কি দৃঢ় হইয়াছে? হৃদয়ের সকল অন্ধকার কি অপসারিত হয়েছে? কর্ত্তব্যে কি দৃঢ়তা জন্মেছে। সাধু সঙ্কল্পগুলি কি ভেসে গিয়েছে, না কার্য্যে পরিণত হয়েছে? অন্যের দুঃখে কি সমবেদনা প্রদর্শন করিতে শিখেছি? অন্যের আনন্দে কি সুখী হ'তে পেরেছি? বিপন্নব্যক্তির হাতখানা কি ধরতে শিখেছি? যাঁহারা প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর দিতে পেরেছেন, তাঁহারা যে এই একটী বৎসরে আশাতিরিক্ত লাভবান হয়েছেন তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজিয়া পান না, আজ তাঁহাদের চিত্ত নিরাশায় পূর্ণ হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের বিষম ক্ষতি—সঙ্কল্প ভঙ্গে, ব্রহ্মকৃপায় অবিশ্বাসে, এবং সাধনে দৃঢ়তার অভাবে। স্বীয় জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া যখন দেখিতে পাই যে, বৎসরে তেমন কিছু লাভ করি নাই, অযাচিত ব্রহ্মকৃপাপ্রবাহের এক বিন্দুও প্রাণে ধারণ করিতে পারি নাই, আদর্শের দিকে একটুও অগ্রসর হইতে পারি নাই, তখনই বুঝিতে পারি যে, জীবনস্রোত নিম্নগামী হইতেছে। সাধনরাজ্যে কেহ তো একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না,—হয় অগ্রসর হইবে, না হয় পশ্চাৎপদ হইবেই। আজকার দিনে আমরা নূতন করিয়া জীবন-গ্রন্থ অধ্যয়ন করি। হৃদয় কত সময় অযাচিত ভাবে ভগবৎ প্রেম অনুভব করেছে তাহা স্মরণ করি; জীবনসংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও মাথা রাখ্‌বার যে স্থান পেয়েছি, তাহার কথা আজ অনুধ্যান করি। অসহ্য বেদনা দিয়াও পরম দয়াল যে আমাদিগের মোহকলুষ বারংবার দূর করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিয়া আজ তাঁহার চরণে গর্ব্বিত মস্তক অবনত করি। সকল স্মরণ করিয়া জীবন আজ উদ্বুদ্ধ হউক, আজ জীবনের গতি আলোকের দিকে ধাবিত হউক। আজ নবজীবনলাভের জন্য সংকল্প গ্রহণ করি। অন্তর্দৃষ্টি আজ খুলুক। প্রাণের অন্তরতম প্রদেশ হইতে বিশ্বাসী ও ভক্ত কবি শিবনাথের অমর ভাষায় বলি ;—

"খাঁটি থেকো সদা নিজ আলোকের কাছে,
পতনেও রাখিও ধরমে ;
নিও সাজা দুর্গতির যা নিবার আছে,
বাঁচা'ওনা আপন করমে।
আস নাই এ জগতে বাহবা লইতে,
আস নাই সুখ-অন্বেষণে ;
আছে কিছু কাজ যাহা এসেছো সাধিতে,
সাধ তাহা জীবনে মরণে।

* * *

এ জগতে বড় কিছু করিতে না পার,
খাঁটি থাক আছরে যেখানে,
মহৎ, পবিত্র, শুভ্র, যা কিছু নেহার,
খাঁটি থাক তাঁর সন্নিধানে।

সায়ংকালে "যুগান্তর সংগঠন" বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

১লা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল) রবিবার— প্রাতে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। "নবীন দিনে আজি নূতন বরষে" ইত্যাদি সংগীত হইলে পর তিনি নিম্ন-লিখিত মর্ম্মে উদ্বোধন করেন :—

সংসারতাপের মধ্যে, কলুষ কলঙ্কের মধ্যে, অনুতাপ বেদনার মধ্যে আশার কথা আছে। যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপাস্য তিনি আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়াছেন, পূজার মন্দিরে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার যে বর্ণনাতীত রূপ, কতবার তাহার আভাস দিয়াছেন! ইহাতেই আশা। আপনারা বলিতে পারেন, ইহাতে কি বেদনাতে আশা বুঝায়? হাঁ, বেদনাতেই আশা। তিনি অনবরত শাসন করিতেছেন, বেদনা দিয়া কাছে ডাকিতেছেন, এই আশার কথা। তাহা না হইলে কোনও আশা থকিত না। আর একটি ভাব কিছুদিন হইতে প্রাণে আসিতেছে—পুরাতন কথা—নিয়ত বিশ্বের সকলের জন্য কল্যাণকামনা করিতে হইবে। শুধু মানুষেরই কল্যাণ হউক তাহা নহে, জড়ের—বৃক্ষ লতা, নদী গিরি বনের,—সমস্ত বিশ্বের কল্যাণ হউক, এই কামনা করিতে হইবে। তাহাদের একটিরও মঙ্গল দেখিলে মনে হয়, বিশ্বপতি কত শোভায় তাহাদিগকে শোভিত করিতেছেন, তিনি কত স্নেহ করিতেছেন! বর্ষার দিনে জল সিঞ্চন করিয়া তাহাদিগকে কিরূপ স্নিগ্ধ করিতেছেন! শীতকালে ইউরোপে না গেলে evergreen (চিরশ্যামল বৃক্ষলতা) শব্দের অর্থ বুঝা যায় না। শীতকালে সেখানে দুই একটি evergreen ব্যতীত অপর সমস্ত বৃক্ষলতার পাতা ঝরিয়া পড়ে, কেবল শুষ্ক মৃত ডাল লইয়া গাছগুলি দাঁড়াইয়া থাকে। ফাদার লরেন্স এরূপ একটি গাছ দেখিয়া মনে ভাবিলেন, কয়দিন পরেই ত ইহার নূতন পাতা বাহির হইবে, এই দুর্দ্দিন আর থাকিবে না। ইহাতে বিশ্ববিধাতার কি কৃপা! ইহা হইতে তিনি আশা পাইলেন। শাস্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলাম, বৃক্ষ লতা নবপল্লবে শোভিত দেখিলে যে তাহার মধ্যে পরমেশ্বরের কৃপা অনুভূত হয়, ইহা কি কল্পনা? তিনি উত্তর করিলেন, "বল কি? ইহা দেখিয়াই ফাদার লরেন্স নবভক্তি পাইলেন।" এই বলিয়া ফাদার লরেন্সের কথা উল্লেখ করিলেন। কিছুদিন হইল একখানা ইংরাজী পত্রিকাতে একটি নূতন কবিতা পাইলাম,তাহা পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম, সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিলাম। সাহিত্যের অধ্যাপক এক সুপণ্ডিত বন্ধুকে পড়িয়া শুনাইলে তিনিও মুগ্ধ হইয়া তাহা লিখিয়া লইলেন। সেই কবিতার লেখিকা মহিলাটি ভগবানকে বলিতেছেন, "আমি শান্তি চাই না, বেদনা আমাকে দেও, এই বেদনার মধ্য দিয়াই আমি পরম শান্তি পাইব। অসার আমোদ প্রমোদ আমি চাই না, আমাকে গভীর চিন্তাশীলতা দেও।" কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলিয়াছেন—In the ports of levity there is no refuge for the human spirit in distress—অসার আমোদ প্রমোদের বন্দরে (পোতাশ্রয়ে) বিপন্ন মানবাত্মার কোনও নিরাপদ আশ্রয় নাই। অসার আমোদ প্রমোদে শান্তি নাই। বেদনার দ্বারা কি শান্তি পাওয়া যায় কবি ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ তাহা দেখাইয়াছেন। এখানেই তাঁহার মহত্ত্ব। এই মহিলার কবিতাটি পড়িয়া অন্তরে বল পাইলাম। ঘোর শোকের সময় ভক্তিভাজন ভুবনমোহন সেন মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন, "এই পথ দিয়াই যাইতে হইবে"।

আজ এই ভাবেই নববর্ষ আরম্ভ। তিনি আমাদিগকে শাসন করিতেছেন। ভয় কি? তিনি আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়াছেন। এই ত আশা। নানা যুগে নানা লোকে তাঁহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়াছেন। ইহা কি কল্পনা? তিনি তুলনারহিত। তবে কেন ক্ষুদ্রের পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইব? ক্ষুদ্রের পূজা করিব? প্লেটো, উপনিষদ্‌, এমার্সন প্রভৃতির কথা অনেকবার বলিয়াছি। আজ আর একজনের কথা বলি। জেমস্‌ ফ্রিম্যান ক্লার্ক বলিয়াছেন এক বচনাতীত সৌন্দর্য্য আমাদিগকে নিয়ত প্রলুব্ধ করিতেছে। আজ তাহাই স্মরণ করি। তিনি আমাদের ডাকিয়াছেন, ইহাতেই আশা। সকল সময়ে তাঁহার আভাস পাইব, এরূপ আশা করিতে পারি না। যিশুকেও বলিতে হইয়াছিল "পিতা, তুমি কেন আমাকে এ সময়ে পরিত্যাগ করিলে?" Tides of the inner life—আধ্যাত্মিক জীবনের জোয়ার ভাটা—কেন হয় বলা যায় না। তবে সকলের জীবনেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। সেণ্টফ্রান্সিস্‌ অফ্‌ এসিসি দুই বৎসর কি বিরহ কষ্টই না ভোগ করিয়াছিলেন! ম্যাডাম গিয়োঁ সাত বৎসর কি কষ্ট পাইয়াছিলেন! তিনি বলিয়াছিলেন "আমার মাথা রাখিবার স্থান নাই।" আমারও অনেক সময় ঠিক তাহাই মনে হয়। এখানে সায় পাইলাম। এমন সাধু যিনি, তাঁহার এই অবস্থা হইল! আমার তবে কি হইবে! নিয়ত শান্তি ও আনন্দ সম্ভোগই যে আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষণ তাহা নহে। নিষ্ঠাই উন্নতির প্রকৃত লক্ষণ। অন্ন জল পাইলেই যে তাঁহার স্নেহ উপলব্ধি করিতে হইবে এমন নহে, না পাইলেও তাঁহার স্নেহে বিশ্বাস করিতে হইবে। রাজনারায়ণ বসু ভক্তিভাজন নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "যিনি অনাহারে থাকিয়াও ভক্তিভাবে ব্রহ্মের পূজা করিতে পারেন তিনিই ব্রাহ্ম।" আমাদের সঙ্গীতে আছে, "যখন যে ভাবে বিভু রাখিবে আমারে সেই সুমঙ্গল, যেন না ভুলি তোমারে।" গীতাকার বলিয়াছেন "তৎপর" হইতে হইবে। তৎপর অর্থ তদেকনিষ্ঠ, এক তাঁহারই উপর নির্ভর। "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্‌" এই মন্ত্র যদি সাধন করিতে পারি তবেই নির্ভরের শক্তি আসিবে। নববর্ষের দিনে তিনি কৃপা করিয়া সেই দৃঢ়তা, নিষ্ঠা ভক্তি দিন, যেন তাঁহাকে ধরিয়া থাকিতে পারি। Pray without ceasing, অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর। নিয়ত তাঁহার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী হইয়া যেন থাকিতে পারি। সকলের প্রাণেই শান্তির আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা তাঁহার জন্য নিয়ত আকাঙ্ক্ষা। আমাদের প্রাণে সেই প্রার্থনা আসুক। যিনি দেশাতীত কালাতীত তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আসুক। কিছুতেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছাড়িব না, নিরাশ হইয়া ফিরিব না। নিয়ত প্রতীক্ষা করিতে হইবে, তিনি প্রকাশিত হউন আর না হউন। তাঁহার চিন্তনে প্রাণ ডুবিয়া যাউক। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনায় মানুষ ডুবিয়া যায়। আর্কিমিডিস্‌ কি দৃষ্টান্ত দেখাইলেন! রোমান সৈন্য তাঁহাকে বধ করিতে আসিলে তিনি প্রাণভিক্ষা করিলেন না, বলিলেন, "অপেক্ষা কর, এই অঙ্কটা শেষ হউক।" তাঁহার চিন্তনে সেরূপ ডুবিতে পারিলাম না! তবে আমরা কি করিয়া ভূমার উপাসক হইব? আমরা তাঁহাতে ডুবিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হই। নব নিষ্ঠা, নব ভক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগুক। পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া আসিল, ইহাতে আত্মার নববর্ষ হয় না। আত্মার নববর্ষ নূতন সত্যলাভে হয়, নব ভক্তিতে হয়, নিষ্ঠাতে হয়। তাহাই আমাদের হউক।

এমার্সনের কথা—"খাল নালা সকল বস্তুতেই সূর্য্যের ছায়া পড়ে, তুমি যদি না দেখ তবে তুমি অন্ধ।" তাঁহার প্রকাশ সকলের মধ্যেই আছে। "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বম্‌" বলিলেই হয় না। তাহা সাধন করিতে হয়। আমাদের প্রাণে নূতন আকাঙ্ক্ষা আসুক। তাঁহার প্রকাশ ভিক্ষা করিয়া আমরা অন্তকার পূজাতে প্রবৃত্ত হই। হে অসীম, আমাদের নিকট প্রকাশিত হও। তোমার কৃপা ভিন্ন "নাহি অন্য গতি।" সেই বচনাতীত রূপের আভাস দিয়াছ। প্রাণে নব আকাঙ্ক্ষা, নব নিষ্ঠা দেও। তোমার পূজার তুমি পুরোহিত। আমরা কিরূপে তোমার পূজা করিব? তুমি পাপীকে দিয়াও তোমার পূজা করাইয়া লও, দেখাইয়াছ। আজও তাহাই করাও।

অনন্তর "প্রাণ সখাহে আমার" ইত্যাদি দ্বিতীয় সঙ্গীতের পর আরাধনা ও মিলিত প্রার্থনা। তাহার পর "জয় জয় পরব্রহ্ম তুমি অপার অগম্য" ইত্যাদি তৃতীয় সঙ্গীত গীত হইলে পর যে উপদেশ প্রদত্ত হয় তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

অন্তরে একটি নব যুগের প্রার্থনা করিতেছি। সেই নব-যুগ যদি পাই তবেই নববর্ষ আসিয়াছে বলিতে পারি। সেই নবযুগ সম্বন্ধে ইহুদি জাতির উপাস্য দেবতা যাভে (যাঁহাকে যিহোভা বলা হয়) যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রাণে জাগিতেছে। তিনি জেরিমায়াকে বলিতেছেন "এতদিন তোমাদের সঙ্গে আমার এই

অঙ্গীকারপত্র বিনিময় হইয়াছিল যে, তোমরা যদি আমার আদেশ পালন কর তবে আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব, সুখৈশ্বর্য্য দিব, আর যদি তাহা না কর তবে তোমাদিগকে বিনষ্ট করিব—তাহা এখন চলিয়া গেল, তাহার পরিবর্ত্তে ইহুদি জাতির জন্ম নূতন ব্যবস্থা করিতেছি। I will put the law in their inward parts আমি তোমাদের অন্তরে আমার বিধি নিহিত করিয়া দিব। এখন হইতে তোমরা যে আমার অধীন হইবে তাহা দণ্ডের ভয়ে নয়, পুরস্কারের আশায়ও না, শান্তির আকাঙ্খায় নয়, বেদনার ভয়েও নয়। আমার অধীন হইবে এই বলিয়া যে তাহা না হইয়া পার না।" এই আনুগত্যের ভাব ব্যতীত আর আশা নাই, এই ভাবটি প্রাণে আসিয়াছে। "মুক্তির আশা ছাড়িয়া দেও, আমাকে অনুসরণ করিয়া যাও!" আমাদেরও যেন তিনি এই কথা বলিতেছেন আমাদিগকে তাঁহার অনুগত হইয়া চলিতেই হইবে। এই কথার উপর জোর দিতেই হইবে—"তুমি যে বিধি কর বিধি সেই হয় মঙ্গল বিধি।" আমার পরিত্রাণ যদি না হয়, আমার বেদনা যদি দূর না হয়, পাপের জন্ম যদি নিয়ত দণ্ডই পাইতে হয়, তবে তাহাতেই কল্যাণ। পাপের দণ্ড হইলে, তাহা দেখিয়া লোকের শিক্ষা হইবে; আমারও শিক্ষা হইবে। এই আনুগত্য যদি পাই, তবেই নব যুগ, নব বর্ষ, আসিয়াছে বলিতে পারি। ইহাই আমাদের পাইতে হইবে। কেবল আমার ত্রাণ নয়, গতি-মুক্তি নয়, জগতের গতি-মুক্তি তাঁহার চরণে প্রার্থনা করিতে হইবে।

লর্ড বায়রণ সম্বন্ধে অনেকেই জানেন, তাঁহার জীবন ভাল ছিল না, কত অপরাধ ছিল; কিন্তু তিনি যে ভাবে প্রাণ দিলেন তাহাতে মনে হয় তিনি যেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। গ্রীসের দুর্দ্দশায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিল। তাহার কল্যাণের জন্ম কবিতাতে প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। তাঁহার কথায় সকলের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কেবল প্রতিভা দিয়াই সেবা করিলেন না, কবিতা লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। গ্রীসের জন্ম প্রাণ দিলেন, তাহার স্বাধীনতার জন্ম যুদ্ধ করিতে যাইয়া প্রাণ হারাইলেন।

অন্তরে এই ভাব জাগিতেছে.—এমন ভাবে জগতের মঙ্গল কামনা কর যাহাতে তোমার নিজের ভাবনা থাকিবে না। লোকে প্রেমের জন্ম কি না করিতে পারে? জগতে পিতা-মাতা সন্তানের জন্ম কি না করেন! যে সন্তান পাপে মলিন তাহাকেও পিতা-মাতা স্নেহ করেন। তথাপি এমন লোকও আছে, যাহারা সন্তানকে দূর করিয়া দেয়। কিন্তু পরম জননী কাহাকেও ছাড়িবেন না। তাঁহার প্রেম সকল সন্তানের জন্মই আছে। প্রত্যেকেই অন্তরে সে প্রেমের পরিচয় পাই। "এখন তোমাদের অন্তরে আনুগত্যের ভাব দিব, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ সকল অবস্থার মধ্যে তোমরা আমার অনুগত হইয়া চলিবে", এই আনুগত্যের যুগ তিনিই প্রাণে আনিয়া দিন। "তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যার, প্রাপ্ত হয় আত্মবিস্মৃতি, ব্যাপ্ত হয় জগতে প্রীতি।"

আমাদের উপাস্য দেবতা অসীম। তাঁহাকে যে একটু প্রীতি করিতে পারে সেই বলিতে পারে,—"তুমি যে বিধি কর বিধি সেই হয় মঙ্গল বিধি।" ভক্ত যাঁহারা তাঁহারা এই কথা বলিয়াছিলেন। তবে এই প্রার্থনা প্রাণে আসিয়াছে—আপনাদের কাছে বলিতে পারি সকলেই যেন এই প্রার্থনা করি—আর শান্তি চাই না, শান্তির প্রার্থনা করি না, তিনি যাহা দেন তাহাই যেন মাথা পাতিয়া লই। তিনি যে রূপ দেখাইয়াছেন তাহাতে অন্য আকাঙ্খা থাকে না। দেখা দেন ভাল, না দেন ভাল। তিনি যে পথ দেখান তাহাই অনুসরণ করিব,—আনুগত্য চাই, সকলের কল্যাণ চাই। বুদ্ধদেবের উপদেশ হইতে এই শিক্ষা লইতে হইবে, জগতের কল্যাণ কামনা করিতে হইবে, সকলের বেদনা আপনার করিয়া লইতে হইবে। সুখের ইচ্ছা হইতে যে পূজা তাহা পূজাই নয়। কল্যাণের জন্মই পূজা করিব। এমার্সন বলিয়াছেন, I am dear to the heart of Being—যিনি জগতের অন্তরাত্মা আমি তাঁহার প্রিয়। তিনি আমাকে ভাল বাসেন, তিনি আমার কল্যাণই করিবেন।

আমি যদি তাঁহার অনুগত হই, তাঁহাকে পাই, তবে জগতেরও সেবা তাহাতে হইবে, পূজা ভাল করিয়া করিলে নিজের কল্যাণ হইবে, জগতের কল্যাণ হইবে। লোকপ্রীতি, লোক-সেবা তাঁহার পূজার অঙ্গ। কালই ফাদার ডামিয়ানের কথা হইতেছিল; লিট্‌ল্ সিষ্টার্স অব দি পূওরদের কথা অনেকেই জানেন। তাঁহারা কি করিয়া পরকে আপনার করিয়াছেন! পিতাকে পুত্র তাড়াইয়া দিয়াছে—তাঁহারা বলিতেছেন "আমরাই তোমার পুত্র।"

"I will put the law in their inward parts." আনুগত্যের জন্মই পূজা, শান্তির জন্ম পূজা কিছু নয়। আমার কল্যাণ হইলেও জগতের কল্যাণ, আমিও জগতের একজন।

লর্ড মর্লি বার্কের কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন "ধর্ম্ম দিয়া লোকের কি উপকার হইবে? এই যে তন্তুবায় সমস্ত দিন খাটিয়াও পরিবার পালন করিতে পারিতেছে না, তাহার জন্ম ধর্ম্ম কি করিবে?" ইহার উত্তরে বলা যায়, তাহারও আত্মার ক্ষুধা আছে, ঘর-বাড়ী দিয়া তাহা দূর হয় না, একমাত্র ধর্ম্মই সে ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারে। "তব বলে কর বলী যে জনে, কি ভয় কি ভয় তাহার!" তিনি যাঁহাকে বল দেন তাহার কিছুতেই ভয় নাই। তাই অন্তরে এই ভাব আসিয়াছে "তুমি যে বিধি কর বিধি সেই হয় মঙ্গল বিধি।" সাধুরা যে মৃত্যুকে কষ্টে বরণ করিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহারা আনন্দেই দুঃখ কষ্ট মৃত্যুতে ঝাঁপ দিয়াছেন। ম্যাডাম গিয়োঁ সমুদ্রে ঝড়ের মধ্যে ডুবিবেন এরূপ অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও বলিলেন, "ভয় হইল না, আনন্দই হইল"। তাঁহার প্রভাবে তাঁহার পরিচারিকাও ঘোর বিপদের সময় আনন্দই অনুভব করিল। ইহাই আনুগত্য। "তুমি যে বিধি কর বিধি সেই হয় মঙ্গলবিধি", একথা যেন আনন্দেই বলিতে পারি। ভয়ে নয়, সুখের আশায় নয়, অনুগত না হইয়া পারি না, এই জন্মই আনুগত্য চাই। প্রাণে একটা বিশ্রামের স্থান চাই। যদি প্রাণ বলিদান দিতে পারি, তবেই সেই বিশ্রামের স্থান পাই, আনুগত্য আসে।

যিশু প্রার্থনা করিয়াছিলেন "Nevertheless, not as I will, but as thou wilt." বিপদে পড়িয়া যিশু একবার প্রাণ

চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই "তথাপি, আমি যেরূপ ইচ্ছা করি সেরূপ নয়, তুমি যাহা ইচ্ছা কর তাহাই হউক", এই বলিয়া আপনার ইচ্ছা বলিদান করিলেন, আনুগত্যের সহিত মৃত্যুকে বরণ করিলেন।

লোকের মঙ্গলকামনায় বেদনার মধ্যে আনন্দে ঝাঁপিয়া পড়িতে হইবে। আমাদের উপাস্য দেবতা বলিতেছেন, "আমার অধীন না হইয়া পারিবে না, আমি যাহা দেখাই তাহা দেখিবে, যাহা শুনাই শুনিবে, যে পথে চালাই চলিবে।" সেই অসীমের চরণে আত্মদান ব্যতীত কল্যাণ নাই।

এমার্সন প্রচার করিতে বড় অগ্রসর হন নাই। কিন্তু যাহা বলিয়াছেন তাহাতেই জগতের অসীম কল্যাণ হইতেছে। দেবেন্দ্রনাথ অনেক গ্রন্থ লেখেন নাই, অধিক কথা বলেন নাই, কিন্তু যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই মহা কল্যাণ সাধিত হইতেছে। ব্রহ্মের চরণে যদি স্থান পাই, তাহা হইলে জগতের কল্যাণ হইবেই। তিনি অন্তরে থাকিয়া যে প্রেরণা দিবেন, তাহার অনুগত হইয়া চলিলেই কল্যাণ। জেরিমায়া যাহা বলিয়াছিলেন প্রাণে জানিয়াই বলিয়াছিলেন। ব্রহ্ম আমাদিগকে সেই ভাবে বলিতেছেন, "তোমাদের পূজা হয় নাই"। কোনও ফল কামনায় নয়, জগতের কল্যাণকামনায়ই পূজা হয়। যখন ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পূজা করিতে পারিব, লোকপ্রীতিতে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারিব, তখনই পূজা হইবে। আমাদের জীবনে এই পূজা আসুক, এই ভক্তি আসুক, এই উপাসনা আসুক।

বিশ্বপতি বিশ্বরাজ, অন্তরে সেই ভক্তি চাই যাহাতে সুখ দুঃখের অতীত হইতে পারি। অন্তরে সেই লোকপ্রীতি চাই যাহাতে সকলের কল্যাণ কামনা করিতে পারি। অন্তরে সেই নূতন যুগ আনিয়া দেও, যাহাতে তোমার গৌরবেই আমরা গৌরবান্বিত হইতে পারি। এই প্রেম আমাদিগকে দেও।

"ওহে জীবনবল্লভ সাধ-দুর্লভ" ইত্যাদি সংগীত হইয়া এই বেলার উপাসনা শেষ হয়।

অপরাহ্ণে সমাজের কার্য্যব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য সভাপতির কার্য্য করেন। সায়ংকালে সঙ্কীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম পরে প্রকাশিত হইবে।

প্রচার ব্যবস্থা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৩। প্রচারার্থী গ্রহণ—

(১) অন্যূন ২ বৎসর কাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য না থাকিলে কেহ প্রচারার্থী বলিয়া গৃহীত হইবেন না।

(২) যোগ্যতা—কেহ প্রচারার্থী হইবার জন্য প্রার্থনা করিলে (১) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্ততঃ ৫ জন সভ্যের সেই আবেদনকারী অন্যূন ২ বৎসর কাল তাঁহাদের পরিচিত (personally known),(২) তিনি ধর্ম্মানুরাগী, (৩) উপাসনাশীল, (৪) বিশুদ্ধচরিত্র, (৫) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য ও কার্য্যের সহিত তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি আছে, এবং (৬) শিক্ষা ও প্রকৃতিতে প্রচারক হইবার উপযুক্ত, এই সকল বিবরণ জ্ঞাপন করা আবশ্যক।

(৩) এই বিবরণ প্রাপ্ত হইলে, প্রচারসভা তাঁহাকে প্রচারকপদের উপযুক্ত বোধ করিলে প্রচারার্থীরূপে গ্রহণ করিবেন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকট প্রেরণ করিবেন। এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্তৃক অনুমোদিত হইলে, প্রচারসভা প্রচারার্থীর ব্রতগ্রহণের জন্য বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা করিবেন।

১৪। প্রচারার্থীর প্রতিজ্ঞা:—

প্রচারার্থিগণকে বিশেষ উপাসনান্তে গ্রহণ করা হবে। প্রত্যেক প্রচারার্থীকে নিম্নোক্ত প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হবে :—

(১) ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং অপরের সেবা আমার প্রধান ব্রত। (২) এই ব্রত সাধনে আমি প্রচারসভার নির্দ্দেশের অনুগত হ'য়ে চল্‌ব। (৩) চার বছর আমি প্রচারসভার শিক্ষাব্যবস্থার অধীন থেকে শিক্ষা লাভ কর্‌তে সম্মত। (৪) সকল বিষয়ে বিলাসিতা ও লঘুতা বর্জ্জন ক'রে, আমি সরল শুদ্ধ সংযত থাক্‌তে চেষ্টা কর্‌ব। (৫) ধর্ম্ম-জীবনের গভীরতালাভকে প্রধান উদ্দেশ্যরূপে সাম্নে রেখে, আমি সকল কাজ কর্‌ব। (৬) শিক্ষাধীন অবস্থায় এবং তার পর, আমি সমাজের সেবার ক্ষেত্রে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ও প্রচারসভার নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য করিব।

১৫। শিক্ষা ও পরীক্ষার সময় ও ক্রম—

প্রচারার্থিগণ বৎসরান্তে ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা দিবেন। ১ম বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে, জানুয়ারী মাসে ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীত হ'বেন। ২য় বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে, মাঘোৎসবের পূর্ব্বে বিশেষ উপাসনান্তে "পরিচারক" রূপে ৩য় বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশ কর্‌বেন। ৩য় বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, পরিচারক অধ্যয়নের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট প্রচারকার্য্যও কর্‌বেন এবং বৎসরের মধ্যে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে নিজের অধ্যয়ন ও গবেষণার ফল রচনার আকারে প্রচারসভার বিচারার্থ অর্পণ কর্‌বেন। শিক্ষা বিষয়ে প্রচারার্থী ও পরিচারকগণ প্রত্যক্ষভাবে প্রচারসভার ও সভাপতির তত্ত্বাবধানে থাক্‌বেন।

১৬। পরীক্ষা—(ক) পরীক্ষার নাম :—প্রথম তিন বছরের পরীক্ষার নাম আন্ত, মধ্য অন্ত্য পরীক্ষা। অন্ত্য পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর কৃতিত্ব অনুসারে কোন উপাধি দেওয়া প্রচারসভার বিবেচনাসাপেক্ষ। কিন্তু চতুর্থ বৎসরের শেষভাগে পরিচারক যে রচনা প্রচারসভার বিচারার্থ দিবেন, তা গ্রাহ্য হ'লে লেখককে কোন উপাধি দিবেন এবং তাঁকে প্রচারকরূপে বরণ কর্‌বার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে অনুরোধ কর্‌বেন।

(খ) শিক্ষণীয় বিষয় :—

(১) ভাষা—(ক) বাংলা, (খ) ইংরাজী, (গ) হিন্দী, (ঘ) উর্দ্দু, (ঙ) সংস্কৃত; (বাংলা এবং অন্য দুই)। (২) ইতিহাস (ভূগোল)—ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, জাপান, টার্কী, (আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ)। (৩) দর্শন—Logic, Psychology, Ethics—

ভারতীয় দর্শন, পাশ্চাত্য দর্শন। (৪) বিজ্ঞান (গণিত)—পদার্থবিদ্যা, Chemistry, Astronomy, Physiology, Nursing, Hygiene, First Aid. (৫) ব্রাহ্মসমাজের (ক) ইতিহাস—সংগ্রাম, (খ) দর্শন, (গ) সামাজিক আদর্শ, (ঘ) সাধনতত্ত্ব ও প্রণালী, (ঙ) ব্রহ্মসঙ্গীত, (চ) অনুষ্ঠান, (ছ) Constitution, Act; (জ) ভারতের নানাস্থানের ব্রাহ্মমণ্ডলীর তথ্য। (৬) গান, বাজনা, Gramophone, Magic Lantern, Bycycle চড়া, notice লেখা, রিপোর্ট লেখা, সমিতি গঠন, Typing, Postal Rules, Railway guide, Proof-reading. (৭) Practical ministry. পাঠ, উচ্চারণ, উপদেশ রচনা ও দেওয়া, বক্তৃতা তৈরী ও দেওয়া; আরাধনা, প্রার্থনা, ধ্যান। (৮) ধর্ম্মশাস্ত্র—হিন্দু (শাক্ত, বৈষ্ণব), বৌদ্ধ, শিখ, Bible, কোরাণ (৯) ধর্ম্ম বিধানের ইতিহাস......N. B. যে শিক্ষার্থী যে সব বিষয় B. A. পর্য্যন্ত পড়েছেন, তাঁকে আর সে সব বিষয় পড়্‌তে হবে না; কিন্তু পরীক্ষা দিতে হবে। (১০) জীবনী—বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ, পার্কার, লুথার, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র। ক্রমশঃ

সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একাধিক পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইবে :—

১লা জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে) বুধবার—সায়ংকালে বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও ডাক্তার কালিদাস নাগ।

২রা জ্যৈষ্ঠ (১৬ই মে) বৃহস্পতিবার—প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার। সায়ংকালে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ :—বিগত ২৫শে মার্চ্চ কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের ষট্‌ষষ্ঠিতম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রায় দুই শত নরনারী কলিকাতা হইতে তথায় গমন করিয়াছিলেন। প্রাতে ৮ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস উপাসনা ও শ্রীযুক্ত মানিকলাল দে সঙ্গীত করেন। সাড়ে দশ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় সংক্ষেপে প্রার্থনা করিলে শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার পরলোকগতা মাতা যোগেন্দ্রমোহিণী দেবীর জীবনী পাঠ করেন এবং বিদ্যাসাগর কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য উক্ত মহিলার কয়েকটী সদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়া তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব বর্ণনা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহাশয় সমাজপ্রাঙ্গণে নবনির্ম্মিত "সাধ্বী যোগেন্দ্রমোহিণী সেবাশ্রমের" দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। উপস্থিত সকলকে সামান্য জল যোগে আপ্যায়িত করা হয়। মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন হয়। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত মানিকলাল দে সংকীর্ত্তন করিলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বিষ্ণুপুরাণ হইতে প্রহ্লাদের ভক্তি সাধন বিষয়ে কিছু পাঠ করিয়া সংক্ষেপে উপাসনা করেন ও তদীয় পত্নী শ্রীযুক্তা বিনোদিনী চৌধুরী সঙ্গীত করেন। সন্ধ্যাকালীন উপাসনায় স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীর দ্বারা মন্দির পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং স্থানাভাবে অনেকে বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে বিগত ২১শে এপ্রিল কলিকাতা-নগরীতে পরলোকগত ডাক্তার গিরীশচন্দ্র দের পত্নী অমরধামে গমন করিয়াছেন। শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়-স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

সিটিকলেজ বিল্ডিং ফণ্ড—মার্চ্চ মাসে সিটি-কলেজ বিল্ডিং ফণ্ডে নিম্নলিখিত দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—মেসার্স জে এন দাস ১০৲, এস্ বি দত্ত ১০৲, অমরনাথ ভট্টাচার্য্য ১০০৲, জে এন বসু, ২৫০৲, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ৫০০৲, শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি ৫০৲, মোহিনীমোহন হাজরা ১২৲ মোট ৯৩২৲, পূর্ব্ব স্বীকৃত ৬,৬০৪৸৶ সর্ব্বশুদ্ধ মোট ৭,৫৩৬৸৶০।

গৃহপ্রতিষ্ঠা—বিগত ২১শে এপ্রিল ডাক্তার শিশিরকুমার মিত্রের বালিগঞ্জস্থ নবনির্ম্মিত গৃহের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। নব গৃহ প্রেম-স্বরূপের পুণ্যময় আবাস হউক।

জাতকর্ম্ম—বিগত ৬ই এপ্রিল কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহের প্রথমা কন্যার জাতকর্ম্মানুষ্ঠান (জন্ম ৫ই মার্চ্চ) সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে শিশুর পিতামহ শ্রীযুক্ত শরৎ-কুমার সিংহ ব্রহ্মমন্দিরের জন্য একখানা পাখা দিয়াছেন।

বিগত ২৮শে এপ্রিল ঢাকুরিয়া উপনগরীতে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বর্ম্মণের অষ্টম সন্তানের জাতকর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন। অশ্বিনী বাবু প্রচার বিভাগে ৫৲, সাধনাশ্রমে ৫৲, প্রদান করিয়াছেন।

মঙ্গলময় বিধাতা শিশুদিগকে সতত রক্ষা করুন।

শুভ বিবাহ—বিগত ২৩শে এপ্রিল বরিশাল নগরীতে বোলপুর প্রবাসী অধ্যাপক ফার্ণাণ্ড বেনোয়া ও পরলোকগত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শান্তিসুধার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রেমময় পিতা নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

বিদ্যারম্ভ—গত ৯ই বৈশাখ অধ্যাপক সরোজকুমার দাসের পুত্রের জন্মদিনে পঞ্চম বৎসর পূর্ণ হওয়াতে তাঁহার বিদ্যারম্ভ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। বালকের পিতামহ শ্রীযুক্ত গোলোকচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এই উপলক্ষে

তাহার পিতা কোন দরিদ্র বালকের পাঠের সাহায্যার্থে দাতব্য বিভাগে ১০৲, টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মঙ্গল বিধাতা বালককে কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

দান—পরলোকগত নগেন্দ্রনাথ দের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার পত্নী প্রচার বিভাগে ৫৲ পাঁচ টাকা দান করিয়াছেন। এই দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মা শান্তি লাভ করুন।

কাশীতে মাঘোৎসব—১১ই মাঘ সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাসায় মাঘোৎসব সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মজুমদার ও শ্রীযুক্ত নীলমণি পাল সঙ্গীত এবং মহেশ বাবু প্রার্থনা করেন। ব্রাহ্ম ও অনেক হিন্দু নর-নারীর সমাগম হইয়াছিল। উপাসনান্তে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। ১৪ই রবিবার দরিদ্রদিগকে কিছু চাউল ও পয়সা দেওয়া হয়।

হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ।

(আবেদন পত্র)

প্রায় ৬২ বৎসর গত হইল কলিকাতার দক্ষিণবর্ত্তী হরিনাভি গ্রামে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হরিনাভি ব্রাহ্মদের নিকট এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এই স্থানের ব্রহ্মমন্দিরের প্রাঙ্গণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, সাধু উমেশচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ভাই কেদারনাথ দে প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের ভস্মাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে। এই স্থানের সন্নিকটবর্ত্তী চাংড়িপোতা গ্রামে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর উৎসবে অনেকেই সেই জন্মস্থান দর্শন করিতে গমন করিয়া থাকেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও সাধু উমেশচন্দ্র দত্ত হরিনাভি ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও এই গ্রামের বিবিধ জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠাতা ছিলেন। এই স্থানের প্রাচীন মন্দির জীর্ণ হইয়াছে, মন্দিরপ্রাঙ্গণের প্রাচীর প্রায় ভূমিসাৎ হইয়াছে। অচিরে ইহার সংস্কার না করিলে ইহার আর কোন চিহ্ন থাকিবে না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে সংস্কারের কার্য্যে ৩০০৲ টাকার প্রয়োজন হইবে। আমাদের ভরসা, এই কার্য্যে সকলেই মুক্তহস্ত হইবেন। যিনি যাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক দান করিবেন তাহা ৩৯ এণ্টনি বাগান লেন কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার দত্ত, এম এ, মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার, শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীহরকুমার গুহ।

আবেদন পত্র।

বীরভূমের ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জন পরলোকগত কর্ণেল ডি বসু, আই এম এস, ভূতপূর্ব্ব জেলার জজ পরলোকগত মিঃ কে এন, রায়, এম এ এবং ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর মিঃ এস্ সি মুখার্জ্জি, আই সি এস, মহোদয়গণের চেষ্টায় ১৮৯৩ সালে বীরভূম জিলার সদর সিউড়ি সহরে একটি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়। তাঁহারা সিউড়ি থাকাকালীন ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইত; তাঁহারা এই স্থান ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে সাধারণের বিশেষ উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায় না। একমাত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল রায় মহাশয় সমাজের কার্য্য উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিতেন; কিন্তু তিনিও সিউড়ি ত্যাগ করাতে সমাজের কার্য্য প্রায় ৮ বৎসর বন্ধ থাকে। কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক সময় সময় যাইয়া ব্রাহ্মসমাজ খুলিয়া উপাসনায় আচার্য্য কার্য্য করিয়া আসিতেন। প্রায় ৭।৮ বৎসর সমাজের সম্পূর্ণ ভার লইবার কেহ না থাকায়, ঐ সময়ের মধ্যে সমাজের বেঞ্চ চেয়ার আলমারি, আলো প্রভৃতি সমুদয় চুরি হইয়া যায়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল রায় মহাশয়ের চেষ্টায় এবং পরলোকগত ডাক্তার বসু ও পরলোকগত ট্রাষ্টি লর্ড সিংহের অনুমোদনে নলহাটি ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধায়ক ও নৈশবিদ্যালয়ের ট্রাষ্টী শ্রীযুক্ত কালীদাস সরকার মহাশয় সিউড়ি ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করিয়াছেন; এবং এক্ষণে দৈনিক ও সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে। সমাজ-গৃহটী বহুদিন বে-মেরামত অবস্থায় থাকায় গত বর্ষায় সমাজের ছাদ হইতে প্রচুর জল পড়িয়াছে এবং দরজাগুলিও অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সমাজের সংলগ্ন জমির উপর দিয়া সাধারণে ও নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশিগণ যাতায়াতের পথ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ সামান্য জমিও নিজ সীমানার মধ্যে লইয়াছেন। সমাজগৃহটী মেরামত এবং ভবিষ্যতে যাহাতে সমাজের সহিত অন্যের জমির কোন গোলযোগ না হয় এবং সাধারণের যাতায়াত বন্ধ হয়, সেই জন্য চারিধারে ২॥০ ফুট উচ্চ পাকা প্রাচীর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কালীদাস সরকার হোমিওপ্যাথ মহাশয় প্রস্তাব করেন "প্রাচীর দিবার সময় প্রাচীরের সহিত একটী ১৫ ফুট লম্বা এবং ৬ফুট প্রশস্ত রাণীগঞ্জ টাইলের ঘর রাস্তার ধারে প্রস্তুত করিয়া ঐ স্থানে প্রত্যহ প্রাতে ৭ ঘটিকায় সমাগত দরিদ্র রোগীদিগকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ এবং সন্ধ্যায় দরিদ্র শ্রমজীবিদিগের জন্য অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।" এই সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে অন্ততঃ ৫০০৲ টাকা প্রয়োজন। সিউড়ির ন্যায় ক্ষুদ্র সহর হইতে ঐ টাকা সংগ্রহ হওয়া একান্ত অসম্ভব। সেইজন্য আপনার সমীপে এই আবেদন প্রেরণ করিতেছি আশা করি আপনি আমাদের প্রস্তাবিত এই সৎঅনুষ্ঠানে সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিবেন। আপনার সাহায্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নামে ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পাঠাইলে যথা সময়ে বীরভূমের সাপ্তাহিক এবং ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার নামক ইংরাজী পত্রিকাতে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইবে। ইতি

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার।
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ও প্রচারক।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৩০শে বৈশাখ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি, এ

Registered No 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫২ম ভাগ। | ১লা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৩৬, ১৮৫১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১ | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
৩য় সংখ্যা। | 15th May, 1929. | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে ধর্ম্মাবহ পাপনুদ বিশ্ববিধাতা, তুমিই কৃপা করিয়া তোমার বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বার্ত্তা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছ এবং আমাদের শত ত্রুটি দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও আমাদিগকে তাহার আশ্রয়ে আনিয়াছ। তোমার কৃপা ব্যতীত আমরা কিছুতেই তোমার এই মুক্তিপ্রদ ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে এবং সকল বাধা বিঘ্নের মধ্যে ইহাকে অবলম্বন করিতে পারিতাম না। সংসারের নানা দুঃখ তাপ মলিনতার মধ্যে তোমার অপার করুণাই আমাদিগকে এতদিন ধরিয়া রাখিয়াছে, তোমার জীবন্ত প্রেমের অপূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিয়া প্রাণে আশা ও বল সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তোমার এত করুণা পাইয়াও আমরা এখন পর্য্যন্ত তাহার মূল্য ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না, আমাদিগকে যে কি উচ্চ অধিকার দিয়াছ তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিলাম না, তোমার ধর্ম্মকে জীবনে সম্পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হইতে দিলাম না। আমরা যদি আমাদের গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিয়া তোমার পবিত্র ধর্ম্মের হাতে আপনাদিগকে অর্পণ করিতাম, তবে না আমরা কতই সুখী হইতে পারিতাম, তোমার ধর্ম্মের গৌরবও না কতই বর্দ্ধিত হইত! আমাদের উদাসীনতা ও অবহেলাতেই আমরা এত মলিন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি; চারিদিকে কেবল মৃত্যুর বীজই ছড়াইতেছি। হে জীবনদাতা, তুমি আমাদের মধ্যে নব জীবনের সঞ্চার কর, আমরা যেন আর এমন মৃতের ন্যায় পড়িয়া না থাকি। তোমার ধর্ম্মকে তুমি আমাদের সকলের জীবনে জয়যুক্ত কর। আমাদের এই মণ্ডলীকে প্রেমে পুণ্যে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত কর, তোমার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোল। তোমার পবিত্র ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

নদী—গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী, কত নদ নদী কোন্ অনাদি কাল হ'তে বহিয়া চলেছে! কোন্ স্বর্গলোকে, কোন্ গিরিকন্দরে, তারা জন্মিল, জানি না; কিন্তু তারা দিন রাত চল্‌ছে, কার সন্ধানে ছুটছে। অনন্ত সাগরে আপনাদিগকে হারিয়ে তাদের কৃতার্থতা। কত দেশ জনপদ উর্ব্বর ক'রে যাচ্ছে; কত বাণিজ্যসম্ভার বহন কচ্ছে; কত প্রাণে শান্তি দিচ্ছে; তৃষ্ণা নিবারণ কচ্ছে; কল্যাণ ছড়িয়ে তারা আপন মনে কুল কুল রবে গান গাইতে গাইতে চল্‌ছে। অনন্তের পানে ছুটছে। এ গতির বিরাম নাই, এ গতিরোধ কর্‌বার কারও সাধ্য নাই। এই সঙ্গীত-ধ্বনি অবিরাম অনন্ত গগনে উঠ্‌ছে। আমারও ইচ্ছে হয়, সব ভু'লে কেবল অনন্তের পানে ছুটি! আমারও ইচ্ছা হয়, প্রেম ও কল্যাণ ছড়িয়ে যাই; আমারও ইচ্ছা হয়, আপনাকে অনন্তের ভিতর হারিয়ে ফেলি। ঐ ত অনন্ত আমাকে ডাক্‌ছেন; ঐ ত প্রাণনাথ আমার প্রাণ উদাস ক'রে দিচ্ছেন। ঐ ত তাঁর ইঙ্গিত। তবে আমিও ছুটি—অনন্তের পানে ছুটি। তোমরা আমাকে বাধা দিও না, তোমরা ক্ষণিক সুখে আমাকে ঠেকিয়ে রে'খো না। আমি আজ কারও কথা শুন্‌বো না; আপনার কিছু রাখ্‌ব না; তোমাদের সব বিলিয়ে দিয়ে যাব। তোমাদের জন্য রইল আমার হৃদয়ভরা প্রেম, রইল আমার প্রাণভরা কল্যাণ-কামনা ও মঙ্গলচেষ্টা। আমি ছুটলাম, নদীর মতন অনন্তের টানে, অনন্তের পানে।

পতঙ্গ—ওগো পতঙ্গ, তুমি কোথায় যাও, কোন্ দিকে তুমি ছুটছ? আগুনের দিকে? আগুনের টান বুঝি এড়াতে পার না? ওতে যে পু'ড়ে মর্‌বে! ঐ দেখ না, শত সহস্র পতঙ্গ

পু'ড়ে ম'রে আছে। তবুও তুমি যাবে? পু'ড়ে মরতে যাবে? এতই টান, এতই প্রেমের আকর্ষণ? প্রাণ দিয়ে তুমি আগুনকে বরণ করবে? ধন্য তুমি, ধন্য তোমার প্রীতি। আমারও ইচ্ছে হয়, প্রিয়তমের সৌন্দর্য্য দেখে তোমারই মত কতভাবে তিনি ডাকছেন, কতরূপে তিনি টানছেন, ইঙ্গিত কচ্ছেন! এ পথে চলেছি, ছুটেছি, বেদনা পেয়েছি। প্রেমের আঘাত অনেক—প্রেম যে ভাবেই প্রাণকে মজিয়ে তুলুক, অনেক আঘাত সইতে হয়। মানুষকে ভাল বাস, দেশকে ভাল বাস, সব প্রেমইত সেই প্রেমের প্রকাশ। সব প্রেমেই ত বেদনা; সব প্রেমেতে আত্মবিলাপ। তবে আমি ছুটি। পতঙ্গ, তোমার মত আপনা ভু'লে ছুটি। তোমার মত আত্ম-বিসর্জ্জন দেই। আমার প্রাণের দেবতা ডাকছেন; ঐ যে তাঁর অপরূপ জ্যোতি, ঐ যে তাঁর মনোমোহন আকর্ষণ! ঐ আকর্ষণে ছুটে যাই, এ জীবন দান করি। প্রেম যে রূপেই আসুক, তাতেই বেদনা—প্রেমের জন্য মৃত্যুতেই কৃতার্থতা। প্রাণ-প্রিয়ের জন্য এ জীবন অর্পণ করি; মৃত্যুতেই নূতন জীবন।

নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর—মুকুরে মুখ দেখতে চাও, মুকুরে পরিষ্কার রূপে মুখ দেখতে চাও? মুকুর খানি পরিষ্কার কর, নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর; তবেই তাতে তোমার মুখ, সকলের মুখ সুন্দর প্রতিভাত হবে। একটু ময়লা থাকলেও মুখ ভাল দেখা যাবে না। জীবন-মুকুরে ঈশ্বরের মুখ প্রতিভাত দেখবে? জীবনকে নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর, ময়লামুক্ত কর, পবিত্র কর। তুমি শুদ্ধভাবে অনুষ্ঠান ক'রে যাচ্ছ, সব শাস্ত্র-বিধি পালন কচ্ছো। তাতে যে জীবন নির্ম্মল হবে, ঈশ্বরের মুখ প্রতিভাত হবে, তা নয়। চিত্তে যদি একটু মিথ্যা ভাব থাকে, একটি মিথ্যা চিন্তা আসে, তা হ'লেও চিত্ত নির্ম্মল হলো না। একটু অপ্রেম যদি আসে, একজনের প্রতিও যদি হিংসার ভাব জাগে, জীবন নির্ম্মল হলো না। দৃষ্টিতে, বাক্যে, মনে, কার্য্যে যদি একটু কুভাব আসে, চিত্ত শুদ্ধ হলো না। যদি একটু স্বার্থের ভাব আসে, যদি ধর্ম্মকার্য্যের, দয়ার কার্য্যের পশ্চাতেও একটু অভিসন্ধি থাকে, তবে মন পবিত্র হলো না। জীবন নির্ম্মল করলে ঈশ্বরের রূপ প্রতিভাত দেখবে। সকল অসত্য দূর কর, সকল অপ্রেম হ'তে মুক্ত থাক, চিন্তা, বাক্য, ভাব ও কার্য্যে পবিত্র হও, সকল অভিসন্ধি, সকল স্বার্থচিন্তা, সকল অহঙ্কার থেকে মুক্ত থাক। সত্য আসুক, প্রেম আসুক, পবিত্রতা আসুক, ত্যাগ আসুক, সেবা আসুক, আত্মবিলোপ আসুক। চিত্ত শুদ্ধ হবে; নির্ম্মল চিত্তে ঈশ্বর প্রতিভাত হবেন।

সম্পাদকীয়

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যের দায়িত্ব—

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আমাদের ও জগতের নিকট যে উচ্চতম উদারতম ও বিশুদ্ধতম ধর্ম্মের আদর্শ ও তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়াছে এবং ইহা এই একান্ন বৎসরের জীবনে যে কার্য্য সাধন করিয়াছে, তাহাতে আমরা সকলেই বিশেষ গৌরববোধ করিয়া থাকি। আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের তুলনায় কাজ যে অতি সামান্যই হইয়াছে, সে কথা আমরা সকলেই জানি ও অনুভব করি; তথাপি এপর্য্যন্ত ইহা যাহা করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা যে নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে, তাহার মধ্যে সত্যই গৌরব অনুভব করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, সে কথাও সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ, ইহা প্রত্যেককে যে উচ্চ অধিকার দিয়াছে, যে বিশুদ্ধ মহৎ আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছে, তাহাতে বাহিরের সকল কাজ অপেক্ষাও অধিকতর গৌরব অনুভব করিবার কারণ রহিয়াছে। কিন্তু ইহার কোনটাতেই যে অহঙ্কার অনুভব করিবার কিছু নাই, সে কথা যেন আমরা কোনও ক্রমেই ভুলিয়া না যাই। সত্য গৌরব-বোধ দৃষ্টিটাকে যেমন করুণাময় বিশ্বনিয়ন্তার দিকে প্রসারিত করিয়া হৃদয়কে কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ করিবে, তেমনি আমাদের অপূর্ণতার জ্ঞানটাকে উজ্জ্বল করিয়া প্রাণে দায়িত্ববোধটাকেও জাগ্রত করিবে, আমাদের এ বিষয়ে আরও কত করিবার আছে তাহাও অনুভব করিতে সমর্থ করিবে। অহঙ্কার যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফলই উৎপন্ন করিয়া থাকে, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। সুতরাং অহঙ্কার সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য হইলেও, গৌরবের অনুভবটা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই গৌরববোধটা যে আমাদের মধ্যে যথেষ্টই আছে, এ কথা ত বলিতে পারি না। কেন না, ইহাকে যে আমরা উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিতেছি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে কি অমূল্য জিনিষ দিয়াছে তাহা যে আমরা সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি, এরূপ কোনও পরিচয় ত আমাদের জীবনে ও কার্য্যে পাওয়া যায় না। যে ভাবে আমরা ইহার জন্মোৎসব সম্পাদন করি, তাহা ত ইহার বিপরীত সাক্ষ্যই দিতেছে। ইহার গুরুত্ব যদি আমরা সত্যভাবে অনুভব করিতাম, তবে নিশ্চয়ই মাঘোৎসব ও ভাদ্রোৎসব অপেক্ষাও ইহার উপর অধিকতর মূল্য প্রদান করিতাম, ইহার জন্য অধিকতর কৃতজ্ঞ হইতাম। বাহিরের নানা ঘটনাবশতঃ ইহাদের বাহিরের আকারে অনিবার্য্য-রূপেই যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। যদিও তাহার পরিবর্ত্তনসাধন কোনও ক্রমেই সাধ্যাতীত নহে, তথাপি বর্ত্তমান পার্থক্যের যথেষ্ট বাহিরের কারণ আছে স্বীকার করিয়া লইতে আমরা প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমাদিগকে বলিতেই হইবে যে, এই পার্থক্যের মূল কারণ বাহিরের অবস্থা ততটা নয় যতটা অন্তরের। অন্তর বাহিরের উপর কিছু না কিছু কার্য্য করিবেই,—যত অল্প পরিমাণেই হউক না কেন, বাহিরকে একটু প্রভাবান্বিত করিবেই। সে যাহা হউক, শুধু অন্তরের ভাব দিয়া বিচার করিতে গেলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আমরা অধিকাংশই অতি লঘু ভাবে এই উৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকি, ইহার গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে অনুভব করিয়া যেরূপ কৃতজ্ঞ-চিত্ত হওয়া উচিত তাহা হই না। আমরা সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্য দিয়া করুণাময়ের যে অপার করুণা পাইয়াছি, তাহা সম্যক্ প্রকারে অনুভব করিলে, এই সময়ে তাহার

মহৎ আদর্শটাকে জীবনে উজ্জল রূপে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার অনুগত হইয়া তাঁহার ধর্ম্মের গৌরবকে বর্দ্ধিত করিবার এবং ইহার সাধনে ও সেবায় নিজেরা ধন্য ও কৃতার্থ হইবার জন্য, আকুল আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা আমাদের প্রাণে স্বভাবতঃই অধিকতর প্রবল হইত। আমরা কিছুতেই এরূপ উদাসীনতার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারিতাম না। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, আমরা যাহা পাইয়াছি তাহার মূল্যটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু আমরা ইহার প্রসাদে যে সকল উচ্চ অধিকার পাইয়াছি তাহাকে যে আমরা মোটেই মূল্যবান জ্ঞান করি না, তাহার জন্য যে আমাদের কোনও আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা নাই, এমন নহে। বরং একভাবে আমরা তাহাদিগকে যথেষ্টই মূল্যবান মনে করি, তাহা লাভ করিবার জন্য খুবই ব্যস্ত। কেন না, অধিকার স্থাপন ও রক্ষা করা বিষয়ে আমাদের কোনও প্রকার শৈথিল্য বড় একটা লক্ষিত হয় না, অপিচ একটু অতিরিক্ত আগ্রহ ও চেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা অনেকেই শাঁস ফেলিয়া খোসার পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইতেছি। আমাদের দৃষ্টিটা অন্তরের পরিবর্ত্তে বাহিরেই নিবদ্ধ। আমরা অধিকারের জন্য যত ব্যস্ত, তৎসংসৃষ্ট কর্ত্তব্যপালনদ্বারা কল্যাণ ও উন্নতির জন্য তাহার শতাংশের একাংশও চেষ্টিত নহি। আমাদের পূর্ণ বিকাশের জন্যই, সুস্থ সুন্দর মহৎ জীবন, প্রকৃত মনুষ্যত্ব, লাভের জন্যই যে আমরা অন্তরের ও বাহিরের সকল বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়াছি, পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা না ভাবিয়া বা না দেখিয়া, আমরা বাহিরের মুক্তি ও স্বাধীনতাটাকেই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া ধরিয়াছি। ইহাতে যে আমরা আসল মূল্যবান বস্তুটা হইতেই বঞ্চিত হইতেছি, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিতেছি না বা বিন্দু পরিমাণেও বুঝিতে পারিতেছি না। এই হেতু আমরা প্রকৃত মুক্তি বা স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া যে উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেই যাইয়া পড়ি এবং ইষ্টের পরিবর্ত্তে নিজেদের ও অপরের মহা অনিষ্টই সাধন করি, তাহাও কখন চিন্তা করিয়া দেখি না বা বুঝিতে সমর্থ হই না। কল্যাণ ও উন্নতির সীমাকে লঙ্ঘন করিলে স্বাধীনতা দাঁড়াইতে পারে না, উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হইয়া অকল্যাণই উৎপন্ন করে, একথা একমাত্র তাহারাই বুঝিতে পারে, বিধাতানির্দ্দিষ্ট মহৎ লক্ষ্যের দিকে যাহাদের দৃষ্টি আছে, প্রকৃত পক্ষে মানবজীবনের সার্থকতা কোথায় যাহারা বুঝিতে পারিয়াছে। সে লক্ষ্য ও দৃষ্টি যাহাদের নাই তাহারা যে শাঁস ছাড়িয়া খোসার পশ্চাতে ছুটিয়া নিজের ও অপরের জন্য কেবল দুঃখ কষ্ট ব্যর্থতাই সংগ্রহ করিবে, তাহা বিস্তারিত করিয়া বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, সকল প্রকার অধিকার সম্বন্ধেই এই এক কথা। উন্নতি ও বিকাশের, ব্রহ্মানুগত জীবন যাপন করিবার, অধিকারই মানুষের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অধিকার—অপর সমস্তই ইহার অন্তর্গত। অথচ মানুষ অনেক সময় এই মূল কথাটা ভুলিয়া নানা অধিকার লাভের ও স্থাপনের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত হয়, সংগ্রামেও প্রবৃত্ত হয়। ইহার অতিরিক্ত বা বিরোধী কোনও অধিকার যে বিধাতা কাহাকে দেন নাই, সেরূপ কোনও অধিকার থাকিলেও যে কল্যাণের পরিবর্ত্তে উহা অকল্যাণেরই কারণ হইবে, এবং প্রকৃতপক্ষে অধিকারের সঙ্গে কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, কর্ত্তব্যশূন্য কোনও অধিকার যে বিধাতা কাহাকেও প্রদান করেন নাই, একটু অনুসন্ধান করিলেই আমরা সহজে এই সত্যটা বুঝিতে পারি। অধিকারের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়াই আমরা উহার অপব্যবহার দ্বারা নিজের ও অপর সকলের অকল্যাণ সাধন করি, সংসারে নানা বিরোধ ও দুঃখ কষ্ট অশান্তি উৎপাদন করি। অধিকারের অর্থ যে অপরের উপর ক্ষমতাপরিচালন নহে, অব্যাহত ভাবে ও প্রকৃষ্ট রূপে আপনার কর্ত্তব্যপালনদ্বারা নিজের ও অপরের কল্যাণসাধন, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে এ বিষয়ে যেরূপ পূর্ণ অধিকার প্রদান করিয়াছে, অব্যাহত-ভাবে বৈধশক্তিচালনার, সকল কর্ত্তব্যসম্পাদনের ও সমাজের সেবা করিবার যে সুযোগ দিয়াছে, আর কোথাও তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা যে অনেক সময় ইহাকে বিকৃত দৃষ্টিতে দেখিয়া আমাদের শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত অধিকার হইতে বঞ্চিত হই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র—আমাদের কার্য্যকলাপ একটু সূক্ষ্ম ভাবে পরীক্ষা করিলেই সহজে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারের উপরই যদি আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি, তাহা হইলে আমাদিগকে আর এরূপ ভ্রমে পড়িতে হয় না। তখন আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব, সমগ্র মন প্রাণ দিয়া জীবনের সকল প্রকার কর্ত্তব্যগুলি সম্পন্ন করিয়া যাওয়ার এবং সকল বিষয়ে ব্রহ্মানুগত জীবন যাপনদ্বারা নিজের ও জগতের কল্যাণসাধন করিবার বিধাতাদত্ত অধিকার অপেক্ষা উচ্চতর ও মহত্তর অধিকার আর কিছু নাই—প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভের, মানবজীবনের সার্থকতাসাধনের, চিরস্থায়ী বিশুদ্ধ সুখশান্তি অর্জ্জনের, প্রকৃষ্টতর উপায়ও আর কিছুই নাই। কাজেই এ বিষয়ে আমাদের গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন উপলক্ষে প্রত্যেক সভ্যকে এই গুরুতর দায়িত্বের বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত আমাদের কাহারও ব্যক্তিগত উন্নতি ও বিকাশের কোনও সম্ভাবনা নাই, সমাজেরও কল্যাণ নাই—কোনও প্রকার আনন্দ সুখেরও আশা নাই। প্রেমময় পিতা আমাদের নিকট তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মের সুমহান্ আদর্শ প্রকাশ করিয়া এবং আমাদিগকে এই ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিয়া, আমাদের ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি যেমন অপার করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি দুর্ব্বল সন্তানদের স্কন্ধে অতি গুরুতর দায়িত্বভার ন্যস্ত করিয়াছেন। তিনি যে ভার প্রদান করেন, তাহা বহন করিবার বলও চিরদিনই তিনিই দিয়া থাকেন। আমাদের কার্য্য যতই কঠিন বলিয়া অনুভূত হউক না কেন, আমরা যদি সরল ভাবে আমাদের কর্ত্তব্যপালনে আকাঙ্ক্ষিত ও চেষ্টান্বিত হই এবং সকল প্রকার দুর্ব্বলতার মধ্যে আকুল প্রাণে তাঁহারই শরণাপন্ন হই, তবে কখনও আমরা তাঁহার করুণা ও সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইব না,—তিনি কখনও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না, নিশ্চয়ই

প্রয়োজনীয় বুদ্ধি ও শক্তি দিবেন। আমরা যেন আমাদের গুরুতর কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের কথা ভুলিয়া আর বৃথা উদাসীন ভাবে জীবন ক্ষয় না করি, অথবা অসারের মিথ্যা কুহকে ভুলিয়া বিপথে গমন করিয়া মৃত্যু ও অকল্যাণকে ডাকিয়া না আনি। মঙ্গলবিধাতা আমাদিগকে আমাদের গুরুতর কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের কথা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে ও তদনুযায়ী জীবন যাপন করিতে সমর্থ করুন। আমাদের জীবনে ও সমাজে তাঁহার ধর্ম্ম জয়যুক্ত হউক। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সাধন।

ব্রহ্ম বিচিত্র রূপ। এই জন্যে ভক্তের প্রাণে তাঁর আস্বাদনও বিচিত্র প্রকার। প্রত্যূষে ভক্ত তাঁর যে আস্বাদন পান, দ্বিপ্রহরের আস্বাদন সেরূপ নয়; সন্ধ্যায় বা নিশীথে অন্য প্রকার। প্রকৃতির শ্রী যেমন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদ্‌লায়, ভক্ত হৃদয়ে ব্রহ্মের রূপও তেমনি বদ্‌লায়; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আস্বাদনও বদ্‌লায়। কালের পরিবর্ত্তনে যেমন ব্রহ্মের আস্বাদন বদ্‌লায়, স্থানের পরিবর্ত্তনেও তেমনি। রুদ্ধপ্রকোষ্ঠে তাঁর যে আস্বাদন, প্রান্তরে বা সাগরতটে অথবা পর্ব্বতশিখরে ঠিক সেই আস্বাদন নয়। এক এক স্থানে হৃদয়ে এক এক প্রকার ভাব উদিত হইয়া, তাঁর আস্বাদনকে ভিন্ন করে।

কাল ও স্থানের ন্যায়, জীবনের বিভিন্ন অবস্থাও ব্রহ্মের বিচিত্র আস্বাদ জন্মায়, সুখে সম্পদে, সুযোগ সুবিধায়, আশায় আনন্দে, ভক্ত তাঁর বিধাতার যে আস্বাদন পান, দুঃখে বিপদে, বিঘ্নে প্রতিকূলতায়, নিরাশায় নিরানন্দে সেই আস্বাদন পান না। প্রতি অবস্থার আস্বাদন ভিন্নরূপ। কৃতজ্ঞতায় তাঁর একরূপ আস্বাদন, ভয়ে অন্যরূপ, শোকে আবার অন্য প্রকার। হৃদয়ের সরসতায় একরূপ আস্বাদন, শুষ্কতায় অন্য আস্বাদন। শুষ্কতার সময়ে আমরা তাঁকে পাই না, মনে করি; ইহা ভুল। সরসতায় তিনি যেমন হৃদয়ে থাকেন, শুষ্কতায়ও তেমনি হৃদয়ে থাকেন; কোথাও সরিয়া যান না;—কেবল আস্বাদন ভিন্ন। যখন তাঁকে পাই না ভাবি, তখনও তাঁকে পাই—না জানিয়া পাই; অন্যভাবে পাই। কাছেই থাকেন, প্রাণেই থাকেন, কেবল আস্বাদন বদ্‌লিয়া যায়। বিচ্ছেদেও প্রাপ্তি আছে; কিন্তু সেই প্রাপ্তি অন্য প্রকার। যেমন তরুলতা শ্রাবণের বারিধারায়ও প্রকৃতিমাতার করুণা পায়, নিদাঘের উত্তাপেও তাঁহার করুণা পায়, কেবল উভয় প্রকার করুণার আকার ভিন্ন; তেমনি আমরাও সরসতায় ও নীরসতায়, বিচ্ছেদে ও মিলনে, লীলাময় বিধাতার করুণা বিভিন্ন আকারে পাইয়া থাকি। বাস্তবিক, বিচ্ছেদ নাই; কেবলই মিলন। বিচ্ছেদ আমাদের ভ্রান্তি।

পাপী কি পুণ্যময় ব্রহ্মকে পায় না? পায়; তিরস্কর্ত্তারূপে পায়; শাস্তিদাতা-রূপে পায়; রুদ্ররূপে পায়। কিন্তু তাঁকে মা বলিয়া বুঝিতে পারে না। মা যখন আদর করেন, তখন যেমন মা, যখন শাস্তি দেন, তখনও তেমনি মা। ব্রহ্মকে আমরা পুণ্যে পাপে সকল সময়েই পাই; কেবল আস্বাদন ভিন্ন রকম হয়। রোগের সময় চিনি তিক্ত লাগে। তিক্ত লাগিলেও উহা চিনিই। তিক্ত স্বাদ বশতঃ আমি যদি উহাকে চিনি বলিয়া বুঝিতে না পারি, তথাপি উহা চিনি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

বুঝি আর না বুঝি, দিন রাত্রি তাঁকেই পাইতেছি—সকল আস্বাদন তিনিই জন্মাইতেছেন। আমার সঙ্গে তাঁরই অবিরাম লীলা, বিচিত্র লীলা! এই জন্যই ব্রহ্ম-ভক্তের সাধন জীবনব্যাপী। জীবনের কোনও একটি মুহূর্ত্তকে বা কোনও একটি ঘটনাকে তিনি সাধনক্ষেত্র হইতে ফেলিতে পারেন না। সাধন আর কি? —সকল কালে, সকল স্থানে, সকল অবস্থায়, সকল ঘটনায়, তিনি যে সঙ্গে আছেন ও সাক্ষাৎভাবে লীলা করিতেছেন, তাই দেখা; আর না দেখিতে পাইলে দেখিবার উপায় করা। না দেখিতে পাইলে, দেখিবার উপায় করা ত চাই! না দেখিলে, জীবন যে দুঃখময় ও ব্যর্থ। জীবনে সকল ভোগের মধ্য দিয়া কাহাকে পাইতেছি, তাই যদি না জানিলাম, তবে ত জীবনের অর্থই পাইলাম না। সুখ দুঃখের আন্দোলনে আন্দোলিত হইলাম, কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

প্রথম তাঁকে সত্যভাবে চেনা চাই। বস্তুর লক্ষণ না জানিলে, অন্বেষণ বিপথগামী হয়। আর লক্ষণ না জানিলে, পাইয়াও হয়ত হেলায় ফেলিয়া গিয়া মনের কল্পনার পশ্চাতে ধাবিত হইব।

পরমেশ্বরের অস্তিত্বের ক্ষীণ আভাস মানুষ মাত্রেরই মনে স্বভাবতঃ আসে। কিন্তু বাল্যকাল হইতে তাঁর সম্বন্ধে নানারূপ জড়ীয় ভাব ও মানবীয় ভাব কল্পনার সহিত মিশ্রিত থাকে। চারিদিকের মানুষের ভ্রান্ত সংস্কারও সেই কল্পনাকে বিশ্বাসে পরিণত করে। এ সকল ভ্রান্ত কল্পনা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসকে মন হইতে দূর করিয়া, তাঁর সম্বন্ধে সত্য ধারণা পাইবার জন্য ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চা করা প্রয়োজন। পরমেশ্বরকে রাগ দ্বেষ, পক্ষপাতিতা, প্রভুত্বপ্রিয়তা, স্তুতিপ্রিয়তা, যথেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি হইতে মুক্ত বলিয়া জানা আবশ্যক। তাঁকে অসীম অথচ ক্ষুদ্রের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, শক্তিমান্ অথচ সংযত, ন্যায়বান্ অথচ করুণাময়, সাধারণের অথচ প্রত্যেকের, বলিয়া বোঝা, এবং তাঁর নিয়মসকলকে অমোঘ, সমদর্শী, দোষরহিত ও মানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের সহায় বলিয়া জানা প্রয়োজন। দীর্ঘকালব্যাপী ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা ভিন্ন এ সকল বিষয়ে সন্দেহাতীত জ্ঞান লাভ করা যায় না। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চা এক প্রধান সাধন। এই সাধন সাকারবাদী পরিবার হইতে আগত সন্তানদেরও যেমন প্রয়োজন, নিরাকারবাদী পরিবারে উৎপন্ন সন্তানদেরও তেমনি প্রয়োজন। কারণ, কেবল সাকারবাদ হইতে মুক্ত হইলেই ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে সকল জ্ঞান লাভ হইয়া যায় না। নিরাকারবাদী হইয়াও ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে নিতান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন থাকা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। আর এই সাধন যে শুধু প্রথমাবস্থায়ই প্রয়োজন, পরে প্রয়োজন নাই, তাহাও নহে। সর্ব্বদাই তাঁর সম্বন্ধে নির্ম্মল হইতে নির্ম্মলতর জ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তা আছে।

ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায়, ব্রহ্মভক্তিরও চর্চ্চার প্রয়োজন। ভক্তি-

---

বিগত ৮ই মাঘ সঙ্গতসভার উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক পঠিত।

বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ, ভক্তদের জীবনচরিত পাঠ এ বিষয়ে পরম সহায়। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের কার্য্য কেবল জ্ঞানদান নয়; অনুরাগ উৎপাদন, উদ্দীপনা প্রদান এবং সাধনপথে আলোক-পাতও ধর্ম্ম শাস্ত্রের কার্য্য। সুতরাং উৎকৃষ্ট শাস্ত্র পাঠ আমরা জীবনের কোনও অবস্থাতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না।

জগতের সকল শাস্ত্রই আমাদের শাস্ত্র। আমরা কোনওটিকে পরের শাস্ত্র বলিয়া বাদ দিতে পারি না। উপনিষদ্ পাঠে ব্রহ্মের যে পরিচয় পাই, গীতায় ঠিক তাহা নয়। ভাগবতে অন্যরূপ। কোরাণে বা বাইবেলে আবার অন্যপ্রকার। প্রত্যেকটির রস ভিন্ন, উপকারিতা ভিন্ন। একটিকে পরিত্যাগ করিলে আমরা ধর্ম্ম-জীবনে সেই পরিমাণে বঞ্চিত হইব।

পূর্ব্বে শাস্ত্র সম্বন্ধেও জাতিভেদ ছিল। ঋগ্বেদ এক শ্রেণীর লোকের শাস্ত্র; তাঁহারা ঋগ্বেদী। তাঁহাদের সন্ধ্যাবন্দনা ও ও শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের মন্ত্র ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। অন্য বেদের মন্ত্রে সন্ধ্যাবন্দনা করা বা ক্রিয়ানুষ্ঠান করা তাঁহাদের পক্ষে অবৈধ। সামবেদ আর এক শ্রেণীর শাস্ত্র; তাঁহারা সামবেদী। তাঁহাদের সন্ধ্যাবন্দনাদির মন্ত্র সামবেদ হইতে গৃহীত; তাঁহাদেরও সেইগুলি পরিবর্ত্তন করিবার যো নাই। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন বেদের আশ্রিত ব্রাহ্মণেরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসার সময়, নাম, পিতার নাম, গোত্র, প্রবর ইত্যাদির সঙ্গে একটি প্রশ্ন হইত—"আপনাদের কোন্ বেদ?" উত্তর—অমুক বেদ। আমাদিগকে বাল্যকালে এইরূপ প্রশ্নোত্তর শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। তোমার নাম কি? পিতার নাম কি? কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ? উত্তর—শ্রোত্রীয়। রাঢ়ী না বৈদিক? উত্তর—বৈদিক। কোন বেদ? যজুর্ব্বেদ। কোন্ শাখা? কৃষ্ণ শাখা। যজুর্ব্বেদের দুই শাখা আছে—শুক্ল যজুর্ব্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ। 'কৃষ্ণ শাখা' পর্য্যন্ত আমাদিগকে প্রশ্নোত্তরে বলিতে হইত। যজুর্ব্বেদ কখনও দেখি নাই; উহা কি বস্তু জানিতাম না। 'কৃষ্ণ শাখা' শব্দের অর্থ কি তাহাও জানিতাম না। যজুর্ব্বেদ দেখিবার বা জানিবার বা যজুর্ব্বেদ অনুযায়ী ব্রহ্ম সাধনার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনাও ছিল না; তথাপি বলিতাম, আমার যজুর্ব্বেদ। সুখের বিষয় বেদের দ্বারা এইরূপ শ্রেণী বিভাগের রীতি আজকাল চলিয়া যাইতেছে। উদার ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বোধহয় এমন একজনও নাই, যিনি বলিবেন,—"আমার অমুক বেদ"। এখন চারি বেদই সকলের হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মপিপাসু শিক্ষিত হিন্দু সকল বেদ হইতেই আত্মার আহার সংগ্রহ করেন। তেমনি সেইদিন আসিতেছে, যখন আর বেদ বাইবেল কোরাণ বা জেন্দ-আবেস্তার দ্বারাও মানুষের শ্রেণী বিভাগ থাকিবে না। সকল শাস্ত্রই সকলের হইবে। আমি বেদপন্থী, উনি বাইবেলপন্থী, তিনি কোরাণপন্থী, এইরূপ পরিচয় দিতে লোকে লজ্জা বোধ করিবে। তখন সকল সম্প্রদায় এক পন্থী হইবে—সত্যপন্থী, ঈশ্বরপন্থী। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের শিক্ষার ফলে আমরা এই আলোক পাইয়াছি। আমরা আর শাস্ত্র সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ ভাব পোষণ করিতে পারি না। বাস্তবিক, যার ধর্ম্মপিপাসা নাই, অথবা যার মন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, কেবল সে-ই শাস্ত্র সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকিতে পারে।

যেমন শাস্ত্র সম্বন্ধে, তেমনি সাধু সম্বন্ধে। আমরা জগতের কোনও সাধুকে ভিন্ন সম্প্রদায়ের বলিয়া অনাদর করিতে পারি না। অমুক অমুক সাধু মহাজন আমাদের আপন, আর অন্যেরা পর, এইরূপ ভেদ করিলে উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্মের সাধনা হইতে পারে না। একটি মাত্র মহাপুরুষকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার উপদেশে জীবন গঠন করিলে গভীর ধর্ম্মভাব লাভ হইতে পারে না, এমন কথা বলি না; কিন্তু অসাম্প্রদায়িক মহাধর্ম্মের যে আলোক আমরা পাইয়াছি, তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া ধরা, এবং সকল সম্প্রদায়ের মিলন সাধন করাও আমাদের একটি কর্ত্তব্য। আমরা কোনও একজন মহাপুরুষের প্রদর্শিত পথ বিশেষভাবে আশ্রয় করিতে পারি, কিন্তু সকলের উপদেশের প্রতিই প্রণিধান করা এবং সকলকে যথাযোগ্য ভক্তি প্রদান করা আমাদের কর্ত্তব্য।

অতীতের সাধুগণের উপদেশ ও চরিত্রের আলোচনা যেমন প্রয়োজন, বর্ত্তমান সাধুদিগের সঙ্গও তেমনি বা ততোধিক প্রয়োজন। সাধুসঙ্গ ধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত করে, এবং প্রতিকূল অবস্থাসকলের মধ্যে বল দেয়। কিন্তু বর্ত্তমানে সাধু সজ্জন পাইতে হইলে অন্তরে শ্রদ্ধার প্রয়োজন। দোষেগুণে মিশ্রিত মানুষের মধ্যেই শ্রদ্ধার যোগে মহত্ত্ব দেখা প্রয়োজন। ইহা যদি না পারি, যদি দোষের অংশই প্রধান ভাবে দেখি, তবে বর্ত্তমানে সাধু খুঁজিয়া পাইব না। ভক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয় বলিতেন, "চারি দিকেই সাধু রহিয়াছেন; শ্রদ্ধার সহিত গুণগুলি দেখিলেই সাধু; অশ্রদ্ধায় দোষ দেখিলেই অসাধু।" তিনি আরও বলিতেন, "সাধু গড়িয়া, তাহার সঙ্গ করিতে হয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সাধু আত্মা বর্ত্তমান। সৎকথা বলিয়া, সদ্ব্যবহার করিয়া, তার সাধুতাকে জাগাইয়া তুলিতে হয়। ইহা করিলে, প্রতিদিনই সাধুসঙ্গ সম্ভব।" তিনি বলিতেন, "সদালাপ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা শিশুর সহিত বা ভৃত্যের সহিতও সাধুসঙ্গ করা যায়।"

সঙ্গীতসংকীর্ত্তন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা, স্তোত্রপাঠ, নাম-জপ প্রভৃতি কোনও সাধনকে আমরা বাদ দিতে পারি না। এ সকলের প্রত্যেকটিতে এক এক প্রকার রস। রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে আমাদের সকল রসই আস্বাদন করা কর্ত্তব্য। আমরা আরাধনা ও প্রার্থনা এবং এ দুয়ের সহায়রূপে সঙ্গীতকে সর্ব্ব-প্রধান সাধনরূপে অবলম্বন করিয়াছি। যেমন বৈষ্ণব ধর্ম্মবিধানে নামসঙ্কীর্ত্তন ও নামজপ প্রধান সাধন হইয়াছিল, তেমনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মবিধানে আরাধনা ও প্রার্থনা প্রধান সাধন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের প্রত্যেক পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে আরাধনা প্রার্থনা ও সঙ্গীত অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া গিয়াছে। এমন সর্ব্ব-সাধারণের উপযোগী ও ফলপ্রদ সাধনাকে যে আমরা সমাজের অস্থিমজ্জায় গ্রহণ করিয়াছি, ইহা মঙ্গলজনক। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি আরাধনামন্ত্রটি নবযুগের নূতন গায়ত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই মন্ত্র ও ইহার ভাব আমাদের সকল সাধনার কেন্দ্র হইয়াছে। এই শ্রেষ্ঠতর মন্ত্র পাইয়া আমরা আর ইচ্ছা

করিলেও পুরাতন গায়ত্রী মন্ত্রে ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি না। প্রাচীন গায়ত্রীতে পাইয়াছিলাম—"সেই জগৎপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় তেজকে ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন।" ইহা ধ্যান করিবার উদ্‌যোগ। নূতন গায়ত্রী মন্ত্রে সত্য সত্য ধ্যান করিলাম—তিনি "সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত ব্রহ্ম; যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; শান্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, অদ্বিতীয়; শুদ্ধ পাপস্পর্শশূন্য"। এই মহামন্ত্রের সাধনায় আমরা জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে পরিত্রাণের পথে অগ্রসর হইতেছি। আমরা অনেক সময় এই মহামন্ত্রের মূল্য না বুঝিয়া, ইহাকে হেলায় ব্যবহার করিতেছি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ সাধনরাজ্যে যাহা কিছু নূতন আনিয়াছেন, তন্মধ্যে এই মন্ত্র ও ইহার অবলম্বনে আরাধনাই প্রধান। এই আরাধনায় কত তাপিত আত্মা জুড়াইতেছে; কত পিপাসু আত্মা জ্ঞান প্রেম পুণ্যে অগ্রসর হইতেছে! সংসারমরুভূমিতে ইহা ওয়েসিসের ন্যায় আমাদিগকে আশ্রয়, আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিতেছে। আমাদের মধ্যে যাহারা সজ্ঞানে কোনও সাধনাই করি না, তাহারাও শোকতাপের সময়ে এই আরাধনা ও প্রার্থনা ধরিয়া বাঁচিয়া যাই। ব্রাহ্ম পরিবারে মৃত্যুঘটনা ঘটিলে, আর বন্ধুজনের প্রবোধবাক্যের বড় প্রয়োজন হয় না। তাঁহারা আসিয়া যদি আরাধনা ও প্রার্থনায় সাহায্য করেন, তবে তাহাতে ডুবিয়া শোকার্ত্ত পরিবার প্রচুর সান্ত্বনা লাভ করেন। এমন দুর্দ্দিনের সম্বল আর কি আছে? আরাধনা ও প্রার্থনা আমাদের মৃত্যুশয্যারও সম্বল। কত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, এমন কি ব্রাহ্ম ঘরের কত বালক বালিকা, মৃত্যুকালে এই আরাধনা প্রার্থনা ও তাহার সহায়স্বরূপ সঙ্গীতের অবলম্বনে মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করিয়া হাস্যমুখে পরলোক চলিয়া গিয়াছেন! এমন বস্তুকে অবহেলা করা আমাদের কোনও মতে উচিত নয়।

উপাসনা তিন প্রকার—ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক। তিন প্রকার উপাসনার আস্বাদন ও ফল ভিন্ন ভিন্ন। একটির কার্য্য অন্যটির দ্বারা হয় না। প্রত্যেকটিই অবলম্বনযোগ্য। একজন ভক্ত বলিয়া থাকেন, "ব্রাহ্মকে তিন প্রকোষ্ঠে ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে—প্রথম, নির্জ্জনে মনোমন্দিরে; দ্বিতীয়, পরিজনের সহিত গৃহমন্দিরে; তৃতীয়, সর্ব্বসাধারণের সহিত সমাজমন্দিরে।" এই তিন প্রকোষ্ঠের একটিকেও বাদ দিলে পূর্ণাঙ্গ উপাসনা হয় না। কিন্তু, এই তিন প্রকোষ্ঠের উপাসনার মধ্যে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের উপাসনা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। নির্জ্জনে ব্যক্তিগত উপাসনা, যে যেমন পারি, করা সহজ। যথার্থ উপাসনা হউক না হউক, অন্ততঃ বসিতে সকলেই পারি। সমাজমন্দিরেও যেমন মন লইয়া হউক উপস্থিত হওয়া সহজ। কিন্তু পরিবারে দৈনিক উপাসনাপ্রতিষ্ঠার অন্তরায় অনেক। বাহিরের অন্তরায় অপেক্ষা ভিতরের অন্তরায় গুরুতর। পরিজনের সঙ্গে প্রতিদিন উপাসনা করিতে হইলে, আচার্য্য ডাকিয়া করান চলে না; গৃহকর্ত্তা বা গৃহকর্ত্রীর নিজে করিতে হয়। অথচ, যে ব্যক্তি অকপট চিত্তে ধর্ম্মকে অনুসরণ করিতেছে না, যে ধর্ম্মের শাসনে আপনাকে বাঁধিতে কৃতসঙ্কল্প নয়, যে দেনাপাওনায় খাঁটী নয়, যার ব্যবসায়ে বা আচরণে এমন কোনও দোষ আছে যাহা সে বুঝিতে পারিয়াও ছাড়িতে চায় না, তাহার পক্ষে পরিজনের সম্মুখে মুখ খুলিয়া উপাসনা করা বড় কঠিন। কেন না, পরিবারস্থ লোকেরা সকলই জানে; অন্যত্র দোষ ঢাকিয়া চলা সম্ভব হইলেও, নিজ গৃহে সম্ভব নয়। প্রণালীবদ্ধ মন্ত্র আওড়ান এরূপ অবস্থায়ও তেমন কঠিন নয়; কিন্তু জীবন্ত উপাসনা কঠিন। ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন আজও মন্ত্র-উচ্চারণ মাত্রে পরিণত হয় নাই। "লোকে জীবনে প্রমাণ চায়।" স্বামী স্ত্রী হইতে, স্ত্রী স্বামী হইতে "জীবনে প্রমাণ চায়"। বালক বালিকারাও পিতামাতা হইতে "জীবনে প্রমাণ চায়"। পরিবারে দৈনিক উপাসনাপ্রতিষ্ঠার এই এক অন্তরায়। এ ছাড়া, যে গৃহে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলন নাই, দু'জন দুই পথের পথিক, সেখানেও পারিবারিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। এই সকল অন্তরায় বশতঃ, এবং সম্ভবতঃ আমাদের চেষ্টারও ক্রটীবশতঃ ব্রাহ্মসমাজে পারিবারিক উপাসনা যথোচিত পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অথচ, আমাদের চিন্তাশীল নেতৃগণ অনুভব করিয়াছেন যে, গৃহে গৃহে নিত্য উপাসনার প্রতিষ্ঠা ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ নাই।

নিত্য উপাসনার ন্যায়, নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানসকলও আমাদের সাধনের অঙ্গ। জন্মদিন, নামকরণ, দীক্ষা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানসকলকে কেবল কল্যাণকর রীতি বলিয়া না দেখিয়া, নিজ নিজ ব্যক্তিগত সাধনার অঙ্গরূপে দেখা উচিত। অনুষ্ঠান করিয়া আমি যদি স্বয়ং কিছু উপকার লাভ না করি, তবে অন্যের পক্ষে যাহাই হউক, আমার পক্ষে সেই অনুষ্ঠান ব্যর্থ। শিশুদের জন্মদিনের ছোট উপাসনা কি কেবল শিশুদেরই জন্য? না না; বয়স্কদেরও জন্য। ছোট বলিয়া তুচ্ছ করা উচিত নয়। উপাসনার ছোট বড় নাই। যখন কোনও বন্ধুর গৃহে কোনও অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করি, তখন ইহাকে কেবল সামাজিক আত্মীয়তারক্ষা মনে না করিয়া নিজের সাধনার সাহায্য বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য। যতই সামান্য অনুষ্ঠান হউক, শ্রদ্ধার সহিত যোগদান করিলে, তাহা হইতে আমরা প্রচুর কল্যাণ লাভ করিতে পারি। আচার্য্যের দেখা উচিত যেন অন্যের গৃহে পারিবারিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে গিয়া কেবল পৌরহিত্য না হয়; যেন তদ্দ্বারা নিজেরও আত্মাতে কিছু লাভ হয়।

প্রত্যেক মানুষের আত্মিক উন্নতি পরিবার পরিজন, বন্ধু বান্ধব, এমন কি জনসাধারণের উন্নতির সহিত জড়িত। এই জন্যই বলা হইয়াছে—"একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ"। প্রত্যুষে নির্জ্জন উপাসনা যতই গভীর ও সরস হউক, যদি পরিজনবর্গ অনুকূল না হন, তবে তাঁহাদের এক জনের একটি কথায় বা কার্য্যে সেই উপাসনার ফল মুহূর্ত্তে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এক গৃহে সর্ব্বদা যাঁহাদের সহিত বাস করি, তাঁহাদের সাধনা বা সাধনায় অভাবের উপর ব্যক্তিগত সাধনার ফল বহু পরিমাণে নির্ভর করে। আবার, আফিসে আদালতে বা হাটে বাজারে যাহাদের সহিত সংস্রবে আসিতে হয়, তাঁহাদের অন্তরের ভালমন্দ অবস্থাও আমাদিগকে সর্ব্বদা স্পর্শ করিয়া থাকে। একটি জিনিস কিনিতে গিয়া দোকানদারের একটি অন্যায় কথায় রাগারাগি ঘটিলে, সেই দিনের নির্জ্জন সাধনা পণ্ড হইয়া যায়। অতএব, হাটবাজারের লোকদের আত্মিক কল্যাণ ভিন্ন আমাদের আত্মিক

কল্যাণ সম্যক্‌রূপে হইতে পারে না। পরিজনের কল্যাণ, ধর্ম্ম-বন্ধুদের কল্যাণ, মণ্ডলীর কল্যাণ ও জনসাধারণের কল্যাণ, এ সকল আমাদের নিজের কল্যাণ হইতে পৃথক্ নয়। সকলের সাধনায় বা সাধনার অভাবের ফল আমরা প্রত্যেকে ভোগ করি; এবং আমাদের প্রত্যেকের সাধনার বা সাধনাভাবের ফল সকলে ভোগ করেন। সমগ্র মানব জাতির সাধনার ফল একই ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। অতএব, অন্যের সাধনার সহায় হওয়া নিজের সাধনারই অঙ্গ।

সাধনা ও প্রচার দুইটি ভিন্নধর্ম্মী বা ভিন্নমুখী বস্তু নয়। উভয়ের লক্ষ্য একই। সেই লক্ষ্য এই—অগ্রসর হওয়া। সাধনা—স্বয়ং অগ্রসর হইয়া অপরের পথ সুগম করা; 'প্রচার' কথাটির সহিত দাতা ও গ্রহীতার ভাব, শিক্ষক ও ছাত্রের ভাব, শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্টের ভাব, জড়িত হইয়া গিয়াছে। এই ভাবকে পরিবর্ত্তন করিয়া সহযাত্রীর ভাব আনা আবশ্যক। সহযাত্রীর ভাব আসিলে 'প্রচার' উভয় পক্ষের অধিকতর কল্যাণজনক হইতে পারে। বাস্তবিক প্রচারও সাধনারই অঙ্গ। সকলেরই আপন আপন শক্তি অনুসারে অপরের সাধনার সহায় হওয়া উচিত।

সাধন সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিব। ব্রাহ্মধর্ম্ম অতিশয় উচ্চ ও অতিশয় মহান্। ধর্ম্মও যাহা, ব্রাহ্মধর্ম্মও তাহা। সুতরাং জগতের সকল প্রকার উৎকৃষ্ট সাধনপ্রণালীই আমাদের সাধনপ্রণালী। যেমন জগতের সকল উৎকৃষ্ট শাস্ত্র আমাদের আপনার, সকল উৎকৃষ্ট সাধু সাধ্বী আমাদের আপনার, সকল উৎকৃষ্ট সাধনপ্রণালীও আমাদের আপনার। ব্রাহ্মধর্ম্ম চারিদিকের সকল প্রাচীর আমাদের জন্য সরাইয়া দিয়াছেন। আমরা সময় সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বিশালতা ভুলিয়া গিয়া, এমন ভাবে কথা বলি, যেন কেবল রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতিই আমাদের সাধু মহাজন, যেন কেবল ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম-সাহিত্যই আমাদের শাস্ত্র, যেন কেবল এই ক্ষুদ্র সমাজের অবলম্বিত সাধনপ্রণালীই আমাদের সাধনপ্রণালী। এইরূপ ভাবিলে আমরা সঙ্কীর্ণ ও বদ্ধ হইয়া পড়িব। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মসাধনের এমন কোনও সুনির্দ্দিষ্ট পথ বলিয়া দিতে পারেন নাই, যাহা ধরিয়া যে কোনও ব্যক্তি চলিতে থাকিলে, ব্রহ্মলাভ হইবেই হইবে"। এমন কোনও পন্থা আছে কি না, এবং ব্রাহ্মসমাজ এমন পন্থা দেখাইতে পারিয়াছেন কি না, সেই প্রশ্নের বিচার না করিয়াও বলি, ধর্ম্মসাধনকে stereotype করা ব্রাহ্মসমাজের কাজ নয়। সকল সম্প্রদায়ের নির্দ্দোষ ও ফলপ্রদ সাধনাকে প্রয়োজন অনুসারে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবার উপদেশই ব্রাহ্মসমাজ দিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে সকল দিকে মুক্তি দিয়াছেন। মুক্তি দেওয়াই ব্রাহ্মসমাজের কাজ। যেমন ব্রাহ্মসমাজ একটি নূতন অভ্রান্ত শাস্ত্র দিতে আসেন নাই, একজন নূতন অভ্রান্ত মহাপুরুষ খাড়া করিতে আসেন নাই, তেমনি কোনও অভ্রান্ত সাধনপ্রণালীও দিতে আসেন নাই। সকল শাস্ত্রে সকল সাধন প্রণালীতে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া এবং এই উপায়ে সকল সম্প্রদায়কে এক মহাসম্প্রদায়ে পরিণত করাই ব্রাহ্মসমাজের কাজ। এই কাজ ব্রাহ্মসমাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

পরিত্রাণের পথ অনন্ত। প্রত্যেকের জীবনের অবস্থা যেমন ভিন্ন ভিন্ন, আত্মার প্রয়োজনও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন। পরিত্রাতা পরমেশ্বর প্রত্যেকের প্রয়োজন বুঝিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে আপন চরণে গ্রহণ করেন। একজনের সহিত তাঁর যে লীলা, অপর কাহারও সহিত ঠিক সেই লীলা নয়। সুতরাং কেহ কাহাকেও সুনির্দ্দিষ্ট পথ বলিয়া দিতে পারে না। তবে একটি মাত্র সুনির্দ্দিষ্ট পথ সকলেরই জন্য আছে; তাহা—ব্যাকুল অন্তরে তাঁকে চাওয়া। চাহিয়া তাঁকে পায় নাই, এমন কখনও শুনা যায় নাই। প্রণালীর জন্য আটকাইয়া থাকে না। যে চায়, উপযুক্ত প্রণালী ও সুযোগ সুবিধা তার নিকট আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব, সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালীর জন্য ব্যস্ত হওয়া অপেক্ষা, তাঁর জন্য ব্যগ্র হওয়াই আমাদের অধিক প্রয়োজন। ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

পরলোকগতা রুক্মিণী মহলানবীশ

(শ্রাদ্ধবাসরে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ কর্তৃক পঠিত)

আমাদের মাতৃদেবীর লোকান্তর গমনে প্রাচীনতমা নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মিকার তিরোধান হইল। অতীতের ব্রাহ্মসমাজের সহিত এই পরিবারের সপ্ততি বর্ষ ব্যাপী সাক্ষাৎযোগ ছিন্ন হইল। এই সুদীর্ঘ জীবনে মাতৃদেবী অজস্রধারে ব্রহ্মকৃপা লাভ করিয়াছেন—ব্রাহ্মসমাজের অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া বিধাতার অপূর্ব্বলীলা দেখিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন।

অখণ্ড কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্ম সংখ্যা ও ন্যূনতর ব্রাহ্মিকাদের লইয়া সমাজ গঠিত হইয়াছিল—যাঁহারা একমেবাদ্বিতীয়মের উপাসনার জন্য নানাবিধ পরীক্ষা ও নির্য্যাতনের বাত্যা অকাতরে সহিয়াছিলেন—মাতৃদেবী সেই মণ্ডলীভুক্তা ছিলেন। ক্রমান্বয়ে আদি, ভারত-বর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ত্রিধারার পূত সলিলে তাঁহার ধর্ম্মজীবন অভিষিক্ত হইয়াছে। আজ শ্রাদ্ধবাসরে মাতৃদেবীর আড়ম্বরশূন্য জীবনের কয়েকটি কথা উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে সেই মাতার মাতা পরম মাতার চরণে প্রণিপাত করি, এবং যে সকল সমব্যথী বন্ধুগণ এই পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আমাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন ও যাঁহারা দূরে থাকিয়াও পরলোকগত আত্মার কল্যাণোদ্দেশে শুভ কামনা জানাইয়াছেন—তাঁহাদের কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করি।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত আমতলী গ্রামে এক পণ্ডিতকুলে আনু-মানিক ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মাতৃদেবীর জন্ম হয়। আমার মাতামহের নাম গৌরসুন্দর চক্রবর্ত্তী। তাঁহাদের বাটীতে বহুকাল হইতে সংস্কৃত টোল ছিল। আমার মাতামহ সেই টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া উপাধিলাভের জন্য নবদ্বীপ গিয়াছিলেন। তথায় কৃত-কার্য্য হইয়া জগন্নাথদর্শনের জন্য শ্রীক্ষেত্র গমন করেন। তথা হইয়া ফিরিবার সময় পথে বিসূচিকা রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। মাতামহের মৃত্যুর পর তদীয় অনুজ দুর্গাদাস ন্যায়লঙ্কার মাতৃ-দেবীকে পালন করেন। সেই সময় স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হওয়া

দূরে থাকুক, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও জন্ম হয় নাই। মাতৃদেবী লেখাপড়া না শিখিয়াও ভদ্রসমাজের শিষ্টাচার শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সুনীতিপরায়ণা ও গৃহকার্য্যে সুনিপুণা ছিলেন। তিনি কখনও বিলাসিতার লেশমাত্র জানিতেন না। অল্প বয়স হইতেই তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত নির্ভীকতা জন্মিয়াছিল; উত্তরকালে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মাতৃদেবী কলিকাতায় আসেন ও আমার পিতার সহিত পরিণীতা হইয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আজ ব্রাহ্মসমাজের প্রসাদে—স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে অসংখ্য নারীজীবনে জ্ঞান ধর্ম ও কর্ম্ম স্ফূর্ত্তি পাইতেছে; কিন্তু পঞ্চষষ্টি বৎসর পূর্ব্বে সেই ঘোর অন্ধকারের দিনে সুদূর বিক্রমপুরবাসিনী একজন গ্রাম্য মহিলার পক্ষে এই বিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজে যোগপ্রদান কি অসাধারণ সাহসিকতার পরিচায়ক ছিল, তাহা এখন সম্যক অনুমিত না হইতে পারে। আমাদের পিতামাতাকে জীবনের এই মহা সন্ধিস্থলে কি ভীষণ পরীক্ষার ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত।

সেই সময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়প্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহের তুমুল আন্দোলনে বঙ্গদেশকে আলোড়িত করিয়াছিল। একদিকে আমার পিতা ও মাতা উভয় পক্ষেরই আত্মীয়েরা এই বিবাহের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত, অপরদিকে পিতৃদেবের এক প্রিয়তম বন্ধু, যিনি এই বিবাহের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, তিনি হঠাৎ লোকের কুৎসাভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন, এবং মর্ম্মবন্ধুকে ফেলিয়া কলিকাতা হইতে পলায়ন করিলেন। এই ঘোর বিপদের সময়, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় কন্যাকর্ত্তারূপে বিবাহের সকল ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু পিতা উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং আর হিন্দুমতে অনুষ্ঠান করিতে সম্মত হইলেন না। মাতৃদেবীও তাহাই সমর্থন করিলেন। তখন শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত, কৃষ্ণদয়াল রায়, হরগোপাল সরকার, রামপ্রসাদ সেন, মধুসূদন লাহিড়ী, ও কামাখ্যাচরণ ঘোষ প্রভৃতি পিতার কতিপয় বন্ধুর উদ্যোগে ব্রাহ্মমতেই বিবাহ হইল।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তখন বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে প্রচারার্থে গমন করিয়াছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে প্রথমোক্ত বন্ধুটি পরে নিজ ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পিতার নিকট অনুতাপের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁহাদের পুনর্মিলনে দুই পরিবার প্রগাঢ় প্রীতির বন্ধনে বদ্ধ হয়।

এই সময়ের বিবরণ পিতৃদেবের লিখিত আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "যে সময়ে রুক্মিণী দেবীর সহিত আমার বিবাহ হয়, সেই সময়ে কলিকাতাতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও কিশোরীলাল মৈত্রেয় মহাশয় সপরিবারে এক বাটিতে বাস করিতেন। অঘোরনাথ গুপ্তও সেই বাড়ীতে থাকিতেন এবং সেই বাড়ীতে আমার বিবাহ হইয়াছিল। তখন তিন চারিজন মাত্র প্রচারক হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদেরও সকলের পরিবার তখনও পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে আসেন নাই। তখন কলিকাতাতে ব্রাহ্ম পরিবার অধিক না থাকাতে মফঃস্বলের কোন ব্রাহ্ম কলিকাতাতে আসিলে আমার বাড়ীতেই অতিথি হইতেন, তাহাতে আমার খুব আনন্দ হইত, এবং ব্রাহ্মগণ রুক্মিণী দেবীর সহিত আলাপ করিয়া বড়ই সুখী হইতেন।"

ব্রাহ্মসমাজের আসিবার পর মাতৃদেবীর প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয় ও তিনি অতি যত্নের সহিত বাঙ্গালা লেখাপড়া শেখেন। বরিশাল নিবাসী পরলোকগত ভক্তিভাজন গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন।

ক্রমেই ব্রাহ্ম পরিবার বাড়িতে লাগিল। এই সময় দলে দলে স্কুল ও কলেজের ছাত্রেরা এবং হিন্দুসমাজের অনেক বিধবা ও কুলীন কুমারী ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মেয়েরা প্রথমেই আমাদের মাতৃগৃহেই আসিয়া অবস্থিতি করিতেন। মাতৃদেবী তাঁহাদের কন্যা-নির্ব্বিশেষে যত্ন করিতেন এবং পক্ষান্তরে মেয়েরাও তাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকিতেন।

ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৎসরাধিক কাল আমাদের বাটীতে থাকিয়াছেন। পিতৃদেবই ইঁহাদের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন ও অনেকেরই উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দিয়াছেন। এই সকল কার্য্যে মাতৃদেবীরও সহকারিতা ও অনুরাগের উল্লেখ করিয়া পিতৃদেব লিখিয়াছেন "জগদীশ্বরের কৃপায় আমি এরূপ সুগৃহিণী পাইয়াছিলাম বলিয়াই এই সকল ছেলে মেয়েদের বাড়ীতে রাখিয়া সুখী হইতে পারিয়াছি।" প্রথম ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া অন্যূন বিংশতিজন মহিলা অল্পাধিক কাল আমাদের মাতৃগৃহে আতিথ্য লাভ করিয়াছেন। মাতৃদেবী মিতব্যয়ী ছিলেন বলিয়াই পিতৃদেব কখনও ঋণগ্রস্ত হন নাই, বরং নানারূপ সদনুষ্ঠানে অর্থসাহায্য করিতে পারিয়াছেন। মাতৃদেবী প্রতিদিন আমাদের পিতার সহিত মিলিত হইয়া পূর্ণাঙ্গ উপাসনা করিতেন। পিতৃদেবের মৃত্যুর পরেও তাঁহার দৈনিক উপাসনায় নিষ্ঠার ত্রুটি হয় নাই। পারিবারিক উপাসনা ব্রাহ্ম-জীবনের মেরুদণ্ড; ইহার শৈথিল্যে ব্রাহ্মসমাজে অবসাদ ও দুর্ব্বলতার ব্যাধির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। পুরাতন ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকারা উপাসনাকে জীবনের সকল শক্তি ও প্রেরণার মূল জানিয়া তাহাকে প্রাণের সম্বল করিয়াছেন।

আমাদের মাতা সুগায়িকা ছিলেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে স্নেহময়ী মাতার ক্রোড়ে বসিয়া তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠের ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিয়াছি। শৈশবের সুমধুর স্মৃতিরাশির সঙ্গে মনে পড়ে মাতার প্রিয় সঙ্গীত "কর তাঁর নাম গান, যতদিন রহে দেহে প্রাণ।" এই সঙ্গীতের সার্থকতা তাঁহার জীবনে দেখিলাম। পূর্ণাঙ্গ উপাসনায় ব্রহ্মসঙ্গীতের স্থান বিশিষ্ট বলিয়া মানিতেই হইবে। ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মসঙ্গীত প্রচার করিয়া বঙ্গদেশকে অমূল্য সম্পত্তি দিয়াছেন। আজ ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবেই গৃহে গৃহে ব্রহ্মসঙ্গীতের আদর ও সঙ্গীতচর্চ্চার প্রতি ভদ্র সমাজের শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ ব্রাহ্মিকাসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। মাতৃদেবী নিয়মিতরূপে ইহাতে যোগ দিতেন। তখন ব্রাহ্ম পরিবার ও ব্রাহ্মিকার সংখ্যা অতি বিরল ছিল। সেই

সময়ে পিতৃদেব ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সিংহ, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সাধু অঘোরনাথ প্রভৃতি পিতৃ বন্ধুরা সপরিবারে এক বাড়ীতে থাকিতেন। এই বাড়ীতেই কিছুদিন ব্রাহ্মিকা সমাজের অধিবেশন হয়।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যে ব্রাহ্মমণ্ডলী, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করিলেন, আমাদের পিতামাতাও সেই দলভুক্ত ছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠা ও তৎপরবর্ত্তী ঘটনাবলীতে ব্রাহ্মসমাজের অপূর্ব্ব সজীবতা প্রকাশ পাইয়াছে। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের কলুটোলাস্থ গৃহে তখন ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র ছিল। সেখানে দিবানিশি, সৎপ্রসঙ্গ, উপাসনা ও সদনুষ্ঠানের সূচনা হইতে লাগিল। বিশ্বাস বৈরাগ্য ও ভক্তি জলন্ত ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

এই সময়ে ব্রহ্মানন্দ-জননী দেবী সারদা সুন্দরী নিষ্ঠাবতী হিন্দু হইয়াও আমার মাতার প্রতি পুত্রবধূ নির্ব্বিশেষে যে স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার কথা পিতৃদেব আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ও মাতৃদেবী চিরদিন প্রাণে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন।

সেই সুদূর অতীতের ব্রাহ্মবন্ধুরা এখন অমর লোকে চলিয়া গিয়াছেন। যে সকল ব্রাহ্মিকার সখিত্বে মাতৃদেবী জীবনে অনেক উপকার, শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিয়াছেন, আজ কৃতজ্ঞ ভরে তাঁহাদের স্মরণ করিতেছি। সেই সময়ের একটি স্মরণীয় ঘটনা সুপ্রসিদ্ধ জনহিতৈষিণী কুমারী মেরী কার্পেন্টারের কলিকাতা আগমন। তাঁহার সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ডাক্তার সূর্য্যকুমার গুডিভ চক্রবর্ত্তীর বাটীতে এক সায়ংসমিতি হয়, তাহাতে মাতৃদেবী ও তাঁহার সমসাময়িক ব্রাহ্মিকারা উপস্থিত ছিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীদের সায়ংসমিতিতে যোগের এই প্রথম উদাহরণ।

কখনও লোকনিন্দা বা উপহাসের ভয় মাতৃদেবীকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করে নাই। উচ্চ শিক্ষা লাভ না করিয়াও ব্রাহ্মসমাজে নারীর আদর্শের ক্রমবিকাশের সঙ্গে তিনি নিজ জীবনকে মিলাইয়া চলিতে যত্নবতী থাকিয়াছেন। পতির সহকারিণী-রূপে অনবদ্য অনুষ্ঠান মাত্রেই প্রাণের যোগ রাখিয়া-ছেন। আজ রমণীর অবরোধপ্রথার বিরুদ্ধে ও নারীর ন্যায্য অধিকার লাভের প্রয়াসে সমগ্র ভারত আলোড়িত হইয়াছে। আমার মাতৃদেবী ইহার অগ্রণীদের একজন ছিলেন। দ্বিষষ্টি বৎসর পূর্ব্বে মাতৃদেবী বিনা আড়ম্বরে রাজপথ দিয়া প্রকাশ্যভাবে পদব্রজে যাতায়াত করিতেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আমার ভগিনী সরলা দেবীর জন্ম হয়। তিনি আমাপেক্ষা দুই বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আমার অনুজ প্রবোধচন্দ্র ব্যতীত আর একটি ভাই ও সর্ব্বকনিষ্ঠ এক ভগ্নী ছিলেন। অল্প বয়সেই সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়। এই শেষোক্ত ভগ্নীর জন্মের পর সূতিকা-গৃহেই মাতার আবার এত কঠিন পীড়া হয় যে, আর নবজাত শিশুটিকে পালন করার শক্তি ছিল না। এই সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পরলোকগত মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী এবং পিতৃবন্ধু পরলোকগত কামাখ্যাচরণ ঘোষ মহাশয়ের পত্নী ক্রমান্বয়ে এই শিশুটির পালনের ভার লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের যত্ন সত্ত্বেও ইহার প্রাণ রক্ষা হইল না। এই নমস্য মহিলাদ্বয় এখনও জীবিত আছেন। আজ মাতৃশ্রাদ্ধবাসরে মাতার এই পুরাতন বন্ধুদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এক সময়ে মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রীদ্বয় শ্রীযুক্তা অন্নদায়িনী ও রাধারাণী ও তাঁহাদের অভিভাবক এবং আমার পিতা মাতা এক বাটীতে বাস করিতেন। এই মহিলা-দ্বয়কে মাতৃদেবী বিশেষ ভাবে স্নেহ করিতেন। ভক্তিভাজন লাহিড়ী মহাশয় অনেক সময় সেখানে আসিতেন। তাঁহার সাধু জীবনের সংস্পর্শে আমার পিতা মাতা বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। মাতৃদেবীকে লাহিড়ী মহাশয় বড়ই স্নেহ করিতেন ও তাঁহার পণ্ডিতকুলে জন্ম বলিয়া সমাদর করিতেন। পরে পিতৃবন্ধু হরগোপাল সরকার মহাশয়ের সহিত শ্রীযুক্তা অন্নদায়িনীর বিবাহ হয়। লাহিড়ী পরিবারের সহিত আমাদের পরিবারের বন্ধুতা চিরদিন অক্ষুন্ন থাকে।

পরলোকগত স্বনামধন্য দুর্গামোহন দাস মহাশয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ব্রহ্মময়ী দেবীর নিকটে এই পরিবার অশেষ ঋণী। আমাদের মাতা অসুস্থ অবস্থায় কিছুকাল তাঁহাদের বাটীতে আতিথ্য লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছেন। দাস পরিবারের সহিত আমাদের পারিবারিক ঘনিষ্টতার সুমধুর বাল্যস্মৃতি ভুলিবার নহে।

১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠার পর এই মণ্ডলীর সকল কার্য্যেই মাতৃদেবী প্রাণের সহিত যোগ দিয়াছেন। এই অর্দ্ধ শতাব্দীর স্মৃতি আমাদের পিতা মাতা উভয়েরই জীবনকে কিরূপ নিবিষ্ট ভাবে জড়াইয়া আছে তাহা ব্রাহ্ম সাধারণের অবিদিত নহে। এই সুদীর্ঘ কালে সংখ্যাতীত ধর্ম্ম-বন্ধুর সৌহার্দ্দে এই পরিবার কৃতার্থ হইয়াছেন। তাহা আজ বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে দুরন্ত বিসূচিকা রোগে প্রাণপ্রিয় দুহিতা সরলা দেবীর একবিংশ বয়সে মৃত্যু হয়। প্রিয়তমা কন্যাকে হারাইয়া মাতার প্রাণে যে শেল বিদ্ধ হইয়া ছিল, আমরণ তাহার দাগ মুছে নাই।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে মাতৃদেবী জীবনের চরম শোকের আঘাত পান। আমার পিতৃদেবের স্বর্গারোহণে অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককালব্যাপী সাথী সাধু পতিদেবকে হারাইয়া শোকাতুর হয়েন। যাঁহার সখ্য ও সাহচর্য্যে ব্রাহ্ম-সমাজের পবিত্র আশ্রয়ে আসিয়া অজস্র ব্রহ্মকৃপা ও সৌভাগ্য-রাশি লাভ করিলেন, যাঁহার সাধু দৃষ্টান্তে ও সপ্রেম পরিচালনায় মুক্তির পথ চিনিলেন, যাঁহার হাত ধরিয়া জীবনতরী তরঙ্গ-সঙ্কুল সংসারপাথারে ভাসাইয়া সুদীর্ঘ জীবনে কত প্রবল ঝটিকা অতিক্রম করিয়াছেন, সেই পুণ্যশ্লোক স্বামী জগজ্জননীর আহ্বানে অমরলোকে চলিয়া গেলেন। সেই সময় হইতেই মাতৃদেবীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গেল। তখন হইতেই এই দারুণ বিচ্ছেদের অবসানে দিব্যধামে পুনর্মিলনের প্রতীক্ষায় দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া চলৎশক্তিরহিত হইয়া রোগযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন। ইহার

মধ্যেও প্রিয়তম পৌত্রদ্বয় ও স্নেহের পৌত্রীদ্বয়ের বিবাহে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। ক্রমে বার্দ্ধক্যভারে জরাক্রান্ত দেহ ক্ষীণ, দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি প্রায় লুপ্ত ও দৈহিক যন্ত্রসকল শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। তথাপি গত ১২ই পৌষ তারিখে প্রগাঢ় নিষ্ঠার সহিত, পিতৃদেবের দ্বাদশ বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন। তাহার পর হইতেই ক্রমশঃ জীবনের অন্তিম লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। যে গৃহে পিতৃদেব দেহমুক্ত হয়েন, মাতৃদেবীর জীবনপ্রদীপও সেই গৃহেই ধীরে ধীরে নিবিয়া গেল। ছিয়াশি বৎসর বয়সে, বিগত ৫ই চৈত্র তারিখে মাতৃদেবীর অমর আত্মা নিশীথিনীর আঁধার অঞ্চলে লুকাইয়া আত্মীয় স্বজনের দৃষ্টির অগোচরে এক অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে সকল রোগ শোকের অতীত হইয়া অমৃতময়ের ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। আমরা মাতৃহীন হইলাম।

হে মাতার মাতা, আমাদের মাতাকে তুমি বক্ষে লুকাইয়াছ,—তোমার দিকে চাহিব বলিয়া। তবে অশ্রুসলিলধৌত দিব্য চক্ষু দাও যেন তোমার ভিতরে মাতাকে দেখিতে পাই। কত গুণে যে জীবনকে এখানেই সাজাইয়া ছিলে! না জানি সেই অমৃতনিকেতনে লইয়া আরো কত অতুল সম্পত্তি দিতেছ! শোকের ভিতর দিয়া তুমি স্বর্গের ছবি দেখাইয়া থাক। এ ছবি যেন প্রাণে চির মুদ্রিত হয়। সে সান্ত্বনা আমরা চাহি না, যাহা উঁহাকে ভুলাইয়া দিবে। যে অনন্ত ধামে মাতৃদেবী আমাদের পিতাকে অনুসরণ করিলেন, আমরা সেই লোকের দিকেই চাহিয়া, সেই পুণ্যস্মৃতি যাহাতে প্রাণে জাগাইয়া রাখিতে পারি, এই ভিক্ষা দাও। তোমার মঙ্গল ইচ্ছার জয় হউক। তোমার প্রসাদে বায়ু মধু বহন করুক, সূর্য্য মধু ক্ষরণ করুক, জগৎ মধুময় হউক। ইহলোক পরলোক মধুময় হউক।

প্রচার ব্যবস্থা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৭। কোন্ বছরে কোন্ কোন্ বিষয় এবং কোন্ কোন্ বই পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট থাকবে।

১৮। বৃত্তির ক্রম—প্রত্যেক স্তরের বৃত্তির ক্রম নির্দ্দিষ্ট থাকবে।

বিশেষ রোগ বা অন্য কোন কারণে, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।

১৯। প্রচারার্থিগণ বছরে দুই মাস ছুটি পাবেন; ছুটীর সময় তাঁরা কোথায় কি ভাবে থাকবেন তা প্রচারসভার অনুমোদনসাপেক্ষ। পরিচারক ও প্রচারকগণ বছরে দেড়মাস ছুটী পাবেন। প্রচারকগণ কাজের ব্যবস্থা বুঝিয়া ছুটি লইবেন।

২০। জীবন বীমা—কোন ব্যক্তিকে প্রচারকরূপে গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্যনির্ব্বাহক সভা, তাঁর বৃত্তি অনুসারে ২০০০—৩০০০৲ টাকার জীবন-বীমা করাইয়া দিবেন।

প্রচারকগণের কার্য্যব্যবস্থা

১। প্রচারক্ষেত্র, প্রচারকেন্দ্র, প্রচারকসংখ্যা, এবং অর্থ এই কয়টি বিষয়ের সমাবেশ ক'রে স্থায়ী ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। এলোমেলো ভাবে কাজ হওয়ায় বহু শক্তি ও সময় বৃথা ব্যয় হয়

নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে এবং নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে আমাদের দায়িত্বকে সুস্পষ্ট ক'রে রাখলে, সেখানেই কর্ম্মশক্তিকে ক্রমাগত নিযুক্ত রাখলে, কর্ম্মক্ষেত্র গ'ড়ে উঠে। যেখানে দায়ী স্থায়ী ব্যবস্থা হয়েছে সেখানেই কিছু দাঁড়িয়েছে।

২। প্রথমতঃ দেখতে হবে, কোন্ কোন্ স্থান আমরা প্রচারক্ষেত্ররূপে গণ্য করতে পারি। সে সকল স্থানের মধ্যে আবার কোন্ কোন্ স্থান বেশী অনুকূল। প্রচারক্ষেত্র বিস্তৃত, আমাদের শক্তি সীমাবদ্ধ। সুতরাং প্রথমতঃ আমাদের শক্তি অনুসারে কয়টি বিশেষ স্থান নির্ব্বাচন করতে হবে। পরে ক্রমশঃ বিস্তারের চেষ্টা হবে। বিশেষ স্থান বা কেন্দ্র নির্ব্বাচনের সময় দেখতে হবে, কোথায় কোথায় (১) সমাজমন্দির, (২) উপাসকমণ্ডলী ও (৩) প্রচারকনিবাস আছে এবং উপাসক-মণ্ডলী (৪) প্রচারকের সেবাগ্রহণে ইচ্ছুক ও (৫) তাঁর সহায়তা করতে প্রস্তুত। যেখানে এই পাঁচটি বিষয় বর্ত্তমান সে স্থানকে সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র করতে হবে। সেই সেই স্থানের মণ্ডলীর সঙ্গে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাঁচি, ঢাকা, চাটগাঁ ও বাঁকুড়ার উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম তিন স্থানে মন্দির মণ্ডলী ও নিবাস আছে। বাঁকুড়ায় মন্দির ও নিবাস আছে, মণ্ডলী নাই। কোথায় মন্দির ও মণ্ডলী আছে, নিবাস নাই। কোথায় মন্দির আছে, মণ্ডলী নাই; কোথায় মণ্ডলী আছে, মন্দির নাই। মণ্ডলী, মন্দির, প্রচারক-নিবাস, এই তিনই যে যে স্থানে আছে, সেই সেই স্থানই কেন্দ্র হওয়ার বেশী অনুকূল স্থান। যেখানে প্রচারকনিবাস নাই, আর সব আছে, সেরূপ স্থানে কেন্দ্র করতে হ'লে প্রচারকের বাসের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

৩। যে যে স্থান কেন্দ্র হওয়ার যোগ্য ব'লে প্রচারসভা মনে করেন, সেই সেই স্থানের মণ্ডলীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করবেন যে স্থানীয় মণ্ডলী প্রচারকের বাসস্থান ও ব্যয়নির্ব্বাহ বিষয়ে কিরূপ সাহায্য করবেন। উভয় পক্ষের ব্যবস্থা অনুসারে প্রচারসভা, কয়েকটি স্থানকে নিজেদের প্রচারকেন্দ্ররূপে স্থির করবে এবং সেই কয় স্থানে প্রচারকার্য্যপরিচালনের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করবেন। পাঁচ জায়গায় যদি এইরূপ পাঁচটা কেন্দ্র হয়, তা হ'লে সেই পাঁচ কেন্দ্রের কাজ ধারাবাহিক রূপে পরিচালনের ব্যবস্থার জন্য প্রচারসভা নিজেকে দায়ী মনে করবেন, সে দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখবেন এবং কাজের প্রসারবৃদ্ধির সহায়তা করবেন। স্থানীয় মণ্ডলী এবং প্রচারকের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, আবশ্যক মত এক স্থানের প্রচারককে অন্যত্র পাঠাতে পারেন।

৪। কোথায় কোথায় কর্ম্মকেন্দ্র হবে এবং কোন্ প্রচারক কোথায় থাকবেন, এবং তাঁর থাকার কিরূপ ব্যবস্থা হবে, এ সবের যেমন স্থায়ী ব্যবস্থা হওয়া উচিত, তেমনি প্রচারকের কয়েকটি কাজেরও নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকা উচিত, যা স্থায়ী হবে, প্রচারকের খুসীর উপর নির্ভর করবে না। যেমন, রবিবারের উপাসনা, সঙ্গত, নীতিবিদ্যালয়, ছাত্রসমাজ, মহিলা সমিতি, পারিবারিক উপাসনা, Temperance, জনসেবা,

শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি। প্রচারকের পরিবর্ত্তনেও এই সব কাজ ঠিক চলবে ক্রমশঃ

সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত

প্রাপ্ত।

বিবেক ও ধর্ম্মমত।

শাস্ত্র আওড়ান আমাদের মজ্জাগত অভ্যাস হইয়া উঠিয়াছে। ইহা দোষ কি গুণ সে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এ স্থলে আমার ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, অনেক সময় আমরা তাৎপর্য্য যথাযথ ভাবে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া শাস্ত্রোক্তি করিয়া থাকি। এমন কি ইহাও সচরাচর দেখা যায়, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অশাস্ত্র প্রচার করা হয়—কত অশাস্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হয়। আমরা বলিয়া থাকি, 'বিদ্যাহীনা জনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ'—কিন্তু ইহার গূঢ় অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করি না। যেমন বিদ্যার অভাব অবিদ্যা, তদ্রূপ অবিদ্যার নাশ বিদ্যা। আবার, অবিদ্যার নাশে অর্থাৎ বিদ্যার উৎপত্তিতে বিবেকের বিকাশ। সুতরাং, উল্লিখিত শ্লোকাংশে বিদ্যাহীন বলিলে বিবেকহীনই বিশেষরূপে বুঝায়। একটু চেষ্টা করিলে ইহা আরও স্পষ্টতর ভাবে বুঝা যাইবে। আমরা জানি, মনুষ্য বলিলে আমরা সাধারণতঃ দুইটি কথা বুঝিয়া থাকি; তাহা পশুত্ব ও বিবেকবুদ্ধি (Animality ও rationality) অর্থাৎ 'মানুষ' শব্দের অর্থ—বিবেকসম্পন্ন পশু—প্লেটোর পালকহীন দ্বিপদ নয়। এই স্থলেই মানুষে ও পশুতে প্রভেদ। বিবেক আছে বলিয়াই মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। এই বিবেকানুযায়ী কাজ করে বলিয়াই মানুষ মানুষ, পশু নয়! কিন্তু এরূপ অনেক লোক আছে—তাহাদের সংখ্যাই অধিক—যাহারা এই বিবেকের বাণী হৃদয়ের অন্তস্তলে লুক্কায়িত রাখিয়া কার্য্য করে, তাহারা পার্থিব সুখসম্পদের বিনিময়ে বিবেক বিক্রয় করে। তাঁহারা মনুষ্যাখ্যা পাইবার উপযুক্ত কি না, তাহা বিবেচ্য।

যাহা হউক, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, এই বিবেকানুযায়ী কার্য্য করাই মনুষ্যের বিশেষত্ব এবং এই বিবেকই মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রদান করে। বিবেক অন্তরাত্মার স্ফুরণ; বিবেক যখন মানবহৃদয়ে জাগরিত হয়, তখন কোন বাহ্যিক শক্তি ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তাই, তখন ইহা প্রস্রবণের দমা জলধারার ন্যায় অবাধগতিতে বাহিরের কার্য্যে প্রকাশ পায়; তখন ইহা মিথ্যা আবরণ অপসারিত করিয়া সত্যকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়; পুরাতন ভ্রম-প্রমাদ লোকমত খণ্ডন করিয়া নূতন সত্য ঘোষণা করে। কিন্তু এই বিবেকের বাণী প্রচার করিতে হইলে যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ এবং নৈতিক সাহসের প্রয়োজন হয়। যাহারা নৈতিক বলে বলীয়ান্ নয়, যাহারা ভগবানের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, তাহারা ইহা প্রকাশ করিতে পারে না। ইহা তাহাদের কণ্ঠাগ্রে আসিয়া, সামাজিক উৎপীড়ন ও রাজশক্তির ভ্রূকুটির ভয়ে, পলায়ন করে; সম্মুখীন হইয়া সম্মুখ-সমরে শত্রুকে আক্রমণ করিতে পারে না। তাই বলিতেছি, সাধারণ লোকে বহিঃশত্রুর নির্য্যাতনের ভয়ে ভগবানের আদেশ প্রচার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে না। এই স্থলেই সাধারণ ও অসাধারণে পার্থক্য। যাঁহারা জগতের ইতিহাসে মহাপুরুষ বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এই আত্মার বাণী বহির্জগতে প্রচার করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তাই, ব্রাহ্মসমাজের গত শত বার্ষিক উৎসবে রামমোহনকে লক্ষ্য করিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—মহাপুরুষেরা যখন আসেন, তখন বিরোধ লইয়া আসেন। বাস্তবিকই উক্তিটি অত্যন্ত অর্থবোধক। বস্তুতঃ, এই বিবেকের বাণী বাহিরে প্রকাশ করিতে কত লোকের জীবনপাত করিতে হইয়াছে, কত আত্মীয় স্বজনের বিরোধ, কত সামাজিক গ্লানি, কত রাজনিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছে! কিন্তু শেষে এই শাস্তি শান্তিতে পরিণত হইয়াছে। পোপ কবি সত্যই বলিয়াছেন,—'Blood of the martyrs is the seed of the church."

যে সমস্ত মহাপুরুষের ধর্ম্মজীবনে এই বিবেক প্রতিফলিত হইয়াছিল, আমি তাঁহাদের মধ্যে কেবলমাত্র কয়েকজনের সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ করিব। যীশুর জীবনে এই বিবেক পরিস্ফুট হইয়াছিল। কত ষড়যন্ত্র, কত অপবাদ, কত নিগ্রহ! তথাপি তিনি এই বিবেকের বার্ত্তা ঘোষণা করিতে নিরস্ত হন নাই। তাঁহার বিবেক সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল যখন তিনি বলিয়াছিলেন,—"Who is my father, mother, brother and sister? Whoever doeth the will of my father who is in heaven, is my father, mother, my brother and sister. বালকের কি অদ্ভুত ভগবদ্‌জ্ঞান! ভগবানই যে আমাদের একমাত্র মাতা পিতা এরূপ ধারণা বালক যীশুর জীবনে দেখুন। পার্থিব মাতা পিতার অপেক্ষা স্বর্গস্থ পিতা ভগবানের স্থান যে কত উচ্চ, তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, এ সমস্ত বিষয়ে চিন্তা করিলে হৃদয় যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দরসে পরিপ্লুত হয়। যীশু খৃষ্টের কথা ছাড়িয়া দিই। আমাদের দেশে রাজা রামমোহনের জীবনেও এই বিবেক পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। মূর্ত্তিপূজা যে এক অধঃপতিত জাতির ভ্রান্তসংস্কার এবং ইহা যে প্রকৃত ভগবানের আরাধনার ঘোর অন্তরায়, তাঁহার বিবেক বলিয়া দিয়াছিল এবং তিনি কখনও সে ধারণা হইতে বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার জননী রুগ্নাবস্থায় শায়িতা; মরণাপন্ন মাকে তিনি দেখিতে যান। মা যখন শুনিলেন, রামমোহন আসিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে প্রথমে তাঁহার রাধাগোবিন্দ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট আসিতে বলিলেন। এ অবস্থায় রামমোহন কি করেন? যে মায়ের কোলে তিনি বাল্যকালে লালিত পালিত হইয়াছেন, যাঁহার স্নেহ ও অপার করুণায় তিনি জীবনধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সেই মাকে তিনি জীবনের তরে আর একবার মাত্র দেখিতে গিয়াছেন। তাই, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার হৃদয়ে শান্তি বিধানের নিমিত্ত ঠাকুরের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি আমার মায়ের রাধাগোবিন্দকে প্রণাম করিলাম।" যুবকের কি অসাধারণ উক্তি! কি বিবেক-জ্ঞান! যে মূর্ত্তিপূজা

একবার ভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহা নিজের বলিয়া কি প্রকারে গ্রহণ করিবেন ? আচার্য্য শিবনাথের জীবনেও এই বিবেক পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। স্বগ্রাম মজিলপুরস্থ বাড়ীতে তাঁহার পিতা একদিন তাঁহাকে ঠাকুরপূজা করিতে বলেন। পিতার আদেশ হইলেও তিনি তাহা কি প্রকারে করিবেন ? তাহা যে ভ্রম-প্রমাদ, কুসংস্কার বই আর কিছুই নয়। তাই বলিলেন, "বাবা, মাপ করিবেন। আমি আপনার সমস্ত আদেশ পালন করিতে পারি, কিন্তু ঠাকুরপূজা করিতে পারিব না"। পিতার নিকট পুত্রের কি বেয়াদবী ! কিন্তু এ বেয়াদবীর বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। প্রথম জীবনের এই বেয়াদবী শেষ জীবনে অনেক যুবককে মহাপুরুষে পরিণত করিয়াছে, এবং এই বেয়াদবীর জন্য অনেকে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

যাহা হউক, বিবেকানুযায়ী কার্য্য করাই মানুষের প্রকৃত ধর্ম্ম, বিবেক-বাণীর অনুবর্ত্তী হইয়া চলাই মানুষের প্রকৃত কর্ম্ম। বিবেকানুসারে কাজ করা যেমন ধর্ম্ম, বিবেকের বাণী গোপন করাও তেমন অধর্ম্ম; এবং তদনুযায়ী কাজ না করাও তেমন কুকর্ম্ম বলা যাইতে পারে। এই বিবেকে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালার অমর কবি হেমচন্দ্র সত্যই গাহিয়াছেন—

ধর অস্ত্র, কর রণ,
যায় যাবে যাক্ প্রাণ।

লিখিতে বসিলে অনেক কথা মনে আসে। কিন্তু পত্রিকার স্থানাভাব বিবেচনা করতঃ বড়ই দুঃখের সহিত পাঠক পাঠিকাগণের নিকট হইতে বিদায় লইতে হইতেছে। প্রত্যেক ব্রাহ্ম ভ্রাতা ভগিনী মনে রাখিবেন, ব্রাহ্মসমাজ এই বিবেকের উপর প্রতিষ্ঠিত। সকলে যেন বাহিরের পাপ-পঙ্কিল চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া এই বিবেকের অনুবর্ত্তী হইয়া মনের উল্লাসে শুভোৎসবে যোগদান করেন। তাহা হইলে তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন সার্থক হইবে—ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

শ্রীকিশোরীমোহন রায়, বি এ।

ব্রাহ্মসমাজ।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথচন্দ মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগিনী সারদা দেবী গত ২৫শে এপ্রিল দেরাদুন নগরে বার্দ্ধক্যজনিত রোগে কয়েক মাস কষ্ট পাইয়া দয়াময় নাম শুনিতে শুনিতে ৭৫ বৎসর বয়সে জীবনলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সময়ে যে সকল মহিলা ধর্ম্মজীবনে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদেরই একজন। উপাসনায় দৃঢ়নিষ্ঠা এবং উদার প্রেমপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি পুত্র কন্যাগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। গত ৫ই মে ময়মনসিংহ নগরীতে তাঁহার পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন এবং শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ চন্দ স্বর্গীয়া পিসিমাতার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। শ্রীনাথ বাবুও তাঁহার জীবনের কথা বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান প্রতিশ্রুত হইয়াছে:—সারদা দেবী যে ব্রহ্মমন্দিরে প্রথম সামাজিক উপাসনা আরম্ভ করেন, ময়মনসিংহের সেই পুরাতন ব্রহ্মমন্দিরে ৫৲ টাকা, ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীনতম প্রচারক ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী মহাশয়ের সেবার জন্য ৫৲ টাকা, সাধনাশ্রমের রুগ্ন পরিচারকদিগের পথ্যাদির জন্য ৫৲ টাকা, ঢাকা অনাথ আশ্রমের শিশুদিগের দুধের জন্য ৫৲ টাকা। বিধবাশ্রমের গরীব বিধবাদিগের বস্ত্রের জন্য ৫৲ টাকা। মোট ২৫৲ টাকা।

গিরিডি-প্রবাসী শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসুর পত্নী সরলাবালা বসু দেড় বৎসরকাল শয্যাশায়ী থাকিয়া বিগত ১৪ই মে কলিকাতা নগরীতে ৪১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—বর্ষ শেষ ও নববর্ষের উৎসব উপলক্ষে ২৯শে চৈত্র সায়ংকালে একটী বক্তৃতা সভা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি প্রার্থনান্তে "বাঙ্গালার শতবর্ষ" বিষয়ে প্রারম্ভিক বক্তৃতা করিলে, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ সেন উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভাপতির মন্তব্যসূচক বক্তৃতান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়। ৩০শে চৈত্র প্রাতঃকালে কীর্ত্তনান্তে মনোমোহন বাবু সংক্ষিপ্ত উপাসনা করিলে, বাবু শ্রীচরণ সেন তাপসমালা হইতে পাঠ ও প্রার্থনা এবং বাবু ললিতকুমার বসু প্রার্থনা করেন। সায়ংকালে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১লা বৈশাখ প্রাতে সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে উপাসনায় সঙ্গীত কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১৮ই বৈশাখ সায়ংকালে ডাক্তার বিহারীলাল বিশ্বাসের ভবনে তাঁহার কঠিন রোগমুক্তি উপলক্ষে উপাসক বন্ধুদিগকে লইয়া বিশেষভাবে উপাসনা কীর্ত্তনাদি হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য এবং বিহারী বাবু প্রার্থনা করেন।

তিন মাসের অধিক হইল রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের কার্য্য পুনরায় কল্যাণ-কুটিরে মনোমোহন বাবুর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মকন্যাগণ শিক্ষাদান করিতেছেন। বালক বালিকার সংখ্যা ৪০ হইবে।

১৫ বৎসরের অধিককাল হইল কল্যাণ-কুটিরে মনোমোহন বাবুর প্রযত্নে মঙ্গলবারে উপাসনাদি হইত। তিনি অসুস্থ হইয়া পড়াতে প্রায় দুই বৎসর বন্ধ ছিল। ২।৩ মাস হইল পুনরায় মঙ্গলবারের সমবেত উপাসনা বগুড়াপল্লীস্থ প্রতি ব্রাহ্ম পরিবারে পালাক্রমে সম্পন্ন হইতেছে।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১০ই জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি, এ

অসতো মা সদ্গময়,

তমসো মা জ্যোতির্গময়,

মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত

৫২শ ভাগ।
৪র্থ সংখ্যা।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৬, ১৮৫১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০

30th May, 1929.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে জ্ঞানময় জীবন-বিধাতা, তুমি আমাদিগের উপর যে সকল কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিয়াছ, আমরা কেন যে সে সমস্ত উপযুক্ত রূপে সম্পন্ন করিতে পারি না, তাহা তুমিই জান। আমরা কত সময় সুযোগ সুবিধার অভাবের অথবা বাহিরের নানা বাধা বিঘ্নের বা অপরের ত্রুটির কথা বলিয়া, নিজেদের দোষক্ষালনের চেষ্টা করি, মনে একটা মিথ্যা সান্ত্বনা লাভ করিতে যত্নশীল হই। প্রকৃত কারণ যে কোথায় তাহা একবার ভাবিয়াও দেখি না। যখন তোমারই দিকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিতে অগ্রসর হই, তখন ত দেখিতে পাই, সুযোগ সুবিধা দিতে তুমি কখনও ত্রুটি কর না, সমস্ত বাধা বিঘ্নকে অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইবার উৎসাহ ও শক্তি তুমিই প্রদান কর। আমরা যখন বাহিরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, আপনার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে যাই, তখন সামান্য অসুবিধাতেই নিরুৎসাহ হইয়া পড়ি, তুচ্ছ প্রতিবন্ধকতার নিকটই পরাজিত হই। তুমি কখনও আমাদিগকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া রাখ না, শরণাগতকে পরিত্যাগ কর না। আমরা তোমার শরণ লই না, তোমার অনুগত হইয়া চলিতে প্রস্তুত হই না, তোমাকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য স্থানে রাখি না বলিয়াই এরূপ ঘটে। হে শুভবুদ্ধিদাতা করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়ে শুভবুদ্ধি প্রদান কর, আমরা অপর কোনও দিকে দৃষ্টি না করিয়া, এক তোমারই ইচ্ছাকে জীবনের প্রধান চালক করি; তোমার বাধ্য সন্তান হইয়া, অনুগত দাস হইয়া, তোমার কার্য্য করিয়া যাই। তুমি যে ভার দিয়াছ তাহা নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন হইবে। তুমি দুর্ব্বলের বল, তুমিই সর্ব্বদা বল বিধান করিবে। তোমার কার্য্য তুমিই সম্পন্ন করাইয়া লইবে। তোমার ইচ্ছাই আমাদের সকলের জীবনে জয়যুক্ত হউক, তোমার ইচ্ছাই সর্ব্বোতোভাবে পূর্ণ হউক।

নিবেদন

ধর্ম্মের বিলাস—সংসারে অনেক লোক দেখা যায়, তারা কেবল উপর উপর চলে; কেবল ফুলে ফুলে মধু খেয়েই বেড়ায়; সংসারের সুখ ও আরামটুকুই কেবল খোঁজে—যেখানে কর্ত্তব্য, যেখানে কষ্টস্বীকার কর্‌তে হয়, সেখানে তারা নাই। বন্ধু তারা চায়; তাদের সঙ্গসুখ ভালবাসে; একত্রে গল্প করে; কিন্তু বন্ধুর অসুখ কর্‌ল, সে বিপদে পড়্‌ল, তখন আর তাদের দেখা গেল না। সংসারে পরিবারে তারা যেন সরকারে খায়, খায় দায় আমোদ করে; কিন্তু কোথা থেকে কি আসে, কার কখন অসুখ, তার খবর রাখে না। খবর পেলেও তার ব্যবস্থা কর্‌তে, রাত জেগে সেবা কর্‌তে, তারা প্রস্তুত নয়। এরা সংসারের বিলাসটুকুই চায়; দায়িত্ব নিতে চায় না। ধর্ম্মসমাজেও এক দল লোক আছেন, তাঁরা কেবল ধর্ম্মের মধুটুকু চান; ধর্ম্মের জন্য যে ক্লেশ ক'রে সেবাও কর্‌তে হয়, তা তাঁরা চান না। তাঁর নাম করেন, কীর্ত্তন করেন, বেশ আনন্দ পান; কিন্তু ধর্ম্মের ভিতরে যে কঠোর কর্ত্তব্য আছে, সেবার ক্লেশ আছে, দশজনের কাজ কর্‌তে গেলে যে অনেক খোঁচা লাগে, সেটুকু তাঁরা চান না। ইহারাও ধর্ম্মের বিলাস চান, ধর্ম্মের কঠোর দায়িত্ব চান না। ধর্ম্ম আনন্দ আনে; সে আনন্দ কেবল মাধুর্য্যসম্ভোগে নয়, প্রিয়তমের কাছে কেবল ব'সে থাকাতে নয়; প্রিয়তমের জন্য, তাঁর আদেশে, কর্ম্মক্ষেত্রে দুঃখ লাঞ্ছনা বরণ কর্‌তে হয়।

নিষ্ঠার সহিত প'ড়ে থাক—তিনি কখন আস্‌বেন, কোন্ পথে আস্‌বেন, তাহা তিনিই জানেন।

তোমার কাজ তাঁর চরণে প'ড়ে থাকা; প্রাণমন তাঁর চরণে সমর্পণ করা। তাঁর কৃপার ভিখারী হ'য়ে ব'সে থাকবে; যদি তাঁর দর্শন না-ই পাও, তবুও ব'সে থাকবে। তাঁর সন্ধান করবে, তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করবে; অনুতাপের অশ্রুতে পাপ ধৌত করবে; তাঁর ইঙ্গিত বুঝে তাঁর সেবা করবে; তাঁর চরণে আকুল প্রার্থনা জানাবে। তাঁর সময়ে তিনি আসবেন। যদি প্রাণে শুষ্কতা থাকে, তা নিয়েও তাঁর চরণে বসবে; যদি চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে, তবুও তাঁর চরণে বসবে; যদি চারিদিকে বিপজ্জাল ঘনিয়ে আসে, তবুও তাঁর চরণে প্রণতি করবে। অনন্যগতি হ'য়ে তাঁর চরণে বসবে; তিনি ছাড়া আর কেহ নাই, এই ব'লে তাঁর চরণে বসবে; এ জীবনে যদি তিনি দেখা না-ও দেন, তবুও তাঁর চরণে প'ড়ে থাকবে। তাঁর সময়ে তিনি আসবেন; জীবনের প্রভাতে না হয় সন্ধ্যায় আসবেন; ইহজীবনে না হয়, পরজীবনে আসবেন; সে তাঁর কাজ। তোমার কাজ, আকুল চিত্তে তাঁর চরণে প'ড়ে থাকা।

কি ভাবলাম কি হলো—কি আলোক দেখে, কি স্বপ্ন দেখে, ছুটে এলাম! ব্রহ্মনাম কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হবে; গৃহে গৃহে ব্রহ্মের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হবে; ব্রহ্মের নামে মানুষ জেগে উঠবে; তাঁর প্রেমে প্রেমিক হ'য়ে পরস্পর পরস্পরকে ভাই বোন ব'লে দেখবে; প্রেম পরিবার প্রতিষ্ঠিত হবে; সত্য প্রেম ও পবিত্রতার হাওয়া প্রবাহিত হবে; দুর্নীতি কুসংস্কার, অশিক্ষা কুশিক্ষা দূর হবে; মানুষ দেবতা হ'য়ে উঠবে; সর্ব্ব বিষয়ে মানুষ স্বাধীন হবে। কি স্বর্গীয় চিত্র দেখে ছু'টে এলাম! আজ কি দেখছি! ঈশ্বর, তুমি কোথায় লুকালে? যাঁদের ডেকে এনেছিলে, তারাও তোমাকে ভু'লে গেল! যারা তোমার জন্য কত ক্লেশ, কত নির্য্যাতন সহ্য করল, তারাও পথের ধারে ঘুমিয়ে পড়ল! মানুষ কোথায় ছুটে চলছে? কোন্ দিকে তার গতি? ঐ যে দলে দলে মানুষ আমাদের পশ্চাতে ছুটেছে, তারা সুখ স্বার্থ বিলাস নিয়ে ভু'লে রইল! তোমার নামের মাধুর্য্য আস্বাদ করলে না; তোমার নামে ত্যাগ এল না, প্রেম এল না, পবিত্রতা শুদ্ধতা এল না? কি দেখলাম, আর আজ কি দেখছি! প্রাণ ভেঙ্গে পড়ে, চোখে জল আসে। তিনি তোমাকেও কত ডাকলেন, কত প্রেমের আস্বাদ দিলেন; তুমিও এসে তাঁর প্রেমের সাক্ষ্য দিলে না! তুমিও তাঁর জন্তে রইলে না! তুমিও আপনাকে অর্পণ করলে না! ভগবান্, এ যে আর দেখতে পারি না। যা ভাবলাম, তা কোথায় গেল? যা দেখলাম, তা লুকাল কেন? আবার এস, নূতন আলোকে নূতন দৃশ্য দেখাও; প্রেম প্রতিষ্ঠা কর।

সম্পাদকীয়

কেন এমন হয়—সমাজের কার্য্য আশানুরূপ লভেতে বিস্তার লাভ করিতেছে না এবং যাহা কিছু চলিতেছে তাহাও অতি পঙ্গুভাবেই অগ্রসর হইতেছে বলিয়া আমরা সকলেই বিশেষ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকি; এবং প্রয়োজনীয় অর্থের ও যথেষ্ট সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মীর অভাবেই যে এরূপ ঘটিতেছে তাহাও সর্ব্বদাই সকলের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ অবস্থার মূল কারণ কোথায় এবং তাহা দূর করিবার প্রকৃষ্ট উপায়ই বা কি, সে বিষয়ে আমরা কে কতটা গভীর ভাবে চিন্তা করি, জানি না। টাকা ও লোকের অভাব যে আমাদের খুবই বেশী এবং তাহার জন্ম যে গুরুতর ক্ষতিই সাধিত হইতেছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু টাকা ও অনন্যকর্ম্মা লোক যথেষ্ট হইলেই সকল কার্য্য আশানুরূপ ভাবে চলিবে, আমরা কি নিঃসন্দিগ্ধভাবে এরূপ স্থির-নিশ্চয় হইতে পারি? বাহিরের দিকে চাহিয়া ত সেরূপ বলা যায় না। চারিদিকে এরূপ অনেক প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে টাকা ও লোকের কোনও অভাবই নাই, বেশ প্রাচুর্য্যই আছে—অথচ তাহার দ্বারা প্রকৃত কাযা, কল্যাণকর কার্য্য কিছু হইতেছে না, বরং অনেক অপকার্য্যই সাধিত হইতেছে। অবশ্য আমাদের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত সেরূপ সুযোগ উপস্থিত হয় নাই, উক্তপ্রকার ঘটনাও ঘটে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে কখনও উক্তপ্রকার ঘটিতে পারে না, দৃঢ়তার সহিত এরূপ কথাও বলা কঠিন। তবে তাহা হইবে না বলিয়া আমরা সহজেই আশা করিতে পারি। সে যাহা হউক, বর্ত্তমানে এ বিষয়ে কোনও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই। যথেষ্ট টাকা ও কর্ম্মী যখন হয়, তখন আবশ্যক হইলে সেই আলোচনার সময় ও সুযোগ পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমানে প্রধান প্রশ্ন এই—আমরা যথেষ্ট টাকা ও লোক পাই না কেন? আমাদের দারিদ্র্য ও সংখ্যার অল্পতাই কি ইহার প্রধান কারণ? তাহা একটা কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও ত আমরা বলিতে পারি না যে, পূর্ব্বের তুলনায় আমাদের দারিদ্র্য ও সংখ্যার অল্পতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা আমরা সমান অনুপাতে টাকা ও লোক পাইতেছি। টাকা সম্বন্ধে অনেকে বলেন, পূর্ব্বে বাহিরের লোকের নিকট হইতে অনেক টাকা পাওয়া যাইত, এখন আর তাহা পাওয়া যাইতেছে না। ইহার কারণ কি? কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, তাঁহাদের মতি গতি অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই আর আমাদের সঙ্গে তাহাদের সহানুভূতি নাই, আমাদের কার্য্যাদিতে তাঁহাদের অনুরাগ নাই। কতক লোক সম্বন্ধে ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, সকলের সম্বন্ধে ত এরূপ কথা কিছুতেই বলা যায় না। কোনও মিথ্যা হুজুগে মাতেন না, প্রকৃত কল্যাণ কোথায় বুঝিতে পারেন এবং সাধু কার্য্যে অনুরাগী, এরূপ লোকও ত অনেক আছেন। আমরা তাঁহাদের সাহায্য ও সহানুভূতি পাই না কেন? আবার কেহ কেহ বলেন, আমরা কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া চলি না, তাই তাঁহারাও আমাদিগের পানে চাহেন না, বিরক্ত হইয়া দূরে চলিয়া যান। এখানে জিজ্ঞাস্য এই, পূর্ব্বে কি আমরা ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে লোকের মুখে দিকে চাহিতাম, অপরকে সন্তুষ্ট করিয়া চলিতে ব্যস্ত ছিলাম? ইতিহাস বলিবে ইহার বিপরীতটাই সত্য। আজ কালই উক্ত প্রবৃত্তির পরিচয়টা স্থানে স্থানে কিছু পরিমাণে দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে উহা মোটেই দেখা যাইত না। কোনওরূপ বন্দোবস্ত করিয়া চলিবার ভার, ঈশ্বর অপেক্ষা মানুষের

সন্তোষের দিকে অধিকতর দৃষ্টিপ্রদান করা, পূর্ব্বের ব্রাহ্মজীবনে কখনও দেখা যায় নাই। আর, এই উপায়ে যে লোকের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণ করা যায় না, বরং ভিতরে ভিতরে অশ্রদ্ধাই উৎপাদন করা হয়, তাহারও প্রচুর দৃষ্টান্ত চারিদিকে রহিয়াছে। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝা যায়, নির্ভয়ে তাহা করিয়া গেলে যে বিরুদ্ধ পক্ষেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা সহজ হইয়া উঠে, তাহারও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তাহা ছাড়া, সকল লোকের পছন্দই যে একই প্রকারের, এমন ত কোনও কথা নাই। আমাদের পন্থাই পছন্দ করেন, এরূপ লোকও ত বাহিরে অনেক আছেন। তাঁহাদের সাহায্য পাই না কেন? আমাদের দেশে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনও সাধু কার্য্যের সাহায্যে অগ্রসর হওয়ার ভাবটা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেকটা কম স্বীকার করিলেও এ বিষয়ে যে কেবল অপরকে দায়ী করা যায় না, দায়িত্বের বেশীর ভাগটাই আমাদের আপনার স্কন্ধেই নিতে হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। নিশ্চয়ই আমাদের ত্রুটিতেই আমরা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছি না। ইংরাজীতে একটি প্রবাদবাক্য আছে—Nothing succeeds like success—কিছুই সফলতার ন্যায় সফল হয় না। যে কাজ সতেজে সুন্দর ভাবে চলে তাহা সহজেই অধিকতর সফলতা লাভ করে, সকলের উৎসাহ অনুরাগ সহায়তা লাভে সমর্থ হয়। নিশ্চয়ই আমরা এমন ভাবে কাজ চালাইতে পারিতেছি না, যাহাতে অপরের প্রাণে বিশেষ উৎসাহ ও অনুরাগ সঞ্চারিত হইতে পারে। আমাদের পূর্ব্বের বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রকে যে আমরা বহু পরিমাণে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি এবং যাহা কিছু নামাগুরূপ করিতেছি তাহাও অতি মৃদুভাবেই চলিতেছে, এ কথা অস্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই। বাহিরের কেন, ভিতরের লোকদিগকেও আমরা যথেষ্টরূপে আকৃষ্ট ও উৎসাহিত করিতে পারিতেছি না, নিজেরাও নিজেদের কাজে সন্তুষ্ট হইতে সমর্থ হইতেছি না। আমাদের প্রচারকার্য্য বিষয়ে অনেক মফঃস্বলস্থ বন্ধুদের নিকট হইতে যাহা শুনিতে পাওয়া যায়, এই প্রসঙ্গে সেই কথাটাও স্মরণে রাখা আবশ্যক। অনেকে বলেন,"আজ কাল প্রচারকগণকে আর মফঃস্বলে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না, এমন কি উৎসবাদির সময়ও লোক চাহিয়া পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ তাঁহাদের নিকট হইতে সেরূপ কোন উপকারও পাওয়া যায় না। প্রচার ফণ্ডে টাকা দিয়া কি হইবে?" প্রচার বিভাগের চাঁদা ও দান যে কমিয়া গিয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কতকগুলি স্থায়ী ভাণ্ডারের সুদ হইতেই যাহা কিছু আয় হয়। বন্ধুদের উৎসাহ ও অনুরাগ হারাণ একটা গুরুতর ক্ষতি। তাঁহারা যে সকল দিক ভাল করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা যুক্তিসঙ্গত মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের অভিযোগের মধ্যে কোনও ভুলভ্রান্তি নাই, এরূপ কথা আমরা বলিতেছি না। যথেষ্ট লোকের অভাব যে এরূপ ঘটিবার একটা প্রধান কারণ, এবং টাকার অভাবও যে লোকাভাবের জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বের ন্যায় খাটিতে না পারিলেও ভগ্নস্বাস্থ্য প্রচারকদের প্রতি যে আমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে, তাহা বলা বাহুল্য। তথাপি, তাহাদের যে অভিযোগ করিবার কোনও কারণ নাই, এরূপ কখনও আমরা বলিতে পারি না। আমাদের যে আয়োজন আছে তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিলে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষজনক কার্য্য হইতে পারিত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর, শুধু লোক পাঠাইলেই যে ইহারা সন্তুষ্ট হইবেন, তাহাও নহে। যে সকল লোক সময় সময় পাঠান হয়, অনেক স্থলে তাহাদের ব্যবহারাদি সম্বন্ধেও নানা অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়,—তাহাতে প্রচারকার্য্যের প্রতি অনুরাগের পরিবর্ত্তে বিরাগটাই বর্দ্ধিত হয়। বাধ্য হইয়া লজ্জার খাতিরে একবার অর্থ প্রদান করিলেও চিরদিনের জন্য অনেকে বিমুখ হইয়া দাঁড়ান। ইহাতে মফঃস্বলের সঙ্গে বন্ধনটা দৃঢ়ীকৃত না হইয়া, একেবারে শিথিল হইয়া যায়। বাহিরের দুই চারিটা উপাসনা, বক্তৃতা, সঙ্কীর্ত্তনাদির বিবরণ কাগজে ছাপাইয়া, আমরা সফলতার একটা উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কনদ্বারা একটু সাময়িক বাহবা অর্জ্জন করিয়া, আত্মপ্রতারিত হইতে পারি বটে, কিন্তু পরে দেখিতে পাইব ইহার দ্বারা ইষ্টের পরিবর্ত্তে গুরুতর অনিষ্টই সাধিত হইয়াছে। এমন ভাবে কাজ করা চাই, যাহাতে লোকে উপকৃত বোধ করিয়া আগ্রহের সহিত আপনা হইতে টাকা দিবে, প্রীতির বন্ধনে যুক্ত হইয়া থাকিবে। শুধু লোক হইলেই হইবে না, সর্ব্বোপরি উপযুক্ত লোক চাই। শুধু টাকা হইলেই যে উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইবে, এরূপও বলা যায় না। তথাপি টাকা নিশ্চয়ই চাই। কোনও লোকেরই নিজের ও পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণ বিনা টাকায় চলিতে পারিবে না। আর, সেজন্য যদি তাহাকে টাকা অর্জ্জন করিতে হয়, তবে হয়ত আবশ্যক সময়ে অবসর পাইবে না। অনন্যকর্ম্মা লোক না হইলে সমাজের কাজে প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারিবে না। কিন্তু টাকা দিয়া অনন্য-কর্ম্মা লোক নিযুক্ত করিলেই যে তাহার নিকট হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাজ পাওয়া যাইবে, এরূপ কোনও কথা নাই। যাহার যথেষ্ট অবসর আছে, সে-ই যে সকল সময় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাজ করিতে পারে, তাহা বলা যায় না। সংসারে সর্ব্বদা দেখিতে পাই, নানা কাজে লিপ্ত থাকিয়াও এক জন যে পরিমাণ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক অবসর-প্রাপ্ত ব্যক্তিও তাহার শতাংশের একাংশ করিতে পারে না। গ্লাডষ্টোনের সঙ্গে তাঁহার সমসাময়িক নানা লোকের তুলনা করিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। অনুসন্ধান করিলে আমাদের মধ্যেও ইহার বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। শুধু অবসর থাকিলেই হয় না, কর্ম্ম করিবার আকাঙ্ক্ষা ও শক্তি সর্ব্বোপরি আবশ্যক। যাহারা কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন অলস প্রকৃতির লোক, তাহাদের কথা গণনার মধ্যে আনিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু সাধারণ কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকিলেই যথেষ্ট নয়। একটা উচ্চদরের নিষ্ঠা, অনুরাগ ও আত্মত্যাগের ভাব থাকা আবশ্যক। যাহার তাহা আছে, সে অল্প অবসরের মধ্যেও বহু কাজ—এবং ভাল করিয়াই—করিতে সমর্থ হয়। আর তাহা না থাকিলে অনেক অবসর পাইয়াও অতি অল্পই করিতে পারে, তাহাও ভাল করিয়া পারে না। শুধু অর্থ দিয়া এরূপ চরিত্র

ক্রয় করা যায় না, অনুমানও যায় না। একমাত্র জীবন্ত ব্রহ্মানুরাগ, ব্রহ্মপ্রেমে আত্মবিসর্জ্জন হইতেই ইহা জন্মিতে পারে। আমাদের মধ্যে এরূপ লোক কেন যথেষ্ট পরিমাণে হয় না, এবং কি প্রকারে হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। এখন কথা হইতে পারে যে, এরূপ লোক ত আমরা ইচ্ছা করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি না, তবে কি তাহার অপেক্ষায় আমরা কাজ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিব? কাজ নিশ্চয়ই বন্ধ করিতে হইবে না, কিন্তু যাহাতে উহা সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয় তাহা ত দেখিতে হইবে। উপযুক্ত লোক চাই-ই। ইচ্ছা করিলেই এরূপ লোক পাওয়া যায় না সত্য। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। এরূপ লোকের জন্ম যে আমাদের উপর কিছুমাত্র নির্ভর করে না, তাহা বলা যায় না। আমরা যেরূপ শ্রেণীর লোক পাইবার জন্য চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা করি অনেক পরিমাণে সেই শ্রেণীর লোকই আমাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিবে। আমাদের মধ্যে এরূপ লোক যাহাতে জন্মিতে পারে, তাহার অনুকূল অবস্থা আনয়ন বহু পরিমাণে আমাদের উপর নির্ভর করে। আমরা যদি যথার্থই আমাদের মধ্যে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, ব্রহ্মানুগত জীবন লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হই, তাহার জন্য আকুল প্রার্থনা ও সরল মন প্রাণে যথাসাধ্য চেষ্টা যত্ন করি, তবে নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে এমন ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, যাহাতে সমস্ত ক্ষুদ্র বিষয়াসক্তি আপনিই দগ্ধ হইয়া যাইবে, ত্যাগের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য উদ্ভাসিত হইবে। বিষয়কে, অর্থ মান বিত্তকেই, যদি আমরা প্রধান স্থানে রাখি, তবে আমাদের মধ্যে কোনও ক্রমেই ত্যাগের ভাব জন্মিতে ও বর্দ্ধিত হইতে পারিবে না। একটু সামান্য অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইব, আমরা কাহাকে প্রধান স্থানে রাখিয়া চলিতেছি। আমাদের মধ্য হইতেও অধিক টাকা কেন পাইতেছি না, তাহার কারণটাও একবার ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। টাকা যে আমরা শুধু অধিক উপার্জ্জনই করিতেছি তাহা নহে, ব্যয়ও অনেক বেশীই করিতেছি। অথচ ধর্ম্মার্থে দান, সমাজের কাজে যথোচিত অর্থপ্রদান, সেই অনুপাতে কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় নাই, বরং হ্রাসই পাইয়াছে। শারীরিক সুখ সুবিধা আরামের জন্য, বিলাস ব্যসন আমোদ প্রমোদের জন্য, মান প্রতিপত্তি বর্দ্ধনের জন্য, অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে অতি অল্প লোকেই দ্বিধা করিতেছে, যতকিছু অর্থাভাব সমাজে কিছু দেওয়ার বেলায়। এরূপ কেন হয়, তাহা কি আমরা ভাবিয়া থাকি? না, তাহা দূর করিবার জন্য কোনও উপায় অবলম্বন করি? সংসারের কত অসার গল্প গুজবে বহুমূল্য সময় নষ্ট করিতে অধিকাংশই কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে, যত সময়াভাব সমাজের কাজে। কথায় বলে "আছে গরু না বহে হাল, তার দুঃখ চিরকাল।" আমাদের সেই দশা ঘটিয়াছে। সুতরাং কিছুতেই আমাদের দুঃখ দৈন্য ঘুচিতেছে না। বাস্তবিক যদি আমাদের যথাশক্তি দিবার ও করিবার প্রবৃত্তি থাকিত, তাহা হইলে কখনও এরূপ অর্থাভাব ও লোকাভাব ঘটিত না। আর, সামান্য যাহা কিছু আছে তাহার দ্বারাও ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী এবং ভাল কাজ হইত। অনেক থাকিয়াও যে আমাদের কিছু নাই, প্রাচুর্য্যের মধ্যেও যে আমাদের অভাব কিছুতেই ঘুচিতেছে না, তাহার একমাত্র কারণ আমাদের মধ্যে ত্যাগ নাই, ধর্ম্মে অনুরাগ নাই। অনুরাগ থাকিলে ত্যাগ আপনা হইতে আসে। আমরা এই মূল কথাটা ধরিতে না পারিয়া নানা বাহিরের উপায় অবলম্বন করিতে যাইয়া কেবলই পদে পদে ব্যর্থকাম হইতেছি। আমাদের কাজের মধ্যে যে যথোচিত বুদ্ধি বিচার চিন্তা অপেক্ষা ভাবেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ব্যর্থতার একটা কারণ, এই কথাও ভুলিলে চলিবে না। একটু গভীর ভাবে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইব, আমাদের দৃষ্টিটা এখনও বাহিরের প্রদর্শনের দিকেই আবদ্ধ হইয়া আছে, প্রকৃত কাজের দিকে যায় নাই। তাই আমরা ক্ষণিক কৃত্রিম উপায়ের পশ্চাতেই ছুটিতেছি, প্রতীকারের প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করিতেছি না। আমরা সকলে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখি, আমাদের প্রকৃত অভাব কোথায়, কেন এমন হইতেছে এবং কি প্রকারেই বা তাহা দূর করা যাইতে পারে, আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে কি করিতে হইবে। তাহা হইলে যে অল্পদিনের মধ্যেই এই অবস্থা বিদূরিত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। করুণাময় পিতা আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন এবং সমগ্র মন প্রাণের সহিত সকল বিষয়ে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে, জীবনে তাঁহার ইচ্ছাকে সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে সমর্থ করুন। আমরা সকলে সর্ব্বোপরি তাঁহারই হই।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক-পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক-পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব নিম্ন লিখিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে:—

১লা জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে) বুধবার—সায়ংকালে বক্তৃতা। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম "অনাগতের আহ্বান" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি আরাধনাসাধনকেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অন্যান্য বক্তাগণ উপস্থিত না থাকাতে সভাপতি মহাশয় একটু বিস্তারিত ভাবে বক্তৃতা করিয়া সভা ভঙ্গ করেন।

২রা জ্যৈষ্ঠ (১৬ই মে) বৃহস্পতিবার—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দিন—প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য" বিষয়ে যে উপদেশ প্রদান করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

ব্রাহ্মসমাজের শতবর্ষের ইতিহাসে ঈশ্বরের করুণা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত। রামমোহন হইতে দেবেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ হইতে কেশবচন্দ্র, এবং কেশবচন্দ্র হইতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যে ভগবানের মঙ্গল অভিপ্রায় ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, কিন্তু ভগবানের মঙ্গল ধারায় ক্রমভঙ্গ ঘটে নাই। কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারই কার্য্য পূর্ণতররূপে সমাধা করিয়াছিলেন। তদ্রূপ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কেশবচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যই রক্ষা এবং পূর্ণ করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পূর্ব্বাচার্য্যগণের সাধনা ও

কার্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের স্কন্ধে সেই কার্য্যভার আসিয়া পড়িয়াছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে উদার আধ্যাত্মিক সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের আদর্শ জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যাহাতে ভাব ও ভক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে তাহারই সাধনের গুরুতর কার্য্য অর্পিত হইয়াছে। রামমোহন জ্ঞানে ধরিলেন, মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দ ভাবে মাতাইলেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম সমন্বয়ের বৃহৎ আদর্শ সাধনজগতে ব্যাপ্ত করিবার সময় আসিয়াছে। ভগবান সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে এই গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ উদার, সর্ব্বতোমুখীন ও জীবনব্যাপী। ইহার সাধনের তিনটী ক্ষেত্র—ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার ও সমাজ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রথম হইতেই ব্যক্তিগত জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মসাধনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্মের মহৎ আদর্শ দেশের লোকের সম্মুখে ধরিয়াছেন। জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, বিবেকের উজ্জ্বলতা, মানবের সেবা এবং সর্ব্বোপরি ভগবৎভক্তি, ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবনের এই পূর্ণ আদর্শ। ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল জ্ঞানীদের জন্য নয়, ইহা সকল শ্রেণীর লোকের জন্য; কিন্তু জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব পতিত হইলেই জ্ঞানের জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিবে। সত্যানুসন্ধান এবং জ্ঞানচর্চ্চা ব্রাহ্মজীবনের লক্ষ্য; 'আরও জ্ঞান', ইহাই ব্রাহ্মজীবনের মন্ত্র। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত ব্রাহ্মজীবনের আদর্শ প্রেমে বিশালতা। মানবমাত্রই ভগবানের সন্তান, সুতরাং আমাদের ভাই; এখানে দেশ জাতি বর্ণের পার্থক্য নাই। সমুদয় মানবমণ্ডলী এক পরিবার। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই মহৎ আদর্শ সাধন ও প্রচার করিয়াছিলেন। সমগ্র মানবজাতির সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইতে হইবে, আমাদের প্রেম কোথাও বাধা পাইবে না। তাহা দেশ জাতি ও বর্ণের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বে ব্যাপ্ত হইবে।

তৃতীয়তঃ, ব্রাহ্মজীবনের লক্ষণ বিবেকের তীক্ষ্ণতা। কেবল জ্ঞান ও ভাবেই ধর্ম্ম পর্য্যবসিত হইবে না। ধর্ম্মের একটি প্রধান কার্য্য বিবেককে তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল করা। বিবেকের শিক্ষা ও ও চর্চ্চা আবশ্যক। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে বিবেক ম্লান হইয়া যাইতে পারে। একজন বা একজাতি যাহাকে ঘোর অন্যায় মনে করিতেছে, অপর ব্যক্তি বা জাতি অসঙ্কোচে তাহা করিতেছে। এই জন্য অনেক চিন্তাশীল ধার্ম্মিক লোক বিবেককে যথেষ্ট মনে করেন নাই। কিন্তু পরিণামে বিবেক ভিন্ন ব্যক্তিগত জীবনে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের অন্য উপায়ও নাই। তবে, সেই বিবেকের শিক্ষা ও উন্নতি সম্ভবপর ও আবশ্যক। সাধন ও চর্চ্চার দ্বারা বিবেক উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠুক। ব্রাহ্মধর্ম্ম নীতিপ্রধান ধর্ম্ম। বিবেকের আদেশে ব্রাহ্মগণ বহুক্লেশ ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন। কত ব্রাহ্ম বিবেকের অনুরোধে ধন মান, আত্মীয় স্বজন, পিতা মাতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিবেকের প্রাধান্য ঘোষণা করিয়া ভারতে এক নব আদর্শ আনয়ন করিয়াছেন।

"কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা নির্ভয়ে করিব তাহা,
যায় যাক, থাকে থাক, ধন প্রাণ মানরে।"

ইহাই ব্রাহ্মসমাজের বাণী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তিগত জীবনে এই আদর্শ রক্ষা করিতে হইবে।

তৎপরে মানবের সেবা। এখন দেশমধ্যে সেবার ভাব বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। কিন্তু প্রথমে ব্রাহ্মসমাজই এই আদর্শ আনয়ন করেন। ধর্ম্ম মত ও ক্রিয়াকাণ্ডে আবদ্ধ ছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বলিলেন, মানবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহারই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, 'তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।' পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ জীবন ও উপদেশের দ্বারা এই আদর্শ প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মানবের সেবা ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি পবিত্র সাধন। অনুগ্রহের ভাবে নয়, দয়া করিয়া নয়, প্রেমে পূর্ণ হইয়া, স্বীয় আত্মার কল্যাণের জন্য, ভগবৎপ্রীতির জন্য, সেবা ও সৎকার্য্য করিবে; ইহাই ব্যক্তিগত ব্রাহ্ম জীবনের লক্ষ্য।

সর্ব্বোপরি ভগবদ্ভক্তি। মানবজীবনের গৌরব ও মুকুট ঈশ্বরপ্রেম। যদি গভীর জ্ঞান থাকে, অনেক কাজ করি, আর ঈশ্বরে ভক্তি না পাই, তাহা হইলে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ হারাইলাম।

"কি সুখে জীবনে মম নাথ দয়াময় হে।
যদি চরণ-সরোজে পরাণ-মধুপ চিরমগন না রয় হে।"

"ইহ চেদবেদীৎ অথ সত্য মস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।"

'যদি ভগবানকে না জানিলাম, তাঁহাকে ভাল না বাসিতে পারিলাম, তাহা হইলে 'মহতী বিনষ্টি।" ব্রাহ্ম জীবনের প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ ভগবৎভক্তি। ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কার্য্য ঈশ্বরোপাসনাপ্রতিষ্ঠা। দেশে জ্ঞান বিস্তার হইতেছে, সেবার ভাবও জাগিতেছে; কিন্তু ইহাতেই ব্রাহ্মসমাজের কাজ শেষ হইবে না; ব্রাহ্মসমাজকে সরস, জীবন্ত ভক্তির ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ব্যক্তিগত জীবনে গভীর, মধুর, উচ্ছ্বসিত ভক্তি ব্রাহ্মের লভনীয় ও লোভনীয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় কার্য্য পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। এ দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধন ছিল; কিন্তু ধর্ম যে পরিবারে ও সমাজে সাধন করিতে হয় সে ভাব একেবারে অজ্ঞাত না হইলেও অতি বিরল ছিল। পরিবার ও সংসারকে ধর্ম্মের বিরোধীই মনে করা হইয়াছে। গভীর ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে সমাজ ও সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইবার ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘোষণা করিলেন, স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। মানবের গৃহই ধর্ম্মসাধনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। প্রথম হইতেই ব্রাহ্মগণ পরিবারে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। বিশেষতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই আদর্শ দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা-

গণ চাহিয়াছিলেন, স্ত্রী ও পুরুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে একত্র ধর্ম্মসাধন করিবেন। এইজন্য তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছেদের ইহাও একটি কারণ। কিন্তু সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণিগণের চেষ্টা সফল হইয়াছে। দেশমধ্যে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিগত ৫০ বৎসরে দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করিয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক করিবার আছে। শিক্ষা ও স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যে পরিমাণে জ্ঞান বিস্তার হইবে, সেই পরিমাণে ধর্ম্মের গভীরতা আবশ্যক। আদর্শ-গৃহ প্রতিষ্ঠিত করা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য। দুঃখের বিষয়, এখনও দেশে আদর্শ ব্রাহ্মগৃহ কত বিরল!

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের তৃতীয় কার্য্য সমবেত জীবনে ধর্ম্মসাধন অথবা মণ্ডলীগঠন। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। দেশের কাজে, সমাজের কাজে, ধর্ম্মভাব লইয়া যাইতে হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্ম ও সংসারের মধ্যে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এখানে আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িকের মধ্যে রেখা টানা হয় নাই। কি ভাবে কাজ করা হয়, তাহাতেই বৈষয়িকতা ও আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পায়। ভগবৎভক্তিতে মানবের হিতার্থে যে কাজ করা হয়, তাহাই ধর্ম্মকার্য্য। এই ভাবে প্রণোদিত হইয়াই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও নেতৃগণ দেশসেবা, সমাজসেবা, সমাজসংস্কার প্রভৃতি কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। অন্যদের নিকটে ইহা শুষ্ক, বাহিরের কাজ। ব্রাহ্মগণের নিকটে তাহাই ঈশ্বরের সেবা। এই জন্যই আনন্দমোহন বসু কংগ্রেসের সভাপতিরূপে মাদ্রাজে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দ কাঁদিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের এই আদর্শ দেশের সকল কাজেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহা অতি কঠিন কাজ। লোকে এখনও মনে করিতেছে, মিথ্যা প্রবঞ্চনা শঠতা দ্বারা দেশের কল্যাণ হইতে পারে; রাজনৈতিক আন্দোলনে, সমাজসংস্কারে, ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই; ধর্ম্মকে মন্দিরে বা গৃহকোণে অথবা কথায় আবদ্ধ রাখিয়া দেশের ও দশের কাজ চলিতে পারে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজকে দৃঢ়তার সহিত বলিতে হইবে—'Righteousness exalteth a nation.' ধর্ম্ম ছাড়িয়া দেশ বড় হয় না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শেষ হয় নাই। ভগবান সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে বৃহৎ কার্য্যভার দিয়াছেন। ভারতে ও জগতে ধর্ম্মের এই বৃহৎ আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভগবৎপ্রদত্ত কার্য্য। আজ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্মদিনে আমরা এই আদর্শ স্মরণ করি এবং ইহার সাধনে নূতন করিয়া দেহ মন প্রাণ উৎসর্গ করি।

সায়ংকালে উপাসনা। তাহাতে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব" বিষয়ে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করেন :—

প্রাচীন ঋষি শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "তপসা ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসস্ব"—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। ব্রহ্মকে জানাই জীবনের লক্ষ্য। ব্রহ্মকে কেবল নিজে জানিলে হবে না, যাতে সকলে ব্রহ্মকে জানিতে পারে, যাতে ব্রহ্মের রাজ্য ধরাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, যাতে সত্য প্রেম ও পবিত্রতা হৃদয়ে হৃদয়ে জাগ্রত হয়, এবং মানুষ প্রেমে এক হ'য়ে ব্রহ্মেরই উপাসনা করে, ব্রহ্মকেই জানিতে চায়, তাহা করা প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য। তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে হইবে—উপাসনাই তপস্যা। এই উপাসনা কাহাকে বলে? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একটি মন্ত্রে উপাসনা-তত্ত্ব ব'লে দিয়াছেন, "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"। এক সত্য প্রেম পবিত্রতার আধার নিরাকার পরব্রহ্মে প্রীতি, সাক্ষাৎভাবে প্রেম ভক্তি সহযোগে তাঁর অর্চ্চনা, আর তাঁর প্রিয়কার্য্যসাধন, তাঁর প্রেমপ্রণোদিত হ'য়ে, তাঁহারই প্রিয়কার্য্য-বোধে, মানবের সেবা, লোকশ্রেয়ঃসাধন,—ইহাই উপাসনা। পূর্ব্বাচার্য্যগণ "ঈশ্বরকে ভাল বাস" ও "প্রতিবেশীকে আপনার ন্যায় ভাল বাস", অথবা "নামে রুচি" ও "জীবে দয়া" এই ভাবে এই তত্ত্ব ব'লে গিয়াছেন। কিন্তু এই যে "প্রতিবেশীকে আপনার ন্যায় ভাল বাস" এই যে "জীবে দয়া", ইহা উপাসনার অঙ্গ ব'লে বলেন নাই,—ঈশ্বরে প্রীতি আর মানবে প্রীতি, মানবের সেবা, এ যেন দুইটি কার্য্য। ইহাদের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যোগ রয়েছে, উহা যে একই রজ্জুর দুইটি দিক মাত্র, তাহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই প্রথম ব'লে গিয়াছেন। ঈশ্বরে প্রীতি কর, আর মানবে প্রেম—মানবের সেবা—কর, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য ব'লে; সংসারধর্ম্ম সাধন কর, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য ব'লে; লোকের দুঃখ বিমোচন কর, ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য ব'লে; দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি সাধন কর, মানবকে সকল প্রকার বন্ধন হ'তে মুক্ত কর, ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য ব'লে; এই যে মহা উপাসনার আদর্শ মহর্ষিই এক কথায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, এই মন্ত্রেই তপস্যা করেছিলেন এবং মানবমণ্ডলীকে এই তপস্যায় নিযুক্ত হ'তেই সকলকে আহ্বান করেছিলেন। তাঁর প্রিয়কার্য্যসাধন সর্ব্বাঙ্গীণ ও সর্ব্বতোমুখীন ছিল। ঈশ্বরে চিত্ত রেখে তাঁরই প্রীতি-প্রেরণায়, তাঁরই প্রিয়-কার্য্যবোধে, তিনি মানবের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণচিন্তায় ও কল্যাণ-চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন। মানবের অশিক্ষা কুশিক্ষা দূর করা, দুঃখ দারিদ্র্য দূর করা, সমাজের দুর্নীতি কুসংস্কার দূর করা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা, সর্ব্ব বিষয়ে মানব আত্মাকে মুক্তির পথে লইয়া যাওয়া, তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও ঐ মন্ত্রেই তপস্যা করেছিলেন; কিন্তু প্রিয়কার্য্য-সাধনকে তিনি একটু যেন সঙ্কীর্ণ করেছিলেন। লোকের দুঃখ দৈন্য দূর করা, জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকে ব্রহ্মের চরণে আনা, ইহা তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তিনি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে এবং তাঁহার অনেক বন্ধু বান্ধব, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারেও নিযুক্ত ছিলেন। নিজে ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সম্পাদক রূপে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন; কিন্তু সমাজসংস্কার, রাজ-নৈতিক উন্নতি-চেষ্টা তিনি ধর্ম্ম-সমাজের বাহ্যের—প্রিয়কার্য্যসাধনের—মধ্যে আনয়ন করেন

নাই। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রিয়কার্য্যসাধনকে আরও বিস্তৃতভাবে দেখিলেন—সমাজসংস্কার, জাতিভেদ দূর করা, বাল্যবিবাহ রহিত করা, ব্রাহ্মণেতর জাতির দ্বারা আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করান প্রভৃতি সমাজসংস্কারগুলিকে, প্রিয়কার্য্যসাধনের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এই জন্যই গুরু ও শিষ্যে, পিতা ও পুত্রে, মতভেদ হইল; ব্রাহ্মনন্দের অনুরাগী ব্রাহ্মগণ আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। এখানেও উপাসনাসাধনই তপস্যা রহিল। ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্য্যসাধনই উপাসনা; প্রীতি ব্যতীত প্রিয়কার্য্যসাধন হয় না। ঈশ্বর-প্রেমে মগ্ন হ'য়ে তাঁর প্রিয়কার্য্য-বোধে মানবের সেবা কর। এখানেও সমাজসংস্কার প্রিয়কার্য্য-সাধনের অন্তর্ভুক্ত হলো বটে, প্রিয়কার্য্যসাধনের প্রসার বর্দ্ধিত হলো বটে, কিন্তু ব্রহ্মানন্দও ঠিক রামমোহনের উদার আদর্শ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিলেন না। যদিও ব্যক্তিগত ভাবে তিনি ও তাঁহার পারিষদবর্গ রাজনীতিচর্চ্চা সময় সময় করিতেন—বিশেষতঃ তিনি ইংলণ্ডে এ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন—তথাপি ব্রাহ্মধর্ম্মসাধনের, প্রিয়কার্য্যের, অবশ্য করণীয় অঙ্গরূপে রাজনীতিক চর্চ্চাকে তিনি গ্রহণ করেন নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্মের অধিকার মানবজীবনের প্রত্যেক বিভাগে। আমার খাওয়া পরা, পরিবারপ্রতিপালন, তাঁর প্রিয়কার্য্য-বোধে করিতে হইবে। লোকের দুঃখনিবারণ, সুশিক্ষা বিস্তার, রোগীর সেবা, সমাজের দুর্নীতি কুসংস্কার দূর করা, রাজনীতিক উন্নতি সাধন করা, মানবের মনুষ্যত্ব ফুটিয়ে তোলা, সর্ব্ব বিষয়ে মানবাত্মার স্বাধীনতার সুযোগ দেওয়া, সবই তাঁর প্রিয়কার্য্যের অন্তর্গত। রাজনীতিকেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উন্নীত ক'রে তুলিলেন, প্রিয় কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। অবশ্য কে কোন ভাবে রাজনীতি চর্চ্চা করিবে, কে নরমপন্থী হবে, কে চরমপন্থী হবে, তাহা সমাজ নির্দ্দেশ করিবেন না, করিতে পারেন না; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের তপস্যার ভিতরে ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত উপাসনার ভিতরে, রাজনীতিচর্চ্চার, অর্থনীতিচর্চ্চারও স্থান আছে। কিন্তু ঈশ্বরে প্রীতি রাখিয়াই এই প্রিয়কার্য্য সাধন করতে হবে। নতুবা জনহিতকর কার্য্যের ভিতরেও ঝগড়া আসিতে পারে, অপ্রেম আসতে পারে, অসত্য আসিতে পারে। আগে ঈশ্বরপ্রেমে প্রতিষ্ঠা, তারপর ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যবোধে লোকসেবা, সমাজসংস্কার, দেশের উন্নতিসাধন। রাজা রামমোহন রায় যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছিলেন ব্রাহ্মসমাজ সেই মহান্ আদর্শ, সর্ব্বাঙ্গীণ ও সর্ব্বতোমুখীন্ উন্নতির আদর্শকে একটু খর্ব্ব করিয়াছিলেন; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণিগণ প্রিয় কার্য্যের পূর্ণ আদর্শ অনুসরণ করিলেন; প্রিয় কার্য্যকে ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করিলেন; তাই যেমন সমাজ-সংস্কার ধর্ম্ম সংস্কার করতে যাইয়া ব্রাহ্মগণ নির্য্যাতন বরণ ক'রে নিয়েছিলেন, রাজনীতিক স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হ'তে যেয়েও তাঁরা অনেকে নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা মাথায় পাতিয়া লইয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইহা একটি বিশেষত্ব। আজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিনে এই বিশেষত্বটিকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করতে হবে। আমরা যেন আমাদের বিশ্বব্যাপী আদর্শকে, উপাসনার সমগ্রত্বকে, খর্ব্ব ক'রে না ফেলি, কার্য্যক্ষেত্র যেন সঙ্কীর্ণ না করি, তাহা দেখিতে হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় বিশেষত্ব প্রত্যেক মানুষের ভিতরে যে ব্রহ্ম রয়েছেন, প্রত্যেক মানুষের প্রাণে যে অনু-প্রাণনা জাগ্রত হ'তে পারে, প্রত্যেক মানুষই যে সমাজগঠনে, ধর্ম্ম-সমাজপরিচালনে আপনার হৃদয় মন বিচার বুদ্ধি দিয়া সহায়তা করিতে পারে, প্রত্যেক মানুষেরই যে ধর্ম্ম-সমাজেও অধিকার আছে, তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজই বিশেষ ভাবে স্বীকার করিয়াছেন, এবং "নর নারী সাধারণের সমান অধিকার" এই মহাবাণী বজ্রনিনাদে ধ্বনিত করিয়া সকলকে সমাজগঠনে আপনার শক্তি প্রয়োগ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ই মানবের সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন; প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে ব্রহ্ম রহিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষ যে সেই ব্রহ্মের আদেশ শুনিয়াই চলিবে, এবং মানুষ পরস্পর ব্রহ্মের আদেশেই মিলিত হ'য়ে মণ্ডলী গঠন করবে, ধরাতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করবে, এ কল্পনা রামমোহন রায়ই করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি তাহা আরও স্পষ্টভাবে বলিলেন। সেই দিন কি শুভদিন, যে দিন মহর্ষি বেদের অভ্রান্ততা অস্বীকার করিয়া, মানবের চিত্তের বিশুদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত ধর্ম্মবুদ্ধিকেই ধর্ম্মের ভিত্তি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" গায়ত্রীর এই মহাবাক্য তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলেন—প্রত্যেক মানবের হৃদয়ে ব্রহ্ম জীবন্ত জাগ্রত ভাবে বিরাজিত থাকিয়া বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন, তিনিই মানবকে পরিচালিত করেন। মানুষ গুরুবাক্য কিম্বা শাস্ত্রবাক্য শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনিবে বটে, কিন্তু তাহাই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবে না; হৃদয়ে ঈশ্বর বিরাজিত, তিনিই কথা বলেন প্রাণে; তিনিই বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। জ্ঞানো-জ্জ্বলিত ধর্ম-বুদ্ধিই তোমার চিন্তা বাক্য ভাব ও কার্য্যের নিয়ামক। প্রত্যেক মানুষই স্বাধীন, কারণ ঈশ্বরের অধীন; সুতরাং কেবল যে তাঁর নিজের ধর্ম্মজীবনগঠনেই সে ঈশ্বরের আদেশ লইয়া স্বাধীন ভাবে চলিবে, তা নয়, ধর্ম্মমণ্ডলী গঠনে, ধরাতে প্রেম-রাজ্য, ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপনেও প্রত্যেক মানবের অধিকার আছে, কিছু করবার আছে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই কথাটা আরও উজ্জ্বল ভাবে মানবের সম্মুখে ধারণ করিলেন। প্রত্যেকের অন্তরেই ঈশ্বর কথা বলেন; বিবেক তাঁহারই বাণী; মানুষ তুমি আর কারও কথা শুনিও না, বিবেক অনুসারে চল; বিবেক যখন ঈশ্বরে প্রীতি সাধন দ্বারা বিশুদ্ধ হয়, তখন তাহাই আবার ঈশ্বরের বাণীরূপে আসে; ঈশ্বর কেবল প্রাচীন কালে মানবের সঙ্গে কথা বলেন নাই, তিনি এখনও কথা বলেন, তোমার আমার প্রাণেও তিনি কথা বলেন; কেবল কাণ পেতে থাকতে হয়; ঈশ্বরের প্রীতি সাধন ক'রে কাণ পেতে থাকতে হয়; তাঁর ইঙ্গিত আসে, বাণী আসে; তা শু'নে চলতে হয়। Imitation of Christ পুস্তকে পড়েছি "জগতের শিক্ষকগণ, গুরুগণ, এখন নির্ব্বাক হউন, সমস্ত জগৎ, হে ঈশ্বর, তোমার সম্মুখে স্তব্ধ হউক, কেবল তুমিই আমার কাছে কথা

বল।” “এখন যেন মূসা কিম্বা অন্য কেহ আমার কাছে কথা বলিতে না আসেন, এখন কেবল তুমিই আমার সঙ্গে কথা বল।” এই যে প্রত্যেক মানবের প্রাণে ঈশ্বর বিরাজিত, এই যে প্রত্যেক মানবের প্রাণেই ঈশ্বর কথা বলেন, এই যে প্রত্যেক মানুষই স্বাধীন, ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই ব্রাহ্মসমাজ ঘোষণা করিলেন—“নর নারী সাধারণের সমান অধিকার”। মানুষ, তুমি ব্রহ্মসন্তান, তোমার ভিতরে ব্রহ্ম বিরাজিত, ব্রহ্ম তোমার প্রাণে কথা বলিতেছেন, তুমি ছোট নও, ক্ষুদ্র নও, তুমি স্বাধীন—তুমি শ্বেত হও আর কৃষ্ণ হও, ব্রাহ্মণ হও আর শূদ্র হও, ধনী হও আর নির্ধন হও, পণ্ডিত হও আর মূর্খ হও, তুমি ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বর তোমার প্রাণে বাণী প্রেরণ করিতেছেন; তুমি নিজ জীবনে সেই বাণী শু'নে চলিবে। তোমার মনুষ্যত্বের অধিকার আছে; সকল শুভ কর্ম্মে তোমার অধিকার আছে, ধর্ম্মমণ্ডলী গঠনে তোমারও কিছু করিবার, কিছু বলিবার আছে; দেশ শাসনে, সমাজ সংগঠনে তোমার অধিকার আছে; ধরায় স্বর্গরাজ্য স্থাপনে, প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠায়, তোমার অধিকার আছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে আদর্শ, ধর্ম্মের আদর্শ, ঈশ্বর প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্য্যসাধনের আদর্শ দিয়াছেন, তাহা নিজ জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সাধন করতে হবে, মানবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে; সেজন্য মণ্ডলীর প্রয়োজন। সে মণ্ডলীগঠনে, মণ্ডলীর নিয়মপ্রণালীপ্রণয়নে তোমারও অধিকার আছে। প্রত্যেক মানবের বিবেক অনুসারে, ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে চলিবার, ধর্ম্ম সাধন করবার অধিকার ব্রাহ্মসমাজে প্রথম হইতেই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মমণ্ডলী গঠনে, ধর্ম্ম-সমাজ পরিচালন যে প্রত্যেকেরই অধিকার আছে, তাহা পূর্ব্বে স্বীকৃত হয় নাই। কখনও একনেতৃত্ব ছিল, কখনও বহু-নেতৃত্ব ছিল; কিন্তু সর্ব্ব সাধারণের অধিকার এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেই প্রথমে স্বীকৃত হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজই প্রথম হইতে ধর্ম্মসমাজ গঠন ও পরিচালনে গণতন্ত্র-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন—এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই এখানে অধিকার আছে, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ যখন মহর্ষির হাতে আসিল, তখন এক নায়কত্ব ছিল। অল্প কয়েক বৎসর পরেই তাহা বিভক্ত হ'য়ে গেল; তারপর এল বহুনায়কত্বের যুগ, প্রচারকদলের হস্তে নেতৃত্ব যেয়ে পড়িল। ১২ বৎসর যেতে না না যেতেই আবার মতদ্বৈধ হলো, আবার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দুই দলে বিভক্ত হ'য়ে পড়িল। কিন্তু সেই ১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যখন স্থাপিত হইল, তখন 'নর নারী সাধারণের সমান অধিকার' এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ যে সমাজগঠনে সকলের অধিকার প্রদান করলেন, মানুষকে মানুষের অধিকার দিলেন—নর এল, নারী এল, বৃদ্ধ এলেন, যুবক এলেন, সকলে সমবেত হ'য়ে সমাজমণ্ডলী গঠন করতে প্রবৃত্ত হলেন। আজ ৫১ বৎসর পূর্ণ হলো; এখানে মতদ্বৈধতা এসেছে, সময় সময় কলহও হয়েছে, মনান্তরও হয়েছে—কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তবুও অখণ্ড থাকিয়া মানব-কল্যাণসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে। মানুষের ভিতরে ঈশ্বর; মানুষকে বিশ্বাস করতে হয়; মানুষকে বিশ্বাস করলে পরিণামে শুভই উৎপন্ন হয়। এই ৫১ বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রত্যেক মানুষের হৃদয় নিহিত ঈশ্বরের বাণীতে নির্ভর করিয়া যে মণ্ডলী গঠন ও মণ্ডলী পরিচালন করিয়াছেন, তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই। প্রত্যেকেই অনুভব করিতেছে এ সমাজ আমারই, এখানে আমারও কিছু বলিবার আছে, কিছু করিবার আছে। আজ আমার কথা সমাজ শুনিল না। যদি আমি সত্য যাহা, কল্যাণকর যাহা, তাহা বলি, তবে কালে আমার কথা শুনিবে; কারণ, ভগবান সকলের প্রাণে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। তবে এখানেও যে বিপদ নাই তাহা নহে। বিপদ প্রত্যেক মানুষের যে অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে সেখানে নয়; কিন্তু প্রত্যেক মানুষ সেই অধিকার কতটুকু পরিচালনা করবে, কি ভাবে পরিচালনা করিবে, তাহার উপর সমাজের মঙ্গল অমঙ্গল নির্ভর করে। সেখানে যখন মানুষ ভুল করে—তখন বিপদের সম্ভাবনা হয়। মানুষের যে অধিকার আছে, সে অধিকার অন্যের খর্ব্ব করিবার শক্তি নাই, কিন্তু নিজেরই দশদিক বিবেচনা করিয়া অনেক সময় অধিকার খর্ব্ব করার প্রয়োজন হয়। আমার বাড়ীতে অন্য কাহাকেও আসতে না দিবার অধিকার আমার আছে, ভিখারী এলে তাড়িয়ে দিবার অধিকার আছে, ঝড় ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে রাস্তার পথিক আশ্রয় চাইলে দরজা বন্ধ করবার আমার অধিকার আছে; কিন্তু এ অধিকার ঈশ্বরেরই বাণীতে খর্ব্ব করতে হয়। আমার ধন আছে—চারিদিকে দুর্ভিক্ষে লোক মারা যায়—আমার ধন আছে কাহাকেও দিব না, এ অধিকার আমার আছে; কিন্তু তবুও মনুষ্যত্ব বলে, প্রাণে নিহিত দেবতা বলেন, না, ঐ অর্থ তোমাকে পরহিতের জন্য, লোকের প্রাণ বাঁচাবার জন্য বণ্টন ক'রে দিতে হবে। সমাজগঠনে সকলেরই এক ভোট, সাধুভক্ত যারা, পণ্ডিত জ্ঞানী যারা, তাহাদেরও যেরূপ অধিকার, আমার মত মূর্খ তমসাচ্ছন্ন যে তারও এক ভোট, সেই অধিকার। কিন্তু আমাকে আমার মত সংযত করতে হবে—জ্ঞানের কথা, ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতার কথা, শুনতে হবে; আপনার অধিকার তাঁহাদের কথা শুনে সময় সময় খর্ব্ব করতে হবে। সংসারে, পরিবারে এইরূপ অধিকার খর্ব্বের দৃষ্টান্ত, ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্মবিলোপের দৃষ্টান্ত, বিরল নহে। এই আত্মবিলোপ, অধিকার খর্ব্ব, যে পরিবারে নাই, সে পরিবার ভেঙ্গে যায়, সেখানে অশান্তি আসে। ধর্ম্মসমাজেও অধিকার পেয়েও যদি সংযম মানুষ না শেখে, কোথায় অধিকার খর্ব্ব করতে হবে তাহা না জানে, তবেই অনর্থ উপস্থিত হয়। যে ধর্ম্মের এই যে প্রথম অঙ্গ—ঈশ্বরে প্রীতিসাধন—তাহাতে নিযুক্ত না হয়, যে ঈশ্বরের নামকীর্ত্তন, তাঁতে প্রেম অর্পণ, না করে, তাঁর চরণে ব'সে আত্মসমর্পণ না করে, সে অধিকার খর্ব্বের কি মাধুর্য্য, কি সৌন্দর্য্য, তাহা অনুভব করতে পারে না। সমাজের কল্যাণের জন্যও অধিকারখর্ব্বকে সে দুর্ব্বলতা, ভীরুতা মনে করে। কিন্তু ঈশ্বরে যাঁর প্রীতি অর্পিত হয়েছে, সে জানে আমার অধিকারের সীমা কোথায়, সে জানে কখন আমাকে আত্মবিলোপ করতে হবে; সে জানে কোন্ স্থানে উঠবার আমার সামর্থ্যে কুলায় না। বর্ত্তমান সময়ে এই পরাধীন

দেশেও রাষ্ট্রনীতিতে কতকগুলি অধিকার সকলেরই স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক ভোটারই কাউন্সিলের মেম্বর হবার অধিকারী; কিন্তু সে অধিকার অবস্থা বুঝে সকলে ভোগ করতে অগ্রসর হয় না। প্রত্যেকেই হাইকোর্টের জজ হ'তে পারে, জাতি বর্ণের বাধা নাই; কিন্তু কার্য্যতঃ প্রত্যেকেই জজ হ'তে পারে না; তার আকাঙ্ক্ষা ও অধিকার খর্ব্ব ক'রে চলতে হয়। অধিকার আছে—সকলের কাছেই দ্বার উন্মুক্ত—কিন্তু সকলে সকল কাজ করবে না; আমার অধিকার আর অপরের অধিকারে সংঘর্ষ না হয়, তাহা দেখতে হবে। আমি আমার শক্তি অতিক্রম ক'রে অধিকার বিস্তার করতে না যাই, এই দেখতে হবে। সমাজ—মণ্ডলীর কল্যাণ—উপেক্ষা ক'রে আমার অধিকার বিস্তার না করি, তাহা ভেবে দেখতে হবে। কিন্তু আমার যাহা দিবার আছে, যাহা করিবার আছে, যাহা বলিবার আছে—তাহাদ্বারা সমাজের সেবা করতে হবে। এই যে অধিকারের সংঘর্ষ, এই যে অধিকারের সীমালঙ্ঘন, এই যে আবশ্যকবোধে অধিকারের খর্ব্বতা, এই যে অধিকারত্যাগ, আত্মবিলোপের কথা বলা হলো, এই দিকে দৃষ্টি পড়ে তখনই যখন মানুষ ভগবানে প্রীতি রাখে, তাঁর চরণে দৃষ্টি রাখে, তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করে। তিনি বাস্তবিক প্রাণে এসে যখন আদেশ করেন,—আপনার খেয়ালে নয়, তাঁহার আদেশেই যখন চলি,—তখনই প্রকৃত ভাবে অধিকারের পরিচালনা করা হয়। তাঁকে ভুলিয়া, প্রীতিসাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া, অধিকার পরিচালনা করতে যাওয়াতেই সময়ে সময়ে সমাজে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে—প্রেমের পরিবর্ত্তে অপ্রেমের সৃষ্টি হইয়াছে, ধর্ম্মের নামে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে—সমাজের গতি রুদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু তবুও বলি, মানুষ মোটের উপর অবিশ্বাসের কাজ করে নাই। তবুও বলি, মানবের বুদ্ধিতে, ঈশ্বরপ্রদত্ত মার্জ্জিত বুদ্ধিতে, সুনির্ম্মল বিবেকে, বিশ্বাস কর; ভয় নাই, সমাজ-তরণী নির্ভয়ে বিপদসঙ্কুল তরঙ্গবিক্ষোভিত সমুদ্রবক্ষ পার হ'য়ে যাবে।

এই যে "নর নারী সাধারণের সমান অধিকার" ইহার আর একটা দিক্ আছে। সেই দিকে লক্ষ্য না রেখে কেবল অধিকার পরিচালনা করতে গেলেই অনর্থ উপস্থিত হ'তে পারে। অপর দিকটা এই—যাহা ধর্ম্মসমাজেই বিশেষ ভাবে খাটে—আমার ধর্ম্মসমাজগঠনে অধিকার আছে বটে, আমার কথার, আমার ভোটের, মূল্য আছে বটে; কিন্তু ধর্ম্মসমাজগঠনে ও পরিচালনে ভোটের অধিকার, কথা বলিবার অধিকার, সর্ব্বোচ্চ অধিকার নহে। তুমি ব্রাহ্ম, তুমি ব্রহ্মোপাসক, তুমি ব্রহ্মের পূজা করতে এসেছ, তুমি ব্রহ্মোপাসনা—তাঁর প্রীতি ও প্রিয়কার্য্যসাধন—ধরায় স্থাপন করতে এসেছ। এ রাজনীতিক রাজ্য নহে, এ যে ধর্ম্মরাজ্য—প্রেমরাজ্যস্থাপন—এখানে অনেক রকম তোমার অধিকার আছে, কিন্তু এখানে তোমার সর্ব্বোচ্চ অধিকার সেবার অধিকার। কে কতটা আপনার মত চালাতে পারে, সেটা এখানে দেখতে হবে না; এখানে দেখতে হবে, কে কতটা আপনাকে বিলোপ ক'রে, ঈশ্বরের সেবা, সমাজের সেবা ক'রে যেতে পারে। হয়ত সমাজ তোমার কাজের মূল্য দিল না, তোমার যে অধিকার প্রাপ্য তাহাতে বঞ্চিত করল, কিন্তু সেদিকে তোমার লক্ষ্য রাখিলে চলবে না; তোমাকে ঈশ্বরের প্রেমপ্রেরণায়, তাঁর প্রিয়কার্য্য-বোধে সেবা ক'রে যেতে হবে—অপমান সহিয়া, লাঞ্ছনার বোঝা বহিয়া, লোকের গঞ্জনা মাথায় করিয়া, অত্যাচার নির্য্যাতন সহিয়া সেবা ক'রে যেতে হবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রথমাবধিই আর একটা কথা বলিয়াছেন—প্রত্যেক ব্রাহ্মই প্রচারক। ব্রহ্ম যে সকলের প্রাণে থেকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন, সকলকে সাক্ষাৎভাবে অনুপ্রাণিত করিতেছেন, সকলের প্রাণে—কেবল প্রাচীন ঋষিদের প্রাণে নয়, এখনও সকলের প্রাণে—স্পষ্ট কথা বলেন, এই মহাসত্য হইতেই প্রসূত যে বাণী, তার একদিক "নর নারী সাধারণের সমান অধিকার", আর একদিক "প্রত্যেক ব্রাহ্মই প্রচারক।" ব্রাহ্মসমাজ, বিশেষ ভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, সকল প্রকার সেবা ও কর্ম্মের দ্বার নর নারী—উচ্চ বর্ণ, নিম্ন বর্ণ—সকলের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। অস্পৃশ্যতা দূর করিয়াছেন; সার্ব্ববর্ণিক, সার্ব্বজাতিক বিবাহ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; সকল বর্ণের লোককে কমিটিতে, আচার্য্যের পদে, প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; নারীকে সভানেত্রীর পদে, আচার্য্যের পদে উন্নীত করিয়াছেন; বিবাহে এ পর্য্যন্ত নারী সম্পত্তির সমান ছিল, পিতা কিম্বা অভিভাবক নারীকে বরের নিকট সম্পত্তির ন্যায় দান করতেন, বর গ্রহণ করত; নববিধান সমাজেও বরের নিকট কন্যার ভার অর্পণ করা হয়। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ "নর ও নারীকে" সমান ভাবে দেখিয়াছেন; নর নারী পরস্পরকে মনোনীত করিয়া বিবাহ করেন, পিতা কিম্বা অভিভাবক তাহাদিগকে বিবাহার্থে উপস্থিত করেন মাত্র। সর্ব্ব বিষয়ে, অন্ততঃ মতে, 'নর নারী সাধারণের সমান অধিকার" স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু যত প্রকার অধিকার মানুষ লাভ করিয়াছে, সে-সব অধিকার ইচ্ছা ক'রে মানুষ সমাজের মঙ্গলের জন্য, অপরের সুবিধার জন্য, নিজের অযোগ্যতার জন্য, সঙ্কুচিত করতে পারে। ঈশ্বরে প্রীতিসাধন চাই, তাহা হ'লেই কতদূর আমার অধিকারের প্রসার তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু সর্ব্বপ্রধান অধিকার সেবার অধিকার, ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্যবোধে তাঁর প্রেমরাজ্যস্থাপনের সহায় হইবার অধিকার। তাই বলিতেছিলাম, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রথম হইতেই ঘোষণা করিয়াছেন, প্রত্যেক ব্রাহ্মই প্রচারক। প্রচারক ও যাঁরা প্রচারক নহেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক স্থানে যে কল্পিত সীমা-রেখা অঙ্কিত করা হয়,—প্রচারকগণ যেন অন্য একশ্রেণীর লোক, প্রচারক ও অপ্রচারকে যে কেবল পরিমাণে পার্থক্য নয়, প্রকারেও পার্থক্য আছে (not difference in degree but in kind)—এই যে ভ্রান্ত মত তাহা মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। অবশ্য প্রচারকে ও অপ্রচারকে প্রভেদ আছে; প্রচারকে প্রচারকেও প্রভেদ আছে। আবার, অনন্যকর্ম্মা প্রচারকের যে একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহাও আমি অস্বীকার করিতেছি না। তবুও বলিতেছি, প্রত্যেক ব্রহ্মসন্তান প্রচারক—প্রত্যেককেই সেন্ট পলের মত বলা প্রয়োজন, Woe

unto me if I preach not the Gospel—ঈশ্বর যে বাণী আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যদি আমি প্রচার না করি, তবে আমি হতভাগ্য, আমাকে ধিক্। প্রত্যেক মানবের প্রাণেই সাক্ষাৎ ভাবে এবং পরোক্ষ ভাবে ভগবান্ আলোক প্রজ্বলিত করেন; সেই আলোক লুকিয়ে রাখ্‌বার জন্য নয়। তুমি যে সত্য পেয়েছ, তাহা তোমাকে বণ্টন ক'রে দিতে হবে। কত লোক পাপে তাপে জর্জ্জরিত, অত্যাচার অবিচারে প্রপীড়িত, রোগে শোকে দরিদ্রতায় কাতর, কত দুর্নীতি, কত কুসংস্কার, কত ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, কত রক্তপাত, কত ব্যভিচার! তুমি প্রাণে সত্য পেয়েছ, পরিত্রাণের মন্ত্র পেয়েছ, তুমি নূতন আলোক দেখেছ। তুমি কেমন ক'রে নীরবে থাক্‌বে? তোমার প্রাণ কি কাঁদ্‌বে না? তোমার প্রাণে কি লোকসেবার, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য কর্‌বার, তাঁর প্রেমরাজ্যপ্রতিষ্ঠার সহায় হবার ইচ্ছা জাগ্রত হবে না? প্রচার ত সকলেই করে; নানা ভাবে মানুষ আপনার মত প্রচার করে; কেবল বক্তৃতাতে নয়, কেবল পুস্তকপ্রচারে নয়, জীবনের খুঁটিনাটির দ্বারা, জীবনের গতিদ্বারা, লোকের সঙ্গে আচার আচরণ, আলাপ ব্যবহার দ্বারা মানুষ প্রচার করে। প্রত্যেক মানুষ যতই সে ক্ষুদ্র হউক, তারও একটি সঙ্ঘ আছে, একটি গোষ্ঠী আছে, যার সে মধ্যবিন্দু; ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, প্রত্যক্ষে পরোক্ষে তারা তার হাব ভাব, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, অনুকরণ ও অনুসরণ করিতেছে। সুতরাং প্রত্যেক মানুষেরই দায়িত্ব গুরুতর। তুমি ব্রাহ্ম, নূতন সত্য পেয়েছ; সেই সত্য নিজ জীবনে পালন কর্‌বার, ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্য্যসাধন দ্বারা তোমার নিজের উন্নতি কর্‌বার, ঈশ্বরানুগত প্রাণ কর্‌বার জন্য যেমন তুমি দায়ী—সত্যের একটা দায়িত্ব আছে, সে দায়িত্ব গুরুতর, সে দায়িত্ব লঙ্ঘন করা যায় না—তেমনি সেই সত্যের দিকে অন্যকে ডাকিবার জন্যও তুমি দায়ী। সকলেই যে অনন্যকর্ম্মা হ'য়ে ধর্ম্মপ্রচার কর্‌বে তাহা নয়; নানা ভাবে ধর্ম্মপ্রচারের, সত্য-প্রচারের, ব্রহ্মের প্রেমরাজ্যস্থাপনের, সে সহায় হইবে। কর্ম্ম-ক্ষেত্র বিস্তৃত—কত স্থানে যেতে হয়, কত কাজ কর্‌তে হয়, কত লোকের সঙ্গে মিশ্‌তে হয়—মনে থাকে যেন তুমি ব্রাহ্ম, তুমি ব্রহ্মোপাসক, তুমি সত্য ধর্ম্ম, নীতির ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম প্রাণে পেয়েছ; তোমার কার্য্য, তোমার চিন্তা, তোমার ব্যবহার, তোমার আচার আচরণ, তোমার কথাবার্ত্তা, তোমার চাল চলন, এই ধর্ম্মের অনুরূপ হবে; তোমার আমোদ প্রমোদ, তোমার সাজ সজ্জা, তোমার পাঠ ও অধ্যয়ন, এই সত্য প্রেম ও পবিত্রতার ধর্ম্মের অনুরূপ হবে। কেবল তাহা নহে, তোমার শক্তি, তোমার অর্থ, তোমার সময়, যথাসম্ভব ধর্ম্ম-কার্য্যে, ঈশ্বরের আদেশপালনে, ব্যয়িত হইবে। ও কোথায় তুমি যেতেছ? কোন্ পথে চলিতেছ? কিসে অর্থ ব্যয় করিতেছ? কোন্ আমোদে যোগ দিতেছ? সাবধান, ব্রহ্ম দেখিতেছেন, আর কেহ না দেখুক, ব্রহ্ম তোমার প্রাণে থেকে দেখিতেছেন। তুমি সেবা কর্‌তে চাও, ব্রাহ্মসমাজের কাজ কর্‌তে চাও, তাই তুমি আচার্য্য হ'তে এসেছ, কার্য্য নির্ব্বাহক সভা, অধ্যক্ষ সভার সভ্য হ'তে ইচ্ছা করেছ। ভাল কথা, এই ভাবে সেবা কর্‌তে পার। কিন্তু যদি সেরূপ না হয়, যদি এইভাবে সেবা করার সুযোগ তোমাকে সমাজ না দেন, ক্ষতি কি? The world is wide enough for all men to work পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষেরই কাজ কর্‌বার স্থান আছে। অধিকার চাও? অধিকার ত পেয়েছ। কিন্তু সে অধিকার সংযত ক'রে সেবার রাজ্যে গমন কর। ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি ফিরাও; তাঁর চরণে বস; তাঁর নাম গান কর; একাকী নির্জ্জনে তাঁর সাধন কর, দশজনের সঙ্গে তাঁর নাম কীর্ত্তন ও ধ্যান কর, তাঁর প্রীতিপ্রেরণায় তাঁর প্রিয়কার্য্য-সাধনে অগ্রসর হও; দেখ্‌বে, এখানে সংঘর্ষ আস্‌বে না; ভাই ভাই এ কলহ বাঁধিবে না। সব যে তোমরা এক পিতার সন্তান; সকলে যে প্রেমে প্রেমে বাঁধা। প্রীতিসাধন ব্যতীত প্রিয়কার্য্য-সাধন হয় না। এ ধর্ম্ম সমাজ—ধর্ম্মসমাজে সেবাব্রত গ্রহণ কর্‌তে হ'লে আগে ঈশ্বরচরণে বসা চাই, তাঁর নিকট হইতে অনু-প্রাণনা লাভ করা চাই, তাঁর প্রিয়কার্য্য-বোধে সেবাব্রতে ব্রতী হওয়া চাই। এই ভাবে যদি সেবার কার্য্য গ্রহণ কর, তবে যে কার্য্যই কর তাহাই প্রচারকার্য্য হবে, তাহাতেই ব্রহ্মের প্রিয় কার্য্য সাধন হবে। তখন অধিকার লইয়া দ্বন্দ্ব কলহ আসিবে না; মানুষে মানুষে অপ্রেম আসিবে না; ঈশ্বর থাক্‌বেন জীবনের মধ্যবিন্দু, প্রাণের দেবতা। তাঁর নাম ল'য়ে প্রচার, তাঁর নাম নিয়ে সেবা, তাঁরই প্রীতির জন্য কার্য্য।

প্রাণ ব্রহ্মপদে, হস্ত কার্য্যে তাঁর,
এই ভাবে দিন কাটুক আমার।

এই যে মহাবাণী ভক্তিভাজন আচার্য্য উচ্চারণ ক'রে গিয়া-ছিলেন, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ, ইহাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার করেছেন।

আজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিনে আমাদের লক্ষ্য, আমাদের দায়িত্ব, আমাদের কার্য্য অনুভব কর। ঈশ্বরে প্রীতি রেখে প্রত্যেকে আমরা তাঁর প্রিয়কার্য্যে নিযুক্ত হই। তিনি আশীর্ব্বাদ করুন।

প্রচার ব্যবস্থা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৫। এই সব ব্যবস্থা এমন হওয়া আবশ্যক যে, প্রতি বছর কে কোথায় কাজ কর্‌বেন, কার কি ব্যবস্থা হবে, এ নূতন ক'রে আমূল স্থির কর্‌তে না হয়। ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করা যায়, করা উচিত; অবশ্য, উন্নতির পথ খোলা রেখে। কেবল মানুষই মাঝে মাঝে বদলানো দরকার হয়। কোন কেন্দ্রের প্রচারকের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র কত দূর, তাঁর কি কি অবশ্য করণীয় স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট করা যায়; এবং করা থাকলে নূতন লোকের তাতে সাহায্য হয়। প্রত্যেক প্রচারকের সমস্ত বছরের rough প্রোগ্রাম নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া সম্ভব—যেমন, কোন্ মাসে কোথায় যাবেন, কোন্ কোন্ স্থানের উৎসবের সময় সেখানে যাবেন ইত্যাদি। (যেমন, ঢাকা কেন্দ্র হইতে চাটগাঁ, নোয়াখালী, কুমিল্লা ইত্যাদি)।

৬। কোন একটি শিক্ষাপরিষদের অধীনে পাঁচ জায়গায়

পাঁচটি স্কুল থাকলে যেমন হয়, প্রচারসভার সঙ্গে পাঁচটি কেন্দ্রের সম্বন্ধ সেইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিয়মাদি ও কার্য্য-ব্যবস্থাও ঠিক সেইরূপই হবে।

৭। প্রচারকগণকে শিক্ষা শক্তি পদমর্য্যাদায় উন্নত করায় সমাজের নিজের উন্নতি। প্রচারার্থী ২।৩ জনের বেশী হোক আর না হোক, ব্যবস্থা সম্পূর্ণ থাকা আবশ্যক।

সম্বন্ধ রচনা—পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা

সব চেয়ে বড় সমস্যা কমিটি প্রচারক এবং পরিবারগুলির মধ্যে সম্বন্ধ। এ বিষয়ে প্রচারসভার গুরুতর দায়িত্ব আছে। শিক্ষার্থী অবস্থা হ'তেই বিধিপূর্ব্বক প্রচারার্থিগণকে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠগণের সঙ্গে এবং পরিবারগুলির সঙ্গে শ্রদ্ধার ও প্রীতির সূত্রে যুক্ত করতে হবে। শিক্ষার্থিগণকে শিক্ষালাভের জন্যে নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী ব্যতীত ব্যক্তিগতভাবে এক এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে পাঠানো যেতে পারে—কথাবার্ত্তা বলতে, আলাপ করতে। আবার, তাহাদিগের কোন কোন পরিবারে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে নীতিশিক্ষার সহায় বন্ধু শিক্ষকরূপে মিশ্তে দেওয়া যেতে পারে। নিয়মপূর্ব্বক এরূপ করা উচিত।

সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের সঙ্গেও শিক্ষার্থিগণকে যুক্ত করা উচিত। লাইব্রেরী, সমাজের বই, Messenger, তত্ত্ব-কৌমুদী, নীতিবিদ্যালয়, সঙ্গত, তত্ত্ববিদ্যা সভা, উৎসব, অনুষ্ঠান—এ সব বিষয়ে জায়গা প্রস্তুত করা, সাজানো, plan করা, প্রবন্ধ রচনা ও পাঠ, বিতর্কে যোগদান, রিপোর্ট লেখা ইত্যাদি বিবিধ কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার ও পরিচয়ের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। এসবের মধ্য দিয়েই আধ্যাত্মিক সেবার যোগ্যতা এবং অধিকার বিকশিত হয়।

সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

ব্রাহ্মসমাজ।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৯ই মে কাকিনাতে তথাকার ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও ট্রাষ্টী নিষ্ঠাবান ব্রহ্মোপাসক রসিকচন্দ্র গুপ্ত দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

কিছুদিন হইল কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার নিয়োগীর কনিষ্ঠা কন্যা মেনিঞ্জাইটিস রোগে দেড়বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ২৬ মে কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র সাধুখাঁর দ্বিতীয় জামাতা কালীপদ বসাক ২৯ বৎসর বয়সে দুইটি শিশুপুত্র ও পত্নীকে রাখিয়া অতি শোচনীয় অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বিগত ১৭ই মে কলিকাতানগরীতে শ্রীমতী প্রেমলতা রায় মাতা সরসীবালা বসুর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভ-বিবাহ—বিগত ১৮ই মে কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত নির্ম্মলচন্দ্র মল্লিকের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া সান্ত্বনা ও পরলোকগত রজনীকান্ত দের চতুর্থ পুত্র শ্রীমান অমলচন্দ্রের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১৮ই মে কলিকাতা নগরীতে বহরমপুর নিবাসী পরলোকগত শ্যামাচরণ রায়ের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া অমিয়া ও পরলোকগত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান সুধীন্দ্রকুমারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২৪শে মে কলিকাতানগরীতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ হালদারের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া সুজাতা ও পটিয়া নিবাসী শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে কন্যার পিতা সমাজের দেয় চাঁদা সমস্ত শোধ করিয়া দিয়াছেন এবং প্রচার বিভাগে ৫৲, নববিধান ট্রাষ্টফণ্ডে ৫৲ ও সরোজনলিনী স্কুলে বিধবাদের সাহায্যার্থ ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

নামকরণ—বিগত ১৯শে মে চট্টগ্রামে শ্রীযুক্ত ললিত-কুমার রায়ের কন্যার নামকরণ ও অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। কন্যার নাম লীনা রাখা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কন্যার পিতা কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে "তিন টাকা ফণ্ডে" তিন টাকা দান করিয়াছেন। মঙ্গল বিধাতা শিশুকে কল্যাণের পথে বর্দ্ধিত করুন।

দান—শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস পরলোকগত পিতা ব্রজমোহন দাসের প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান প্রতিশ্রুত হইয়াছেন—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার ফণ্ডে ৫৲ টাকা, শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজে ৩৲ টাকা, তেজপুর ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা। এই দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মা চির-শান্তিলাভ করুন।

ছাত্রীদের পরীক্ষার ফল—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাইস্কুল ও অন্যান্য পরীক্ষাতে নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম,—প্রথম বিভাগে—সুপ্রভা দাস, মনোজ্যোৎস্না ভট্টাচার্য্য, শতদলবাসিনী সরকার, আশা গুহ, হেমলতা দাস, মঞ্জীষ্ঠা ঘোষ, শৈলবালা দে, অরুণপ্রভা ভদ্র' বীণাপাণি দাসগুপ্ত, শোভা ঘোষ, প্রমীলাবালা গুপ্ত, লীলাবতী দত্ত। দ্বিতীয় বিভাগে—শোভাময়ী গুপ্ত, রূপপ্রভা নাগ, লীলাবতী সেন গুপ্ত। তৃতীয় বিভাগে—নীহারিকা দাস, মহামায়া সেন।

আই এ—প্রথম বিভাগে—করুণাকণা গুপ্ত (১ম স্থান অধিকার করিয়া), মীরা দে, (৪র্থ স্থান), ললিতা সেন (৬ষ্ঠ স্থান), সুকৃতী দাস (৯ম স্থান), রেণু সেন গুপ্ত, নিরমল সেনগুপ্ত, অশোকা সেনগুপ্ত, সুনীতিপ্রভা নাগ, কমলা সেনগুপ্ত, সুলেখা সেন, সুধাময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দিরা দাসগুপ্ত। দ্বিতীয় বিভাগে—লতিকা দাসগুপ্ত, নবমল্লিকা দত্ত রায়, কিরণবালা দে, প্রীতিময়ী ঘোষ, জ্যোতির্ম্ময়ী গুপ্ত, অণুপ্রভা নাগ, বীণাপাণি রায়, মনীষা সেন, অমিয়া সেনগুপ্ত। তৃতীয় বিভাগে—হিরণ্ময়ী পাল।

আই এস্‌সি—প্রথম বিভাগে—উমা মৈত্রেয়।

বি, টি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি টি পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম—প্রথম বিভাগে—শান্তি দে (২য় স্থান অধিকার করিয়া), ফ্লোরেন্স মরিসন (৪র্থ), ক্যাথলীন নাহাপীট (৫ম), সিল্‌ভিয়া মেবেল ওয়েব, মার্গারেট হান্না লেজেরাস্‌, শোভনা সরকার, এলিস ডাকওয়ার্থ। উত্তীর্ণ—সুলতা বসু, বনজ্যোৎস্না ভট্টাচার্য্য, বেল হাড্‌সন্‌, আনন্দী কেলোয়াড়, গায়ত্রী রায়, বনজিনী সাহু, অমিয়া সেন।

আই এ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগন উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম :—প্রথম বিভাগে—রমা বসু (২য় স্থান অধিকার করিয়া), বীণা দাস, জোয়ান হাওয়ার্ড, মাদার মেরী সেণ্ট চাড, জ্যোৎস্নাকুমারী দেবী, অঞ্জলী দাস, সরস্বতী দত্ত, ননীবালা দত্তগুপ্ত, এনা লরেন্স, মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণতি রায় চৌধুরী, ভেঙ্গালীল কৃষ্ণা চিন্নাম্মালু আম্মা, অমিতা দত্ত, জেরবানু জেহাঙ্গীর কাবরাজী, মার্গারেট ডব্‌লিউ ক্লার্ক, বীণা দত্ত, রমলা ঘোষ, ডরিস্‌ পেরী, অমিয়া দাসগুপ্ত, পারিজাত ঘোষ, খৃষ্টিনা মণ্ডল, উষা রায়, উমা চট্টোপাধ্যায়, ইন্দিরা বসু, মার্গারেট গ্রেগরী, লরা লেলা লতিকা দে, জ্যোতিপ্রভা দাস গুপ্ত, বীণাপাণি দাস, মানেক এস্‌ পভরী, উমারাণী বসু, এনী সুকিয়াস্‌, সন্ধ্যালতা দত্ত, শেফালিকা সেন গুপ্ত, বেলা দাস, মার্গারেট ভীরা আবৃস্‌, বীণা মজুমদার, লীলা বসু, ইন্দিরা দে, বিভাবতী রায়, এডিথ ভায়োলেট হেপডন, শান্তি দাস গুপ্ত, মায়া দেবী, লতিকা বসু, জেইন এস্‌ কোয়েন্‌, জ্যোতিপ্রভা দাস গুপ্ত, ভ্রমর ঘোষ, শান্তি গুহ, শান্তি নিয়োগী, বীণা চৌধুরী, রুবি মৃণালিনী গৌড়। দ্বিতীয় বিভাগ—আশালতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা বসু, উর্ম্মিলা ভট্টাচার্য্য, অমিয়া বিশ্বাস, সুষমা বিশ্বাস, শকুন্তলা চন্দ্র, পারুল চট্টোপাধ্যায়, বেলারেণু চৌধুরী, মণিকা দাস, জ্যোৎস্না দাস গুপ্ত, ফুলরেণু দত্ত, শান্তি দত্ত, সিন্ধুরাণী দে, গার্ট্রুড অমিতা গৌড়, নীহার গুপ্ত, নীলিমা গুপ্ত, প্রভাবতী মজুমদার, স্নেহলতা মল্লিক, কমলা মিত্র, শৈলা উষারাণী মুখার্জ্জি, নির্ম্মলা নাগ, ওরা নায়ক, কনকপ্রভা নিয়োগী, নর্ম্মা ফোর্টাম, অশোকা রায়, রুবি কোহেন, অন্নপূর্ণা সেন, জ্যোৎস্না সেন, নিভা সেন, নীলিমা সেন, স্নেহলতা সেন, মণিকুন্তলা সেন গুপ্তা। তৃতীয় বিভাগ—শান্তিপ্রভা রায়।

আই এস্‌সি—প্রথম বিভাগ—চামেলী দত্ত, লক্ষ্মীরাণী সান্ন্যাল, অমলপ্রভা দাস, রুথ মিলিসেণ্ট ক্যাম্বেল, সুহাসিনী দত্ত, কেলোসিডা পার্সতী, সুনীতি সেন, অমিয়া দাস গুপ্ত, রমা দাস, কুঞ্জলতা গোসাই, নির্ম্মলা ঘোষ। দ্বিতীয় বিভাগ—প্রতিভা বসু, কমলা গুপ্ত, ক্যাথারীণ অলিভ রিচার্ড, সুলেখা সেন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ১০ই বৈশাখ অপরাহ্ণে বরিশালস্থ কল্যাণ-কুটিরে "ব্রহ্মবাদী" পত্রিকার ত্রিংশৎ-বর্ষারম্ভিক একটী প্রীতিসম্মিলন হয়। সহরের জমিদার, তালুকদার সাব জজ, মুন্সেফ, ডাক্তার, উকীল, অধ্যাপক, এবং শিক্ষক প্রভৃতি সকল শ্রেণীস্থ গ্রাহক বর্গের উপস্থিতিতে একটী পবিত্র মধুর বিদ্বজ্জন সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে একটী সঙ্গীতান্তে ব্রহ্মবাদী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রার্থনা করেন। তৎপরে শ্রীমান্‌ কল্যাণকুমার চক্রবর্ত্তী বৈশাখের ব্রহ্মবাদী পত্রিকায় লিখিত সম্পাদকের সম্ভাষণ ও নিবেদন পাঠ করিয়া গ্রাহকদিগকে বিতরণ করেন। কবিতাবৃত্তি, সঙ্গীত এবং এস্রাজ্‌ বাদ্য হইলে, রায় গণেশচন্দ্র দাস বাহাদুর, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বিশ্বাস, অধ্যাপক বনমালী বেদান্ততীর্থ প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী পত্রিকার প্রবন্ধের এবং সম্পাদকের এই ব্রত সাধনে কৃচ্ছ্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সম্পাদক কৃতজ্ঞতা প্রকাশচ্ছলে কিছু নিবেদন করিলে সভাপতির সহৃদয়তাপূর্ণ মন্তব্য অন্তে প্রীতি জলযোগে সম্মিলনের কার্য্য শেষ হয়। পুরুষ মহিলা ও বালক বালিকাগণ সহ প্রায় দেড়শত লোক এই সম্মিলনে যোগদান করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছেন।

বিগত ৩০ শে বৈশাখ সর্ব্বানন্দভবনে ব্রাহ্মিকা সমাজের মাসিক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "বিচারের ধর্ম্ম ও নিষ্ঠার ধর্ম্ম" বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একপঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক উৎসব দিনে বরিশাল ব্রহ্মমন্দিরে সায়ংকালে জমাট কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। "ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য ও পরীক্ষা" বিষয়ে উপদেশ দেন।

৩/৪ মাস যাবত কল্যাণ-কুটিরে রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতেছে। বিগত ৫ই জ্যৈষ্ঠ বালকবালিকাগণ সঙ্গীত কবিতাবৃত্তি প্রভৃতি করিলে, মনোমোহন বাবু প্রার্থনা ও উপদেশ প্রদান করেন। সকলকে মিষ্টি বিতরণ করা হইলে তিন সপ্তাহের জন্য স্কুল বন্ধ দেওয়া হয়।

বিগত ২৪ শে বৈশাখ সায়ংকালে বাবু প্রসন্নকুমার দাসের মাতার পরলোক গমন-দিনে, ৫ই জ্যৈষ্ঠ সর্ব্বানন্দভবনে ডাক্তার রায় প্রেমানন্দ দাস বাহাদুরের পরলোকগমন-দিনে এবং ৬ই জ্যৈষ্ঠ ভৈরবভবনে কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরলোকগমন-দিনে বিশেষ উপাসনা হয়। তিন অনুষ্ঠানেই মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। সকল স্থানেই প্রীতিজলযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ২২শে জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি, এ

Regsterde No. 65

১৮৫১-১৮৫২ শক

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫২ম ভাগ
২৪শ সংখ্যা।

১৬ই চৈত্র, রবিবার, ১৩৩৬, ১৮৫১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০১
30th March, 1930.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে অবিরামকর্ম্মা বিশ্ববিধাতা, তোমার জীবন্ত কর্ম্মপ্রবাহ ত নিয়ত অবিশ্রাম গতিতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে চির উন্নতি ও বিকাশের পথে লইয়া যাইতেছে! তুমি ত সর্ব্বত্র অপূর্ণতা ও কদর্য্যতা বিদূরিত করিয়া নিত্য পূর্ণতা ও সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিতেছ! তবে আমাদের জীবনে কেন তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ কিছু দেখা যাইতেছে না? দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, আমরা ত এখনও জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে, সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে, মণ্ডিত হইয়া তোমার উপযুক্ত বাধ্য সন্তান হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারিলাম না! তুমি ত দীর্ঘকাল হইতেই সম্পূর্ণরূপে তোমার অনুগত হইয়া চলিবার জন্য নানা উপায়ে বিভিন্ন ভাবে, আমাদিগকে ডাকিতেছ। অশেষ প্রকার করুণাও ত করিয়াছ! তোমার অনুগত হইয়া চলিবার আনন্দ এবং আলস্যে ও উদাসীনতার মধ্যে সংসারস্রোতে ভাসিয়া বেড়াইবার দুঃখ, উভয়ই ত জীবনে অনেক বার অনুভব করিতে দিয়াছ! তবু যে কেন আমাদের চৈতন্য হইতেছে না, মোহঘোর ছুটিতেছে না, বুঝিতে পারিতেছি না। দিন ত ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতেছে,—দ্রুতগতিতে চলিয়া যাইতেছে। আর কতকাল এই ভাবে যাইবে? তুমি এবার আমাদের সকল মোহঘোর ভাঙ্গিয়া দেও, আমাদিগকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, দুঃখাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, তোমার অপার প্রেমে গলাইয়া, চিরদিনের তরে তোমার করিয়া লও। আমরা চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণরূপে তোমার হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। তোমার জীবন্ত মঙ্গল-বিধাতৃত্ব আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি পূর্ণ হউক।

শততম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) রবিবার—প্রাতে সাধনাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি প্রথমে নিম্নলিখিত মর্ম্মে উদ্বোধন করেন:—

প্রায় ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে ভক্তিভাজন আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মভাবের ম্লানতা অনুভব ক'রে, বিশেষতঃ ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে উৎসাহের অভাব অনুভব ক'রে, সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার অঙ্গীভূত মানুষগুলির মধ্যে কত জন আজ পরলোকে র'য়েছেন। তাঁদের আজ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতির সহিত স্মরণ করি। আজ এই বিশেষ উৎসবের দিনে স্বর্গীয় শিবনাথ, নবদ্বীপচন্দ্র, প্রকাশদেবজী, সুন্দর সিংহজী, চঞ্চলা দেবী, কাশীচন্দ্র, হরিমোহন, মহেন্দ্রনাথ, জয়শঙ্কর, অবিনাশচন্দ্র, গুরুদাস প্রভৃতি সাধনাশ্রমের সংসৃষ্ট বিশ্বাসী কর্ম্মী ভক্ত আত্মাগণের সান্নিধ্য অনুভব করি। সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের জীবন্ত লীলা আশ্রমের জীবনে ও ইহার দাসদলের জীবনে অনুভব করি। তিনি যে আশ্রমের সব অভাব পূরণ কর্‌চেন, তিনি যে আমাদের খেতে পর্‌তে দিচ্ছেন, তাঁর এ দয়া আমরা জীবনে অস্বীকার করি না। কিন্তু সে কথাই আজ বিশেষ ক'রে বল্‌ব না। কারণ, তিনি তদপেক্ষা আরও কত প্রসাদ দিয়ে আশ্রমের জীবনকে ধন্য ক'রেছেন। এমন অমৃতময় ধর্ম্মজীবনের অধিকার দিয়েছেন, এমন অমৃতময় সঙ্গ দিয়েছেন! সাধু ভক্তদিগকে যেন ঘরের লোক ক'রে দিয়েছেন। তাঁর নিজ সঙ্গ দিয়ে ও আমাদের পরস্পরের মধুময় সঙ্গ দিয়ে, আমাদের জন্য জীবন মধুময়, জগৎ মধুময়, ও কর্ম্ম

মধুময় ক'রে দিয়েছেন। সেবার মহান্ অধিকার দিয়ে আমাদের তুচ্ছ জীবন ধন্য ক'রে দিয়েছেন। আজ সেই কৃতজ্ঞতাতে মনকে পরিপূর্ণ ক'রে, পরলোকস্থ ও দূরস্থ সকল আত্মাগণকে প্রাণে নিয়ে, প্রাণস্বরূপের পূজায় প্রবৃত্ত হই।

উপাসনান্তে তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন :—

প্রেমভক্তি সাধনের অনুকূল ক্ষেত্র রচনা।

সাধনাশ্রমকে এখন আর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যের দ্বিতীয় একটি আয়োজন ব'লে দর্শন কর্‌বার আবশ্যকতা নাই। প্রথম স্থাপনের সময়ে ইহাকে কিছু পরিমাণে সেই ভাবে কাজ কর্‌তে হ'য়েছিল বটে। কিন্তু এখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মজীবন সংস্পৃষ্ট একটি বিশেষ মণ্ডলীরূপে তাহার অঙ্গীভূত হ'য়ে জীবিত থাকাই ইহার সার্থকতা। আমি কোন কোন বার ইহাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মজীবনের একটি gland রূপে বর্ণনা ক'রেছিলাম। মানবদেহে glandএর কাজ, রক্ত হ'তে নানা রূপ রস উৎপন্ন ও সংকৃত ক'রে, এবং সমগ্র দেহে তাহা সঞ্চারিত ক'রে, দেহের কার্য্যকে বিশেষ বিশেষ ভাবে পরিচালিত করা। ধর্ম্মসমাজেও তেমনি, বিশেষ বিশেষ ভাব উৎপন্ন ও সঞ্চার কর্‌বার জন্য বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র থাকা আবশ্যক।

এই ভাবে চিন্তা কর্‌লে দেখা যায়, সাধনাশ্রমের একটি সুমহৎ কাজ, ধর্ম্মপিপাসু মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচয় লাভের বিষয়ে, ও ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ হবার বিষয়ে, সহায়তা করা। আমি 'পরিচয়' ও 'সম্বন্ধ', এই কথা দুটি কি অর্থে ব্যবহার কর্‌চি,তা প্রথমতঃ একটি তুলনার সাহায্যে ব্যক্ত কর্‌বার চেষ্টা করি।

হিন্দু সমাজের একটি বালিকা বধূ তার পিতৃগৃহ ছেড়ে পতিগৃহে চ'লে যাবে। তার মন নানা সংশয়ে আকুল হ'য়ে রয়েছে। আমি পরিচিত পিতৃগৃহ ছেড়ে কোন্ অচেনা অজানা জায়গায় যাব, কোন্ অচেনা একদল লোকের সঙ্গে আমাকে বাস কর্‌তে হবে, কাদের অধীনতার মধ্যে, নূতন কোন্ এক পরিবারের শাসন-শৃঙ্খলার (disciplineএর) মধ্যে আমাকে গিয়ে পড়্‌তে হবে, এই ব'লে তার মন অস্থির। তার এই অস্থির ভাব দূর কর্‌বার জন্য তার বাবা তাকে বোঝাতে লাগ্‌লেন। "না, আমি খুব ভাল ক'রে জেনে শুনে, খুব ভাল ঘরেই তোমার বিয়ে দিয়েছি। তোমার যিনি স্বামী, তিনি অতি সদাশয় ও মহৎ অন্তঃকরণের লোক। তাঁদের বাড়ীর সব লোকগুলির বিষয়ে আমি খোঁজ নিয়েছি, সকলেরই প্রকৃতি বড় ভাল। তাঁদের শরীরে বড় দয়ামায়া। তোমার কোন ভাবনার কারণ নাই।" এইরূপে পিতা তাঁর কন্যার কাছে তার স্বামীর ও স্বামীর আত্মীয়দের গুণসকল বর্ণনা ক'রে ক'রে, ও সুযুক্তিপূর্ণ কথা ব'লে ব'লে, তার দ্বিধা সংশয় দূর ক'রে দিবার চেষ্টা কর্‌লেন।

তার পরে ঘর ছেড়ে যাবার সময়টি নিকটে এল। তখন তার সমবয়স্ক অন্যান্য বধূরা তাকে নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দিয়ে আশ্বাস দিতে লাগল। বল্‌ল, "প্রথম প্রথম আমাদেরও কত ভয় ক'রেছিল। বাপ মা ভাই বোনকে ছেড়ে গিয়ে, ও পরিচিত সব মানুষ পরিচিত ঘর বাড়ী ছেড়ে গিয়ে, প্রথম প্রথম কষ্টও পেয়েছিলাম বই কি? তা'ছাড়া, নূতন পরিবারের শাসন-শৃঙ্খলার বশবর্ত্তী হ'য়ে চল্‌তে গিয়েও প্রথম প্রথম অনেক কষ্ট পেতে হ'য়েছিল। কত অভ্যাস বদ্‌লাতে হ'য়েছে, কত রকমে আপনাকে জোর ক'রে বাঁধ্‌তে হ'য়েছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে কষ্টের দিন চ'লে গিয়েছে। এখন, দেখ না, আমরা কত মনের আনন্দে ঘরকন্না কর্‌চি।" বাপের বাড়ীর বউয়েরা এ রকম বল্‌ল। শ্বশুরবাড়ীতে পূর্ব্বে আগত অন্যান্য বউয়েরাও এই রকম কথাই বল্‌ল। তাদের সকলের সাক্ষ্য শুনে সেই নব বধূর মন একটু নির্ভয় হ'ল।

আর সকলের সাক্ষ্যের চেয়ে সে তার নিজের মার সাক্ষ্য পেয়ে অধিক আশ্বস্ত হ'ল। তার মা বল্‌লেন, "এই দেখ না, মা, আমিও তো এক দিন তোমাদের এ বাড়ীতে বউ হ'য়েই এসেছিলাম। আমি তখন এসেছিলাম ব'লেই না তোমরা সকলে আমার কোলে জন্মেছ?" এই প্রকারে সকলে নিজ নিজ জীবনের সাক্ষ্য দিয়ে নব বধূকে নির্ভয় ক'রে দিবার চেষ্টা কর্‌ল।

সে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে সাবধানে সকলকে খুসী ক'রে চল্‌বার চেষ্টা করে। এই ভাবে কিছুকাল যাবার পর নিজ পতির সঙ্গে তার পরিচয় হ'ল ও প্রণয় জন্মাল। তখন তার এক নূতন জীবন আরম্ভ হ'ল। তখন আর তার সে সংশয়ও নাই, সে ভয়ও নাই। আপনা হ'তেই সে সব দূর হ'য়ে গিয়েছে। তখন তার জীবন দিনে দিনে আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌চে। এই সময়ে সে একদিন তার স্বামীকে বল্‌ল, "আমি মনে ক'রেছিলাম, এখানে এসে কেবল সাবধানে নিজেকে সংযত ক'রে ক'রে, ও সকলকে খুসী ক'রে ক'রে, ভয়ে ভয়েই আমাকে চিরকাল চল্‌তে হবে। আমি তো তার জন্যই মনকে প্রস্তুত ক'রেছিলাম। সে ভাবে এখানকার জীবন আরম্ভ ক'রেই তো আমি সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু এখন তোমাকে ভালবেসে আমার এ কি-জীবন আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে! এমন আনন্দময় জীবন যে আমার ভাগ্যে আছে, তা তো আমি আগে জান্‌তাম না!"

ধর্ম্মের ঘরে কোন মানুষ যখন প্রথম আসে, তখন তাকে ঐ নব বধূর সঙ্গে তুলনা করা যায়। ধর্ম্মরাজ্য তার কাছে নূতন। ঈশ্বরকে তখন সে জানে বটে, কিন্তু তাঁকে আপনার ব'লে চেনে নি। পিতৃগৃহ ছেড়ে পতিগৃহে গমনোদ্যত বধূর সম্বন্ধে তার পিতা যা ক'রেছিলেন, ধর্ম্মসমাজের পক্ষে নবাগতের জন্য তা করা প্রয়োজন হয়। তার চিন্তার সকল সংশয় দূর ক'রে দিবার জন্য, তাকে ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা ও মঙ্গলস্বরূপ প্রভৃতি ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিবার জন্য, তাকে ধর্ম্মরাজ্যের সুপথ বিপথ ভাল ক'রে চিনিয়ে দিবার জন্য, একটি ভাল আয়োজন ধর্ম্ম-সমাজে থাকা প্রয়োজন হয়। অজ্ঞান অন্ধকারে তার হাতখানি ধর্‌বার জন্য, সারা জীবনে তার জ্ঞানপিপাসাকে জাগিয়ে রাখ্‌বার ও তৃপ্ত কর্‌বার জন্য, ধর্ম্মসমাজে উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন হয়।

তৎপরে দেখ্‌তে পাই, চিন্তা ও যুক্তিলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা ধর্ম্মপথে নূতন যাত্রীর সব সংশয় দূর হ'য়ে গেলেও, তার অন্তরের ভয় দূর হয় না। ভীরুতা ও অল্প-বিশ্বাস মনুষ্যমাত্রেরই প্রকৃতিগত। নূতন পথে চল্‌তে গেলেই মানুষের প্রকৃতিগত সেই ভীরুতা ও বিশ্বাসের অল্পতা এসে মানুষকে ভীত করে। এজন্য প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজে এমন ধর্ম্মমণ্ডলী থাকা প্রয়োজন, যেখানে গিয়ে নূতন মানুষ একদল সাক্ষীর সাক্ষাৎ পাবে। সাক্ষীর দরকার কেন? তারা যে তাকে কিছু বোঝাবে, তা নয়। এমন কি, তাকে কিছু যে বল্‌বে, তাও নয়। কিন্তু তারা তাকে কিছু দেখাবে। "আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখ। ধর্ম্মের পথে আমরাও চ'লেছি। এ পথে দুঃখ সংগ্রাম আছে বটে, কিন্তু তাতে ভয় নাই। দেখ, আমরা কত সংগ্রাম পার হ'য়ে এসেছি; তুমিও তোমার সব সংগ্রাম পার হ'য়ে যাবে, ভয় নাই," এই ব'লে যারা সাক্ষী হ'য়ে তার সম্মুখে দাঁড়াবে, এমন মানুষ থাকা দরকার।

দয়ালের দয়াতে ধর্ম্মজগৎ এইরূপ সাক্ষীর দ্বারা পরিপূর্ণ। প্রথমতঃ দেখ্‌তে পাই, সকল দেশের ও সর্ব্ব কালের সাধুভক্তেরা এইরূপ সাক্ষী। তাঁরা অভয় দিয়ে বল্‌চেন, "চলে এস, শান্তি আছে। পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্তেরা এস, বিশ্রাম আছে। দুঃখী তাপীরা এস, অশ্রু মুছে যাবে।" প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজের একটি বিশেষ কাজ, ধর্ম্মপিপাসু নরনারীকে সাধুভক্তগণের সহিত জীবন্ত যোগে যুক্ত ক'রে দিবার জন্য একটি কেন্দ্র রচনা করা। যে ধর্ম্মসমাজে ধর্ম্মের আলোচনা অনেক আছে, কিন্তু এই সাক্ষীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগ-স্থাপনের ভাল ব্যবস্থা নাই, সে ধর্ম্মসমাজ ব্যাকুল-হৃদয় নূতন নূতন মানুষ পাবার ও রাখ্‌বার যোগ্য স্থান নয়। ধর্ম্মসমাজের সর্ব্বপ্রধান কাজই বোধ হয়, সাধু ভক্ত, ধর্ম্মবীর, চরিত্রবীর ও মহামনা মানুষদের সঙ্গে এইরূপ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ সাধনের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। সে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ কিরূপ? শুষ্কতায় যখন আমার প্রাণ কাঁদ্‌বে, তখন আমি অনুভব কর্‌ব, চৈতন্যদেব আমার কাছে এসেছেন; আমার জন্য নিজের চোখের জল ফেলে, আমার শুষ্ক চোখের যে জল উৎসারিত হ'চ্ছিল না, তাকে উৎসারিত করে দিচ্চেন। পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত ভগ্ন চূর্ণ অবস্থায় আমি অনুভব কর্‌ব, যীশু আমার কাছে এসেছেন; এসে তাঁর করুণ চোখের দৃষ্টি দিয়ে আমার দুঃখ তাপ হরণ কর্‌চেন। রিপুর উত্তেজনায় আমি অনুভব কর্‌ব, বুদ্ধদেব আমার কাছে এসে তাঁর অমৃতময় নির্ব্বাণ-বাণী উচ্চারণ ক'রে আমার সে উত্তেজনা শান্ত ক'রে দিচ্চেন। ভগবান্ কি ধর্ম্মরাজ্যটাকে একটা বিশাল জনহীন প্রান্তরের মতন ক'রে, একটি নির্জ্জন বন্ধুহীন স্থান ক'রে, সৃষ্টি ক'রেছেন? তা কখনও নয়। সাধুভক্তগণের দ্বারা, কত বন্ধুজনের দ্বারা, তাহা পরিপূর্ণ। সেই সাধুভক্তগণকে কি অতীত যুগই ফুরিয়ে ফেলেছে? তাঁরা কি এ যুগে বর্ত্তমান নাই? তাঁদের আশ্বাসবাণী কি আমরা শুনতে পাব না? যীশুর "come unto me" এই অমৃতময় আহ্বান কি আমরা শুন্‌ব না? তা কখনও নয়। ধর্ম্মজগতের বড় কাজ, মানুষকে দয়ালের দয়ায় এই সাক্ষীদের জীবন্ত সংস্পর্শের মধ্যে স্থাপন করা।

কিন্তু যেমন সেই বালিকা বধূর পক্ষে আর সকলের সাক্ষ্যের চেয়ে নিজের মায়ের সাক্ষ্য বড় হ'য়েছিল, তেমনি মানুষের পক্ষে আর সব যুগের সব দেশের সাক্ষ্যের চেয়ে নিজ মণ্ডলীর সাক্ষ্য বেশী বড় হয়। নিজ মণ্ডলী যেন নিজের মা। আমাদের ব্রাহ্মসমাজ কিসে এই বিষয়ে ধর্ম্মপিপাসু আত্মাগণের পক্ষে মায়ের মতন হ'তে পারেন, কিসে সাধনাশ্রম সেই বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য কর্‌তে পারেন, ব্যাকুল হ'য়ে আজ আমরা তাহা ভাবি, ও সেজন্য সচেষ্ট হই।

তার পর, প্রত্যেক ভাল পরিবারে নব বধূ গিয়ে কতকগুলি নিয়ম শৃঙ্খলা ও আজ্ঞাধীনতার হাওয়াতে বাস করে। যে পরিবারে তার ব্যবস্থা নাই, সেখানে মানুষ ভাল গড়ে না। আজকাল এমন অনেক দুর্ভাগ্য উচ্ছৃঙ্খল পরিবার দেখা যায়, যেখানে বধূরূপে প্রবিষ্ট হবার পর, সুশিক্ষিতা সুবিনীতা কন্যাগণের চরিত্র হ'তে পূর্ব্বের সকল সুশিক্ষা ও সদ্‌গুণ মুছে গিয়েছে। যা হওয়া উচিত ছিল মানুষ গড়্‌বার স্থান, তা হ'য়ে গিয়েছে মানুষ নষ্ট কর্‌বার স্থান। ধর্ম্মরাজ্যেও তেমনি। যে সমাজের হাওয়াটি প্রত্যেক নবাগত মানুষের মনে প্রথম হ'তেই ঈশ্বরের হাতে আত্মসমর্পণের শিক্ষা, সর্ব্ব বিষয়ে আদর্শের অনুগত হ'য়ে চল্‌বার শিক্ষা, মুদ্রিত ক'রে দিবার অনুকূল নয়, সে-সমাজ প্রকৃত ধর্ম্মসমাজ নয়। ধর্ম্মসমাজের হাওয়া কিরূপ? একজন নূতন মানুষ সেখানে গেলে তার আত্মার রোমে রোমে এই ভাব প্রবিষ্ট হ'য়ে যায় যে, "রুচি বাসনা কল্পনা বিষয়ে, শক্তি অর্থ ও সময়ের ব্যবহার বিষয়ে, আমি নিয়ত পরম প্রভুর আজ্ঞাধীন।" এই আজ্ঞাধীনতার হাওয়া যে-সমাজে নাই, অথচ স্বাধীনতার হাওয়া আছে, সেখানে গিয়ে নবাগত মানুষের মন সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, স্ফূর্ত্তি, পারিবারিক ও সামাজিক আমোদ আহ্লাদ, এবং ভোগ বিলাসের দিকেই ঝুঁকিয়া যায়; মহত্ত্ব ও উন্নত চরিত্রের দিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে প্ররোচনা কিংবা সাহায্য প্রাপ্ত হয় না। কিসে সমাজমধ্যে এই আজ্ঞাধীনতার হাওয়া, আদর্শের অনুবর্ত্তিতার হাওয়া, নিরন্তর প্রবাহিত থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। একটি সজীব ধর্ম্মমণ্ডলী এ বিষয়ে বড় সহায়।

সাধনাশ্রমের ভাই বোন্, আমাদের মণ্ডলীটি হ'তে আমরা এ দিয়ে যে সাহায্য পেয়েছি, চিরদিন তা যেন মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার কর্‌তে পারি। জীবনের রুচি অভ্যাস সব ভেঙ্গে চুরে নূতন ক'রে গড়া, সুখাসক্ত মনকে প্রভুর সেবায় উদ্যোগী করা, ইন্দ্রিয়াসক্ত প্রকৃতিকে শুদ্ধ করা,—এ সকলের কঠিন সংগ্রামে সাধনাশ্রমের মণ্ডলী হ'তে যে সাহায্য পেয়েছি, তা চিরদিন স্বীকার কর্‌ব। আমার জীবনে দয়ালের বড় দয়া যে আমাকে এই পরিবারের শাসন-শৃঙ্খলার হাওয়ার মধ্যে তিনি এনে ফেলেছেন। এ মণ্ডলীর কত ভালবাসার সুকোমল স্পর্শে, কত ব্যাকুল প্রার্থনার বেষ্টনে, কত শাসনের চাপে, কত আদরে ভর্ৎসনায় দণ্ডে, আমার জীবন গ'ড়ে উঠ্‌বার সৌভাগ্য লাভ ক'রেছে। আমার আত্মার রক্তে সে সকল মিশে র'য়েছে। চিরদিন তার সাক্ষ্য দিয়ে যাব। প্রকৃতিকে ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন

কর্‌বার কঠিন সংগ্রামে এই মণ্ডলী হ'তে আমি যে সাহায্য লাভ ক'রেছি, তার তুলনা নাই। সাধনাশ্রমের ভাই বোন, আমার আযৌবনের অভিজ্ঞতায় আমি দেখ্‌লাম, নিজ প্রকৃতিকে বশ ক'রে ঈশ্বরের চরণে দান করার মত' কঠিন কাজ আর কিছু নাই। আমার জীবনের অনেক শত্রুকেই আমি এক কোপে কেটে নিঃশেষ কর্‌তে পারি নাই। তোমাদের জীবনে যদি এক কোপে কাট্‌বার মত' জিনিস কিছু থাকে, তবে তা তেম্‌নি ক'রেই কাট'। লাগাও তার উপর ব্রহ্মনামের খাঁড়া, তীক্ষ্ণ বৈরাগ্যের খাঁড়া। আর, লাগাও সাধকদলের কাছে আত্মসমর্পণ-রূপ খাঁড়ার কোপ! আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, এই শেষোক্ত ভাবের খড়্‌গাঘাতে বড় কাজ হয়। কাট' এমনি ক'রে বিষয়াসক্তি, সুখাসক্তি, অহংকার! কিন্তু ভাই বোন্‌, কত বিষয়ে যে সারা জীবন ধ'রে আত্মার অণু পরমাণুকে ধৌত কর্‌তে হয়, শরীরের রক্ত মাংসকে বিন্দু বিন্দু ক'রে শুদ্ধ কর্‌তে হয়। এই কাজের জন্য একা একা সেই হৃদয়েশ্বরের চরণতলে প'ড়ে প'ড়েও কাঁদতে হয়; আবার, ধর্ম্মমণ্ডলীতে যাঁরা বাপ-মায়ের মত', জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীর মত', স্নেহভাজন সহোদর সহোদরার মত', তাঁদের কাছে ব'সে ব'সে, অশ্রুজলে ভেসে ভেসে জীবন ধৌত কর্‌তেও হয়। এ বিষয়ে ধর্ম্মপরিবার আমাদের কত সহায়!

তার পরে ধর্ম্মসমাজের হাওয়াটি এমন হওয়া দরকার যে তাহাতে বেষ্টিত থেকে প্রত্যেক ধর্ম্মপিপাসু আত্মা ঈশ্বরের প্রেমানুভূতিতে ও তাঁহার প্রতি প্রেম-ভক্তিতে ফুটে ওঠ্‌বার সাহায্য পায়। ধর্ম্মসমাজের প্রকৃত সার্থকতা প্রেমের অনুকূল ও ভক্তির অনুকূল হাওয়া সৃষ্টিতে। যে হাওয়াতে মানব-হৃদয়ে মানুষ-সম্বন্ধে নম্রতা ও কোমলতার ভাব প্রথমে প্রস্ফুটিত হ'য়ে, মানুষের মূল্য-অনুভূতিটি প্রথমে জাগরিত হ'য়ে, তাহাকে ভক্তির জীবনের জন্য উন্মুখ ক'রে রাখে; যে হাওয়াতে আত্ম-ইচ্ছাপরায়ণতার কঠোর ভাবটি জাগ্‌তেই পায় না; যাতে, সেরূপ ভাব নিয়ে কেউ এলে শীঘ্রই সে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যায়; শীঘ্রই সে কোমল স্নিগ্ধ হ'য়ে, আত্মবিলোপে অভ্যস্ত হ'য়ে, প্রেম-ভক্তির জীবনের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে যায়। যদি ধর্ম্মসমাজের হাওয়াটা কেবল যুক্তি তর্কের হাওয়া, জ্ঞানালোচনার হাওয়া, অথবা কর্ম্মব্যস্ততার হাওয়া মাত্র হয়, তার বেশী আর কিছু না হয়, অর্থাৎ প্রেম-ভক্তির অনুকূল হাওয়া না হয়, তবে তো সেখানে এসে মানুষ ধর্ম্মজীবনের প্রকৃত পরিণতি লাভ কর্‌তে পার্‌বে না। বধূ নূতন বাড়ীর খুব ভাল রাঁধুনী বা ভাল দাসী হ'য়ে থাকলেও যেমন সেখানে তার প্রকৃত জীবন হ'ল না,—প্রকৃত জীবন হয় যখন সে পতির সঙ্গে এবং পতিকুলের লোকগুলির সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধে বাঁধা পড়ে,—এখানেও তেমনি। ধর্ম্মসমাজ তার নবাগত মানুষটির উপরে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেন? সে সমাজে এসে নবাগত মানুষটি ভাল জ্ঞানী, কর্ম্মী, এমন কি নিষ্ঠাবান্‌ তপস্বী হ'লেও হ'ল না। প্রশ্ন এই যে, তার প্রেম-ভক্তি-ফুল কি সে হাওয়াতে ফোটে? যে সজল স্নিগ্ধ হাওয়াতে মানব-হৃদয়ের সুকোমল ভক্তি-বৃত্তি অঙ্কুরিত ও প্রস্ফুটিত হয়, তাহা কি সেখানে প্রবাহিত?

প্রেমভক্তি মানবহৃদয়ের অতি সুকোমল বৃত্তি। এ সকল বৃত্তিকে বাঁচাবার জন্য যাদের মনে আগ্রহ থাকে, তারা বাহিরের জীবনেও কোমলতা ও সুন্দরতার প্রতি দৃষ্টি রাখে। ইংরাজীতে আজকাল bonhomie ও camaraderie ব'লে দুটি কথা বড় প্রচলিত হ'য়ে প'ড়েছে। মানব-প্রকৃতিতে যে-স্থূলচর্ম্মিত্বের ভাবটি বিদ্যমান থাক্‌লে ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ও ধাক্কা দিয়ে দিয়ে মানুষ অম্লানবদনে অগ্রসর হয়, অথবা কমিটির তর্কবিতর্কের সময়ে খোঁচা দিয়েও পরে তার কিছু মনে থাকে না, খোঁচা খেয়েও পরে তার কিছু মনে থাকে না, সেই প্রকৃতির প্রশংসার জন্য ঐ শব্দ দুটি ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যেন আমরা ঐ প্রকৃতি অভ্যাস কর্‌চি ব'লে মনে হয়। ইহার মধ্যে প্রশংসার যোগ্য কিছু যে নাই, তা নয়। কিন্তু ভাব' দেখি, ভাই বোন্‌, spirit of democracyর পক্ষে ঐ প্রকৃতি যথেষ্ট হ'লেও, প্রেমভক্তির সাধনের পক্ষে কি উহা যথেষ্ট? অথবা উহা কি তার অনুকূল প্রকৃতি? প্রেমভক্তির সাধনের পক্ষে পরিবারের মতন হাওয়া থাকা প্রয়োজন,—যেখানে সামান্য একটু সুর চড়িয়ে কথা বলার দরুণই পরে মনে অনুতাপ হয়, যেখানে আমার দৃষ্টিটি একটু গরম হ'য়েছিল ব'লেই পরে কেঁদে মরি। আমরা যাতে স্থূলচর্ম্মী আত্মা হ'য়ে, coarse-fibred souls হ'য়ে, না পড়ি, সেদিকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

বাহিরে তো এইরূপ অপ্রতিকূল হাওয়ার প্রয়োজন। তৎপর একটু ভিতরে প্রবেশ কর্‌লেই দেখ্‌তে পাই, প্রেম-ভক্তির সাধনার জন্য সাধককে একটি ঘননিবিষ্ট মণ্ডলীর মধ্যে থাক্‌তে হয়। প্রেমভক্তির জীবনের অনুকূল আবেষ্টন (setting) হ'ল একটি মণ্ডলী; একাকিত্বে তাহার সাধন হয় না। একা একা ধ্যান ধারণা সম্ভব, কিন্তু ভক্তিসাধন সম্ভব নয়। ভক্তির সাধকের প্রথম কথাই এই যে, আমি আত্মার সঙ্গীদের দ্বারা বেষ্টিত না হ'য়ে জীবন ধারণ কর্‌ব না। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য দ্বিবিধ মণ্ডলীতে বেষ্টিত হ'য়ে বাস করেন। ভক্তির সাধক কিসে ভরপুর হ'য়ে থাকেন? কিসে ডগমগ হ'য়ে থাকেন? তাঁর প্রেমময় দেবতা যে নিত্য তাঁর কাছে! এবং তাঁর প্রিয়জনেরা যে নিত্য তাঁর আত্মার কাছে কাছে! যে সাধু ভক্তেরা তাঁকে মাতিয়ে রাখেন, তাঁরা যে আত্মার গায়ে গায়ে লেগে রয়েছেন! এই আত্মিক সঙ্গের দ্বারা possessed না হ'লে, যেন কিয়ৎ পরিমাণে ভূতাবিষ্টবৎ অবস্থা না হ'লে, ভক্তির সাধন হ'তে পারে না। সাধনাশ্রমের ভাই বোন্‌, মনে রেখো, শুধু কীর্ত্তনে ও খোল করতালের ধ্বনিতেই ভক্তির অনুকূল অবস্থা রচিত হয় না। তার জন্য চাই, ভক্তদের ও প্রিয় আত্মাদের আত্মিক সঙ্গ; তার জন্য চাই, রেশমের পোকা যেমন আপনাকে সোনালি সূতা দিয়া জড়াইয়া ফেলে, তেম্‌নি ক'রে প্রাণেশ্বরের ও প্রিয় আত্মাগণের সঙ্গের দ্বারা নিজ আত্মাকে নিয়ত জড়াইয়া রাখা।

নব বধূর তুলনাটি হ'তে কেবল ধর্ম্মসমাজের বিষয়ে নয়, ধর্ম্মসমাজের আধ্যাত্মিক সেবকের বিষয়েও উপদেশ লাভ করা যায়। যিনি ধর্ম্মসমাজের আত্মিক সেবা কর্‌তে চান, প্রথমতঃ তিনি ধর্ম্মপিপাসু মানুষের সংশয় ছেদন করতে সমর্থ হবেন।

বই পড়া জ্ঞান যদি তাঁর না-ও থাকে, তবু নিজ অন্তর-আলোকে তিনি মানুষের সংশয় দূর ক'রে দিবেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর মধ্যে মানবজীবনের সুখ দুঃখের, সংগ্রাম ও আনন্দের, অভিজ্ঞতার এমন প্রাচুর্য্য থাকা প্রয়োজন, যার দ্বারা তিনি ধর্ম্মরাজ্যের যাত্রীর কাছে সে রাজ্যের জীবনের ভাল সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান হ'তে পারেন। তৃতীয়তঃ, তিনি আত্মাধীনতার জীবনে, নিয়ত ঈশ্বর-ইচ্ছায় আত্মসমর্পণের জীবনে, সুপ্রতিষ্ঠিত হবেন। চতুর্থতঃ এবং সর্ব্বোপরি, তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রেমানন্দে জীবিত থেকে, ভক্তির জীবনে প্রস্ফুটিত হ'য়ে, অপর মানুষকেও সেই প্রেম-প্রলোভনের দ্বারা আকর্ষণ করবেন, ভক্তির জীবনের দিকে অগ্রসর ক'রে দিবেন। হে ব্রাহ্মসমাজের সেবকগণ, হে সাধনাশ্রমের অঙ্গীভূত সেবকগণ, এই আদর্শকে যাতে আমরা অন্তরে ভাল ক'রে ধারণ করতে পারি, তার জন্য ব্যাকুল হই।

প্রেমভক্তির সাধনা করা ও তাহার অনুকূল একটি স্থান রচনা করাতেই যে ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা, এই সত্যটি একবার ভক্তি-ভাজন আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একটি তুলনার সাহায্যে প্রকাশ ক'রেছিলেন। এই তুলনাটি তিনি আমাদের কাছে ১৯০৪ সালে ব'লেছিলেন; সে আজ ২৬ বৎসরের কথা। তিনি ব'লে-ছিলেন, মজিলপুর অঞ্চল থেকে অনেক লোক সুন্দরবনে মধু আহরণ করতে যায়। মৌমাছিরা যখন চাকের দিকে ফিরতে থাকে, তখন এক জন লোক একটি মৌমাছির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সে মানুষটি ঘাড় উঁচু ক'রে সেই মৌমাছিটির দিকে তাকিয়ে থাকে, আর মৌমাছি যে দিকে যায় সেই দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। তার তো চোখ নামাবার যো নাই, তাই পথে খানাখন্দ কাঁটা থাকলে সে তাহা এড়াতে পারে না। তার হাত ধ'রে আর এক জন বা দুই জন লোক যায়। তারা তার সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়ায়, এবং তাকে পথের বিপদ হ'তে রক্ষা করে। ধর্ম্মসমাজের কাজও এইরূপ। ইহার প্রধান মানুষগুলির লক্ষ্য থাকবে প্রেম ভক্তির সাধনার দিকে; সমাজমধ্যে প্রেমানুগত স্বভাব, ভক্তির অনুকূল স্বভাব সঞ্চার করবার দিকে। তাঁদের দৃষ্টি অন্য কোন দিকে গেলে চলবে না। বর্ত্তমান যুগের মানুষ ভক্তির আতিশয্য হ'তে উদ্ভূত অকল্যাণকে বড় ভয় করে। যদি সমাজমধ্যে সে ভয়ের কারণ দেখ, তবে না হয় ধর্ম্ম-রাজ্যের খানা-খন্দ ও কাঁটাবন হ'তে রক্ষা পাবার জন্য প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে সাবধান জ্ঞানী ও কর্ম্মীদের সংযোগ ক'রে দিও; কিন্তু তথাপি প্রধান ব্যক্তিদের দৃষ্টিটা সেই প্রেম ভক্তির দিকেই রাখতে দিও। ব্রাহ্মসমাজে প্রেমভক্তির সাধনায় অর্পিতচিত্ত একাগ্রমনা মানুষের বড় অভাব হয়েছে। কে ব্রাহ্মসমাজকে প্রেমভক্তির সেই মধুচক্রের দিকে নিয়ে যাবে? কার দৃষ্টি একেবারে সেই দিকে লেগে র'য়েছে? ঈশ্বর করুন, যেন ত্বরায় সেই অবস্থা ব্রাহ্মসমাজে আগমন করে।

২৬ বৎসর পূর্ব্বে শাস্ত্রী মহাশয় যাহা ব'লেছিলেন, আজ তাহা আরও প্রবল ভাবে অনুভব করছি। কিসে ব্রাহ্মসমাজ প্রেমভক্তিতে স্নিগ্ধ স্থান হয়, কিসে ইহা সংসারতাপে তপ্ত আত্মাদের জুড়াবার স্থান হয়, আমাদের সকলের চেয়ে বড় ভাবনার বিষয় তো তাই। সমাজমধ্যে ঈশ্বরের প্রেম-প্রলোভন যদি প্রবল ভাবে বিদ্যমান থাকে, তবে ক্ষুদ্র সাংসারিক প্রলোভন মানুষকে কেন টেনে নেবে? তাঁর প্রেমরাজ্যে কত অমৃতময় স্বাদ! মানুষে-মানুষে, মানুষে-ঈশ্বরে, ঈশ্বরে-মানুষে,—তিনে মিলে তাঁর প্রেমরাজ্যে কি প্রেমলীলা, কি মধুময় নিত্য লীলা! কেন আমরা এ সকল হ'তে বঞ্চিত থাকব? সকলে মিলে কাতর হ'য়ে প্রার্থনা করি, ব্রাহ্মসমাজে আবার সুদিন আসুক, ব্রাহ্মসমাজ প্রেমভক্তির স্রোতে আবার সিক্ত হোক্, সরস হোক্।

অপরাহ্ণে ২ ঘটিকায় প্রচার বিষয়ে আলোচনা। তাহাতে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার সভাপতির কার্য্য করেন এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস (সদানন্দ), শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত আশাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চৌধুরী, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, রায় সাহেব শরৎচন্দ্র দাস, প্রভৃতি নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করেন। দল করিয়া প্রচারযাত্রা করিবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে শরৎ বাবু ৫০০৲ টাকা ও কৃষ্ণকুমার বাবু ১০০৲ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন।

সায়ংকালে কীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে উদ্বোধন করেন:—

আপনাদের সকলের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। দুর্ব্বল দগ্ধ হৃদয় লইয়া কি রূপে অনন্তস্বরূপের মহিমার কথা বলিব? তবে যিনি দুর্ব্বলের বল, যাঁহার কৃপাতে অনেক বার অতি গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আপনাদের আদেশ পালন করিতে—বিশেষতঃ বিদেশে, যেখানে অপর কেহ সঙ্গে ছিল না—সমর্থ হইয়াছি, তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করি, তিনি বল দিউন। তাঁহার নিকট অন্তর-প্রেরণা লইয়া সরল ভাবে প্রাণের কথা নিবেদন করি। বিশ্বাস করি, সরল প্রাণে তাঁহার নাম করিলে কখনও তাহা বৃথা যায় না—ভাব ভক্তি অন্তরে থাকুক আর না থাকুক। সরল প্রাণে যদি তাঁহার কথা বলা যায়, তবে তাহাতে সুফল হইবেই হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের একটি বিশেষ ঘটনা আদি ব্রাহ্মসমাজের মন্দির-প্রতিষ্ঠা। তাহার শতবর্ষ পূর্ণ হইল। যদিও ব্রাহ্মসমাজ তাহার দেড় বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল, তথাপি মন্দির-প্রতিষ্ঠা একটা বিশেষ ঘটনা। এই শতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায়, ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে ইয়ুরোপ ও আমেরিকার বর্ত্তমান যুগের একেশ্বরবাদের ইতিহাসের কয়েকটী ঘটনার একটা সমসাময়িকতা আছে। যে বৎসর মন্দিরপ্রতিষ্ঠা হয় সেই বৎসরই লিখিত হইল, "ব্রহ্মাণ্ডপতি স্বপ্রকাশ"—The Everlasting Yea (চিরন্তন "আমি আছি")। ইহা গ্রন্থাকারে পরে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু এই বৎসরই লিখিত হইয়াছিল। মানব-প্রাণের এই প্রশ্ন কেহ কোন কালে রোধ করিতে পারে নাই। ব্যাকুল অনুসন্ধানের পর, অসহনীয় বেদনা ও যাতনার পর, উত্তর আসিল। লেখক বলিতেছেন, "একদিন প্রান্ত

ক্লান্ত মনে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছি, জাগিয়া দেখি কে যেন অন্তরে প্রকাশিত হইয়াছেন, সকল দুঃখ বেদনা দূর হইয়া গিয়াছে।"

আর একটি ঘটনা, যে বৎসর মহাসমারোহের সঙ্গে মাঘোৎসব সম্পন্ন হইল, তাহারও কাছাকাছি এই সত্য প্রচারিত হইল,— "God, not spake, but speaketh"—ঈশ্বর পুরাকালে কথা বলিয়াছিলেন এরূপ নহে, (এখনও) কথা বলেন। এই কথা যিনি বলিয়াছেন তিনি জীবনের দ্বারা ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন থিওডোর পার্কার বলিলেন, "এরূপ stirring oration (প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা) শুনি নাই"। তিনি আচার্য্যদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "তোমরা যদি ভগবানের বাণী না শুনিয়া থাক, তবে তোমাদের বেদীতে বসিবার কি অধিকার আছে?" এই সত্য কথা বলিবার পুরস্কার হইল এই যে, তাঁহাকে সকলে তীব্রভাবে আক্রমণ করিলেন। এই হার্ভার্ডের বক্তৃতা সম্বন্ধে বলা হইল "Whatever in it is not pernicious is meaningless—ইহার মধ্যে যাহা নিতান্ত অনিষ্টকর নয় তাহা অর্থশূন্য"।

তৃতীয় ঘটনা, আমাদের Centenary Celebrations (শতবার্ষিক উৎসব) আর ডাক্তার এষ্টলীন কার্পেন্টার ও ডাক্তার সাণ্ডারল্যাণ্ডের ব্রাহ্মধর্ম্মের সরল ব্যাখ্যা, একই সময়ে প্রকাশিত হইল। এই তিনটি ঘটনা স্মরণ করিয়া অন্য দেশের সহিত আমাদের একেশ্বরবাদের আধ্যাত্মিক যোগ অনুভব করিতে পারি।

ডাক্তার কার্পেন্টার বলিলেন, "I had not sought God, but he sought me—আমি ব্রহ্মকে খুঁজি নাই, তিনিই আমাকে খুঁজিয়াছেন"। ইহাতে দূরদেশে যাঁহারা ব্রহ্মবিশ্বাসী তাঁহাদের নিকট আমরা কত সায় পাই! এই সমসাময়িকতা চিন্তার ও আনন্দের বিষয়। তিনি স্বপ্রকাশ, তাঁহার বাণী শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা চিন্তার বিষয়, প্রার্থনার বিষয়, নিবেদন করিবার বিষয়। পথহারা মানবের অন্তরে বাণীরূপে প্রকাশিত হইয়া তিনি পথ বলিয়া দিতেছেন। তাই আশা করিয়া আমরা আসিয়াছি এবং তাঁহার কৃপায় নির্ভর করিয়া উৎসবে প্রবৃত্ত হইতেছি।

তুমি জানাইতেছ, তোমার দর্শন ব্যতীত, স্পর্শ ব্যতীত বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই, অন্য গতি নাই। আনন্দধারা বহিতেছে, উৎসবে তুমি ডাকিয়া আনিয়াছ। তুমি তোমার পূজার পুরোহিত, তুমি তোমার পূজা করাইয়া লও। ইহাতেই পরিত্রাণ। "তোমার মহিমা মহাপাপীর পরিত্রাণে কিছু যায় জানা।" আমাদের পরিত্রাণ করিয়া সে মহিমার পরিচয় দেও।

"ও অকূলের কূল, অগতির গতি, অনাথের নাথ" ইত্যাদি দ্বিতীয় সঙ্গীত হইলে পর আরাধনা, ধ্যান ও মিলিত প্রার্থনা। অনন্তর "তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে, আর কেহ নাহি যে বিপদ ভয় বারে" ইত্যাদি তৃতীয় সঙ্গীতান্তে তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন :—

As many as are led by the spirit of God they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry "Abba, Father". The spirit itself beareth witness, that we are the children of God. And if children, then heirs of God and joint-heirs with Christ.

যাহারা পরমাত্মার দ্বারা চালিত তাহারা ঈশ্বরের সন্তান। তোমরা পুনরায় দাসত্বের ভাব প্রাপ্ত হও নাই যে ভয় পাইবে; কিন্তু তোমরা পুত্ররূপে গৃহীত হইবার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছ, যাহাতে আমরা "বাবা", বলিয়া ডাকি। আমরা যে ঈশ্বরের সন্তান, পরমাত্মাই তাহার সাক্ষী; যদি সন্তান, তবে উত্তরাধিকারীও—ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী এবং খৃষ্টের সহিত তুল্যাধিকারী।

সেন্টপলের এই কয়েকটি কথা ছাত্রদের নিকট ব্যাখ্যা করিতে করিতে প্রাণে যে কি আনন্দ হইল তাহা কি করিয়া বলিব? যাঁহারা পরমাত্মার কথা শুনিয়া চলেন কেবল তাঁহারাই সন্তান, এ কথা মানি না। যাহারা তাহা করে না, তাহারাও তাঁহার সন্তান। সকলেই তাঁহার সন্তান।

Ye have not received the spirit of bondage to fear—ইহুদিদিগকে বলা হইয়াছে, "তোমরা এই সকল আদেশ বা বিধি পালন করিবে, নতুবা তোমাদের দণ্ড হইবে," সেই দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন আর তোমরা দাসরূপে ভয়ে তাঁহার পূজা করিবে না। Ye have received the spirit of adoption তোমরা পুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছ, জানিয়াছ তিনি পিতা, তাই ভগবানকে Abba, Father (পিতা) বলিয়া ডাক।

আমার এক ভক্তিভাজন বন্ধু বলিলেন, "একদিন উপাসনার সময় দেখি, যতই আমি 'বাবা' বলিয়া ডাকি, ততই আরও ডাকিতে ইচ্ছা হয়, ডাকা আর শেষ হয় না।" এইরূপে ডাকিয়াই ঘোর দুঃখের মধ্যে তিনি শান্তি পান।

The spirit itself beareth witness that we are the children of God. The Holy Spirit—the Oversoul—পরমাত্মাই সাক্ষ্য দেন আমরা তাঁহার সন্তান। তিনিই প্রাণে থাকিয়া বলিতেছেন, তিনি আমাদের পিতা, নতুবা সাহস করিয়া পিতা বলিতে পারি না। অনেক সময় তাঁহার রুদ্ররূপ দেখি, তাহাতে ভয়ে পিতা বলিয়া ডাকিতে পারি না। তিনি পরিচয় দেন বলিয়াই পারি।

If children then heirs—পিতা যদি সন্তানকে তাঁহার ধনরত্ন না দেন তবে কি উত্তরাধিকারী হওয়া যায়? তবে কি পিতার উপযুক্ত কার্য্য হয়? তিনি তাঁহার ধন আমাদিগকে দিবেন। আমি মলিন, অযোগ্য, তবু তাঁহার পুণ্য দিতেছেন, আরও দিবেন। আমি অপ্রেমিক, তিনি প্রেম দিবেন, চিরদিন অপ্রেমিক থাকিব না। আমি দুঃখ তাপে দগ্ধ, তিনি শান্তি দিবেন। আত্মাতে উত্তরাধিকার কিরূপ? পৃথিবীর ন্যায় পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার ধন সম্পত্তি পাইব তাহা নয়, এখনই তাহা পাইব। পরম পিতার ভাণ্ডার অনন্ত, যত দেন, ততই থাকে, কিছুতেই ফুরাইবে না।

আমাদের প্রাণ নানাপ্রকার পাপ তাপের স্থান। সকলের

দুঃখ স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করি। এক অতি দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার কন্যার কষ্টের কথা শুনিয়া বলিলেন, "সে মনে করুক আমি মরিয়া গিয়াছি, এক মুষ্টি অন্নও আমি তাঁহাকে দিতে পারি না।" পরম পিতা আমাদের সেরূপ পিতা নহেন। তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডার কিছুতেই ফুরায় না। আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। সাধু জনেরা কি আনন্দে ক্লেশ যাতনা বহন করিয়াছেন, পরম পিতার প্রেমের সাক্ষ্য দিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন! আমি অধম জনও সাক্ষ্য দিতে পারি। পাপ সন্তাপের তুল্য কোনও সন্তাপ নাই। আশা পাইতেছি, তিনি বলিতেছেন "পাপ থাকিবে না, আমি আছি, আমি তোমার প্রাণের প্রাণ, এই সত্য উপলব্ধি কর, তোমার পাপ সন্তাপ থাকিবে না।" এই টুকু পর্য্যন্ত পাইয়াছি। তাঁহাকে এখনও সেরূপ ভাবে পাই নাই যাহাতে ইহা অপেক্ষা অধিক বলিতে পারি। এমার্সন বিনয় পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, We are all great, all rich in God—আমরা সকলেই ব্রহ্মকে পাইয়া ধনী। অনুতাপের অবকাশ নাই, বিনয়ের অবকাশ নাই, তাঁহার প্রকাশের আনন্দেই পূর্ণ তৃপ্তিবোধ, গৌরবানুভব। পাপ সম্বন্ধে আইজায়ার উক্তি—"Though thy sins be red as blood yet they shall be white as snow—তোমার পাপ যদি রক্তের ন্যায় লালও হয় তথাপি তাহা বরফের ন্যায় সাদা হইয়া যাইবে," স্মরণ করিয়া আগে ভাবিতাম, ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে? বানিয়ান্ বলিয়াছেন, "তুই ভাবিস্ না, তোর পাপের বোঝা পড়িয়া যাইবে।" এখন বুঝিতে পারিতেছি, তাঁহার পুণ্য তিনি দান করিতেছেন, আরও দিবেন। এই বেদী হইতে আমাদের আচার্য্যগণ অতি অমূল্য কথা বলিয়াছেন। এক বন্ধু আরাধনার মধ্যে বলিলেন "তোমার প্রকাশে জগৎ এক প্রকাণ্ড তীর্থ হইয়া রহিয়াছে।" এরূপ আরও কত সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে!

থোরো বলিয়াছিলেন, ওয়াল্ডেন হ্রদের তীরস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে আমি দেখাইব যে ছয় সপ্তাহের পরিশ্রমে বৎসরের খরচ চলিয়া যায়। হৃদয়-ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও প্রেমের বীজ রোপণ করিয়াছি, তাহাও সুন্দর ফসল উৎপন্ন করিবে। সকল অভাব দূর করিয়া দিবে।

ভগবান দিতেছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সাধন বলিয়া একটা জিনিষ আছে। পিতার ধন যে পাইব তাহার জন্য চেষ্টা করা চাই। প্রধান সাধন, পাপস্মরণ, অনুতাপ—অপরাধ স্বীকার করিয়া দ্বারে বলিতে হইবে, তাহা না হইলে কৃপা কেমন করিয়া পাইব? তোমায় না হইলে দিন চলে না, এইভাবে পড়িয়া থাকা চাই। প্রেম নাই, আমি অপ্রেমিক, এইজন্য লজ্জা ও বেদনা থাকা চাই। একজন জারম্যান সন্ন্যাসীকে একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, এক কথায় খৃষ্টধর্ম্মের মর্ম্ম কি করিয়া বলিয়া দেওয়া যায়? উত্তর—Love thy neighbour as thyself, তোমার প্রতিবেশীকে আপনার ন্যায় ভালবাস। প্রেমই সকল ধর্ম্মের সার। আমাদের সেই প্রেমের বড়ই অভাব। কোথায় সেণ্ট ফ্রান্সিস্, কোথায় চৈতন্য, আর কোথায় আমরা পড়িয়া আছি!

শাস্ত্রী মহাশয় এই বেদী হইতে বলিয়াছেন, সুন্দরকে সকলেই ভালবাসে, কুৎসিৎকে ভালবাসিতে পারিলেই প্রকৃত ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রফেসার কেনি বলিয়াছেন, আমার পিতা লণ্ডনের অতি কুৎসিৎ পল্লীতে দুরাচার লোকদের মধ্যে ধর্ম্ম-যাজকের কার্য্য করিতেন। উহাদিগকে তিনি ভালবাসিতেন। উহারাও ভগবানের কৃপায় পবিত্র ও সুন্দর হইবে, ইহা ভাবিয়া ভালবাসিতে হইবে। জনৈক খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক প্রাণদণ্ডের আদেশ-প্রাপ্ত অপরাধীর কাছে যাইয়া প্রার্থনা করিলেন, বলিলেন, ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর। শাস্ত্রী মহাশয়ও আমাদের একটি যুবকের নিকট জেলে যাইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অপরাধীর প্রতি স্নেহশীল হইতে হইবে। কার্লাইল তাঁহার Past and Present নামক গ্রন্থে একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—His misconduct, that also is his misfortune,—তাঁহার দুশ্চরিত্রতাও তাঁহার একটা দুর্ভাগ্য। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, আমাদের দীনতা হীনতা অনুভব করিয়া, যদি প্রতিদিন তাঁহার কৃপা ভিক্ষা না করি, তবে কিরূপে তাঁহাকে পাইব?

প্রেমপরিবার কি সুখের বস্তু, কি স্বর্গীয় বস্তু! The kindred points of Heaven and home—গৃহপরিবার ও স্বর্গ দুই একই সূত্রে গ্রথিত, পরস্পর সম্বদ্ধ। আমি স্নেহশীল হইতে চেষ্টা করিতেছি কি না, ইহা নিয়ত প্রার্থনার বিষয়, সাধনের বিষয়। তিনি কি স্নেহের বীজ অন্তরে রোপণ করেন নাই? সন্তানকে যেরূপ স্নেহ করি সেরূপ স্নেহ কি সকলকে দিতে পারি না? সাধনের দ্বারা পিতার ধন লাভ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। আমি যদি ব্যাকুল হইয়া সাধন না করি, তবে সে ধন কি করিয়া লাভ করিব? ব্যাকুল অন্তরে সে প্রেম প্রার্থনা করিতে হইবে, যাহা hopeth all things, endureth all things (সবই আশা করে, সবই সহ্য করে)। আশা ছাড়িয়া দিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করা হইবে না। মনিকা বিপথগামী সন্তানের জন্য ৪০ বৎসর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। জর্জ্জ মুলার কোনও বন্ধুর জন্য ৬০ বৎসর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মুলারের মৃত্যুর পর একজন তাঁহার জীবনীলেখককে জানাইলেন যে অবশেষে সেই লোকের জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। একমাত্র উপায় প্রগাঢ় প্রেম।

স্বামীর স্বভাবের পরিবর্ত্তনের কথা সে দিন আচার্য্যমুখে শুনিয়াছি। শোকের অপেক্ষাও দুঃখ আছে। আমেরিকার একখানা কাগজে How to meet desperate situations (মহাসঙ্কটে কি উপায় অবলম্বন করা যায়) নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। কত প্রকার মহাসঙ্কট উপস্থিত হয় লেখক তাহার কথা আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কিছু মীমাংসা করিতে পারেন নাই, প্রকৃত উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

We laugh and grin and chuckle at a brother's shame, However we may brave it out, we are a little breed—আমরা ভাইয়ের অধঃপতনে হাসি তামাসা করি। আমরা যতই বড়াই করি না কেন, আমরা ছোট লোক।

সকলের দুঃখে দুঃখ অনুভব করিলে হৃদয় মহৎ হয়। চিরদিন দুঃখ থাকিবে না। "শান্ত অদ্বিতীয় চরণে" বিকাইলে কোনও দুঃখ তাপ থাকিবে না। "বঞ্চিত হওরে কেন লভিতে পরম ধন ?" অবর্ণনীয় রূপের পরিচয় পাইলাম। সে রূপে মুগ্ধ হইলে কিছুতেই শান্তি হরণ করিতে পারে না।

নিয়ত সন্ধান করিতে হইবে। ইহা মনে রাখিতে হইবে, Knock and it shall be opened unto you—দ্বারে আঘাত কর, নিশ্চয়ই দ্বার খোলা হইবে। নিয়ত প্রার্থনা করিতে হইবে। "পিতা, খোল দ্বার", অনেক সময়ই এই প্রার্থনা করি। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "অনেক সন্ধানে পাইয়াছি।" শাস্ত্রী মহাশয় এই বেদীতে বসিয়া ক্রন্দন করিয়াছেন। "সংশয় তিমির মাঝে" একটি পা রাখিবার স্থান প্রার্থনা করিয়াছেন। শেষে দার্জ্জিলিংএর একটি উপদেশে কি শান্তির সাক্ষ্য দিলেন! আগে ব্যাকুল ক্রন্দন, তার পর শান্তি।

এমন লোক চাই যাঁহারা আরামের, শান্তির সাক্ষ্য দিতে পারেন। আমাদের মধ্যে এরূপ লোকের বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে।

তিনি যখন তাঁহার পরিচয় কিছু দিয়াছেন, তখন দ্বার ছাড়িয়া যাইব না। তাঁহার দ্বারেই পড়িয়া থাকিব।

আমার সন্তান, আমার ভাই ভগিনী যেরূপ আমার প্রিয়, সকল পরিবারের সকল সন্তান, সকল ভাই ভগিনী সেরূপ প্রিয় হইতে পারে। তিনি প্রেমের ভাণ্ডার, আমরা প্রেম পাইব না, এমন হইতে পারে না।

প্রেমের তুল্য মিষ্ট বস্তু আর কিছু নাই। এই প্রেম আমরা পাইব। তাঁহার চরণে অভাব নাই। নিয়ত যেন প্রার্থনা করিতে পারি। সাধন করিতে হইবে, ব্যাকুল প্রার্থনার দ্বারা সাধন করিতে হইবে। আমরা উৎসবের সময় ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি। একদিন কল্যাণ প্রার্থনা করিলে আর হইল কি ? নিয়ত সকলের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে।

আমরা যেন এক পরিবার হই। সে সুখের আভাস তিনি দিয়াছেন। তাহার আস্বাদ অনেক সময় পাইয়াছি। তাহার জন্য আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। ধন পাইয়াও অনেকে অনেক সময় অবহেলায় ও অপরাধে উহা হারায়। বিষয়বাসনার বশে সুখের আশায় অপবিত্রতার মধ্যে যদি গেলাম, তবে কেমন করিয়া তাঁহাকে পাইব ? কামনাহরণ তিনি, তাঁহাকে পাইতে হইলে অপর সকল কামনা বর্জ্জন করিতে হইবে। আর, ক্লেশকর সাধন লইতে হইবে। অপরের বেদনাকে আপনার করিয়া লইতে হইবে।

ব্রহ্মরূপের প্রকাশে যে অসীম সুখ তাহা স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে—তোমার পূজার তুমি পুরোহিত, একটু স্থান দাও যেখানে বসিয়া তোমার পূজা করিতে পারি।

হে জগতকারণ, তুমি আমাদের সকলের প্রাণের প্রাণ হইয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বস। কেবল তোমাকে লাভ করাই আমাদের এক মাত্র লক্ষ্য হউক। সকলের ভার তুমি লও; সকলের পথপ্রদর্শক হও, সর্ব্বত্র তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত কর। সাধনে নিষ্ঠা দেও, সকলকে তোমার করিয়া লও।

১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) সোমবার—প্রাতে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম হস্তগত হইলে পরে প্রকাশিত হইবে।

অপরাহ্নে মেরী কার্পেণ্টার হলে রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের পুরস্কারবিতরণ। মিসেস ব্রাউন সভানেত্রীর কার্য্য করেন। প্রার্থনান্তে বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পঠিত হয় ও বালক বালিকাগণ আবৃত্তাদি করেন।

সায়ংকালে মন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার অধিবেশন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার সভাপতির কার্য্য করেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে কুমারী শকুন্তলা রাও তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন না হওয়াতে ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত অধিবেশন স্থগিত করা হয়।

১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—প্রাতে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম হস্তগত হইলে পরে প্রকাশিত হইবে।

অপরাহ্নে বালকবালিকাসম্মিলন। তাহাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রার্থনা করেন এবং শ্রীমতী কুমুদিনী বসু ও শ্রীমতী নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী তাহাদিগকে কিছু উপদেশ দেন। বাল্যদান ভাণ্ডারে তাহাদের দান সংগৃহীত হয়। অনন্তর অন্যান্য বৎসরের ন্যায় স্যার নীলরতন সরকারের ব্যয়ে তাহাদিগকে আহার করান হয়।

সায়ংকালে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ "সমাজ-সংস্কার" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) বুধবার—সায়ংকালে সঙ্গত সভার উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী "নিগূঢ় ধর্ম্ম—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৬ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—প্রাতে কাঙ্গালী-বিদায়। সায়ংকালে সংকীর্ত্তনে উপাসনা। শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে তাহা পরিচালন করেন।

১৭ই মাঘ (৩১শে জানুয়ারী) শুক্রবার—সায়ংকালে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র "জাতীয় সমুত্থান" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৮ই মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী) শনিবার—সায়ংকালে ইংরাজীতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১৯শে মাঘ (২রা ফেব্রুয়ারী) রবিবার—প্রাতে উপাসনা। তাহাতে শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে তিন সমাজের সম্মিলিত

উদ্যান-সম্মিলন। তাহাতে মহারাণী সুচারুদেবী উপাসনা করেন। এবং শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মল্লিক ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন কিছু পাঠ করেন ও প্রসঙ্গাদি হয়; অনন্তর প্রীতিভোজন। সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনা। তাহাতে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

মাঘোৎসবের এই শেষ উপাসনার ভার যাঁর উপর থাকে তাঁর কাছ থেকে আশা করা হয় যে, তিনি তাঁর উপদেশে সমগ্র উৎসবের ভাব, অন্ততঃ তার কিঞ্চিদংশ উপাসকমণ্ডলীকে দিবেন। এই কাজটী বড় কঠিন, কিন্তু কঠিন হোলেও আমি তা সাধ্যানুসারে কত্তে চেষ্টা করবো। কাজটীর বিশেষতঃ এই জায়গায় যে একই উপদেশ বা বক্তৃতার সারভাগটা কি, এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা হয়, আর বিবরণ দিতে গিয়ে কতটুকু বলা উচিত কত টুকু অমুক্ত থাকা উচিত সে সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন মত হয়। মোট কথা—বিবরণটা ব্যক্তিগত রুচি ও ভাবের দ্বারা রঞ্জিত না হ'য়েই যায় না। সুতরাং আমি উৎসব সম্বন্ধে যা বলতে যাচ্ছি তা আপনারা আমার ব্যক্তিগত ধারণা ও মন্তব্য ব'লেই গ্রহণ করবেন।

১লা জানুয়ারি থেকে মন্দিরের প্রাত্যহিক উপাসকমণ্ডলীর সংশ্রবে মাঘোৎসবের প্রস্তুতি কল্পে দিন কয়েক আলোচনা হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে এই চেষ্টা তেমন ফলবতী হয়নি, কিন্তু এবারে ঈশ্বরকৃপায় কিছু ফল পাওয়া গিয়েছে। আলোচনায় মণ্ডলীর নিয়মিত সভ্য ছাড়া আরো কয়েকজন আগ্রহবান্ ব্যক্তি উপস্থিত হোতেন। আলোচনা খুব হৃদয়গ্রাহী হ'তো। উৎসবে ব্রহ্মকৃপা বিশেষ ভাবে বর্ষিত হ'য়ে আমাদিগকে ঐকান্তিক ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত করুক, এই আকাঙ্ক্ষাই মণ্ডলীর মধ্যে প্রবল দেখা যেতো আমি এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই উৎসবে প্রবেশ ক'রেছিলাম আর উৎসবের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে এই আকাঙ্ক্ষারই ইন্ধন অন্বেষণ করেছি।

৪ঠা মাঘ শ্রদ্ধাস্পদ কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে যে উপাদেশ দেন তাতে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার আদর্শ ও প্রণালীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। অনেক ব্রাহ্মের জীবন এই উপাসনাসাধনে বিশেষভাবে প্রভাবিত ও উন্নীত হয়েছে। স্বর্গীয় মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দও এই উপাসনায় আকৃষ্ট হ'য়ে সমাজের সহিত শ্রদ্ধাযোগে যুক্ত হ'য়েছিলেন।

৫ই মাঘ প্রাতে ব্রাহ্মযুবক সমিতির উৎসব উপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটি অতি উপাদেয় ও সময়োচিত উপদেশ দেন। তরুণ বয়সেই ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করবার আবশ্যকতা, ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান নেতৃগণ, অন্য ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণ, এবং আরো অনেক সমাজনেতা যে যৌবন বয়সেই ধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন, সর্ব্বকল্যাণকর কার্য্যের সহায় মঙ্গলময় ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না থাকলে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারচেষ্টা ভিত্তিহীন ও পরিণামে নিষ্ফল হয়, এ সকল কথা উপদেষ্টা অতি পরিষ্কাররূপে বুঝিয়ে দেন। মাধ্যাহ্নিক আলোচনার সভাপতি তাঁর শেষ বক্তৃতায় দেখাতে চেষ্টা করেন যে স্বাধীনতা ও স্বরাজচেষ্টার মূলে শ্রদ্ধা ও বিবেকানুসারিতা না থাকলে সেই চেষ্টা স্বার্থপরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্য্যবসিত হয়। সায়ংকালে শ্রমজীবীদিগের উৎসব উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় প্রচারক অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় উপাসনান্তে ঈশ্বরে ঐকান্তিক আত্মসমর্পণ বিষয়ে উপদেশ দেন।

৬ই মাঘ প্রাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বেদান্তবাগীশ উপাসনা করেন এবং উপদেশে বৌদ্ধ ও শাঙ্কর বৈরাগ্যের সহিত মহর্ষিদেবের বৈরাগ্যের তুলনা ক'রে দেখান যে এই শেষোক্ত বৈরাগ্য ঈশ্বর-প্রীতি-সম্ভূত। ইহার ফলে মহর্ষি ঈশ্বরকে লাভ করেছিলেন এবং তৎসঙ্গে পূর্ব্বপরিত্যক্ত বৈভবও পুনঃপ্রাপ্ত হ'য়েছিলেন। সায়ংকালে তিন সমাজের মিলিত মহর্ষিতর্পণে সমাজত্রয়ের মৌলিক একত্ব দৃঢ়ীকৃত হয়।

৭ই মাঘ প্রাতে শ্রদ্ধেয় মথুরানাথ নন্দী মহাশয় উপাসনান্তে সাধু পল ও সাধু সুন্দরসিংহের উৎসাহময়ী জীবনী বিবৃত ক'রে ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে উপদেশ দেন। সায়ংকালে ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে নির্ব্বাচিত বক্তা মেয়র সেনের অনুপস্থিতিতে অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় বহুল আখ্যায়িকাযোগে জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

৮ই মাঘ প্রাতে শ্রদ্ধেয় ললিতমোহন দাস মহাশয় উপাসনান্তে কতিপয় মূল্যবান্ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বিবৃত ক'রে উপদেশ দেন। সায়ংকালে "ভক্তিধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। তাতে প্রথমে এই দেখাবার চেষ্টা করা হয় যে ধর্ম্মবিষয়ে ঔদাস্য এবং ভক্তিসাধনে শৈথিল্য অনেক স্থলেই সরল বিশ্বাস ও যৌক্তিক মতের ফল নহে, প্রবল বিষয়াসক্তি ও মানসিক চঞ্চলতার ফল। তৎপরে ভক্তিধর্ম্মের তাত্ত্বিক ও নৈতিক ভিত্তি দেখিয়ে ভক্তিসাধনের একান্ত সহায় ভক্তগোষ্ঠীগঠনের আবশ্যকতা প্রদর্শিত হয়।

৯ই মাঘ প্রাতে সিটিকলেজ-গৃহে শ্রদ্ধেয় প্রচারক নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপাসনান্তে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বিষয়ে উপদেশ দেন। মন্দিরে মহিলাদের উৎসবে সরকারজায়া শ্রীমতী হেমলতা দেবী উপাসনা করেন এবং পরিবারে ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে মহিলাদের দায়িত্ব বিষয়ে উপদেশ পাঠ করেন। সায়ংকালে এলবার্ট হলে তিন সমাজের মিলিত উপাসনা হয়। এতে সমাজত্রয়ের মৌলিক একতা উজ্জ্বল রূপে সূচিত হয়। এরূপ মিলিত কার্য্য যত হয় ততই ভাল। এতে যে তিন সমাজের বিশেষত্ব বিলুপ্ত হবে তা আশা করি না, কিন্তু এতে এই সুফল হবে যে আমরা পরস্পরের বিশেষ মত ও সাধনকে সম্মানের চক্ষে দেখতে শিখব।

১০ই মাঘ প্রাতে শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় উপাসনান্তে ভক্তিসাধনের আবশ্যকতা বিষয়ে উপদেশ দেন। মধ্যাহ্নে তাঁরই সভানেতৃত্বে স্বর্গীয় প্রচারক নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের স্মৃতি-তর্পণ আচার্য্য-জায়া শ্রীমতী সুবালা দেবী প্রভৃতি

দ্বারা সম্পন্ন হয়। বৈকালিক নগর সংকীর্ত্তনের তিনটি দল দেখে আমার মনে বিশেষভাবে এই চিন্তার উদ্রেক হয় যে ইদানীং বালক ও বালিকাদের স্বতন্ত্র দল ক'রে সমাজ তাদিগকে উৎসবে আগ্রহান্বিত করবার বিশেষ আয়োজন করেছেন। বিশেষতঃ মেয়েদের স্বতন্ত্র দল সৃষ্টি ক'রে দেশের সামাজিক ও নৈতিক হাওয়া বদলাবার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করেছেন। সায়ংকালে শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার শালকৃষ্ণ আচার্য্য উপাসনান্তে এই ভাবে উপদেশ দেন যে যেমন প্রতি বৎসরে উত্তরায়ণে বৃক্ষলতা শীর্ণপত্র ত্যাগপূর্ব্বক নববেশ ধারণ করে, এবং নির্দ্দিষ্ট কালবশে প্রাণী দেহ জীর্ণ অংশগুলি পরিত্যাগ এবং নবীন অংশ ধারণপূর্ব্বক বস্তুতঃ পুনর্জীবিত হয়, তেমনি আমরা আশা করি যে উত্তরায়ণে সমাগত মাঘোৎসব আমাদের পুরাতন মলিন আকাঙ্ক্ষা ও অভ্যাসগুলিকে ধৌত ক'রে আমাদিগকে নবজীবন দান করবে।

১১ই মাঘের প্রাতঃকালীন কার্য্য সময়োচিত ভাব ও আবেগ পূর্ণ হয়েছিল। বিশেষতঃ উপদেশ খুব প্রাণস্পর্শী ও উৎসাহোদ্দীপক হয়েছিল। আচার্য্য—শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী —নবজীবনপ্রাপ্তির বিষয় বলেন। প্রাকৃত জীবন অতিক্রম ক'রে নব আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করলে মানুষ ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। ব্রহ্মার্পিত জীবনে কখনও নিরাশা আসে না। এরূপ ব্যক্তি নিজের ভিতরে ঈশ্বরের জীবন্ত সত্তা অনুভব ক'রে নিত্য আশান্বিত থাকেন। ক'জন মানুষ তাঁর সহায়, তাঁর দলভুক্ত, তা তিনি দেখেন না। একমাত্র ব্রহ্মকৃপার উপরই তিনি নির্ভর করেন। মধ্যাহ্নে শ্রদ্ধাস্পদ বরদাকান্ত বসু মহাশয় উপাসনা করেন। [তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ "তত্ত্বকৌমুদী"র পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।] বৈকালিক ইংরেজী উপাসনান্তে অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ গীতার শ্রীকৃষ্ণ ও নিউটেষ্টেমেন্টের সাধু পলের বচন উদ্ধৃত ক'রে ব্রহ্মে সমুদায় কর্ম্ম সমর্পণের উপদেশ দেন। সায়ংকালে শ্রদ্ধাস্পদ কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় উপাসনান্তে এই মর্ম্মে উপদেশ দেন যে ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে এসে বহুসংখ্যক লোক শান্তি ও নবজীবন লাভ করেছেন।

১২ই মাঘ প্রাতে সাধনাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে বাবু সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাধনাশ্রমস্থাপনের বিশেষ উদ্দেশ্য বিবৃত ক'রে উপদেশ দেন। সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে সমর্পিত কতিপয় জীবন প্রস্তুত করা এবং সমাজমধ্যে একটা আধ্যাত্মিকতার হাওয়া সৃষ্টি করা—ইহাই সেই উদ্দেশ্য। মাধ্যাহ্নিক প্রচারবিষয়ক আলোচনার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা রায়সাহেব শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের প্রস্তাব—একটী বিশেষ পরিব্রাজকদলের সৃষ্টি। প্রস্তাবক বিশেষ অর্থসাহায্য অঙ্গীকার ক'রে প্রস্তাবিত বিষয়ে ঐকান্তিক আগ্রহের পরিচয় দেন। সায়ংকালীন উপাসনান্তে আচার্য্য অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় বহু আখ্যায়িকা ও উদ্ধৃত মহাজনোক্ত সংযোগে ব্রহ্মপ্রেম লাভ এবং মানবপ্রীতি সম্বন্ধে আবেগপূর্ণ উপদেশ দেন।

১৩ই মাঘ প্রাতে আচার্য্য শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই মর্ম্মে উপদেশ দেন যে প্রেমই ঈশ্বরকে মানুষের এবং মানুষকে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী করে। প্রেম না থাকলে কেবল দেশকালের নৈকট্য আত্মার ব্যবধান দূর করতে পারে না। সায়ংকালে সমাজের বার্ষিক সভার অধিবেশন কেবল উল্লেখমাত্রেই যোগ্য, সে সম্বন্ধে এস্থলে আর কিছু বক্তব্য নেই।

১৪ই মাঘ প্রাতে শ্রদ্ধেয় প্রচারক অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয় উপাসনান্তে ঈশ্বরনিষ্ঠা বিষয়ে উপদেশ দেন এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের উল্লেখ করেন যাঁরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে ব্রহ্মোপাসনায় পরম তৃপ্তি লাভ করেছিলেন এবং সেই তৃপ্তির বলে শেষ দশায় ধননাশেও অবিচলিত ছিলেন। অপরাহ্নে বালকবালিকা সম্মিলনে শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বালকবালিকাদিগকে উপদেশ দেন এবং তৎপরে সাধু নীলরতন সরকার মহাশয় তাহাদিগকে প্রীতিভোজন করান। সায়ংকালে অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ সমাজসংস্কার বিষয়ে একটী গভীর চিন্তাপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা করেন। প্রকৃত সমাজসংস্কার অতি জটিল ব্যাপার, ইহার জন্য ব্যক্তিগত ও জাতীয় চরিত্রের বিশুদ্ধীকরণ আবশ্যক এবং ঈশ্বরবিশ্বাস ইহার ভিত্তি—ইহাই বক্তৃতার সার কথা।

১৫ই মাঘ সায়ংকালে অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বেদান্তবাগীশ "নিগূঢ়ধর্ম্ম—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তাতে তিনি হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টীয় নিগূঢ়ধর্ম্মে (Mysticismএর) মৌলিক একতা ও ঐতিহাসিক যোগ দেখিয়ে বিশেষ ভাবে সাধ্বী টেরেসার সাধনাভিজ্ঞতার বর্ণনা ক'রে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন।

১৬ই মাঘ সায়ংকালে শ্রদ্ধেয় মাণিকলাল দে মহাশয়ের পরিচালিত কীর্ত্তনের দল সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন।

১৭ই মাঘ সায়ংকালে শ্রদ্ধাস্পদ কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় আধুনিক জাতীয় জাগরণ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সর্ব্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত হ'য়ে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা যে স্বাভাবিক এবং সর্ব্ববিধ উন্নতির নিদান, তা ব্যাখ্যা ক'রে তিনি দেখান যে ধর্ম্মকে ত্যাগ ক'রে জাতীয় উন্নতির প্রয়াস কচ্ছে এবং ভারতবর্ষেও যে কতিপয় লোক সেই প্রয়াসের পক্ষপাতী, তার কারণ উভয় দেশে ধর্ম্মের গ্লানি এবং ধর্ম্মের নামে পরাধীনতা-সমর্থন। পক্ষান্তরে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম স্বাধীনতার বিরোধী হওয়া দূরে থাক্, উহা সর্ব্বপ্রকার সাধু উদ্যমের সহায় এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় শক্তির উৎস।

১৮ই মাঘ অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় ইংরেজীতে উপাসনা করেন এবং এই মর্ম্মে উপদেশ দেন যে বিজ্ঞান ও শিল্প ঈশ্বরকে নিকটে আনিতে পারিলেই মানবের বিশেষ কল্যাণকর হয়। জগতের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ বস্তু প্রেম, এবং ইহাই একমাত্র স্থায়ী ও নিত্য বস্তু।

অদ্য প্রাতে এই মন্দিরে শ্রদ্ধাস্পদ নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করেছেন। তিন সমাজের উদ্যান সম্মিলনে ময়ূরভঞ্জের রাজমাতা মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী আচার্য্যের কার্য্য করেন। বহুদিন পরে তিন সমাজের ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাদের এই ঘনিষ্ঠ মিলন অতি মধুর বোধ হলো।

এখন আমার বিশেষ বক্তব্য বলি। স্থায়ী ভক্তিজীবন লাভের যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলাম, বিবৃত কার্য্যাবলীর ভিতরে সে আকাঙ্ক্ষার যথেষ্ট ইন্ধন পাওয়া যায়। আশা করি আমার এবং অন্য অনেকের পক্ষে এই উৎসব সেই জীবনলাভের সহায় হবে। আমি এই ভক্তিধর্ম্ম সম্বন্ধে আজও কিছু বল্‌বো। ৮ই মাঘের বক্তৃতায় যে সকল কথা বলেছিলাম সে সকল কথারই কোন কোন কথা একটু বিস্তৃত ক'রে বলবো, নতুন কিছু বল্‌তে পারি আর নাই পারি। ভক্তিহীন ধর্ম্মও জগতে আছে। প্রাচীনকালের তো কথাই নাই, আধুনিক সময়েও দেশে বিদেশে ভক্তিহীন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হোচ্ছে। কিন্তু ইতিহাস ও নিজজীবনের অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে ভক্তিহীন ধর্ম্ম ব্যক্তি বা জাতি কাহাকেও শুদ্ধ কত্তে পারে না এবং শান্তি আর আনন্দও দিতে পারে না। ভক্তিহীন ধর্ম্ম মানবপ্রকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল উপাদান যে ভাব—তাকে বাদ দিয়ে চিন্তা করে। এই জায়গাতেই ইহা মারাত্মক ভুল করে। বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতি—শ্রীচৈতন্য ও ভক্ত রামপ্রসাদের স্বজাতি—যে কোন দিন ভক্তিশূন্য ধর্ম্মে, ভাবশূন্য উপাসনায় বা উপাসনাশূন্য কর্ম্মে তৃপ্ত হবে তা আমার বিশ্বাস হয় না। যাঁরা তা মনে করেন তাঁরা স্বজাতিকে চিনেননি আর এই যুগের ধর্ম্ম কেন বঙ্গদেশে আবির্ভূত হলো তাও বুঝেননি। যাহোক্ ভক্তিধর্ম্মের ভিত্তি সম্বন্ধে যা সে দিন বলেছিলাম তাই প্রকারান্তরে পুনরুক্তি করি। যতদিন দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর

শিক্ষা আসেনি ততদিন জ্ঞানশূন্য বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে ভক্তি-সাধন সম্ভব হয়েছিল। এখনও যে স্থলে শিক্ষা নাই, অথবা কেবল সাহিত্যিক শিক্ষা আছে, সেখানে তা সম্ভব। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীর শিক্ষা, অর্থাৎ জড়, জীব, আত্মা, নীতি, সমাজ, ধর্ম্ম, ইতিহাস—সকল বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ-মূলক চিন্তা এসে পড়েছে, সেখানে আর শাস্ত্র গুরু বা মহাপুরুষ-বাক্যের উপর নির্ভর ক'রে ভক্তিসাধন চল্‌বে না। সেখানে ভক্তির সাধ্যবস্তু ভগবান্ সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় হওয়া চাই। এই সাক্ষাৎ জ্ঞান কেবল ব্যক্তিগত থাকলে চল্‌বে না। যত দিন ইহা ব্যক্তিগত থাকবে ততদিন ইহার প্রত্যক্ষতা সন্দিগ্ধ থাকবে এবং ইহা প্রচারযোগ্যও হবে না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান কেবল ব্যক্তি-গত ব্যাপার নহে, উহা সার্ব্বজনিক বৈজ্ঞানিক বস্তু। উহা জ্ঞানোপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিমাত্রেরই কাছে আত্মপরিচয় দেয়। এই জ্ঞানলাভের প্রণালী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দার্শনিক সাহিত্যে নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, আমার সেদিনকার বক্তৃতায়ও আমি ইহা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছিলাম। এই প্রণালীর তাত্ত্বিক (theoretic) দিক্‌টা সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে এই যে, দেশকাল এবং দেশকালস্থিত রূপরসাদি বিজ্ঞানের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে এই অনুভূতির আশ্রয়রূপে এক অনন্ত নিত্য পুরুষ জীবের আত্মারূপে প্রকাশিত হন। এইরূপে নিজ আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্য্যন্ত ঈশ্বরবিশ্বাস নিঃসন্দিগ্ধ ও স্থায়ী হয় না এবং স্থায়ী ভক্তিধর্ম্মেরও প্রতিষ্ঠা হোতে পারে না। কিন্তু ভক্তিধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য জ্ঞানের তাত্ত্বিক দিক্ দেখা যথেষ্ট নহে, নৈতিক (practical) দিক্‌ও দেখা চাই। আমাদের কর্ম্মের মূলান্বেষণ কল্লে আমরা দেখ্‌তে পাব সেই মূল প্রেম,—আত্মপ্রেম ও পরপ্রেম। আর প্রেম অর্থ মঙ্গল বা শ্রেয় কর্‌বার ইচ্ছা। নিজের কল্যাণ করা আর যাকে নিজের মনে করি তার কল্যাণ করা, ইহাই প্রেমের স্বভাব। শ্রেয় বা কল্যাণের ধারণা ব্যক্তিগত জীবন, পারি-বারিক জীবন, জাতীয় জীবন ও অন্তর্জাতীয় জীবন, এই চার স্তরের ভিতর দিয়ে বিকশিত হয়। যাঁর নৈতিক চিন্তা উচ্চতম স্তরে উঠেছে তাঁর নিজ শ্রেয়বোধ সার্ব্বজনিক শ্রেয়বোধের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। এই হলো শ্রেয়বোধের পরিমাণের দিক্ (quantitative side)। গুণের দিক্ থেকে (qualitatively) শ্রেয়বোধ দৈহিক, মানসিক, ভাবগত ও আধ্যাত্মিক, এই চার স্তরে বিকশিত হয়। প্রকৃত জ্ঞানীর পক্ষে দৈহিক স্বাস্থ্য ও সুখ, জ্ঞানলাভ, প্রেম ও ভক্তির বিকাশ, সমস্তই প্রকৃত কল্যাণের অন্তর্ভূত হয়ে যায়। উদার সর্ব্বাঙ্গীন্ সাধনের প্রভাবে গুণ ও পরিমাণে পূর্ণ বিকশিত এই শ্রেয়ের আদর্শ উজ্জ্বল বিবেকালোক-রূপে আত্মাতে প্রকাশিত হয়ে সমগ্র জীবনকে নিয়মিত করে,—প্রত্যেক চিন্তা, ভাব, বাক্য ও কার্য্যকে অনুমোদন বা তিরস্কার করে। কিন্তু এই আদর্শ কেবল আদর্শ নয়, ছিন্নসত্তা (abstract) ধারণামাত্র নয়। যেমন প্রত্যেক তাত্ত্বিক জ্ঞান সাক্ষাৎ পরমাত্মার জ্ঞানময় প্রকাশ, তেমনি প্রত্যেক নৈতিকবোধ তাঁর সাক্ষাৎ ইচ্ছাময় প্রকাশ। এতে তিনি তাঁর পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ পবিত্রতা, পূর্ণ সৌন্দর্য্য, পূর্ণ মাধুর্য্য নিয়ে জীবাত্মার ভিতরে প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশিত হন। যাঁরা গভীর ধ্যানমূলক আরাধনায় অভ্যস্ত, তাঁদের নিকট এই প্রকাশ দৈনিক অভিজ্ঞতার বিষয়। এই প্রকাশে ঈশ্বরের পূর্ণতা সম্বন্ধে বিশ্বাস একবারে নিঃসন্দিগ্ধ হয়। জাগতিক ঘটনায় ঐশ্বরিক চরিত্র সাক্ষাৎভাবে প্রকাশিত হয় না, অনুমানের বিষয়ীভূত থাকে। কিন্তু আত্মাতে এই দৈব চরিত্র সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয় হয়। কোন্ ঘটনার মূলে কি মঙ্গলাভিপ্রায় আছে তা আমরা অনুমানদ্বারা জান্‌তেও পারি, না জান্‌তেও পারি; কিন্তু সাক্ষাৎ অনুভবযোগে ব্রহ্মপ্রেম দেখ্‌লে আর সন্দেহ থাকে না যে জাগতিক ঘটনামাত্রেই প্রেম-মূলক। যাঁরা উপাসনাযোগে পূর্ণ পুরুষকে সাক্ষাৎ ভাবে দেখেন না, তাঁদের সর্ব্বদাই এই ধারণাটা থেকে যায় যে আমাদের বুদ্ধিতে প্রকাশিত পূর্ণতার আদর্শ কেবলই একটা আদর্শ. এই আদর্শ কোথাও মূর্ত্তিমান হয়নি। তাঁরা মানবচরিত্রে এই আদর্শ মূর্ত্তিমান কর্ত্তে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তাঁদের ধারণা ও চেষ্টা দুইই আত্মঘাতী (suicidal)। জগৎকারণকে যে ভাবেই ভাবা হোক্, এই আদর্শপ্রকাশ যে তাঁরই কার্য্য, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাক্‌তে পারে না। সুতরাং নিরীশ্বরবাদী এই অসঙ্গত ও স্ববিরোধী কথায় বিশ্বাস করেন যে, যা কারণে নেই তা কার্য্যে আছে এবং ব্যষ্টি বা অংশ সমষ্টির চেয়ে বড়। আর তিনি যে আপন নৈতিক আদর্শ নিজ জীবনে ও সামাজিক জীবনে মূর্ত্তিমান্ কর্ত্তে চেষ্টা করেন সে চেষ্টাও অসঙ্গত। জগৎকারণ যখন প্রেমিক নন, পবিত্র নন, সুন্দর নন, মধুর নন, তখন মানবজীবনে যে এই আদর্শ মূর্ত্তিমান হবে, প্রকৃতি যে আমাদের ধর্ম্মচেষ্টার সহায় হবে, এই আশা কি একবারেই ভিত্তিশূন্য নয়? ফলতঃ ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় সমস্ত সন্দেহই যে স্ববিরোধী এবং অবিশ্বাসীর সমস্ত সংস্কারচেষ্টা যে আত্মঘাতী ও অনেক স্থলেই ব্যর্থ, তা সময় পেলে অনায়াসেই দেখান যায়। দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবনাদি ক্লেশকর জাগতিক ঘটনা দেখে যে আমরা ক্লিষ্টের সহিত সহানুভূতিতে পূর্ণ হ'য়ে তাঁদের হিতসাধন ব্যস্ত হই, আর ঈদৃশ ঘটনার মূল-কারণকে নির্দ্দয় ব'লে সন্দেহ করি, এই ভাবনাতে ইহাই মনে করা হয় যে জগৎকারণে যা নেই, যে দয়া নেই, আমাদের ভিতরে তা আছে। আমাদের দয়াটা কোথা থেকে আস্‌ছে সে কথা আমরা ভেবে দেখি না। "ঈশ্বর কি সত্যিই আমাকে ভাল-বাসেন? আমার পূর্ণ মঙ্গল চান?" এই সন্দেহমূলক চিন্তা তো যখন তখনই আমাদের মনে আসে। কিন্তু এই চিন্তা বস্তুতঃ স্ববিরোধী। আমি যে আমাকে ভালবাসি, আমি যে আমার সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ চাই, সে বিষয়ে তো আর কোন সন্দেহ নাই। তবে কি ঈশ্বরের চেয়ে আমি বেশী প্রেমিক? তা তো অসম্ভব। সুতরাং এই সন্দেহ নিজেকেই নিজে বিনাশ করে। সাক্ষাৎ ব্রহ্মযোগের অবস্থায় এই সন্দেহ আসে না, কারণ তখন আত্মজ্ঞানে ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মপ্রেমে ব্রহ্মপ্রেম সাক্ষাৎভাবে প্রকাশিত হয়।

যা'হোক্ এখন সাধনের কথা কিছু ব'লে শেষ করা যাক্। জ্ঞান তো উজ্জ্বল ভাবেই ঈশ্বরকে নিকটে, অতি নিকটে, দেখিয়ে দেয়। আধুনিক তত্ত্ববিদ্যার সাহিত্য অধ্যয়ন কল্লে দেখা যায় কোন পূর্ব্ব যুগে ব্রহ্মজ্ঞান এমন উজ্জ্বল ও সুলভ হয়নি। কিন্তু বস্তুতঃ ক'জন এই জ্ঞান লাভ কর্ত্তে চেষ্টা করে? আর যাঁরা এই জ্ঞান পেয়েছেন তাঁদের ক'জনই বা এই জ্ঞানের অনুরূপ, এই জ্ঞানবৃক্ষের অমৃতময় ফলস্বরূপ, প্রেমভক্তি লাভের জন্যে সাধন করেন? উভয় স্থলেই সাধনহীনতার ফল নৈতিক বা আধ্যাত্মিক জড়তা। জগতে প্রকাশিত জ্ঞানালোক অন্বেষণ ক'রে যে পায়নি, যার ঐকান্তিক জ্ঞানচেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে, এরূপ সরল সন্দেহবাদী (honest sceptic) অতি বিরল। বড় বড় সন্দেহ-বাদীর স্থলেই দেখা গিয়েছে তাঁরা ব্রহ্মবিদ্যার সাহিত্য সম্বন্ধে অতি অনভিজ্ঞ। সাধারণ শিক্ষিত লোকের তো কথাই নেই। আমি সে দিন ব'লেছিলাম, আজও বলি, আমি অনেকের হাতে ব্রহ্মবিদ্যার বই তুলে দিয়েছি, তারা তা ফেলে রাখে, পড়ে না, চিন্তা ও অধ্যয়নের পরিশ্রম কর্ত্তে চায় না। জ্ঞানলাভের চেষ্টাতে নৈতিক জড়তা ও ভোগাসক্তি তাদের অন্তরায় হয়, অথচ তারা সরল সন্দেহবাদীর (honest doubter এর) সম্মান চায়। যাঁরা কেবল বিশ্বাসে সন্তুষ্ট, ঈশ্বরপ্রেম সম্বন্ধে খুব বড় বড় কথা বলেন, অথচ প্রেমভক্তিসাধনে যথেষ্ট সময় ও শক্তি নিয়োগ করেন না, তাঁদের অনাধ্যাত্মিকতার মূলান্বেষণ কল্লে ঐ জড়তা ও বিষয়াসক্তিই দৃষ্ট হয়। যাঁরা জ্ঞানের পক্ষপাতী এবং জ্ঞানের মহিমাকীর্ত্তন করেন, তাঁদের দায়িত্ব এবং ভক্তিহীনতার অপরাধ আরো বেশী। যার কাছে যত উচ্চ আদর্শ প্রকাশিত হয় তার

বিচারও তত তীব্র হয়। অনেক সময়ই প্রকাশিত উচ্চ আদর্শের সঙ্গে বাস্তব জীবনের শুষ্কতা ও মলিনতা দেখে একান্ত লজ্জিত হই। এই দুর্গতির মূলে কর্ত্তব্য বিষয়ে জড়তা ও আধ্যাত্মিক শ্রমকাতরতা ছাড়া আর কোন কারণ দেখি না। নিজ অপরাধের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন ব্যতীত ব্রহ্মকৃপালাভের আর কোন উপায় দেখি না। জড়তা চ'লে গেলে সাধনের পথ উজ্জ্বলরূপেই দেখা যায়। জ্ঞান ভক্তির ভিত্তি বটে, এবং জ্ঞানলাভ ঐকান্তিক সাধনের বিষয়ও বটে, কিন্তু ভক্তির সাধন জ্ঞানসাধন থেকে ভিন্ন। স্থায়ী এবং গাঢ় ভাবই ভক্তি। এই ভাবরূপী ভক্তি সাধন কত্তে হোলে হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতাকে সযত্নে রক্ষা কত্তে হবে। কর্ম্মবাহুল্য, বাক্যবাহুল্য, কর্ম্ম ও বাক্যে ব্যস্ততা, চিত্তচাঞ্চল্য, বাক্য ও ব্যবহারে শ্রদ্ধা বিনয় ও সংযমের অভাব, এই সমস্ত ত্রুটি ও অপরাধ হৃদয়ের ভাবপ্রবণতা নষ্ট করে। ভক্তিপিপাসুকে এই সমস্ত বাধা সাবধানে পরিহার কত্তে হবে। পক্ষান্তরে ভক্তজীবনের আলোচনা, ভক্তজীবনী পাঠ প্রভৃতি উপায়ে ভক্তির উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রেখে সেই আদর্শের আলোকে নিজ জীবনের হীনতা উপলব্ধিপূর্ব্বক অবনতমস্তক হোতে হবে। সর্ব্বোপরি গভীর ধ্যানযোগে জ্ঞান-প্রকাশিত বস্তুর সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং সরস আরাধনাযোগে সেই বস্তুর মাধুর্য্য আস্বাদন ক'রে ভাব সঞ্চয় কত্তে হবে। এই সাধনে ঈশ্বরের লীলা-ব্যাখ্যায়ক সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন পরম সহায়। কিন্তু সাবধান হোতে হবে যেন গান ও কীর্ত্তনে বাদ্য ও কোলাহলের বাহুল্য না হয়। তাতে ভাবের গাঢ়তা না হ'য়ে ভাব নষ্ট হ'য়ে যায়। অগ্রসর সাধকের সরস উপাসনায় যোগ দেওয়া, যোগ দিতে না পাল্লেও তা নিষ্ঠার সহিত শোনাও ভক্তিসাধনের পরম সহায়। সমসাধক—যার সঙ্গে ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে ঐকমত্য এবং স্বরূপানুধ্যান সম্বন্ধে প্রণালীগত সাদৃশ্য আছে—এরূপ সাধকের উপাসনায় যোগ দেওয়াও ভক্তিসাধনের উৎকৃষ্ট সহায়। সমবেত উপাসনায় পরস্পরের এই গাঢ়যোগ এবং এই যোগ থেকে স্বভাবতঃ যে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার বিনিময় হয়, তাতেই ভক্তগোষ্ঠী গঠিত হয়। ভক্তগোষ্ঠী—সাধকমণ্ডলী—গঠন সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক কথা বলেছি, কিছু চেষ্টাও কচ্ছি। কিন্তু চেষ্টার ফল এপর্য্যন্ত অতি অল্পই হয়েছে। আরো বেশী চেষ্টা, আরো বেশী ফল না হওয়া পর্য্যন্ত সমাজে ভক্তিধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার কোন আশা দেখি না। এবিষয়ে প্রবীণ নবীন সকলের চেষ্টা কেন্দ্রীভূত হওয়া আবশ্যক। সমাজের আধ্যাত্মিকতা রক্ষা ও বৃদ্ধির আর কোন উপায় নাই। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

এখানেই শততম মাঘোৎসবের জন্য অবলম্বিত কার্য্য প্রণালী শেষ হইল। আমাদের অসম্পূর্ণ বিবরণও আমরা এখানে শেষ করিলাম। প্রকৃত পক্ষে উৎসবের যথাযথ বিবরণ পূর্ণভাবে দেওয়া সম্ভবপর নহে। দুঃখের বিষয়, যাহা সম্ভবপর তাহাও আমাদের নানা প্রকার অক্ষমতা বশতঃ ভালরূপে করিতে সমর্থ হই নাই। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কোন কোন বিষয়ে সফল হইতে পারি নাই। করুণাময়ের কৃপায় যেটুকু করিতে পারিলাম তাহার জন্যই তাঁহাকে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। তিনি কৃপা করিয়া সকলের জীবনে উৎসবের ফল স্থায়ী করুন্। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি পূর্ণ হউক্।

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—বিগত ১৬ই মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ ও ইন্দুভূষণ গুপ্ত তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরলোকগত নলিনীভূষণ গুপ্তের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। তাহাতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং শ্রীযুক্ত অনিমেষ দাসগুপ্ত মিঃ গুপ্তের জীবনী সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র আচার্য্যের, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাসের ও মিসেস্ সরলা রায়ের তিনখানা পত্র পাঠ করেন। স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র এবং আচার্য্যও জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলেন। উক্ত তারিখে বরিশাল নগরীতে ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত অশোকগুপ্ত কর্তৃকও তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রপাঠ ও জীবনী বর্ণন করেন।

বিগত ২০শে মার্চ্চ শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র বসুর পুত্রবধূ পরলোকগতা প্রফুল্লনলিনীর আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৫৲, দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ধনভাণ্ডারে ৩৲ ও ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

দান—শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী বসু পিতা পরলোকগত মদনমোহন বসুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ২৲ ও দাতব্য বিভাগে ১৲ দান করিয়াছেন। এই দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মা শান্তি লাভ করুন।

উৎসব—যশোহর জিলার নড়াইল সাবডিভিসনের অন্তর্গত মালিয়াট প্রমুখ নমঃশূদ্র গ্রামসমূহের অষ্টাদশ বার্ষিক ফাল্গুনোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে :—

৩০শে ফাল্গুন প্রাতে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন স্থানীয় উপাসকমণ্ডলীর আচার্য্য শ্রীযুক্ত গুরুচরণ সমদ্দারের বাসভবনে উপাসকমণ্ডলীর সঙ্গে এবং সন্ধ্যায় বালিকা বিদ্যালয়ে যুবকদের সংকীর্ত্তনের পর প্রার্থনা ও প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। ১লা চৈত্র প্রাতে রমেশ বাবু শ্রীযুক্ত নেহালচন্দ্র মোহন্তের বাড়ীতে উপাসনা করেন। নয় ঘটিকার সময় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বিশ্বাস উপাসনা করেন। ২রা চৈত্র প্রাতে ব্রহ্ম সংকীর্ত্তনের দল গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিলে রমেশ বাবু সকল সম্প্রদায়ের সাধু ভক্তগণকে স্মরণ করিয়া উপাসনা করেন। এবং ব্রহ্মবাণী শ্রবণ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। দ্বিপ্রহরে শ্রীযুক্ত রাসমোহন মিশ্রের বাড়ীতে রমেশবাবু ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনায় শ্রীযুক্ত আদিত্যচন্দ্র মৈত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৩রা চৈত্র প্রাতে শ্রীযুক্ত কালিদাস বিশ্বাস বালিকা বিদ্যালয়ে উপাসনা করেন। রমেশবাবু ও মাধববাবু প্রার্থনা করিয়া যুবকগণের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করেন।

এই গ্রামের শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিশ্র ও শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র শিকদার উপাসকমণ্ডলীর সম্পাদক ও সভাপতিরূপে নিযুক্ত আছেন। শ্রীযুক্ত রাসমোহন মিশ্র, শ্রীযুক্ত গুরুচরণ সমদ্দার, শ্রীযুক্ত কালিদাস বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত রাজবিহারী মল্লিক, শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী রায় ও শ্রীযুক্ত আদিত্যকুমার মৈত্র উপাসক মণ্ডলীতে উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত বলরাম ঘোষাল ও সীতানাথ সরকার প্রভৃতি সঙ্গীত করেন। একটী পাকা ব্রহ্ম মন্দির আছে। প্রতি রবিবার সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মমন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা হয়। শনিবার অপরাহ্নে মালিয়াট রামমোহন মধ্য ইংরেজী স্কুলে ছাত্র এবং বালিকা উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রীগণকে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে ও নমশূদ্রঃ জাতির উন্নতি কল্পে এক বিরাট সভা হইয়াছে। যশোহর ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান সৈয়দ আবদুল রউপ সাহেব সভাপতি ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন সহ সভাপতি ছিলেন। রমেশবাবু প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ অনেকেই বক্তৃতা করেন। সভায় অধিকাংশ সভ্যের মতে বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ছাত্র ছাত্রীগণকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৮ই বৈশাখ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি এ।

Registered No. 56

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ. ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৪ম ভাগ
১৫শ সংখ্যা।

১লা অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৩৭, ১৮৫২ শক. ব্রাহ্মসংবৎ ১০১
17th November, 1930.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে জীবনবিধাতা, তুমি আমাদিগকে উন্নত মহৎ ও শুদ্ধ সুন্দর করিবার জন্যই এই সংসারক্ষেত্রে পাঠাইয়াছ, প্রেম ও নানা কর্ত্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছ, সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদের ব্যবস্থা করিয়াছ। কিন্তু আমরা অনেক সময়ই ইহার মধ্যে তোমাকে না দেখিয়া, তোমার মঙ্গল ব্যবস্থা ভুলিয়া, অপ্রেম বিদ্বেষ মলিনতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার মধ্যে ডুবিয়া, সুখ সম্পদে অত্যধিক উল্লসিত ও অহঙ্কৃত, এবং দুঃখ বিপদে একান্ত মুহ্যমান ও আত্মবিস্মৃত হইয়া, জীবনের কর্ত্তব্যসকল অবহেলা করিয়া, অবনতি ও গভীর দুর্গতির পথে ধাবিত হই, মহা মৃত্যুর মধ্যে পতিত হই। তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সতত আমাদিগকে সতর্ক ও সাবধান করিয়া দিতেছ, প্রাণে শুভ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া এবং নানা উপায়ে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ধীরে ধীরে তোমার পথে একটু টানিয়া আনিতেছ বলিয়াই, নানা কর্ত্তব্যপালনে প্রকারান্তরে বাধ্য করিতেছ বলিয়াই, আমরা সে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতেছি, চিরতরে ডুবিতেছি না। আবার, তোমার কৃপাতে যখন সময় সময় তোমার স্নেহের দান বলিয়া সংসারের সমস্ত গ্রহণ করি, তখন তাহারা আমাদের কতই না সহায় হয়, কত সহজেই না উন্নতি কল্যাণ মহত্ত্ব ও পূর্ণতার পথে লইয়া যায়,—ইহা দেখিয়া বুঝিয়াও কেন যে আমরা বার বার ভুলিয়া যাই, মোহাবিভূত হইয়া থাকি, জানি না। হে অন্তরদর্শী দেবতা, তুমি আমাদের সকল ত্রুটি দুর্ব্বলতা জান। হে করুণাময় পিতা, তোমার কৃপা ভিন্ন কিছুতেই এই দুর্ব্বলতা হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারিতেছি না। তুমি আমাদিগকে সে বুদ্ধি ও বল দেও, যাহাতে আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমার অনুগত হইয়াই সংসারে বাস করিতে পারি। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের সকলের জীবনে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সম্পাদকীয়।

দোষ ক্ষেত্রের নয়, সাধনের—পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর বিগত অধিবেশনে "ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন" সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, তাহাতে ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্র বিষয়ে একটু বিশেষ-ভাবে তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল মনে হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সংসার-ক্ষেত্রেই সাধন করিতে হইবে, স্বভাবতঃই প্রায় সকলে তাহা প্রদর্শন করেন। কিন্তু জনৈক বন্ধু এরূপ মত প্রকাশ করেন যে, সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন হইতেই পারে না। আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হই নাই। আমরা অনুমান করি, তিনি তত্ত্বের দিক হইতে এই মত প্রকাশ করেন নাই। তিনি যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে পূর্ব্বকালের সংকীর্ণ আদর্শ ও ধারণা পোষণ করেন, তাহা মনে হয় না। বস্তুতঃ কোনও শিক্ষিত লোকের পক্ষে বর্ত্তমানে সেরূপ করা সম্ভবপর নয়। মতের নানা বিভিন্নতা সত্ত্বেও, ধর্ম্মটা যে আর জীবনের বিশেষ একটা অংশের বিষয় নহে, সমগ্র জীবনটাই, সকল চিন্তা ভাব কার্য্যই, যে উহার অন্তর্গত, কোনও প্রকার কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিয়া যে পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মসাধন হইতে পারে না, ধর্ম্মের এই বিশালতর আদর্শ নিশ্চয়ই সকল চিন্তাশীল শিক্ষিত লোকের চিত্তেই উদ্ভাসিত হইয়াছে। সংসারটা যে সত্যই মায়ার খেলা, ইহার বিবিধ কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিয়া, হৃদয়ের প্রেমকে সমূলে পরিশুষ্ক করিয়াও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মলাভ সম্ভবপর, এরূপ কথা আজকাল আর

কেহ বলেন না। নানা বাধা বিঘ্ন সংগ্রাম ও প্রলোভনের ভিতর মানুষ কার্য্যগত জীবনে ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া শুধু সংসারেই মজিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইয়াই তাঁহারা মনে করেন, সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন হয় না—সংসার পরিত্যাগ করিয়া বন জঙ্গলে একাকিত্বের মধ্যে, অনেক সংগ্রাম প্রলোভন হইতে মুক্ত হইয়া, চিন্তা ও ধ্যানের অনুকূল অবস্থা পাওয়া যায়, তাহাতে পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম-লাভ না হইলেও, অনেকটা ত হয়, একেবারে ধর্ম্মহীনতা অপেক্ষা আংশিক ধর্ম্মও বাঞ্ছনীয়, অথবা অপরাঙ্গ পরে নানা উপায়ে পূর্ণ করিয়া লওয়াও কঠিন হইবে না। ইহার মধ্যে যে কোনও সত্যই নাই, এরূপ কথা কেহই বলিতে পারে না। এই সংসার ভগবানেরই ব্যবস্থা, শয়তানের নয়, মানবজীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য ইহা বিশেষ অনুকূল ও একান্ত আবশ্যক, ইত্যাদি তত্ত্বাঙ্গের কথা বলিলেই যে ইহাদের সম্যক্ উত্তর প্রদান করা হয়, তাহা বলা যায় না। তাঁহারা এই তত্ত্ব অস্বীকার করেন, এমনও নহে। ইহা স্বীকার করিয়াও, কার্য্যগত জীবনে যে গুরুতর কাঠিন্য রহিয়াছে, সাধারণতঃ এ বিষয়ে সফলতার দৃষ্টান্ত যে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না, নিতান্তই বিরল, একান্ত দুর্লভ বলিলেও চলে,—এই কথাই তাঁহারা বলেন। আমরাও তাহা অনেকটা না দেখিতেছি এমন নহে। ইহার একমাত্র সম্যক্ উত্তর—যতই কঠিন হউক না কেন, সফলতার দৃষ্টান্ত যতই দুর্লভ হউক না কেন, ইহা যে একান্ত অসম্ভব নয়, সে-কথা আমাদের মধ্যে যে দুই চারিটি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, তাহার দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু এই উত্তরেই যে সকলে সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা বলিতে পারি না। কেবলমাত্র শক্তিশালী দুই চারিজনের পক্ষেই ইহা সম্ভব, সাধারণ লোকের পক্ষে নহে, এরূপ আপত্তিও সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত না হইলেও, কথাটাকে একান্ত অসঙ্গতও বলা যায় না। আমরা অধিকাংশ লোক যে সত্যই অনেকটা বিফল হইতেছি, তাহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং মূল কারণ নির্ণয় করিয়া, তাহা বিদূরিত করিবার যথোচিত উপায় নির্দ্দেশ ও অবলম্বন একান্ত আবশ্যক।

অবস্থার অনুকূলতা প্রতিকূলতা বিষয়ে বিশেষ কিছু আলোচনা করিবার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। সংসারে ও সন্ন্যাসে উভয়ত্রই অনুকূল ও প্রতিকূল দুইরূপ অবস্থাই রহিয়াছে। পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মসাধনের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সকলেই যে আংশিক ধর্ম্মজীবনলাভেও সফল হইয়াছে, সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা ত পুরাকালের ও বর্ত্তমানের ইতিহাস প্রমাণ করে না। গৃহীদিগের মধ্যে যেমন ব্যর্থতা, সাংসারিকতা, ঘোর অধঃপতনের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, গৃহত্যাগীদের মধ্যেও যে সেরূপ দেখিতে না পাওয়া যায়, এমন নহে। কাহাদের মধ্যে তুলনায় বেশী দেখা যায়, তাহা অনুসন্ধান করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কেন না, সংখ্যার ন্যূনাধিক্যে কিছু আসে যায় না। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীকেও যে পতিত হইতে দেখা যায়, ইহাই যথেষ্টরূপে প্রমাণ করিতেছে যে, গৃহ সংসার ত্যাগ করিলেই নিরাপদ হওয়া যায় না, সাধনে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। বলা বাহুল্য যে, প্রকৃত সাধনক্ষেত্র গৃহ সংসারও নয়, নির্জ্জন গিরি গুহা বন জঙ্গলও নয়—হৃদয়-ক্ষেত্রই সে স্থান, যেখানে গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েরই ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। এখন আর কেহ ধর্ম্মকে একটা বাহিরের বস্তু, কতকগুলি মত বা আচার অনুষ্ঠান মাত্র, মনে করিতে পারে না। হৃদয় মন চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ ব্যতীত যে ধর্ম্ম হইতে পারে না, এ কথা এখন সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে, কর্ত্তব্যসাধনে, সকল বিষয়ে সম ভাবে, উন্নতির পথে অগ্রসর না হইলে কিছুতেই ধর্ম্মলাভ হইতে পারে না। যেখানে যে অবস্থায়ই মানুষ থাকুক না কেন, ইহা তাহাকে অর্জ্জন করিতেই হইবে, না করিলে কিছুতেই চলিবে না। এ বিষয়ে অবস্থা হইতে সে যেরূপ সাহায্য বা প্রতিবন্ধকতাই প্রাপ্ত হউক না কেন, তাহার সফলতা ও উন্নতি মূলতঃ আপনার সাধন বা চেষ্টা যত্নের উপরই নির্ভর করে, তদভাবে যে অপরিহার্য্যরূপেই বিফলতা ও অবনতি আসিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ক্ষেত্র উর্ব্বরই হউক আর অনুর্ব্বরই হউক, বিনা কর্ষণে কোনটাই প্রয়োজনীয় ফসল প্রদান করিবে না। নিপুণ কৃষক উষর ভূমি হইতেও প্রচুর ফসল উৎপন্ন করে, আর অপরে অতি উর্ব্বর জমিতেও বিশেষ কিছু করিতে পারে না। মানবজীবন সম্বন্ধেও ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই ভক্ত সাধক দুঃখ করিয়া গাহিয়াছেন, "মনরে, কৃষিকাজ জান না, এমন মানবজমি রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোণা।"

কৃষকের পক্ষে যেমন শুধু চেষ্টা যত্ন শ্রম ও অনুরাগ থাকিলেই যথেষ্ট হইল না—এ সকল অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক হইলেও, তদতিরিক্ত আরও কিছু চাই, প্রকৃষ্ট কৃষিপ্রণালীও একান্ত প্রয়োজনীয়,—তেমনি সাধকের পক্ষেও অনুরাগ ব্যাকুলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, শ্রমশীলতা, সাধননিষ্ঠা প্রভৃতি ব্যতীত সাধনের যথোচিত প্রণালী অবলম্বন ও অনুসরণ করা একান্তই আবশ্যক, তাহা না করিলে সিদ্ধিলাভের কোনই সম্ভাবনা নাই, ব্যর্থতা সুনিশ্চিত। সাধারণতঃ ধর্ম্মসাধনের প্রণালী বলিতে যাহা বুঝায়, অদ্য সে বিষয়ে কোনও আলোচনা উপস্থিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সংসারে ধর্ম্মসাধনের প্রকৃষ্ট প্রণালী কি, সাংসারিকতা হইতে মুক্ত হইয়া কি প্রকারে সংসারে বাস করা যায়, সংসার ধর্ম্মসাধনের সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল ক্ষেত্র হইলেও, সংসারের বাহিরে পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মসাধন কিছুতেই হইতে পারে না মনে করিয়াও, কি কারণে আমরা অধিকাংশ লোক সিদ্ধিলাভে এরূপ ব্যর্থকাম হইতেছি, উন্নত ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্ষুদ্র সাংসারিক জীবনই যাপন করিতেছি, কল্যাণভ্রষ্ট হইয়া অকল্যাণের পথেই ধাবিত হইতেছি, সে সম্বন্ধেই আমরা একটু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিবার প্রকৃষ্ট প্রণালী কি, সংসারকে কি চক্ষে দেখিতে হইবে, কি ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, কিরূপে সংসারে বাস করিতে হইবে, সে বিষয়ে আমাদের যথোচিত জ্ঞানের যে কোনও অভাব আছে, তাহা আমরা মনে

করি না। এ বিষয়ে অতি উচ্চ তত্ত্ব ও আদর্শই আমরা লাভ করিয়াছি। সে তত্ত্ব কাহারও অজ্ঞাত নহে, তাহার মধ্যে গুহ্য কিছুই নাই। সমস্ত জানিয়াও আমরা কার্য্যতঃ তাহা অবলম্বন করি না, সে প্রণালীতে সাংসারিক জীবন যাপন করিতে বা সংসারে বাস করিতে কোনও চেষ্টা করি না বলিয়াই যে এরূপ ঘটিতেছে, অল্প একটু চিন্তা ও পরীক্ষা করিলেই তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। আমরা কথায় বলি ও মতে বিশ্বাস করি, এ সংসারের যাহা কিছু—ধন জন সম্পদ, স্ত্রী পুত্র পরিবার, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব, অর্থ বিত্ত মান প্রতিপত্তি,—সমস্তই ভগবানের দান। আমাদের সাহায্য ও ভোগের জন্যই তিনি আমাদিগকে এই সমস্ত দিয়াছেন। তাঁহার স্নেহের দানরূপে কৃতজ্ঞচিত্তে এই সমুদয় ভোগ করিয়া তাঁহার সহিত প্রেমে যুক্ত হইতে হইবে। কিন্তু আমরা যখন এ সকল ভোগ করি, তখন কি সে কথা আমাদের স্মরণে থাকে? আমরা কি সেজন্য তাঁহার নিকট কোনও প্রকার কৃতজ্ঞতা অনুভব করি? অথবা, তাঁহার স্নেহ প্রেমের এত নিদর্শন দেখিয়া তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হই, প্রেমে ভক্তিতে তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হই? তাহা করিলে যে এই ভোগ পরম কল্যাণেরই কারণ হইত, ধর্ম্মজীবনবিকাশের বিশেষ সহায়ই হইত, সে বিষয়ে কি কোনও সন্দেহ আছে? প্রকৃত পক্ষে যে আমরা তাঁহার কথা ভুলিয়াই, শুধু ক্ষুদ্র বাসনা কামনার দ্বারা চালিত হইয়াই, এই সমস্ত ভোগ করি, তাহা ত আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। তাহার ফলে যে আমরা অবশ্যম্ভাবী রূপেই তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইব, মোহগ্রস্ত হইয়া সংসারসর্ব্বস্ব হইব, এ সমস্তের মধ্যেই ডুবিয়া থাকিব, কল্যাণ-লাভে ও ধর্ম্মজীবনের উন্নতি ও বিকাশসাধনে অসমর্থ হইব, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বিস্তারিত ভাবে বুঝাইতে হইবে না,—সে কথা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

আমরা জানি ও বলি, জীবনবিধাতাই আমাদের জন্য সংসারের নানা কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, বিশেষভাবে গৃহ পরিবারের ও জগতের সেবায় আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহাতেই আমাদের উন্নতি ও বিকাশ সাধিত হয়। কিন্তু আমরা যে সে সকল কার্য্যে দিবারাত্রি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া জীবন ক্ষয় করি, তাহা কি ইহা স্মরণে রাখিয়া, জীবনদেবতার আজ্ঞাধীন হইয়া করি, না, ইহাদের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, অথবা পদ মানের জন্য, তাঁহাকে এবং জীবনের উচ্চ আদর্শ ও লক্ষ্যকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়াই করিয়া যাই? যথার্থই যে আমরা নিতান্ত মোহগ্রস্ত হইয়াই, তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইয়াই, নানা ক্ষুদ্র মলিন লক্ষ্য লইয়াই, বিবিধ প্রকার বাসনা কামনার বশেই, সংসারের সব কাজ করিয়া থাকি, তাহার মধ্যে অপর কোনও উচ্চতর ও মহত্তর লক্ষ্যই থাকে না, তাঁহার প্রীত্যর্থে অনাসক্ত ভাবে কিছু করি না, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এবং এই হেতু যে ধর্ম্মসাধনের অঙ্গরূপে সংসার করা একটা কথার কথা হইয়া যায়, অনেক সময় আমরা কর্ত্তব্যের নামে অনেক অকর্ত্তব্যও করি, অন্যায় কর্ম্মেও নিযুক্ত হই, সময় সময় কেহ কেহ গভীর পাপে ডুবিতেও ক্ষান্ত হই না, তাহাও একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহার ফলও যে পূর্ব্ববৎই হইবে, শুধু সাংসারিকতাই বৃদ্ধি পাইবে, এবং অপর পক্ষে ভগবানের আজ্ঞাধীন হইয়া, কর্ত্তব্যজ্ঞানে সকল কার্য্য করিলে, তাহা হইতে যে অশেষ কল্যাণ প্রসূত হইতে পারে, পূর্ণাঙ্গ উন্নত ধর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠিতে পারে, সে কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই—কাহারই তাহা বুঝিয়া লওয়া কঠিন হইবে না।

আরও একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। আমরা যে নূতন তত্ত্ব লাভ করিয়াছি, তাহার বলে আমরা উচ্চৈঃস্বরে ও দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করি যে, জগতের যাবতীয় দুঃখ শোক সংগ্রাম বিপদও মঙ্গলময় বিধাতারই অতি প্রয়োজনীয় কল্যাণকর ব্যবস্থা। ইহা ব্যতীত জীবন পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে না, সুন্দর ও সুদৃঢ় হয় না। এ কথা যে কত সত্য এবং দুঃখ তাপ সম্বন্ধে পূর্ব্বকালের ধারণা যে কত ভ্রান্ত, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমরা কি কার্য্যতঃ এ সকলকে সকল সময় মঙ্গলময় বিধাতারই প্রেমের দান বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি? অভিযোগ না করিয়া, বিদ্রোহী না হইয়া, অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞচিত্তে সমস্ত গ্রহণ করিতে পারি? তাহা করিতে পারিলে যে জীবন কিরূপ সুন্দর মধুর ও সতেজ হইয়া উঠে, অহঙ্কার স্বার্থপরতা নিশ্চেষ্টতা হইতে মুক্ত হইয়া, ত্যাগে বিনয়ে উদ্যমশীলতায়, প্রেমে ও নিঃস্বার্থপরতায়, মহৎ ও পবিত্র হইয়া উঠে, তাহা আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। তখন দুঃখ ক্লেশ, শোক তাপ, বিপদ সংগ্রাম যে ভারবহ না হইয়া আনন্দ সুখেই পরিণত হয়, তাহাও বিশেষ করিয়া বলা অনাবশ্যক। এই ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না বলিয়াই আমরা মিথ্যা ভয়ের চাপে পিষ্ট হইয়া যাই, অনেকে সময় সময় অবিশ্বাসী নাস্তিকও হইয়া পড়ি। স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের বহন করিবার শক্তির অতীত কোনও চাপই কখনও আমাদের মস্তকে পতিত হয় না, তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও দূরে চলিয়া যান না, সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদাই নিকটে রহিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে বিশ্বাসকে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবারই বিশেষ সহায়তা হয়। অনন্যগতি হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হওয়ার এমন সুযোগও আর কোনও অবস্থায় পাওয়া যায় না। আমরা তাহা করি না বলিয়াই ভয়ে কাতর হই, ও সে মহা সুযোগ হারাই—কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণ প্রাপ্ত হই, উন্নতি ও বিকাশের পরিবর্ত্তে অবনতির পথে চলি।

এই সমস্ত হইতে সম্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, আমাদের সাধনের ত্রুটি বশতঃই, আমাদের মত ও আদর্শ অনুসারে যে-ভাবে সংসারে বাস করিতে হয়, আমরা কার্য্যতঃ তাহা করি না বলিয়াই, সংসারক্ষেত্র আমাদের ধর্ম্মজীবনের পরম সহায় হইয়াও প্রকারান্তরে অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে। আমাদের সকলের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হউক; আমরা ঠিক ভাবে সাংসারিক জীবন যাপন করিয়া, সংসার-ক্ষেত্রকে সাধনক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করিয়া, সংসারকে স্বর্গধামে পরিণত

করিয়া, ধন্য ও কৃতার্থ হই। মঙ্গলময় জীবনবিধাতা আমাদিগকে সে বুদ্ধি ও বল প্রদান করুন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই সকলের জীবনে জয়যুক্ত হউক।

অমর কথা (২৭)

শুদ্ধতার জয়

চ'লে যবে যাই, গাহি' জয় জয়,
সমাধি-মৌন-মহিমাপুরে,
থামিবে সেদিন মোহ পরমাদ,—
বিধাতার দান অসীম সুরে।
যত নিন্দা গ্লানি, যত অভিশাপ,
আজ থেমে গেল মরণ-গানে,
উঠিছে বাজিয়া বিজয়ের ভেরী,
ছু'টে চলি নব জীবনের পানে।
থামিল রিপুর যতেক পীড়ন,
থামিলরে আজ যতেক দহন,
দেবতা ডেকেছে মধুর লগনে,—
মরণ-বুকেতে পরম শরণ।
অসীম মুকতি দেহের লীলাতে,
ছাই হ'য়ে আজ রয়েছে চাহি',
রূপ কোথা জাগে অরূপ বীণাতে,—
অভয় নামটী উঠিছে গাহি'।
আনন্দে গায় জাগায়ে লহরী,
বিশ্ব ভুবনে তাঁহারি জয়,
জয়গানে ওড়ে বিজয়-কেতন,—
ধন্য যে আমি হে দয়াময়।
বিজয়-মাল্য হাসেরে বুকেতে,
মিটে গেল তাই দীনতার খেদ,
তাঁহারি মহান্ ইচ্ছামাঝারে
উঠিছে ফুটিয়া জীবন-বেদ।
তাই সই আমি যতেক বেদনা,
রিক্ত কাতর দহন-জ্বালা,
তাই বই বুকে শতেক আঘাত,—
আকুল কাঁদন, বিরহ-পালা।
যে জন গড়েছে ধরণীর বুকে
নিতি নব নব প্রেমের বাসা,
সে কি দেবে ঢেলে মরণ-পাথারে
যত আকাঙ্ক্ষা, যা কিছু আশা?
উদাস পরাণী, অনিমেষ আঁখি,
জেগে ব'সে আছি হরষ-পুরে;
তাও কিগো ভুল, দুদিন খেলাতে
সব শেষ হবে ভাঙন সুরে?

যেদিন মানুষ সত্য পূজারীর শান্ত মঙ্গলস্বরূপ বুঝ্তে না পেরে তাঁর রোগশুষ্ক দেহখানিকে শত কণ্টকাঘাতে কত বিকৃত ক'রে, কাঁটার মালা গলায় দিয়ে, নরকের দৃশ্য রচনা কোরল সংসারে, আর রক্তাক্ত হ'য়েও যেদিন ভক্ত হাস্‌তে হাস্‌তে ক্ষমার মঙ্গল-মহিমায় সকলের জন্য কল্যাণ-প্রার্থনার ভিতরে দেহমুক্ত হ'য়ে গেলেন, সেদিনই মানবের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হোল। তখন ক্ষণিকসুখলিপ্সু অত্যাচারী জনের বুক ভয় ও বিভীষিকার ভ্রূকুটীভঙ্গিমা আকুল করিয়া তুলিল। সেদিন দেবতার সম্মান, দেবতার পূজার জন্য, শত শত জন অশ্রুজলে আকুল হ'য়ে বিজন কোণে লুকোতে চাইল। তখন তীব্র বেদনার ভিতর কত সন্দেহকুহেলী জ'মে উঠ্‌ল। তখন মনে করে মানুষ সত্যের এত লাঞ্ছনা কেন? কেন ভগবান তাঁহার সন্তানকে বিশ্বের কাছে এমনি কোরে পীড়িত করেন? বিধাতা কি নেই তবে? একজন ন্যায়বান পুরুষ যদি থাকেন, তবে কেন তাঁর সত্য পূজারীর এ অপমান, পীড়ন? তবে কেন নির্দ্দোষীর এই অসহনীয় তাপ ও লাঞ্ছনা? যদি এম্‌নি ক'রে ভগবদ্ভক্তেরও রক্তাক্ত হ'য়ে ফিরতে হয় সংসারে, তবে কোথায় বিধাতা, কোথায় সত্য বিচার?

এমনি সংশয়-অন্ধকারের ভিতর ও কি কথা শুন্‌ল সব? ঐ দেখ যাঁকে লাঞ্ছিত করেছ, কাঁটার মুকুট পরিয়েছ, আজ তিনি মৃত্যুকে জয় ক'রে জাগ্রত হ'য়ে এসেছেন। এমনতর আশার কথায় সকলের বুক আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল। ও কি দেখ্‌ল, তখন বোলে উঠ্‌ল সব, এ কি জয়গৌরব, এ কি উজ্জ্বল শোভন সুন্দর ভাগবতী তনু! ওগো ভক্ত, ওগো দেবতা, কে তুমি? বুঝেছি শুদ্ধতারই জয়, পুণ্যেরই

অধ্যাত্মজগতে শুদ্ধতা কা'কে বলে? এক কথায় এ যে একেবারে সুনির্ম্মল! এখানে বিন্দুমাত্র লুকোচুরি নেই, একেবারে সরল সুন্দর সত্য স্বরূপ। তাইত মনখানিও পুণ্য-মহিমায় পুণ্যময়। এখানে কোন উত্তেজনা নাই, কোন পরাজয়ের কথাই নেই। তাইত যখন জীবাত্মা শুদ্ধ মুক্ত হ'য়ে চলেন, যাঁকে দৈহিকতা ঐহিকতা স্পর্শ ক'রতে পার্‌ল না, যিনি দেবভাবের ভিতরই দেবমহিমায় মহিমান্বিত হ'য়েই গেলেন, সে যে একেবারে সুনির্ম্মল, সুন্দর। সে দেব আত্মার জন্য পরমকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। ইনি যে দিনের পর দিন পরিপূর্ণতার দিকেই চলেছেন, এ শুদ্ধতা যে অবিনাশী—অজর অমর। কেবল পঞ্চভূতের দেহ যা থেকে জন্মালো তাতেই পরিণত হোল। হাঁ বিদেশী সকলের কাছেই এ কথা সত্য, এ যে অখণ্ড নিয়ম জগতের, যা কিছু আমার ইন্দ্রিয়জ্ঞানপ্রসূত সবইত পঞ্চভূত-জাত। যেই একটীর সঙ্গে একটীর সমন্বয়, তখনই তার সে পূর্ব্বসত্তা বিকৃত। আবার যেই সমন্বয় অণুপরমাণুর বিশ্লেষণ, তখনই আবার তার সেই পূর্ব্ব সত্তা পরিণতি। শুদ্ধ কাঞ্চনেরই ত মূল্য সংসারে। তার সে উজ্জ্বল সত্তা শত অগ্নিদাহনেও পরিবর্ত্তিত হয় না। জ্বলিত কাষ্ঠখণ্ডের অবশিষ্ট ভস্মরাশি ত আবার কাষ্ঠেই পরিণত হয় না, অথচ সোণাকে যতই আগুনে দগ্ধ কর, ততই তার অগ্নিশুদ্ধ উজ্জ্বল স্বরূপ। তেমনিতর শুদ্ধমনা মানবজন যতই সংসারের দুঃখ তাপে দগ্ধ হন, ততই মনখানি

তাঁর ঐহিক ধন মান ভোগ যা কিছুর ভিতর তিনি জড়িত থাকেন, সব কিছু পু'ড়ে ছাই হ'য়ে যায়, অথচ তাঁর সুনির্মল সুন্দর শুদ্ধ স্বরূপ সত্তা উজ্জ্বল মহিমায় মহিমান্বিত হ'য়ে ওঠে।

সকল সংগ্রাম জয়গৌরব শুদ্ধতার ভিতরই। যুগে যুগে সকল ইতিহাস এ কথারই সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে। সেই আদিম যুগে যখন মানুষ সত্য বোঝে নি, কত অসত্যের পথেই চলেছে! অথচ যতই সত্যের বিকাশ, ততই অসত্যের তিরোধান। কোন ভুলই, কোন অসত্যই, স্থায়ী নয়; অথচ যা সত্য তার অবিনাশী মঙ্গলধারা কেমন যুগের পর যুগ প্রকাশিত হ'য়ে আসচে! যেমন মেঘের অন্তরালের ভিতর দিয়েই সূর্য্যের মহিমা প্রকাশ, তেমনি অসত্য-মেঘাবরণের ভিতর দিয়েই সত্যসূর্য্যের বিমল জ্যোতি। অথচ মেঘমালা সূর্য্য হ'তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তেমনি অসত্য-পুঞ্জেরও সত্য হোতে তার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র স্বরূপ। ঘন অসত্য-অন্ধকার মোচন ক'রেই সত্যের উজ্জ্বলতর আনন্দপ্রকাশ। মানুষের ঘোর অত্যাচারে দুর্ব্বল ভীত জন হয়ত সত্যের মহিমা প্রকাশ ক'রতে কুণ্ঠিত হোল, কিন্তু যে সত্য সাধু পূজারী সে ত ভীত হোল না, সে ত শত অগ্নিদাহনের ভিতরই সত্য বাণী জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা ক'রে গেল, সে ত মৃত্যুকে ভয় পেল না! চিন্তাজগতে তার আত্মা মুক্ত, সে ত মানুষের অসত্য অসাধু ভাবকে চিরদিন ঘৃণা ক'রেই গেল! তাই শত মৃত্যু-পীড়ন নিষ্পেষণের ভিতরও সত্যের অবিনাশী তেজ চিরদিন জয়গৌরব লাভ করেছে।

যা শুদ্ধ তা-ই সত্য, তা-ই মঙ্গল। জগৎ তার সাক্ষী। যা কিছু মঙ্গল তার ফলও কল্যাণপ্রদ। যা সত্য তা-ই মঙ্গল, তাই আত্মবীণায় প্রকৃতির বুকে মঙ্গলসুরে সত্যমঙ্গল গান বেজে উঠে। যা অমঙ্গল তার জগতের বুকে জয় কোথায়? কত সময় হয়ত আপাত জয়ের মুকুট পরিধান ক'রে অসত্যের ভিতরই মানুষ কত গর্ব্বে, কত দর্পে, চ'লে যায় কত নির্দ্দোষীর বুক পদদলিত ক'রেই! আবার, কত সময় কত সত্যসেবকের কত লাঞ্ছনা, কত গঞ্জনা! কত বেদনার তীব্র আঘাতেই তার পরম পুরস্কার হোল সংসারে, কত ভক্তপ্রাণকে অগ্নিদাহনে দগ্ধ কোরল! কিন্তু দেখ্‌তে দেখ্‌তে এ কি হোল তার শেষ পরিণতি? আগুন-দহনের ভিতরই, সেই জলন্ত শ্মশানের বুকেতেই, আবার কেমন সত্য জল্ জল্ ক'রে জ্ব'লে ওঠে!

তাই যিশুর রক্তপাতে আজ লক্ষ প্রাণ তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রছে, কত রাজমুকুট আজ সে চরণ পূজা ক'রছে! তাইত ধার্ম্মিক ও জ্ঞানীর পূজা সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে। যদিও হয়ত তাঁরা ইহজগতে তেমন সুখ স্বচ্ছন্দ সম্মান পেলেন না, তবুও সততারই জয়। সাধুতার পূজা মানুষ চিরদিনই কোরছে। এমনি ক'রে দুঃখ বেদনার ভিতর যিনি সত্যের পূজা ক'রে গেলেন, তাঁর সকল দুঃখের সার্থকতাও ঐখানেই—সততাই সকল পরীক্ষার পুরস্কার। সকল অবিচার নিন্দা কলঙ্কে তাঁর ভয় নেই। তিনি যে সত্যসেবক হ'য়ে সাধু ইচ্ছা, ভগবদিচ্ছা, পালন ক'রে গেলেন, এতেই ত আনন্দ। কি হবে তাঁর লোকের নিন্দা লাঞ্ছনায়? তাঁরা জগতে প্রতারিত হ'লেও আত্মপ্রতারিত হন না, তাঁদের বিবেক উজ্জ্বল, শুদ্ধ জ্যোতির্মণ্ডিত স্বরূপ, তাই ত শত অপমানের দৈন্যের ভিতরও শুদ্ধতার জয়।

এমনি করিয়া ভগবদ্ভক্তের অসীম বিশ্বাসে শুদ্ধ স্বরূপ যখন মানুষ মনে করে, তখন সেও তার দুর্ব্বল জীবনেও আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়, সত্য পথে চল্‌তে সাহসী হয়। তখন সত্যের জন্য ভগবানের মুখের দিকে তাকিয়েই এমন দুঃখ নাই যা সহ্য করিতে পারেন না, এমন ত্যাগ নাই যাহা ছাড়িতে পারেন না।

ধন্য সে সত্য পূজারী, ধন্য তাঁর সে দেব স্বরূপ। মানবের দুর্দ্দিনে এ কি আলো জ্বেলে নিয়ে তাঁরা এলেন, সত্যের পথে মঙ্গলের এ কি মাভৈঃ বাণী শোনালেন! তাই ত আশার কথা, তাই ত সততার জয়, শুদ্ধতার জয়।

যুগে যুগে যত সত্য পূজারী আসুন, আমাদের সত্য দীক্ষায় সহায় হউন। আমার দুঃখ দৈন্যে, নিঃসঙ্গ যাত্রাপথে, বল দিন, আমার জীবনসংগ্রামে আশার আলো জ্বেলে নিয়ে আসুন, বলুন ভাল করিয়া শুদ্ধতার, সততার, জয় হবেই হবে। অশুদ্ধতারই বিনাশ—তাইত বলেছেন সত্যসেবকদল, ওগো দুঃখী তাপী যা কিছু অপবিত্রতা সব কিছু হইতে সরিয়া দাঁড়াও, ঐ শোন ভগবদ্বাণী, ঐ দেখ প্রকৃতির বুকে সত্য আলো, ঐ দেখ মানব-জীবনের সকল উত্থান পতনে সত্যেরই জয়, শুদ্ধতারই জয়।

ওগো শুদ্ধ হও, সত্য হও, ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখ হইল না বলিয়া আর ক্ষোভ করিও না। সংসারে সম্মান পাইলে না বলিয়া আর মুহ্যমান কেন? যা সৎ, যা ধর্ম্ম, তাহাই করিয়া যাও, কোন কিছুর প্রতিদান আশা করিও না। যদি সুখের আশা কর, তাহা হইলে তোমার সুনির্ম্মল শুদ্ধ জীবনলাভ হইল না। সকল দুঃখ ভুলিয়া যাও; ওরে অবোধ মন, ভালবাসা পাবে বলিয়া কাহাকেও ভালবাসিও না। তোমার সর্ব্বস্বদান ব্যর্থ হইল বলিয়া আর কেন ক্লিষ্ট হও? কেবল সত্য পথে চল, বিবেকের শুদ্ধ স্বরূপের ভিতর জাগিয়া থাক, তবেই ত তোমার সকল দৈন্য দূরে যাবে, তবেই ত অগ্নি-শুদ্ধ উজ্জ্বল কাঞ্চনজ্যোতিলাভ হবে।

ভক্ত প্রেমিক বলিয়া গেলেন, যে তোমাকে দুঃখ দিলেন তাকেই স্নেহালিঙ্গনদান কর, অভাবগ্রস্তের অভাব যতটুকু পার দূর কর। কে তোমায় দুঃখ দিয়েছে, তাই বলিয়া তুমি তার দুর্দ্দিনে বিমুখ হইও না; ওগো, প্রতিশোধ লইতে হইবে বলিয়া কাহাকেও রোগে শোকে গর্ব্বে দর্পে ফিরিয়া দাঁড়াইও না। এমনি করিয়া নির্ব্বিচারে যদি সত্যব্রত পালন করিতে পার, তবে আর তোমার দুঃখ কোথায়? তখন প্রতি কর্ম্মসাধনার কি শুভ্র মাধুরীজ্যোতি, সৌন্দর্য্য! তখনই তোমার মঙ্গললোকে শুভযাত্রা। তাইত রক্তাক্ত হইয়াও শুদ্ধতার সাধনা। যে হারিয়া গেল, তার যে সবই ব্যর্থতার দৈন্যে দীন হীন। যে ভগবদ্-বলে বলীয়ান হইয়া সংগ্রাম করিতে পারিল না, সংসারে সে দুঃখ দৈন্যের ঝঞ্ঝায় ত্রস্ত বিধ্বস্ত হইয়া বিনাশের পথে ছুটিয়া ত যাবেই।

সকল মানুষই মানুষের মনের দৃঢ়তা ও বিবেকের সত্য ব

সম্মান করে। যে অতি বড় দুর্জ্জন, সেও সত্যনিষ্ঠ সাধু ভক্তের আজীবন সত্যব্রতপালন যখন দেখে, তখন সেও চমকে ওঠে। যে মানুষ সংশয়-দোলায় এ-দিক ও-দিক ফেরে,—আজ সত্যের পথে চল্‌ছে, কাল আবার অসত্যের পথে, আজ ধর্ম্মপালন ক'রছে কাল অধর্ম্মের পথে ছুটেছে—এমন মানুষ কি করিয়া মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিবে? তাদের জীবন ত তেমন শুদ্ধতায় সুপ্রতিষ্ঠিত নয়! হায়! হায়! অভাগা মানুষ পারিল না তার ক্ষণিক লালসার ঊর্দ্ধে উঠিতে, তাই সংশয়-দোলায় দুলে দুলেই—একবার সুপথে আবার বিপথে, এমনি ভাবেই—দিন কেটে যায়। তাইত হইল না শুভ সাধনা, হইল না শুদ্ধ জীবনলাভ।

মনে রেখ সুনির্ম্মল সত্য পুণ্যময় জীবনেরই জয় সংসারে। মনে রেখ ভক্তজীবন, মনে রেখ ভগবৎপ্রেম, জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, মনে রেখ সর্ব্বস্বত্যাগ, মনে রেখ কঠোর সংযম, মনে রেখ দৃঢ় নিষ্ঠা, সত্যসাধনা। সুদিনে যখন আনন্দকানন হেসে ওঠে চারিদিকে, তখনও তোমার শক্তির পরিচয় হয় না; কিন্তু যেদিন ঝড় ঝঞ্ঝা নেমে আসে, যেদিন অন্ধকার, সেদিনই সত্য পরীক্ষা, সেদিনই ধর্ম্মের অগ্নি-দীক্ষা।

সেই ঘন অন্ধকারে যিনি বিশ্বমঙ্গল-দেবতাকে ধ্রুবতারা করিয়া ছোটেন, অন্ধকারেও তিনি ত পথ হারাবেন না—তাঁর গম্য পথে ছুটে যাবেনই যাবেন। যিনি সঙ্কল্প করেছেন বাক্যে মনে ব্যবহারে সত্য হবেন, নির্ম্মল হবেন, তখনই তাঁর সংগ্রাম-সাজ। যদি সত্যসাধনে সে বীরত্ব ও ধীরত্ব না থাকে, তবে কেমন ক'রে উন্নতির পথে অগ্রসর হবে? যে মানুষ সত্য হবে মনে করে, তার সকল প্রকার নিন্দা উপহাস উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত হইতে হবে, তখন জগতের নিন্দা প্রশংসার অতীত হইতে হইবে, তখন সকল স্বার্থসম্ভোগ বলিদান দিতে হবে, তখন সকল ভোগের পিপাসা ভুল্‌তে হবে, তখন সকল মানুষের অভিশাপ, সকল মানুষের ঘাত প্রতিঘাত, বুক পেতে নিতেই হবে, তখন সকল দুঃখ মাথার ভূষণ ক'রতে হবে। তবেইত সকল দুঃখের পুরস্কার হবে পুণ্যসম্ভোগে। যদি আজীবন সত্য পূজারী হ'য়ে চল্‌তে পার, যদি শুদ্ধ প্রীতি ভক্তিতে নম্র ও নিষ্ঠাসাধনে যত্নবান হও, যদি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সত্যের জয়গান গাইতে পার, যদি সকল উত্তেজনা জয় ক'রতে পার, তাহা হইলে আর ভয় নাই। মঙ্গলময় শুদ্ধ সুন্দর, চির সত্য, ধ্রুব সত্য। তিনিই বরণীয়, ভজনীয়, তবে কেন দুঃখ সংসারে দৈন্যপীড়নে? আসুক দুঃখ বেদনা, ভয় নাই, দেবতা আছেন সঙ্গে, পুণ্যময় চির নবীন সুন্দর।

এক এক সময় ঘন ঝঞ্ঝা ঝাপটে পথ খুঁজে পাই না, তবু বুকে বল চাই। আছেন হৃদয়ের দেবতা হৃদয়ে, সে অন্ধকারেও ওঠ, জাগ্রত হও; আছেন জাগ্রত ভগবান চির সঙ্গী, চির বন্ধু, তাঁকেই বুকে চেপে ধর। পরাজিত, তবুও ভেঙে পড়িব না, হারাবো না পথের সম্বল। সকল প্রশংসা গৌরব হইতে বঞ্চিত হোলাম, তবুও ভয় নাই। সংসারে দুদিনের প্রশংসা ধন জনলাভে কি হবে? অথচ এ কি দেব-আশীর্ব্বাদ ক্ষুদ্র মানবজীবনে! সব হারালাম, তবু অমৃতলাভে ত বঞ্চিত হোলাম না! তাই বলি, ধৈর্য্য ধর, বিশ্বাসীর মত সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে, এগিয়ে চল। যা পার্থিব, তা ত দেহের সঙ্গেই ধূলিসাৎ হবে। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, সত্য কখনও বিনষ্ট হবে না। ওগো সত্য পূজারি! তুমি হয়ত হেরে যেতে পার জীবনসংগ্রামে, কিন্তু সত্য কখনও হারাবে না। সত্যের জয় হবেই হবে। তাইত ভক্ত প্রাণ সব মৃত্যুর ভিতরই অমৃত হ'য়ে এসেছেন। তাইত তাঁদের বদন-কমলে স্বর্গের আনন্দবিভা। তাইত তাঁদের মঙ্গলসমাধি পুণ্যের বিজয়মহিমা কীর্ত্তন করে। তাইত মানবজীবনে সকল দুঃখ তাপের ভিতরই দেবপূজা, সত্যসাধনা, পুণ্য তপস্যা।

ভাবুক আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, প্রতিবাসী আমাকে ক্ষুদ্র দীন হীন, ভাবুক আমায় পার্থিব গৌরবহীন, সুখ-আনন্দ-বঞ্চিত দুর্ভাগ্য জীবন, তবু সত্য পথে চল, নীরবে পুণ্যসঞ্চয় কর, কারুর কিছু এসে যাবে না। সত্যের বীজাণু, পুণ্যের বীজাণু, কখনও ধ্বংস হবে না। একদিন জগতের বুকে তার অখণ্ড শক্তি জাগ্রত হবেই হবে। তোমার আমার উত্থান পতনে কার কি এসে যায়? কারুর কিছু এসে যাবে না। কিন্তু তুমি-আমাদের ব্যক্তিগত জীবন যে বড় দীন হীন হ'য়ে যাবে, ছোট হ'য়ে যাবে, আত্মগৃহে যদি না পার সত্য পথে চল্‌তে। তাই বলি, বলীয়ান্ হও, সংগ্রামসাজে সজ্জিত হও, সত্যসাধনে, শুদ্ধতার আলোকে জীবাত্মার নব জ্যোতিলাভ হউক। সকল দুঃখ বন্ধন পরীক্ষা সার্থক হউক, ধন্য হউক এ ক্রন্দন। ধন্য হউক এ নীরস প্রতীক্ষা, কঠোর প্রতীক্ষা—সত্যের জয়, পুণ্যের জয়, ধর্ম্মের জয়। তাই বলি, ওগো শুদ্ধ সুন্দর, পবিত্র কর, নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর। দাও হৃদয়ে সে ব্রহ্মবল, ব্রহ্মতেজ—সকল কিছুর অতীত হ'য়ে যাই। সকল বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য ক'রে ছুটে চলি শুদ্ধ সুনির্ম্মল লোকে। আমার বুকের ঘরেই সকল কিছুর ভিতর পুরস্কার। বুকে হাত দিয়ে যেন বোলতে পারি, ওগো শুদ্ধ সুন্দর হৃদয়মণি, এ হৃদয়ে বাস কর—এ যে দেবতার আসন, শুদ্ধ উজ্জ্বল জ্যোতি-উদ্ভাসিত হৃদয়। আর কি চাই? এ শুদ্ধতারই জয় হউক।

গীত[illegible]—প্রতিবাদ ও উত্তর

প্রেরিত পত্র

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ত্তমান সংখ্যা তত্ত্ব-কৌমুদীতে এই চিঠিখানি পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন।

এই বিষয় বহুদিন হইতে লেখা হইয়া রহিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম, লাহিড়ী মহাশয়ের ধারাবাহিক লেখা শেষ হইলেই ইহা পত্রস্থ করিব। কিন্তু দেখা গেল যে, এক একটি বিষয়ের সঙ্গে অপরটীর বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই, বরং পূর্ব্বেই প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং এই বারেই অনুগ্রহ করিয়া এই লেখাটি পত্রস্থ করিলে কৃতজ্ঞ হইব।

বিগত ১৬ই শ্রাবণের তত্ত্ব-কৌমুদীতে, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত

অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের "গীতার ধর্ম" (৪) প্রবন্ধে "গীতার মতে যজ্ঞানুষ্ঠান" সম্বন্ধে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

যজ্ঞ শব্দে নানা প্রকার অর্থ বুঝায়। যজ্ঞ = যজ + ন। যজ ধাতুর অর্থ অনেক—দেবপূজা—সঙ্গতি—করণ—দানেষু যজ্ঞ। যজ্ঞ বলিলে ঈশ্বর-আরাধনা, সংযোগ, আসক্তি, কর্ম্ম, দান ও হোম বুঝায়। গীতায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এই যজ্ঞ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

শ্রদ্ধেয় লাহিড়ী মহাশয়ের মতে "গীতাকার যে যজ্ঞের দ্বারা বিষ্ণু-আরাধনা লক্ষ্য করেন নাই, বৈদিক যজ্ঞ ও আরও কতকগুলি কার্য্য বুঝাইতেছেন, তাহা ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে নিজেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন" ব'লে তো মনে হয় না। এবং "যজ্ঞ বলিতে প্রধানতঃ বৈদিক হোমের কথাই বলা হইয়াছে", আলোচনা করিলে তাহাও প্রমাণিত হয় না। ইহা ৩।১০—১৬ শ্লোক প্রত্যেকটি বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায় :—

৩।৯ যজ্ঞার্থাৎ···ব্রহ্মনিষ্ঠালাভের জন্য (যজ্ঞ = ব্রহ্মসঙ্গ, ব্রহ্মনিষ্ঠা)

৩।১০ সহযজ্ঞা প্রজা = যজ্ঞের সহিত, ঈশ্বরসঙ্গবিশিষ্ট জীব, স্বাভাবিক ভাবে ঈশ্বরযুক্ত জীব। যজ্ঞ = যজ + ন (কর্ম্মবাচ্য) যিনি শরণ্য বলিয়া উপাস্য, পরমাত্মা

৩।১১ অনেন যজ্ঞেন, ব্রহ্মনিষ্ঠাদ্বারা (মনোবুদ্ধি প্রভৃতিকে শুদ্ধ করা)

৩।১২ যজ্ঞভাবিতা = ঈশ্বরনিষ্ঠা

৩।১৩ যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ = ঈশ্বরনিষ্ঠার শেষ (পরিণাম) ভোগ করেন যাহারা; ব্রহ্মানন্দভোগিগণ।

৩।১৪ যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো—যজ্ঞ = সঙ্গ, রূপরসাদিতে আসক্তি। পর্জ্জন্য = ইন্দ্র = আত্মা। স্থূল প্রকৃতির সঙ্গ বশতঃ আত্মা জন্মগ্রহণ করে (অর্থাৎ দেহধারণ করে)। যজ্ঞ: কর্ম্ম-সমুদ্ভব :—যজ্ঞ = প্রকৃতিসঙ্গ (কর্ম্ম হইতে অর্থাৎ রূপ রসাদি ভোগের ইচ্ছা হইতে) প্রকৃতিসঙ্গ ঘটে।

৩।১৫ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্—যজ্ঞ = কর্ম্ম

সুতরাং "৩য় অধ্যায়ে প্রধানতঃ হোমের কথা" বলা হয় নাই। 'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ' ও 'পুরোবাচ প্রজাপতিঃ', এই বাক্য দুইটীর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজন; কারণ, এই বাক্য দুইটীর মর্ম্মার্থ লইয়াই যত গোলযোগ বাঁধিয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সহযজ্ঞাঃ অর্থাৎ যজ্ঞের সহিত (প্রজা পদের বিশেষণ) ঈশ্বরসঙ্গবিশিষ্ট। সকলেই ঈশ্বরের সহিত যুক্ত বলিয়া সকলের হৃদয়ে আপনা হইতেই একটা মহা চৈতন্যময় অলক্ষ্য আত্মার ভাব আসে। এইরূপে স্বাভাবিক ভাবে ঈশ্বরযুক্ত বলিয়া জীবকে সহযজ্ঞ বলা হইয়াছে।

পুরোবাচ প্রজাপতিঃ, এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, জীব-সমূহের অন্তঃকরণে মহাপ্রকৃতি হইতেই এই ভাব প্রেরিত হইয়াছে। "প্রজাপতি" শব্দ এখানে বিরাট প্রকৃতিকে বুঝাইতেছে। ইহা মনে করিবার আবশ্যক নাই যে, চতুর্মুখ মানবসদৃশ কোন একটি ব্যক্তি এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়া মানুষের কাণে কাণে ঐ কথাগুলি বলিয়া দিয়াছেন। প্রকৃতির অন্তর্গত যে রজোগুণে সৃষ্টির কার্য্য চলিতেছে, তাহাই ব্রহ্মা নামে রূপক ভাবে কথিত। সেই প্রকার স্থিতি এবং বিনাশ বা রূপান্তর ঘটাইবার জন্য তাহাদের মূলীভূত কারণস্বরূপ সত্ত্ব ও তমঃ এই দুইটী গুণ যথাক্রমে বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামে রূপকভাবে কথিত হয়। সুতরাং "ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে অসমর্থ হইয়া ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাহার উপরেই সৃষ্টির ভার" দেন নাই।

৩য় অধ্যায়ের পূর্ব্ববর্ণিত যজ্ঞশব্দ বাচক প্রত্যেকটি শ্লোকদ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, "গীতাতে প্রধানতঃ বৈদিক হোমের কথা" বলা হইয়াছে, বরং তদ্বিপরীতই প্রমাণিত হয়, ঈশ্বরনিষ্ঠা ও আত্মজ্ঞান লাভের জন্যই কর্ম্ম করিবার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ৩য় অধ্যায়ের এই মীমাংসা ৪র্থ অধ্যায়ে আরো স্পষ্ট করা হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের জন্য কর্ম্মই চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। ৪র্থ অধ্যায়ের ২১ হইতে ২৯ শ্লোকের প্রত্যেকটী বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, একমাত্র ৪।২৪ শ্লোকেই প্রথমতঃ বৈদিক আহুতির উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু তাহার ভাব অতি গভীর, অতি মহান্! [যিনি ব্রহ্মের উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি-দানরূপ যজ্ঞ করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যান, তাহার তখন সমাহিত অবস্থা, তখন সেই অবস্থায় তাহার নিকট] অর্পণও ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মকর্তৃক হবনীয় বস্তুও ব্রহ্ম; ব্রহ্মকর্ম্মে সমাহিত তিনি ব্রহ্মময় হইয়া যান। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ব্রাহ্মণকে আহারের পূর্ব্বে গণ্ডূস করিতে হয়। কী মহান্ আদর্শ! তদ্ভিন্ন ৪র্থ অধ্যায়ে অন্যান্য শ্লোকে দৈব যজ্ঞ (ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ শক্তির উপাসনা), ব্রহ্মতে কর্ম্মফল অর্পণরূপ যজ্ঞ, ইন্দ্রিয়সংযম, মনঃসংযম, ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি বায়ুর সংযম, দান, তপ, যোগ, প্রাণায়াম, কুম্ভক প্রভৃতি (ব্রহ্মনিষ্ঠালাভের নিমিত্ত) যজ্ঞের উল্লেখ আছে। বৈদিক হোম যজ্ঞের কথা নাই। এই সমস্তই কর্ম্মসাপেক্ষ।

গীতায় সমস্ত কর্ম্ম বিষয় আলোচনা করিয়া বলা হইয়াছে, ৪।৩৩ অর্ঘ্য, পুষ্প, নৈবেদ্যাদি লইয়া কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানলাভের জন্য কর্ম্ম উৎকৃষ্ট, কারণ সমস্ত কর্ম্মের সমাপ্তি হয় জ্ঞানে। ৩৪। তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মবিদ্‌গণ (জ্ঞানলাভের জন্য) তোমায় কি করা কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিবেন।

দেখা গেল গীতা প্রধানতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠালাভের নিমিত্ত, ঈশ্বর-আরাধনা, তপ, যোগ, আত্মসংযম ইত্যাদি কর্ম্মযজ্ঞসাধনের উপদেশ দিতেছেন। সুতরাং এই প্রকার গীতোক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে কি আপত্তি থাকিতে পারে?

শ্রীহট্ট শ্রীমহিমচন্দ্র চৌধুরী

উত্তর

শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় যজ্ঞ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা তিনি কোথা হইতে পাইয়াছেন, আমরা সে

কথা অনুমান করিতে পারিলেও, তাহা আলোচনা করিবার এখানে কোন প্রয়োজন নাই। আমার যতদূর জানা আছে, তাহাতে বলিতে পারি যে, ইহা কোন প্রাচীন ব্যাখ্যাকারসম্মত নহে। বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রের অভ্রান্ততা রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ ব্যাখ্যা ভারতে চলিতেছে। সে যাহা হউক, নিম্নলিখিত কারণে তাঁহার ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত নহে, ইহাদ্বারা গীতার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না এবং সেই কারণে সুধীজনস্বীকৃতও হইতে পারে না।

(১) সংস্কৃত ভাষায় এক একটি শব্দের একাধিক অর্থ থাকিলেও, অধিকাংশ শব্দেরই এক একটি প্রসিদ্ধ অর্থ আছে। এই অর্থ পরে ব্যাপকভাবে কিছু রূপান্তরিত হইয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু ব্যাকরণ অনুসারে এক একটি শব্দের যে বহু প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে, তাহার অধিকাংশই অপ্রসিদ্ধ ও প্রায় অপ্রচলিত। সেই সকল অর্থের অনুরূপ অর্থজ্ঞাপক অন্য শব্দ রহিয়াছে। যিনি লোক-শিক্ষার্থে কোন পুস্তক প্রণয়ন করেন, তিনি কোন শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ ছাড়িয়া তাহা অপ্রসিদ্ধ অর্থে প্রায়ই ব্যবহার করেন না; করিলেও নিজেই তাহার ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। এরূপ না করিলে লোক-শিক্ষার পরিবর্ত্তে মানবকে কেবল অন্ধকারে রাখা হয়। অবশ্য এখানে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, কোন কোন গ্রন্থ, বিশেষতঃ বৌদ্ধ মহাযান অন্তর্গত তন্ত্রযান ও মন্ত্রযান সম্প্রদায়ের অনেক অনেক গ্রন্থ, প্রকৃত অর্থ গোপন করিয়া লেখা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, অজ্ঞ লোকে স্থূল অর্থ গ্রহণ করুক, কিন্তু জ্ঞানিগণ প্রকৃত অর্থ বুঝিবে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বঙ্গদেশের প্রাচীন বৌদ্ধ কবিতাতে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে সব জলময় ছিল, তাহার উপর এক পেচক আসিল, আর সব সৃষ্টি হইল। সাধারণ লোক জল ও পেচকই বুঝিত। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ আমরা বৌদ্ধ যোগাচার্য্য দর্শন হইতে বুঝিতে পারি। জগতের মূল কারণকে প্রবহমান জলরাশির সহিত তুলনা করা হইয়াছে, এবং অবিদ্যাকে অন্ধকারবাসী পেচকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। উক্ত দর্শনের মত এই যে, জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখপূর্ণ এই জগৎ বিশ্বের মূল কারণের সহিত অবিদ্যার সংস্রব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

গীতাকার লোকশিক্ষার্থে যথাশক্তি সহজ করিয়া আপন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। অপ্রসিদ্ধ অর্থে শব্দ প্রয়োগ করিয়া মানবসকলকে অন্ধকারে রাখিলে, তাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইত না। এমন কি যাহা অনেকটা স্পষ্ট, তাহাও অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরপ্রসঙ্গে আরও স্পষ্টতর করিয়াছেন। ইহাতেও যাহা অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে, তাহা দ্বিতীয় লেখক ১৩ শ অধ্যায় হইতে ১৮শ অধ্যায় পর্য্যন্ত যথা সম্ভব পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, গীতা মানবকে স্থূলার্থ (exoteric) বুঝাইয়া জ্ঞানিগণের জন্য সূক্ষ্মার্থ (esoteric) রাখিয়াছেন, এরূপ দ্বৈত অর্থবোধক পুস্তকও নহে। এই সকল কারণে "যজ্ঞ" শব্দ যেখানে ব্যবহার করা হইয়াছে, সেখানে তাহা প্রসিদ্ধ অর্থে অথবা প্রসিদ্ধ অর্থের ব্যাপক আকারে ব্যবহার করা হইয়াছে, এই কথাই যুক্তিযুক্ত। গীতাকার মানবসকলের মধ্যে অর্থ লইয়া পরস্পর বিবাদ করিবার জন্য ব্যাকরণ ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া অপ্রচলিত অর্থে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। "যজ্ঞের" প্রসিদ্ধ অর্থ, যাহা বেদে ও ব্রাহ্মণশাস্ত্রে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা দেবগণের তুষ্টির উদ্দেশ্যে হোম। পরে স্মৃতিশাস্ত্রে (শ্রীধরও শ্রৌত ও স্মার্ত্ত যজ্ঞের কথা উল্লেখ করিয়াছেন) মুক্তি ও স্বর্গভোগের উদ্দেশ্যে হোম ব্যতীত অনেক ক্রিয়াকে "যজ্ঞ" বলা হইয়াছে, যেমন জপযজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞ বা দান, মনুসংহিতার পঞ্চযজ্ঞ, ইত্যাদি। এইটি ইহার ব্যাপক অর্থ। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে "যজ্ঞ" শব্দকে প্রসিদ্ধ অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার সরলার্থ ও ডাক্তার চৌধুরী মহাশয়ের অনুযায়ী ব্যাখ্যা পরে যেখানে তুলনা করিয়াছি, তাহা দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে। ৪র্থ অধ্যায়ে তাহার সহিত বহুবিধ স্মার্ত্ত যজ্ঞের উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা প্রাণায়াম, স্বাধ্যায়, কুম্ভক, আত্মসংযম ইত্যাদি। গীতার শেষাংশের লেখক এই উভয় অর্থে এক শব্দ ব্যবহারে যে গোল উৎপন্ন হয় (কারণ প্রাণায়াম ও কুম্ভকের দ্বারা দেবতাগণ বর্দ্ধিত হন এবং তাহারা অন্নদান করেন, ইহা অসঙ্গত, কেবল অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হবির্দ্বারাই তাহারা বর্দ্ধিত হইতে পারেন), তাহা দূর করিবার জন্য চতুর্থ অধ্যায়োক্ত ক্রিয়াসকলকে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন (১৮ শ অধ্যায়ের ৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ১৭ শ অধ্যায়ের ১১-১৩ শ্লোকে যজ্ঞ অর্থ যে হোম তাহা স্পষ্টই রহিয়াছে; বিশেষতঃ ১৩ শ্লোকে, "শাস্ত্রবিধিশূন্য, অন্নদানহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন ও শ্রদ্ধাবিহীন যে যজ্ঞ তাহা তামস নামে কথিত।" শাস্ত্র অনুসারে যজ্ঞ করিতে হইবে, তাহাতে অন্নদান করিতে হইবে, মন্ত্র চাই, ব্রাহ্মণের দক্ষিণা চাই ও শ্রদ্ধা চাই। ইহা হোমকেই নির্দ্দেশ করে।

গীতায় এমন স্পষ্টার্থ থাকিতে ব্যাকরণ বা অভিধান হইতে অপ্রচলিত অর্থ খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়োজন কি?

গীতার যত ব্যাখ্যাকার আছেন, তাহার মধ্যে ১৩শ অধ্যায় হইতে ১৮শ অধ্যায়ের লেখক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিশ্বাস্য। কারণ, ইহার লেখা গীতার সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। গীতায় যজ্ঞ শব্দ কি অর্থে ব্যবহার হইয়াছে তাহা তাঁহার লেখায় পাওয়া যায়।

(২) কোন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থপ্রণেতা একটি শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একই শ্লোকে, বা একই প্রসঙ্গে অব্যবহিত পর পর শ্লোকে ব্যবহার করেন না। এরূপ ব্যবহারের দোষ এই যে, ইহাদ্বারা মানুষকে ধোঁকা লাগাইয়া দেওয়া হয়। ইহা ধর্ম্মগ্রন্থ-প্রণেতার উদ্দেশ্য নহে। ইহার আরও কারণ এই, এমনিই তাঁহাদের মত অপরাপর মতের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহার উপর যদি তাহা অস্পষ্ট হয়, তাহা হইলে সে গ্রন্থ প্রচলন করা কঠিন। তবে যাহারা আপনাদের শব্দজ্ঞানের বাহাদুরী দেখাইতে চাহেন, তাহারা সেরূপ করিয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্ত দাশু রায়ের পাঁচালী [illegible]

[illegible] মনরে ভজ বিশ্বরাকে, [illegible]

দ্বিজরাজে করিলে দয়া,

বামনে ধরে দ্বিজরাজে।

অথবা যাহারা হাস্যরসের অবতারণা করিতে চাহেন, তাহারাও করিয়া থাকেন। ইংরাজী Punch সম্পাদক একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ভিন্ন ভিন্ন পদে বসাইয়া হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন।

ডাক্তার চৌধুরী মহাশয় "যজ্ঞ" শব্দ অপ্রচলিত অর্থে ব্যবহার করিয়াও, এক অর্থে বদ্ধ থাকিতে পারেন নাই। প্রায় অব্যবহিত পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোকে তিনটি অর্থ দিয়াছেন। ৩য় অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকে "যজ্ঞ" অর্থ ব্রহ্মনিষ্ঠা করিয়াছেন, ১০ম শ্লোকে "যজ্ঞ" অর্থ ঈশ্বর করিয়াছেন, এবং ১৪শ শ্লোকে "যজ্ঞ" অর্থ প্রকৃতিসঙ্গ করিয়াছেন। এরূপ রচনা গীতাকারের পক্ষে সম্ভব নহে, কাব্যামোদিগণের পক্ষেই সম্ভব।

(৩) ডাক্তার চৌধুরী মহাশয় "পর্জ্জন্য" অর্থ ইন্দ্র করিয়াছেন। পর্জ্জন্যের সে অর্থ হইতে পারে; কারণ, উপনিষদে দেখি, ইন্দ্র অর্থ মেঘও হইয়াছে ("ভয়াৎ ইন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ"), সেইরূপ মেঘ অর্থেও ইন্দ্র ব্যবহার হইতে পারে। কিন্তু ইন্দ্র অর্থ আত্মা, প্রায় ব্যবহার হয় না। ধরা যাউক, ইন্দ্র শব্দের অর্থ আত্মা, কিন্তু তাহাতে "পর্জ্জন্য" অর্থ আত্মা হইতে পারে না। এরূপ ব্যবহার করিলে ভাষাতে দোষ হয়। ইহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। সিংহ শব্দের প্রতিশব্দ হরি, আবার হরি অর্থ ঈশ্বর, কিন্তু সিংহ শব্দে কখনও ঈশ্বর বুঝাইতে পারে না; ভল্লুকের প্রতিশব্দ ঋক্ষ, আবার ঋক্ষ শব্দের অর্থ নক্ষত্রও হয়, কিন্তু কেহ যদি নক্ষত্র অর্থে ভল্লুক শব্দ ব্যবহার করে, তবে সে হাস্যাস্পদ হয়। সেইরূপ ইন্দ্রের প্রতিশব্দ যদি পর্জ্জন্য ও আত্মা উভয়ই হয়, তাহা হইলেও পর্জ্জন্য শব্দ কখনও আত্মা অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে না।

(৪) "প্রজাপতি" অর্থ ডাক্তার চৌধুরী মহাশয় করিয়াছেন "বিরাট প্রকৃতি" এবং আরও বলিয়াছেন, "পুরোবাচ প্রজাপতি এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, জীবসমূহের অন্তঃকরণে মহাপ্রকৃতি হইতে এই ভাব প্রেরিত হইয়াছে।" কিন্তু গীতায় ইহার বিপরীত কথাই রহিয়াছে। ১৩৩ শ্লোকে "মহদ্ ব্রহ্ম" শব্দ পাওয়া যায়, তাহার অর্থ প্রকৃতি। কিন্তু এই জড়রূপা প্রকৃতি ঈশ্বরের প্রকৃতি হইলেও, গীতার মতে ইহা ঈশ্বরনিষ্ঠার কোন ভাব প্রেরণ করিতে পারে না। ৭ম অধ্যায়ের ১৩ ও ১৪ শ্লোক, "এই ত্রিগুণময় ভাবের দ্বারা এই সমুদায় জগৎ মোহিত রহিয়াছে, এই গুণসকলের অতীত যে অব্যয় আমি, আমাকে কেহ জানে না। এই অদ্ভুত আমার গুণময়ী মায়া অতি দুস্তর, আমাকে যাহারা ভজনা করে, তাহারা এই মায়াকে অতিক্রম করে।"

দ্বিতীয়তঃ প্রজাপতি শব্দের প্রচলিত অর্থ ব্রহ্মা। গীতায় যদি ব্রহ্মার কোন উল্লেখ না থাকিত এবং তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা এ কথাও না থাকিত, তাহা হইলে প্রজাপতির অন্য অর্থ সম্ভব হইত। কিন্তু গীতায় ব্রহ্মাকে স্পষ্টই স্বীকার করা হইয়াছে—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণম্ ঈশং কমলাসনস্থং ঋষিংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥
১১।১৫

"হে দেব! তোমার দেহে সকল দেবতা এবং বিশেষ বিশেষ প্রাণীর সঙ্ঘ দেখিতেছি। (সকল দেবতার) প্রভু কমলাসনস্থ ব্রহ্মাকে, দিব্য ঋষিগণকে ও সর্পগণকে দেখিতেছি।" ১১ অ। ৩৭ শ্লোকে আরও স্পষ্ট—

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপি আদিকর্ত্রে।

"হে মহাত্মন্! ব্রহ্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আদিকর্ত্তা তুমি, তোমাকে কেন তাহারা নমস্কার করিবে না?"

এখানে ব্রহ্মাকে আদি কর্ত্তা বলা হইয়াছে, কিন্তু বিশ্বরূপী কৃষ্ণ তাহা অপেক্ষাও আদি কর্ত্তা। এই সকল উক্তি থাকিতে প্রজাপতি অর্থে "বিরাট প্রকৃতিকে" গ্রহণ করা অপ্রাসঙ্গিক।

(৫) ডাক্তার চৌধুরী মহাশয় গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোক, যাহার সরল অনুবাদ, "কাঠের হাতা ব্রহ্ম, ঘৃতাদি ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্ম (অর্থাৎ যাজ্ঞিক) দ্বারা হোম সম্পাদিত হয়, এইরূপ ব্রহ্মকর্ম্মে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন", এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, "কী মহান্ আদর্শ!" কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা ইহার মধ্যে মহান্ আদর্শের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মজ্ঞানকেই সঙ্কীর্ণ করিয়া প্রচলিত শাস্ত্রীয় আচার রক্ষা করিবার চেষ্টাই দেখিতে পাই। ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য ভারত গীতার নিকট ঋণী নহে, গীতার বহুপূর্ব্বে রচিত উপনিষদের নিকটই ঋণী। উপনিষদের ন্যায় আর কেহ (বেদান্ত দর্শন ব্যতীত) ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতে পারে নাই। ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের নিকট যে যাগযজ্ঞ বৃথা ও অকর্ত্তব্য, এ কথা গীতার পূর্ব্বেই ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ, উপনিষদে দেখা যায়, আরণ্যক ঋষিদিগের পক্ষে যজ্ঞের স্থলে আত্মসংযমের ব্যবস্থা রহিয়াছে। (বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অংশে অশ্বমেধ যজ্ঞের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয়তঃ মুণ্ডক উপনিষদে যজ্ঞের বিরুদ্ধে বাণী উত্থিত হইয়াছে (মুণ্ডক ১·২।৭)। এমন কি, মনুসংহিতা যাহা বর্ণাশ্রম ও যজ্ঞের প্রসিদ্ধ ব্যবস্থাপক, তাহাতেও দ্বাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা উপনিষদুক্ত ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করেন, তাঁহাদের যজ্ঞ ও বর্ণাশ্রম অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই। এই উদার মতের বিরুদ্ধে গীতা বলিতেছেন, হোম কর, কিন্তু হোমের সকল বস্তুকেই ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিও, তাহা হইলেই ব্রহ্মলাভ হইবে—যেন ব্রহ্ম কেবল কল্পনারই বস্তু। যাহাকে ব্রহ্ম মনে করা যাইবে, তাহাই সত্য ব্রহ্ম হইয়া যাইবে। মনুষ্যনির্ম্মিত কাঠের হাতাকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিলাম, অমনি তাহা ব্রহ্ম হইয়া গেল, গো-দুগ্ধদ্বারা মনুষ্য যে ঘৃত প্রস্তুত করিয়াছে, তাহাকে ব্রহ্ম মনে করিলাম, অমনি তাহা ব্রহ্ম হইয়া গেল, নানা পাপবাসনাযুক্ত ক্ষুদ্রাশয় আমাকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিলাম, অমনি আমি ব্রহ্ম হইয়া গেলাম! এই যুক্তি যে মানুষকে কতদূর বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ডাক্তার চৌধুরী এতকাল ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়াও বুঝিতে পারেন নাই,

ইহা বড় দুঃখের বিষয়। সাকারবাদিগণ এই যুক্তিবলে ক্ষুদ্র ও স্থূল বস্তুর পূজা সমর্থন করিতেছেন। তাঁহারা বলিবেন, মনে কর না কেন, প্রতিমা ব্রহ্ম, পূজোপকরণ সব ব্রহ্ম, তুমি পূজকও ব্রহ্ম, ছাগও ব্রহ্ম, খড়্গও ব্রহ্ম, ঘাতকও ব্রহ্ম, তাহা হইলে এই সাকারপূজার দ্বারাই তোমার ব্রহ্মোপাসনা হইবে! শাস্ত্রও ছাড়িতে হইবে না, সাকারপূজাও ছাড়িতে হইবে না, অথচ তোমার নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই হইবে। যে গঙ্গাস্নানে পুণ্য হয় না বলিয়া তাহা করিতে চাহে না, তাহাকে বলিবেন, মনে কর গঙ্গা ব্রহ্ম এবং তুমিও ব্রহ্ম, তাহা হইলে গঙ্গাস্নানদ্বারা তোমার ব্রহ্মোপাসনা হইবে!

প্রকৃতপক্ষে, ব্রহ্মকে বুঝিতে না পারিয়া এইরূপ যুক্তির অবতারণা করা হয়। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বৃহৎ, অনন্ত। ব্রহ্ম কোন ক্ষুদ্র বস্তু হইতে পারেন না। যত ক্ষুদ্র বস্তু সে সকল ব্রহ্মের দ্বারা সৃষ্ট অথবা তাঁহার শক্তি জ্ঞান ও ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত। যেমন আমার লেখা, আমার বাক্য বা আমার কার্য্য আমি নহি, সেইরূপ কোন সৃষ্ট বস্তু ব্রহ্ম নহে। কিন্তু সে সকল তাঁহাতে আশ্রিত বা নিমজ্জিত; কারণ, সে সকলের অস্তিত্বের আর কোন কারণ ও আশ্রয় নাই। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি," "রূপং রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ," উপনিষদের এই মহাবাক্যের অর্থ ইহাই। সকল ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহাতে আশ্রিত, কিন্তু ব্রহ্ম এ সকল নহেন। তিনি কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন এবং রূপরসাদিবিশিষ্টও নহেন।

তাঁহার সৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে মানবাত্মা তাঁহার স্বরূপবিশিষ্ট হইলেও ক্ষুদ্র ও স্বয়ং কর্ত্তৃত্বসম্পন্ন। এই জন্য সে ঈশ্বরের স্বরূপ হারাইয়া ফেলিতে পারে। তখন তাহাকে ব্রহ্মস্বরূপ-বিশিষ্টও বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, হাতা, ঘি, প্রতিমা প্রভৃতি মনুষ্যরচিত, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যেরও আভাস পাওয়া যায় না, বরং মানুষের কার্য্যেরই আভাস পাওয়া যায়। এই কারণে ব্রহ্মনাম করিয়া হোমই কর আর প্রতিমাপূজাই কর, ইহা দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা হয় না, মানুষ ব্রহ্মে তন্ময়ও হইতে পারে না।

ডাক্তার চৌধুরী আরও বলিয়াছেন—"দৈব যজ্ঞ (ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ শক্তির উপাসনা)", অন্যত্র বলিয়াছেন, প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ রূপকভাবে যথাক্রমে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর নামে কথিত হয়। এ বিষয়ে তাঁহাকে আমি রাজা রামমোহন রায়ের ইংরাজী গ্রন্থাবলীর "শঙ্কর শাস্ত্রীর সহিত বিচার" পড়িতে সবিনয়ে অনুরোধ করি। সেখানেই পূর্ব্বোক্ত মতের উত্তর আছে। যাহা ঈশ্বরের শক্তি তাহার জন্ম, (প্রলয়ে) মৃত্যু, বিবাহ, সৎ অসৎ কার্য্য, পিতা, মাতা ইত্যাদি কি প্রকারে হয়? যাহা অনাদি গুণময়ী প্রকৃতির গুণ, তাহারই বা জন্ম, (মহাপ্রলয়ে) মৃত্যু, বিবাহ, স্ত্রী, সদসৎ বহু স্বাধীন কার্য্য কি প্রকারে হয়?

(৬) এখন গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৯-১৪ শ্লোকের সরল অর্থ ও ডাক্তার চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থের তুলনা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, শেষোক্ত অর্থের সঙ্গতি হয় না। আমরা এই উভয় অর্থই পর পর দিতেছি।—

৩।৯-১৪ শ্লোকের সরলার্থ এই যে, যজ্ঞের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কর্ম্মে এই লোক কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হয়। হে কৌন্তেয়! আসক্তিশূন্য হইয়া তুমি যজ্ঞের প্রয়োজনে কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। ৯। প্রজাপতি সৃষ্টির প্রাক্‌কালে যজ্ঞের সহিত প্রজা-সকল সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হও, ইহা তোমাদের অভীষ্টভোগপ্রদ হউক। ১০। তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা দেবগণকে বর্দ্ধিত কর, দেবগণ তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করুন। পরস্পর পরস্পরকে বর্দ্ধিত করিয়া পরম অভীষ্ট ("শ্রেয়") লাভ কর। ১১। যজ্ঞের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া দেবতাগণ তোমাদিগকে অভীষ্ট কাম্য বস্তুসকল দান করিবেন। দেবগণের প্রদত্ত বস্তু দেবগণকে না দিয়া যাহারা ভোগ করে, তাহারা চৌরের ন্যায়। ১২। যজ্ঞাবশিষ্ট-ভোজী সাধুগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু যাহারা (কেবল) আপনার কারণে রন্ধন করে সেই পাপিষ্ঠগণ পাপ ভোগ করে। ১৩। অন্ন হইতে ভূতগণ উৎপন্ন হয়, অন্ন মেঘ ("পর্জ্জন্য") হইতে উৎপন্ন, মেঘ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন, যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন। ১৪।

এখন ডাক্তার চৌধুরী যে অর্থ দিয়াছেন, তদনুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া দেখা যাউক, কোন সঙ্গত অর্থ হয় কি না।—

ব্রহ্মনিষ্ঠালাভের কারণ ব্যতীত অন্য কর্ম্মে এই লোক কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হয়। হে কৌন্তেয়! তুমি আসক্তিহীন হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠালাভের জন্য সম্যক প্রকারে কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। ৯। বিরাট প্রকৃতি ("প্রজাপতি") সৃষ্টির প্রাক্‌কালে ঈশ্বরসঙ্গ-বিশিষ্ট করিয়া প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, এই ব্রহ্ম-নিষ্ঠাদ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, ইহা তোমাদের অভীষ্টভোগপ্রদ হউক। ১০। এই ব্রহ্মনিষ্ঠাদ্বারা তোমরা দেবতাগণকে বর্দ্ধিত কর, সেই সকল দেবগণ তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করুন। পরস্পর পরস্পরকে বর্দ্ধিত করিয়া পরম অভীষ্ট লাভ কর। ১১। (তোমাদের) ঈশ্বরনিষ্ঠাদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দেবগণ তোমাদিগকে অভীষ্ট কাম্যবস্তুসকল দান করিবেন। তাহাদের প্রদত্ত বস্তুসকল তাহাদিগকে দান না করিয়া যাহারা ভোগ করে, তাহারা চৌরের ন্যায়। ১২। ব্রহ্মানন্দ-ভোগী সাধুগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হন, কিন্তু যাহারা (কেবল) আপনার প্রয়োজনে রন্ধন করে, সেই পাপিষ্ঠগণ পাপ ভোগ করে। ১৩। অন্ন হইতে ভূতগণ উৎপন্ন হয়, আত্মা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়, রূপরসাদির আসক্তি বা প্রকৃতিসঙ্গ হইতে আত্মা উৎপন্ন হয়। ১৪।

একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলে, বিশেষতঃ চিহ্নিত অংশ-গুলির সার্থকতা স্থির করিতে গেলেই বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় অর্থ সঙ্গত হয় না। অলমিতি বিস্তরেণ।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র লাহিড়ী।

পরলোকগত ব্রজমোহন দাসের জীবনের দু'একটী কথা।

(শ্রাদ্ধবাসরে পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক বিবৃত)

মৃত্যু যে অমৃতের সন্ধান দিয়ে যাবার জন্ম আমাদের দুয়ারে এসে দেখা দেয়, তা সকল সময়ে ঠিক বুঝ্‌তে পারি না; বুঝ্‌তে পারি তখনই যখন সে এসে আমাদের প্রিয়জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়। তখনই আমাদের মনে এ প্রশ্ন উঠে যে, এক মুহূর্ত্ত আগে যাঁকে এত আপনার ব'লে জেনেছি, তিনি কি এই দেহের অবসানে আমার কাছে একেবারে চরমবিনাশপ্রাপ্ত হ'য়ে গেলেন? তখনই সকল হৃদয় মন জুড়ে এই কথাই ধ্বনিত হ'য়ে উঠে যে, তিনি হারান-নি, তিনি আগে যেমন ছিলেন এখনও আছেন। কিন্তু যদি আছেনই, তবে কোথায় আছেন? আমার বহিরিন্দ্রিয় ত তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছে না, তাঁকে স্পর্শ করতে পাচ্ছে না, তাঁর সঙ্গে কথা কইতে পাচ্ছে না, তবে কেমন ক'রে বল্‌ব তিনি আছেন? তখনই অন্তর থেকে কে যেন বলে, "ওরে যাঁরে তুই দেখেছিলি, ছুঁয়েছিলি, যাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলি, তাঁর প্রাণপিঞ্জরের অদৃশ্য পাখীটি উড়ে যাবার পরও ত সেই দেহখানা প'ড়ে ছিল, কিন্তু কৈ, তাঁর সঙ্গে ত তোর কথা বলা চল্ল না!" তা হ'লেই ত এই কথাই প্রমাণ হলো যে, কথা বলা চলেছিল এই দেহাভ্যন্তরস্থ এমন কোন অদৃশ্য বস্তুর সঙ্গে যে এই দেহ নহে, তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

এই দেহখানা যখন চোখের উপর ভস্মীভূত হ'য়ে গেলেও আমরা বল্‌তে পাচ্ছি না যে তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে, তার প্রতি অণুটী পর্য্যন্ত অবিনাশী হ'য়ে আছে ব'লে যখন প্রমাণ পাচ্ছি, স্বীকারও কচ্ছি, তখন কি ক'রে বল্‌ব যে, এই দেহাতিরিক্ত যে চৈতন্য ইহাকে আশ্রয় ক'রে ছিল ব'লে আমরা তাকে 'জীবিত' নাম দিয়াছিলাম, সেই চৈতন্যই বিনাশ পেয়েছে? চৈতন্যের বিনাশ নাই, এই সত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই মৃত্যু দুয়ারে আসে।

তাই প্রায় একমাস পূর্ব্বে মৃত্যু এসে আমাদের পরিবারের দুয়ারে যখন দেখা দিল, ও শান্তির প্রতিমূর্ত্তি আমার পরমারাধ্য পিতৃদেবকে লোকান্তরের যাত্রী ক'রে নিলে, তখন সে এই কথাই আমার প্রাণে ব'লে দিলে যে, এ বিচ্ছেদ ত বিচ্ছেদ নয়, এ যে চরম মিলন। দেহের বর্ত্তমানে যে দূরত্ব সৃষ্ট হয়েছিল, দেহের অবসানে সেই দূরত্ব ঘুচে গিয়ে তাঁকে আমার অন্তরেই পেলাম। তখন দেখ্‌লাম, এ-লোক ও-লোক সব এক হ'য়ে গেছে, স্বয়ং যোগেশ্বর ইহলোক ও পরলোকের সঙ্গে যোগসূত্র হ'য়ে ব'সে আছেন, আর তাঁর অনন্ত ক্রোড়ে আমরা সকলে রয়েছি,—তখনই ত মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের সন্ধান পেলাম। ধন্য সেই দেবতাকে যিনি আমার পিতার ভিতর দিয়ে তাঁর অখিল পিতৃত্বের এমন মধুর পরিচয় পাইয়ে দিলেন। আজ এই পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে সর্ব্বাগ্রে তাঁকে প্রণিপাত করি, ও তাঁর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ক'রে আমার পরমারাধ্য পিতৃদেবকে স্মরণ করি। আমাদের এই শ্রদ্ধার স্মরণ তাঁর কৃপায় সার্থক হোক।

আমার বাবা ত খুব নামজাদা লোক ছিলেন না যে সকলে তাঁকে জানবে। তিনি ছিলেন নীরব কর্ম্মী, নীরব সাধক। তাঁর জীবনের সকল কথা আমরা কেহই জানি না। নিজকে জাহির করতে ত তিনি চাননি কোন দিন। কিন্তু যে দুই চারিটী কথা তাঁর সম্বন্ধে জানি, তা থেকেই তাঁর জীবনের মাধুর্য্যের পরিচয় সম্যক্ পাওয়া যায়। আজ তারই কিঞ্চিৎ আভাস দেবার চেষ্টা করব।

১২৬২ সালের কার্ত্তিক মাসে দীপান্বিতা অমাবস্যা তিথিতে (শুক্রবার) বাবার জন্ম হয় ব'লে শুনেছি। তাঁরা তিন ভাই তিন বোন ছিলেন। আমার দুই পিসীমা ছাড়া সকলেই বাবার ছোট ছিলেন। বাবার বাল্যকালের কথা আমরা ঠাকুরমা ও বড় পিসীমার কাছে যা শুনেছি, তা বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হ'তো না; কারণ, বাবা নাকি বাল্যে বড় চঞ্চল, বড় দুরন্ত, ছিলেন। লোকের গাছের ফল আধখানা খেয়ে আধখানা গাছে ঝুলিয়ে রেখে আস্‌তেন, পায়রার খোপ থেকে তার ডিম নিয়ে এসে উনানে ঢুকিয়ে রাখ্‌তেন। গ্রামের মেয়েরা পুকুরে কলসী নিয়ে জল নিতে এসে কলসী ঘাটে রেখে কোথাও গেলে, সে কলসী পুকুরে ভাস্‌ত, কিম্বা ফুটো হ'য়ে যেতো। আমার বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে বাবাকে যা দেখেছি, তার সঙ্গে এসব কথা মোটেই খাপ খায় না। আমি দেখেছি তাঁর শান্ত স্থির ধীর প্রকৃতি। লোকে আমার দুষ্টামীর জন্য বল্‌ত, "তোর বাবা এমন শিবপুরুষ, আর তুই এমন দুষ্ট হলি কি ক'রে?" বাস্তবিক তিনি শিবপুরুষই ছিলেন, যাকে বলে "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ"। তাই তাঁর বাল্যের দুরন্তপনার কথা শু'নে বিশ্বাস করা কঠিন হতো।

বাবা বলেছেন প্রায় ৯ বছর বয়স পর্য্যন্ত তিনি বড় কাপড় পরেননি—পড়াশুনাও খুব দেরীতে সুরু করেন। এযে শুধু তাঁর বেলা হয়েছিল তা নয়; সেই সময় আমাদের সে অঞ্চলে প্রায় সকলেই এমনি দেরীতে পড়াশুনা সুরু করতেন। বাবা ত আমাদের কোন ভাই বোনকেই পড়াশুনার জন্য তাড়া দেননি; অন্য কেউ তাড়া দিলে ঐ কথাই বল্‌তেন যে, ঐ বয়সে ত তিনি পড়াশুনা সুরুই করেন-নি, সুতরাং এত তাড়া কেন?

বাবা মাইনর পাশ ক'রে এণ্ট্রান্স স্কুলের ২য় শ্রেণী পর্য্যন্ত বুঝি পড়েছিলেন, তার পর আর পড়া হ'য়ে উঠ্‌ল না; কারণ,সে সময়ে আমাদের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না, তাই বাবাকে শীগ্‌গিরই সংসারের ভার নিয়ে উপার্জ্জনের পথ খুঁজতে হয়েছিল।

ক্রমশঃ

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

গত ১৮ই কার্ত্তিক কুমিল্লা নগরে পরলোকগত গুরুদয়াল সিংহ মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা প্রেমমালা সিংহ প্রায় ৩ মাসকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া শান্তিময়ী জননীর ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন।

বিগত ৮ই নবেম্বর বাণীবন নিবাসী শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ সিংহ রায়ের জ্যেষ্ঠতাতপত্নী জ্ঞানদাসুন্দরী সিংহ রায় কলিকাতা নগরীতে তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন হাজরার গৃহে হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে ৫২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অতি সেবাপরায়ণা ছিলেন।

বিগত ২৮সে অক্টোবর বোয়াগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বসু তাঁহার মাতার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত শাস্ত্রপাঠ করেন। এই উপলক্ষে সুশীল বাবু প্রচার বিভাগে ১৲ শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডারে ১৲ ও সাধনাশ্রমে ১৲ দান করিয়াছেন।

বিগত ৫ই নবেম্বর সাধনাশ্রমে পরলোকগতা সতী দাসের

আত্মশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী শাস্ত্রপাঠ এবং মাতুল শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষ চরিত্রবর্ণন ও প্রার্থনা করেন।

বিগত ৫ই নবেম্বর পরলোকগতা সরোজকুমারী দেবীর আত্মশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য এবং কনিষ্ঠতমা ভগিনী জীবনীপাঠ ও প্রার্থনা করেন। পুত্র শ্রীমান শান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায় এই উপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ২৲ দান করিয়াছেন।

বিগত ৯ই নবেম্বর পরলোকগতা প্রতিভা ঘোষের আত্ম-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য এবং পতি শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পুত্র শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে ২৲ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে ৪৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়-স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

দান—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মল্লিক পিতা পরলোকগত বেচারাম মল্লিকের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ ও দাতব্য বিভাগে ২৲ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীপতিনাথ দত্ত মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ২৲ দান করিয়াছেন। শান্তিপ্রিয় দেব পিতামহ পরলোকগত শিবচন্দ্র দেবের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৫৲ সাধারণ বিভাগে ২৲ ও সাধনাশ্রমে ৩৲ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রভাতরঞ্জন ঘোষ পরলোকগতা পত্নী পুণ্যপ্রভা ঘোষের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ২৲ ও প্রচার বিভাগে ২৲ দান করিয়াছেন।

এ সমস্ত দান সার্থক হউক এবং পরলোকগত আত্মা-সকল চির শান্তিলাভ করুন

সান্ধ্য সম্মিলন—ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ান বন্ধুগণের প্রতিনিধিরূপে ব্রাহ্মসমাজের সহযোগে অন্ততঃ এক বৎসর কার্য্য করিবার জন্য রেভাঃ ম্যাগ্‌নাস্ সি র‍্যাটার এখানে আসিয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিগত ৫ই নবেম্বর সিটিকলেজ গৃহে একটি সান্ধ্য সম্মিলনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্ম-সম্মিলনীর চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কতিপয় নির্দ্ধারণ।

১। সম্মিলনী প্রত্যেক স্থানের ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাগণকে অনুরোধ করিতেছেন যে, আগামী ইং ১৯৩১ সালের গবর্ণমেণ্ট সেন্‌সাসে (Census এ) যাহাতে ব্রাহ্মসংখ্যা যথাযথ নির্ণয় হয়, তজ্জন্য প্রত্যেকেই যেন গণনাকারীর কাগজে নিজকে ব্রাহ্ম বলিয়া লেখান।

২। উনচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশনের নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণগুলি পুনর্গৃহীত (Re-affirmed) হইল:—

(ক) ব্রাহ্মসমাজের উন্নত নৈতিক আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য, চরিত্রহীন পুরুষ বা নারী সংশ্লিষ্ট থিয়েটার ও আপত্তিজনক সিনেমা দর্শন না করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য বলিয়া এই সম্মিলনী মনে করেন।

(খ) বর্ত্তমান সময়ে নারীনৃত্যের যে আয়োজন চলিতেছে, এই ব্রাহ্মসম্মিলনী তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকাগণ ইহার সঙ্গে কোনও প্রকার সহানুভূতি বা সংশ্রব না রাখেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

(গ) যে সকল ব্যক্তি পতিতানারী-সংশ্লিষ্ট থিয়েটার আপত্তিজনক সিনেমাগুলিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করিয়া সমাজের মধ্যে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেছেন, এই সম্মিলনী তাঁহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেছেন, এবং সমাজের নৈতিক আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য তাঁহাদিগকে অবিলম্বে এই সকল অনিষ্টকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমুদয় সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

(ঘ) শেষোক্ত প্রস্তাব যাহাতে ফলপ্রসূ হয় সেই উদ্দেশ্যে, এই সম্মিলনী দেশের সকল ব্রাহ্মসমাজকে অনুরোধ করিতেছেন যে, ঐরূপ আপত্তিজনক কোনও থিয়েটার বা সিনেমার সঙ্গে কোনও প্রকারে জড়িত কোনও ব্যক্তিকে তাঁহারা সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভাপদে অথবা অপর কোনও প্রকার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিয়োগ না করেন।

☞ এই নির্দ্ধারণগুলি আসাম, বাঙ্গলা ও বিহারের ব্রাহ্মসমাজসমূহের এবং ব্রাহ্ম সাধারণের অবগতি জন্য মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় কর্ত্তৃক ১লা অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ

তদনুসারে মনোমোহন বাবু বলেন,—ব্রাহ্মসমাজে তিনটি বিভাগ আছে—আদি, নববিধান ও সাধারণ। সাধারণ সমাজের মধ্যেও আবার কয়েকটি শ্রেণীকে পৃথক্ করা যায়। আভিজাত্যের একটি দল আছে; তাঁরা সকলের সঙ্গে সমভাবে মিশেন না। এ সকল খণ্ডতায় সমাজশক্তিকে শিথিল ক'রে দেয়। ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মের নিকট সকল সময় আশানুরূপ সাহায্য ও সহানুভূতি পান না। এ সব ত্রুটি আমাদের রয়েছে।

নৈতিক অবস্থাও আগেকার চেয়ে হীন হয়েছে বলে' মনে হয়। গত শতাব্দীতে ব্রাহ্মসমাজ সকল প্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। এখন সেই অবস্থা আছে, বলা যায় না। নারীদের মহিমা, সৌন্দর্য, [illegible] যদি না থাকে তবে বিপদের আশঙ্কা। নরনারীর সহজ স্বাভাবিক মিলন ভাল; কিন্তু এ সম্বন্ধে পূর্বে যতটা সাবধানতা ছিল [illegible] বোধ [illegible] আমরা পর্দা প্রথা তুলে' দিয়েছি বটে; কিন্তু তাই বলে' বাড়ীতেও কি পরদা থাক্‌বে না? নারীদের অত্যগ্রসর হওয়া কতদূর কল্যাণকর তা বিবেচনা করা উচিত। নারীনৃত্যের বিরুদ্ধে সঞ্জীবনী ঘোর প্রতিবাদ করেছেন। আমিও তত্ত্ব-কৌমুদীতে লিখেছিলাম; কেউ কিছু জবাব দেন নি। দূষিত বায়োস্কোপ ও বারবনিতা-সংশ্লিষ্ট থিয়েটারে ব্রাহ্মেরা যান না, এমন বলা যায় না। এই যে নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতাদি হ'লে আমাদের মন্দির খালি থাকে, পূর্ব্বের ন্যায় যুবকদের দ্বারা পূর্ণ হয় না, এর কারণ কি? ছাত্রগণকে হরণ করেছে কে? থিয়েটার ও বায়োস্কোপ ছাত্রগণকে হরণ করে' নিয়ে ঘোর দুর্গতিতে ফেল্‌চে।

তারপর, বিবাহ-সমস্যা একটি গুরুতর বিষয়। ছেলের আয় কম হলে মেয়েরা আর তাকে পছন্দ করেন না। এর ফলে অনেক মেয়েকে অবিবাহিত থাক্‌তে হয়। তাহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। অধিকবয়স্কা কন্যার সহিত অল্পবয়স্ক পাত্রের বিবাহ স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে ও অন্য সব দিক দিয়ে মঙ্গলকর কি না তাহাও বিবেচ্য।

তারপর আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা। আমাদের উপাসনা-মন্দিরে ব্রাহ্মের সংখ্যা অল্প দেখা যায়। মন্দিরে যদি ব্রাহ্মের সংখ্যা ক্রমেই কমে যায়, তবে দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। আধ্যাত্মিক রস না পাওয়াতেই দলাদলি ও অপ্রেম ঘটে। বিবাহ-সভায় দেখা যায়, একদল উপাসনার সময়েও ফূর্ত্তি করেন, চুরুট টানেন। সুতরাং সমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা যে খুব ভাল, তা বলা যায় না।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে মনোমোহন বাবু উপরোক্ত বিষয় গুলি প্রস্তাবাকারে উপস্থিত করেন। সে গুলির সম্বন্ধে একে একে আলোচনা হয়, এবং পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়া, কোনওটি সর্ব্বসম্মতি ক্রমে এবং কোনওটি অধিকাংশের মতে সভায় গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাবগুলি এই :—

(১) যে সকল স্থানে অনেক ব্রাহ্ম আছেন, তথায় সামাজিক শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, এবং ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে পরিচয় ও ভাবের বিনিময়ের জন্য, বৎসরে অন্ততঃ দুইবার ব্রাহ্মদিগের সামাজিক সম্মিলন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(২) ব্রাহ্মদের পক্ষে বড় বড় পারিবারিক অনুষ্ঠানে সামর্থ্য অনুসারে সমাজস্থ সকলকে আহ্বান করা বাঞ্ছনীয়।

(৩) ব্রাহ্মগণের পরস্পরের বাড়ী গিয়া সংবাদ লওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৪) সন্তানগণের সৎশিক্ষা ও চরিত্রগঠনের সাহায্যার্থ তাহাদের জন্য ভাল সঙ্গ নির্ব্বাচন করিয়া দেওয়া অভিভাবক-দিগের কর্ত্তব্য।

(৫) প্রত্যেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক সভ্য, ও ব্রাহ্মদিগের বয়স্ক পুত্র কন্যার পক্ষে সামাজিক উপাসনায় ও সমাজমন্দিরের অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান বাঞ্ছনীয়।

(৬) আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রতি ব্রাহ্মবহুল স্থানে নীতি বিদ্যালয়, ছাত্রসমাজ ও বালকবন্ধুসভার প্রতিষ্ঠা করা, এই সম্মিলনী অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন।

(৭) অশ্লীল ও [illegible] জনক পুস্তক পত্রিকাদি ব্রাহ্মপরিবারে গ্রহণ ও পাঠ করা অকর্ত্তব্য।

(৮) নীতিবিগর্হিত ও অবৈধ বিবাহাদি অনুষ্ঠানে এবং নীতিবিগর্হিত আমোদ প্রমোদে যোগদান না করা, বরং তাহার প্রতিবাদ করা, প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য।

(৯) ব্রাহ্মসমাজের উন্নত নৈতিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, চরিত্রহীন পুরুষ বা নারী সংশ্লিষ্ট থিয়েটার ও আপত্তি-জনক সিনেমা দর্শন না করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য বলিয়া এই সম্মিলনী মনে করেন।

(১০) বর্ত্তমান সময়ে নারীনৃত্যের যে আয়োজন চলিতেছে, এই ব্রাহ্মসম্মিলনী তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাগণ ইহার সঙ্গে কোনও প্রকার সহানুভূতি বা সংস্রব না রাখেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেনের নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি আলোচিত ও পরিশেষে গৃহীত হয় :—

(১১) যে সকল ব্রাহ্ম পতিতানারী-সংশ্লিষ্ট থিয়েটার ও আপত্তিজনক সিনেমাগুলিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করিয়া সমাজের মধ্যে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেছেন, এই সম্মিলনী তাঁহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেছেন, এবং সমাজের নৈতিক আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহাদিগকে অবিলম্বে এই সকল অনিষ্টকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমুদয় সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

তৎপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটিও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :—

(১২) এই শেষোক্ত প্রস্তাব যাহাতে ফলপ্রসূ হয় এই উদ্দেশ্যে, এই সম্মিলনী দেশের সকল ব্রাহ্মসমাজকে অনুরোধ করিতেছেন যে, ঐরূপ আপত্তিজনক কোনও থিয়েটার বা সিনেমার সঙ্গে কোনও প্রকারে জড়িত কোনও ব্যক্তিকে তাঁহারা সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যপদে অথবা অপর কোনও প্রকার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিয়োগ না করেন।

এইরূপে বেলা সাড়ে বারটার সময় সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশন শেষ হয়।

মধ্যাহ্নে মহিলা-সম্মিলন।

বেলা দেড় ঘটিকার সময় মহিলাদিগের বিশেষ সম্মিলন হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীযুক্ত

সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্তা হেমলতা ভট্টাচার্য্য প্রার্থনা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী দাস ও শ্রীযুক্তা রেণুকণা দাস প্রবন্ধ পাঠ করেন; এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ও সভাপতি মহিলাদিগকে কিছু বলেন।

অপরাহ্নে সম্মিলনীর পঞ্চম অধিবেশন।

বেলা ৩ ঘটিকার সময় সম্মিলনীর পঞ্চম অধিবেশন হয়। প্রথমে অনাথ ব্রাহ্মপরিবার-সংস্থান ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আগামী বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর উক্ত ভাণ্ডারের সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তৎপরে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ঐ ভাণ্ডারের অর্থবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বলিলে, সভাস্থলে ৩০৲ টাকা দান স্বাক্ষরিত হয়, এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহ কলিকাতায় এবং শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু ঢাকায় এই ভাণ্ডারের জন্য অর্থ-সংগ্রহের ভার গ্রহণ করেন।

তৎপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়:—

(১৩) সকল স্থানের ব্রাহ্মসমাজসমূহের সম্পাদকগণকে ও ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকাগুলির সম্পাদকগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে, যেন তাঁহারা প্রত্যেক সমাজের সংবাদসকল পত্রিকা-গুলিতে নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করেন।

(১৪) সম্মিলনীর "পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম-সম্মিলনী" নাম পরি-বর্ত্তন বাঞ্ছনীয় কিনা, এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়া স্থির হইল যে নাম পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই।

(১৫) সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে উপস্থিত অতিথিগণের নিকট হইতে delegation-fee গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় কি না, এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া স্থির হইল যে, delegation-fee গ্রহণের পরি-বর্ত্তে সম্মিলনীর সভ্যগণের বার্ষিক চাঁদা বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয়।

(১৬) কিন্তু ঐরূপ করিতে হইলে পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া স্থির হইল যে, আগামী অধিবেশনের জন্য প্রত্যেক সভ্য বার্ষিক চাঁদা এক টাকার অতিরিক্ত আরও এক টাকা সাহায্য করিবেন; এবং যথাসময়ে বিজ্ঞাপন দিয়া চেষ্টা করিতে হইবে যে, আগামী অধিবেশনে যেন সম্মিলনীর সভ্যগণের বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ ৩৲ টাকা নির্দ্ধারিত হয়।

(১৭) ইহাও স্থির হইল যে সম্মিলনীর অধিবেশন পর বৎসর কোথায় হইবে তাহা সম্মিলনীই নির্দ্ধারণ করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সেই স্থানের তিন ব্যক্তিকে অতিরিক্ত সভ্য (co-opted member) রূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত এক যোগে অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবেন।

(১৮) আগামী অধিবেশন চট্টগ্রামে হইবে স্থির হইল।

(১৯) অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বিশ্বাসকে পুনরায় এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত করা হইল। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক ও শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু অর্থসংগ্রহকারী নিযুক্ত হইলেন।

(২০) বিগত বৎসরের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকগণই আগামী বৎসরের জন্যও স্ব স্ব পদে রহিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসুর প্রস্তাবে নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণটি গৃহীত হয়:—

(২১) বাল্যবিবাহ নিবারণ জন্য আইন উপস্থিত করিয়া রায় সাহেব হরবিলাস সর্দ্দা মহাশয়, এবং উক্ত আইন কাউন্সিলে সমর্থন ও পরিশেষে অনুমোদন করিয়া গবর্ণমেন্ট, এই সম্মিলনীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

(২২) অতঃপর জগন্নাথ হোষ্টেলের কর্তৃপক্ষ, ঈষ্ট বেঙ্গল ইন্-ষ্টিটিউশনের কর্ত্তৃপক্ষ প্রভৃতি যাঁহারা সম্মিলনীর বর্ত্তমান অধি-বেশনের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

(২৩) [illegible] সভাপতি মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন-সূচক নির্দ্ধারণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে ও সাদরে গৃহীত হইল।

সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় বলেন—এই সম্মিলনী আমাদের বড়ই আগ্রহের বস্তু। বৎসর বৎসর ইহাতে উপস্থিত হইতে না পারিলে প্রাণে বেদনা হয়। মাঘোৎসবেও যোগদান করি; কিন্তু এই সম্মিলনীতে তদপেক্ষাও অধিক আনন্দ পাই। বহু-দিন পরে পরিবারের সকলের সঙ্গে মিলিত হইলে যেমন আনন্দের উচ্ছ্বাস হয়, এই সম্মিলনীতে তেমনি হয়। অন্যান্য সভা-সমিতিতে এমন হয় না। এখানে আসিতে কত ক্লেশ হয়, এসেও ভাল আহারাদির অভাবে ক্লেশ পেতে হয়, তবুও অর্থ-ব্যয় ক'রে, সকলে কেন আসেন? আত্মিক আনন্দের জন্য। আত্মিক আনন্দের জন্য আমরা ক্লেশ স্বীকার করি। এ সকল আশার কথা। অতএব, আমরা আর পশ্চাতে যাব না। আমাদের অগ্রগতি কেউ নিবারণ করতে পারবে না। দশ বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, এখন তার কত উন্নতি হয়েছে। ভগবান এখন আর কল্পনার বিষয় নন। তিনি ব্যক্তি; তিনি এই বৃহৎ সমাজকে চালাচ্ছেন। যেমন পিতা সন্তানগণের উন্নতির জন্য যত্ন করেন, তেমনি তিনি আমাদের উন্নতির জন্য যত্ন করছেন। তাঁর উপর নির্ভর রেখে আমরা সকলে অগ্রসর হই। এই সম্মিলনীতে যাঁরা এসেছেন, যত পুরুষ নারী বালক-বালিকা সেবা করেছেন, সকলকে প্রণাম করি।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রীতি সম্মিলন।

এইরূপে সম্মিলনীর শেষ অধিবেশনের কার্য্য সম্পন্ন হইলে সভাস্থ সকলে ও আরও অনেকে ঈষ্ট বেঙ্গল ইন্ষ্টিটিউশনের প্রাঙ্গণে মিলিত হন। বালক বালিকা সহ প্রায় চারিশত ভ্রাতা-ভগিনী সেখানে একত্রিত হইয়াছিলেন। তথায় কন্সার্ট বাদ্য, পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা ও কিঞ্চিৎ জলযোগ হয়।

সন্ধ্যার পর উপাসনা।

তৎপরে মন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। উদ্বোধনে তিনি বলেন, মানুষ মাত্রেই আপনাকে বড় অসহায় মনে করে। কিন্তু জীবনের অন্তরালে পরমেশ্বরের গভীর প্রেম আমাদের জন্য রহিয়াছে।

একবার এক ঈগল্ পক্ষী [illegible] পর্ব্বতশিখরে বসিয়াছিল। শিশুর মাতা আকুল স্নেহের প্রেরণায় সেই দুরারোহ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া শিশুটিকে উদ্ধার করে। এই মায়ের স্নেহ যেমন, পরম মাতার স্নেহও তদ্রূপ। তিনি আমাদের জন্য এমনি ব্যাকুল। আমাদের একজন আপনার ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব সব হারাইয়াছিল। তার হৃদয়ে প্রেম ভক্তি ছিল না। কেবল কিছু অর্থ ছিল; তার সাহায্যে সে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পৃথিবীর কেউ তাকে উদ্ধার কর্‌তে পার্‌ল না। অবশেষে ভগবানের বিধানে সে একজন সাধুর সংস্পর্শে উদ্ধার হ'য়ে গেল। সেই শিশুহারা মায়ের প্রাণে যিনি স্নেহ দিয়েছিলেন, তিনিই সাধুর মধ্য দিয়ে পাপীকে উদ্ধার কর্‌লেন। তিনি জাগ্রত জীবন্ত পুরুষ। তাঁর প্রকাশ দেখ্‌বার জন্যই আমরা মিলিত হয়েছি। সকলে একত্র হ'য়ে বলি, "তোমার প্রকাশ হউক।"

আরাধনার পর সংক্ষিপ্ত উপদেশে তিনি উচ্ছ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে বলেন,—ঈশ্বরের দয়াতে অনেক সমস্যার মীমাংসা হয়েছে; জীবনের ভার তিনি গ্রহণ করেছেন। নিরাশার দুর্দ্দিনে বলেছিলেন, "জীবনের ভার আমায় দিয়ে থাক হে নিশ্চিন্ত হয়ে"; এই কথা এখনও ভুল্‌তে পারি নাই। ঐ বাক্যই সর্ব্বদা স্মরণ করি। তাহাতে নিজের চিন্তা গিয়েছে। তাঁর ইচ্ছা পালন কর্‌তে গিয়ে কত দুঃখ পেতে হয়েছে; কিন্তু দেখেছি দুঃখের পর কি আনন্দ! সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুঃখ মৃত্যুর দুঃখ। সেই দুঃখ চ'লে গিয়েছে। পরকাল আছে, চক্ষে দেখা যায়, অন্তরে বোঝা যায়। সংসারে কেন এত দুঃখ দারিদ্র্য? এর কি কোনও মীমাংসা হবে না? মীমাংসা আছে। যদি দুঃখে প'ড়ে তাঁকে দেখা যায়, তবে ত দুঃখ বাঞ্ছনীয়। তাঁকে পেলে সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়।

১৪ই অক্টোবর, প্রাতে উপাসনা।

১৪ই অক্টোবর প্রাতঃকালে ঊষা কীর্ত্তনের পর উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

উদ্বোধনে তিনি বলেন—মা শিশুকে জোর ক'রে দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখেন। তেমনি জগজ্জননীও আমাদিগকে জোর ক'রে আত্মিক অন্নপান দান করেন। Estlin Carpenter উপাসনায় যেতেন; কিন্তু মন বস্‌ত না; উপাসনা ভাল লাগ্‌ত না। একদিন ছুটীর সময় ছড়ি হাতে সহরের বাইরে বেড়াতে গেলেন। একাকী যেতে যেতে এক অদৃশ্য ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে প্রকাশিত হলেন। বাহিরের চক্ষু দিয়ে যে দেখ্‌লেন, তা নয়; কিন্তু এমন দেখা দেখ্‌লেন যে, জীবনে আর ভুল্‌তে পার্‌লেন না। বন্ধুকে লিখ্‌লেন, "তুমি আমার কাছে আছ, ইহা যেমন স্পষ্ট, তেমন স্পষ্ট দেখ্‌লাম।" চির জীবনের মত বাঁধা প'ড়ে গেলেন। এ কি জোর ক'রে সুধা পান করান নয়? মা সকলের সঙ্গেই নিত্য এইরূপ কর্‌চেন।

এই যে উৎসবে এসেছি, পূর্ব্বে আমাদের মনের অবস্থা কি ছিল, আর এখন কি হয়েছে! আমার আস্‌বার অনেক বাধা ছিল। দু'জন ভক্তিভাজন ব্যক্তি হাত ধর্‌লেন; জোর ক'রে আন্‌লেন। এ কি মায়ের হাত ধরা নয়? আসা সার্থক হয়েছে। সকলের মুখে সুন্দর ছবি দেখ্‌চি; সকলেই যেন তৃপ্ত। বড় সাধ হচ্ছে, উৎসবের শেষদিনে সকলে মিলে মায়ের গুণ গান করি।

উপদেশে বলেন,—যে সব ছেলে মেয়েরা মা বাপকে ভাল বাসে না, ভক্তি করে না, মা বাপের কথা শোনে না, তাদের কখনও ভাল হয় না। যত বড় লোকের কথা শুনা যায়, তাঁরা সকলেই মাকে বড় ভাল বাস্‌তেন। মাকে ভাল বাস্‌লে সন্তানেরই ভাল হয়; সন্তানই বড় হন।

জগতের মাকে যাঁরা ভাল বাসেন তাঁদেরও ভাল হয়; ভাল না বাস্‌লে কখনও মঙ্গল হয় না। নিজ নিজ জীবনের দিকে তাকাইলেই আমরা এটা বুঝ্‌তে পারি। ভাই বোন, যদি জীবনের দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট হতে না পার, যদি দুঃখ দুর্গতি দেখ, তার কারণ জেনো, মাকে ভাল না বাসা! মহর্ষি ঈশা বলেছিলেন, "Thou shalt love the Lord, thy God with all thy heart, with all thy mind and with all thy soul, and thou shalt love thy neighbour as thyself. ঈশ্বরে ভক্তি ও মানবে প্রেম,—এই কথাটির মধ্যে সব আছে। তাঁকে ভাল বাস্‌তে পার্‌লে জীবন ধন্য হ'য়ে যায়। মাকে ভালবাসা সন্তানের পক্ষে কেমন স্বাভাবিক! এটা ব'লে দিতে হয় না। কিন্তু আমরা জীবনটাকে এমন বিকৃত ক'রে ফেলি যে, এই স্বাভাবিক জিনিষটাই অস্বাভাবিক হয়ে যায়। তাঁকে ভাল বাস্‌বে না? তাঁর অনুগত হবে না? জীবন যে তাঁর ভালবাসায় পূর্ণ; তাঁর ভালবাসাই ত জীবনকে রক্ষা কর্‌চে।

তিনি যেমন ভালবাসেন, আমরাও যদি পরস্পরকে তেমনি ভালবাস্‌তে পার্‌তাম তবে ধন্য হতাম। ভালবাসার মতন জিনিস আর নাই। মার শাসন প্রেমের শাসন। আমাদেরও পরস্পরের প্রতি প্রেমের শাসনই হওয়া চাই। বাড়ীর একটি পরিচারিকা কিছু কিছু চুরী কর্‌ত। এটা যখন টের পাওয়া গেল, তখন তাকে বিদায় ক'রে দিতে ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু শেষে স্থির করা গেল, ও ত ভাল খেতে পায় না ব'লেই চুরী করে; ওকে একদিন ভাল ক'রে খাওয়ান যাক্। তাই যখন করা গেল, তখন সে অবাক হ'য়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, "আমার জন্য এত খাবার! আমার জন্য এত আয়োজন!" এই বল্‌তে বল্‌তে সে চোখের জল ছেড়ে দিল। সেই অবধি তার সংশোধন হ'য়ে গেল; আর সে চুরী অপরাধে অপরাধী হয় নি। মা আমাদের প্রতি এইরূপ ব্যবহারই করেন। আমাদেরও পরস্পরের প্রতি এইরূপ ব্যবহারই করা উচিত। সমাজের ভাল দেখ্‌তে চাও? সমাজকে ভাল বাস। ভাইবোনকে ভাল দেখ্‌তে চাও? ভাইবোনকে ভালবাস। জয় কর্‌তে চাও ত ভাল কর্‌তে পার্‌বে না। ভালবাসা থাক্‌লেই সমাজ সুখের স্থান হয়। ভগবানেরও আশীর্ব্বাদ নেমে আসে।

উপদেশ ও সঙ্গীত শেষ হইলে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রাণের আবেগভরে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই ঢাকা নগরে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণকালের বিবরণ ও পরমেশ্বরের করুণার বর্ণনা করেন। পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের ভালবাসামিশ্রিত বাধার সঙ্গে কিরূপ সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, রাত্রির অন্ধকারে ঢাকা হইতে টঙ্গি পর্য্যন্ত পদব্রজে কিরূপ ক্লেশে যাইতে

হইয়াছিল, অশ্রুপাতের সহিত এ সকল স্মরণ করেন ও পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের কোনও কোনও স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সে সকলকে নিজ জীবনের তীর্থস্থান রূপে বর্ণনা করেন।

শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাসও ঐরূপে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে নিজের পূর্ব্ব কাহিনী ও দুঃখ ক্লেশ অনাহার প্রভৃতির মধ্যে পরমেশ্বরের দয়া বর্ণনা করেন; এবং পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দিরকে তাঁহার তীর্থস্থান বলিয়া ব্যক্ত করেন।

তৎপরে মহম্মদ জলিল উদ্দিনও সাশ্রুনয়নে তাঁহার জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব, স্বর্গীয় গুরুদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি বর্ণনা করেন।

এইরূপে উৎসবের শেষ দিনে সকলে পরমজননীর মধুময়ী করুণা বিশেষরূপে অনুভব করিয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বক তৃপ্ত হৃদয়ে স্ব স্ব স্থানে গমন করেন। ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সম্মিলনীর পরে

আমাদের পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর যে সম্মিলন ও উৎসব হ'য়ে গেল, উহাতে যোগদান ক'রে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেছি। শুধু আনন্দ লাভ নয়, কিছু যে উপকার পেয়েছি, সে কথাও স্বীকার করা ভাল। অল্পই হউক আর বেশীই হউক, অনেকেই ত কিছু কিছু পেয়েছি; সে পাওয়ার কথা স্বীকার করলে লোকের মনে আশা জাগ্‌তে পারে, এই রকম একটি সম্মিলনীর যে কত প্রয়োজন, সে বিষয়েও মানুষের একটা ধারণা জন্মিতে পারে। এবার সম্মিলনী যে দিন শেষ হ'ল, সে দিন অনেকেরই যেন সকলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হ'তে মনের মধ্যে কেমন কষ্ট হচ্ছিল। আমি সেই সম্মিলনী বিষয়েই সংক্ষেপে গুটিকয়েক কথা বল্‌তে চেষ্টা করব।

আমরা অনেক সময় সম্মিলনীর মত উৎসবাদিতে, যথেষ্ট বিশ্বাস, বিনয়, ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর এবং মনের অকপট নিঃস্বার্থভাব নিয়ে যোগদান করতে পারি নে, তারই শাস্তি-স্বরূপ অনেক সময় ঐ সকলে তেমন কিছুই ফললাভ করতে সমর্থ হই না। এই জন্ত যখনই একটা উৎসবাদি ব্যাপার এসে উপস্থিত হয়, অমনি একদল নিরাশচিত্ত উৎসাহবিহীন লোক, মুরব্বির মতন, কিছুই হবে না ব'লে সাবধান করতে থাকেন। তাঁরা বলেন, আরে রেখেদাও বাপু তোমার উৎসব, ও সব আমরা ঢের ঢের দেখেছি। সেই ত বৎসরের পরে বৎসর একটি সম্মিলনী হয়, একজন সভাপতি এসে গরম গরম একটা বক্তৃতা শুনান, তা ছাড়া কয়েকদিন সেই একঘেয়ে উপাসনা উপদেশ আর আলোচনার মধ্যে কতকগুলি মামুলি বিষয় নিয়ে কথার কাটাকাটি চলতে থাকে। তার পরে সমস্ত বৎসর কাজের মতন কোন কাজই নাই। এই রকম সম্মিলনীতে লাভ কি?

এই তিরস্কারের মধ্যে যে সত্য আছে, সে কথা মাথা পেতে মেনে নিতেই হবে। কিন্তু আমরা যারা মুরব্বির মতন এই সকল বাক্য উচ্চারণ করি, অনেক সময় আমরা যে কি রকম চিন্তাবিহীন ও আত্মপ্রতারিত হ'য়ে এই সকল কথা ব'লে থাকি, সে বিষয়েও একটুখানি আলোচনা ক'রে বুঝ্‌তে চেষ্টা করা আবশ্যক। উৎসবাদি ও ভক্ত-সম্মিলনের মধ্যে যখন ঈশ্বরের আশ্চর্য্য করুণা নেমে আসে, তখনও আমরা তাঁর বিন্দুমাত্রও করুণা দেখতে পাই না, কিছুই হ'ল না ব'লে কেবলই নিরাশার কথা বলি;—তাহার মূলে কি আমাদের অবিশ্বাস, অহংকার ও প্রভুত্বপ্রিয়তা প্রচ্ছন্ন থাকে না? আমাদের এমনই সংশয় যে, আমাদের কার্য্যের মধ্যে ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ, ত্যাগী শিবনাথ ও আচার্য্য নগেন্দ্রনাথের মতন লোক নেই ব'লে মনে হয়, আর কিছুই হবার নয়। আমাদের মনের তলদেশে এমন একটা অহংকার ও অশ্রদ্ধা লুকানো থাকে যে, এই উৎসবে যাঁরা মিলিত হয়েছেন, যাঁরা উপাসনা, আলোচনা করছেন, তাঁদের কাছে আর কিই বা শুনব? তাঁরা আমাদের কিই বা করবেন? তাহা ছাড়া, সকল কার্য্যের মধ্যে আমার কোন রকম কর্ত্তৃত্ব করবার সুবিধা যে হচ্ছে না, সে জন্যও কোন ভাল কাজকেও অনেক সময় ভাল ব'লে মনে করতে পারি না। অন্তরে এই চিন্তাই উদয় যে, ঐ সব কাজ আমার পরামর্শ ও ইচ্ছায় সম্পন্ন হ'লেই হয় ত খুব ভাল হ'তে পারত। আসল কথা, সব জায়গায়ই আমাদের অহঙ্কার মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় বলেই অনেক ভাল জিনিসকে ভাল ব'লেই গ্রহণ করতে পারি না, তাতেই অনেক বিষয়ে লাভবান হ'তে পারি না এবং অনেক সময় প্রকৃত আনন্দ হ'তেও বঞ্চিত হই।

কিন্তু এই সকলের চেয়েও আর একটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে; আমরা আর এক নিগূঢ় কারণে আত্মার মধ্যে আশ্চর্য্য রকমের কিছু না পেলে, খুব বড় রকমের একটা পরিবর্ত্তন না হ'লে, ধর্ম্মরাজ্যের ছোট ছোট পাওয়াকে কিছু পেলেম ব'লেই মনে করি না; এমন কি, সে রকম পাওয়ার কোন রকম অনুভূতিই আমাদের মধ্যে জাগে না। আমাদের দেহাত্মবুদ্ধি অতিশয় প্রবল, মনের ও আত্মার সম্পদের চেয়ে বাহিরের ক্ষণস্থায়ী বস্তু-প্রাপ্তির দিকেই অন্তরের ঝোঁক অত্যন্ত বেশী। এজন্য কোন উৎসবাদির মধ্যে যদি দেখি, আমাদের প্রচার বিভাগ ও দাতব্য বিভাগের জন্য কয়েক শত টাকা নগদ হাতে হাতেই পাওয়া গেল, আরো হাজার দুই দিবার জন্য কেহ কেহ খাতায় নাম সহি করলেন, তা হ'লে কতই আনন্দ হয়, মনে ভাব, হাঁ, এবার একটা কাজের মতন কাজ হয়েছে বটে, আমাদের উৎসবটা সার্থক হয়েছে। কিন্তু প্রতিদিনের উপাসনা, আলোচনা, বক্তৃতা ও ধর্ম্ম-বন্ধুদিগের সঙ্গে মিলনের মধ্য দিয়া মনের ও আত্মার যে কত প্রকার অপূর্ব্ব সামগ্রী লাভ করি, আমরা কয়জন লোক তাকে মূল্যবান সামগ্রী ব'লে মনে করি? কয়জনে উহা লাভ ক'রে পরিতৃপ্ত ও পুলকিত হই?

আমাদের এক একটা উৎসবের মধ্যে প্রায়ই দুই একটি অতি চমৎকার বক্তৃতা হয়, অনেকগুলি উৎকৃষ্ট উপদেশও আমরা শুনিতে পাই, তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তিরসপূর্ণ গ্রন্থপাঠও হ'য়ে থাকে। এ সকলের মধ্য দিয়া কত সময় আমাদের অন্তরের এক একটা অন্ধকারের দিক্‌ সহসা আলোকিত হ'য়ে উঠে, আমরা যে সত্য জানিতাম না, তাহাও জেনে কত উপকৃত হই। এক উৎসবে নয়, দুই উৎসবে নয়, এমন ত কত উৎসবেই হয়। কি বলেন? আপনাদের তা হয় না কি? হয় বই কি? কিন্তু কে উহার মূল্য দেয়? একটি সত্য, একটি তত্ত্ব, আমাদের অন্তরের যে কি সম্পদ, তা আমরা মোটেই চিন্তা ক'রে দেখি না, উহাতে জীবনের যে কত উপকার, তাহাও অনুভব করি না; এই জন্য ঐ সকল সত্য পাওয়াও আমাদের কাছে মিথ্যা পাওয়ার মতন।

এ সকল ত গেল জ্ঞান ও সত্য পাওয়ার কথা। কিন্তু আমরা যে আধ্যাত্মিক সম্পদ অর্থাৎ বিশ্বাস, ভক্তি ও পবিত্রতা প্রভৃতি লাভ করবার জন্য, উৎসবের মধ্যে বিশেষ ভাবে ব্যাকুল হ'য়ে থাকি। সেই সমস্ত বিষয়েই একটুখানি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা ক'রে দেখুন। আমাদের এক একটা উৎসবের মধ্যে যখন গভীর উপাসনা, উৎকৃষ্ট উপদেশ ও জমাট কীর্ত্তন হয়, তখন কি আমাদের রুদ্ধ হৃদয়দ্বার কিছু সময়ের জন্যও খুলিয়া যায় না? আমরা কি শূন্যপ্রাণে ঈশ্বরের অতি অল্প একটুখানি স্পর্শ, সংশয়ের মধ্যে অল্প একটু বিশ্বাস, বিষয়াসক্তির মধ্যে অল্প একটু সাধনের আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থপরতার মধ্যে সামান্য একটু ত্যাগের ভাব লাভ করিতে সমর্থ হই না? আমাদের অন্তরে কি কিছু কালের জন্যও পবিত্র সংকল্পের উদয় হয় না? হয় বই কি।

(ভাদ্রোৎসবের পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত প্রদত্ত উপদেশ অবলম্বনে লিখিত।)

এই যে আমাদের সম্মিলনীর উৎসব হয়ে গেল, একবার বলুন ত, আপনারা কি আত্মার মধ্যে কোনরূপ আধ্যাত্মিক ভাবের কম্পন অনুভব করেন নাই? করেছেন বই কি? অথচ অনেকেই বাইরের জীবনের দিকে চেয়ে ভিতরের ঐ অল্প পরিমাণ আধ্যাত্মিক ভাবগুলির মূল্য দিতে এবং উহা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। অথচ ঐ যে একটু স্পর্শ, একটু বিশ্বাস, একটু সাধনের আকাঙ্ক্ষা, এমন নিঃস্বার্থ ভাব লাভ করা, উহার মূল্য ত কম নয়। আমরা ধর্ম্মজগতের অতি সাধারণ নিম্নস্তরের লোক;—আমাদের ঐ রকম একটু একটু লাভ করতে করতেই ত অতি ধীরে ধীরে ধর্ম্মজীবনের পথে অগ্রসর হ'তে হবে। কিন্তু এই কথাটাই আমরা ভাল ক'রে বুঝি না, একটু একটু লাভের মূল্য দিতেই চাই নে. এই জন্যই ত আমাদের মনের মধ্যে অন্ধকার, অবিশ্বাস, ও অশ্রদ্ধা ও নিরাশা। আমরা নিরাশাকাতর সংশয়পূর্ণ চিত্তে ব'লে উঠি—রেখে দাও তোমার উৎসব ও উপাসনা, আমার উহাতে কিছুই হয় নাই। আসল কথা আমাদের মনের মধ্যে উৎসবাদি সম্বন্ধে এই রকম একটা ভাব লুক্কায়িত আছে যে, উৎসবের মধ্যে প্রভু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মতন ভক্তির উচ্ছ্বাসপূর্ণ উপাসনা, আচার্য্য শিবনাথের মতন গরম গরম বক্তৃতা ও উদ্দীপনাপূর্ণ উপদেশ হবে, আর তার ভিতর দিয়ে একটা প্রবল ভাবের স্রোত এসে আত্মার মধ্যে খুব বড় রকমের পরিবর্ত্তন উপস্থিত করবে, আমি একেবারে নূতন মানুষ হ'য়ে যাব। যদি তাই না হয়, তবে ঐ সব ছোট খাট পাওয়া—যা কিছুদিন পরে কল্পনার বুদ্বুদ হ'য়ে মনের মধ্যে মিশিয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়, তা পাওয়া আবার কি একটা পাওয়া? সেই কথাও আবার আস্ফালন ক'রে মানুষকে শুনাতে হবে?

আচ্ছা, এখন দেখা যা'ক, সম্মিলনীর উৎসবের মধ্য দিয়া আমরা কি কি বিষয় লাভ করেছি; এবং সম্মিলনীতে আমরা ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাগণ মিলিত হ'য়ে যে ভাবে উপাসনা আলোচনা এবং ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য কথাবার্ত্তা বলেছি, তাতে আমাদের কি কি উপকার হ'তে পারে।

প্রথমতঃ, কতকগুলি ধর্ম্মপিপাসু ও ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থী ব্রাহ্মব্রাহ্মিকার যে কয়েকদিনের জন্য আর সকল ভুলে গিয়ে একত্র হ'য়ে উপাসনা, ধর্ম্মালোচনা, সমাজের কল্যাণচিন্তা এবং একত্র হ'য়ে আহার ও কথোপকথন,—ইহার মধ্য দিয়া আমরা যে কি রকম শক্তি লাভ ক'রে থাকি, সে অনুভূতিই আমাদের নাই। ধর্ম্মমণ্ডলী ও ধর্ম্মসমাজ কেন? এই মিলনেরই জন্য। আমাদের আধ্যাত্মিক মিলনের মধ্য দিয়া স্বয়ং মিলনদেবতা, একটি উন্নত হৃদয়ের ভাব অপর হৃদয়ে অতি আশ্চর্য্যভাবে সঞ্চার করেন এবং তন্মধ্যে তিনি আপনার ঐশীশক্তি ঢালিয়া দিয়া এক আধ্যাত্মিক গূঢ় নিয়মে আমাদিগকে সবল করিয়া তোলেন। আমরা যখন একটি উন্নত আত্মার নিকটস্থ হই, তখন যেন স্পর্শমণির মতন সেই আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি আমাদিগকে সোণা করিয়া ফেলিতে চায়। আমরা অনেকে কেমন ক'রে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছি? নিতান্তই শূন্য প্রাণে শুধুই খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় এসেছিলাম। কিন্তু উন্নত আত্মার আধ্যাত্মিক ভাব কেমন ক'রে যে অনুন্নত আত্মায় প্রবেশ ক'রে পরিবর্ত্তন ঘটালো, তা স্মরণ করলেও বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। পরস্পরের আধ্যাত্মিক মিলনে যে কিরূপ শক্তিলাভ করা যায়, সে বিষয়ে নির্ঝর ও নদীর দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছা হয়। পাহাড়ে ভ্রমণ করিলে দেখতে পাওয়া যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক নির্ঝরের জলধারা একটি স্থানে মিলিত হ'য়ে নদীর আকার ধারণ করেছে, আবার অনেকগুলি ছোট ছোট নদী মিলিত হয়েই মহা নদী হয়েছে। আমরা যতক্ষণ একল থাকি, ততক্ষণ আমাদের শক্তিই বা কতটুকু, আর সেই শক্তিটুকু দ্বারা কয়টা বড় কাজই বা আমরা করতে পারি? কিন্তু আমরা যখন সমাজে ও মণ্ডলীতে বড় হবার জন্য, বড় কাজ করবার জন্য অকপট নিস্বার্থভাবে মিলিত হই, তখন আমাদের ধর্ম্মজীবনও গড়িয়া উঠে, সমাজের যথার্থ কল্যাণকার্য্য করতেও সমর্থ হই।

বোধ হয়, এই অত্যন্ত সহজ কথাগুলি কেহই অস্বীকার করতে পারেন না যে, যখনই কোন উৎসবাদিতে মিলিত হই, তখনই উন্নত আত্মাদিগের উন্নতি লক্ষ্য ক'রে অতি স্বাভাবিক ভাবেই আত্মোন্নতির জন্য আমাদের চিত্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠে। অতিশয় সাধুচরিত্র লোকদিগের পাশে ব'সে, আপনার হৃদয়ের নিকৃষ্ট ভাবের কথা স্মরণ ক'রে আপনাকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়; ভক্তদিগের ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখে উহা কতই স্পৃহণীয় সামগ্রী ব'লে ধারণা জন্মে এবং ত্যাগীপুরুষদিগের জীবনের কাছে আপনার স্বার্থপর জীবনকে কতই হীন ব'লে মনে হয়!

হয় ত এই মন্দিরের অনেকেই স্বীকার করবেন, এবার আমাদের সম্মিলনীর একটি বক্তৃতা খুব ভালই হয়েছিল, আমরা সেই বক্তৃতাটি শুনে অনেক শিক্ষালাভ করেছি। তা ছাড়া বিশেষভাবে শেষের দুই দিনের উপাসনা, উপদেশ ও আত্মনিবেদন, আমাদের অন্তরে আধ্যাত্মিক ভাব উদ্দীপিত ক'রে তুলেছে, আমরা অনেকেই উহা সম্ভোগ করেছি। কয়েক দিনের আলোচনা ব্রাহ্মসমাজের অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে যে, মনের মধ্যে চিন্তা জাগিয়ে দিয়েছে তাহাও অস্বীকার করবার যো নাই। সুতরাং সম্মিলনীর উৎসবে যে আমরা উপকৃত হয়েছি, এ কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবার কোন কারণই দেখতে পাই না।

আমাদের এই সম্মিলনীর মিলনের অভিজ্ঞতা হ'তে আরও একটি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করতে পারি। আমাদের উপাসকমণ্ডলীর প্রতি সপ্তাহে উপাসনার জন্য যে মিলন অথবা সঙ্গত ও ব্রাহ্মবন্ধু সভাতে যে আমাদের মিলন, উহা আমাদের ধর্ম্মজীবনের এবং আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভের পক্ষে কতই প্রয়োজন। আমরা উৎকট বিষয়াসক্তি, নিকৃষ্ট সাংসারিকতা এবং অন্তরের সংশয় ও লঘুভাব একটু একপাশে সরিয়ে রেখে, একটু বিশ্বাস, একটু ব্যাকুলতা, একটু শ্রদ্ধা হৃদয়ে নিয়ে মন্দিরের উপাসনা ও সঙ্গতের আলোচনাদিতে যদি উপস্থিত হই, তা হ'লে ধীরে ধীরে আমাদের ভিতরে যে কি রকম একটি শক্তির প্রকাশ ও প্রীতির উচ্ছ্বাস হয়, তাহা আমরা অনেকেই চিন্তা ক'রে দেখি না। চিন্তা ক'রে দেখলে কি আর মন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনায় ও সঙ্গতাদির আলোচনায় উপস্থিত না হ'য়ে, দূরে দাঁড়িয়ে ঐ সকলের সমালোচনা করতে পারিতাম?

আমরা যখনই অহঙ্কৃত মস্তক নত ক'রে, নম্রহৃদয়ে, একটু বিশ্বাস, একটু ব্যাকুলতা ও শ্রদ্ধা নিয়ে উপাসনামন্দিরে আসি এবং বিশ্বাসী উপাসকদিগের কাছে বসি এবং ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা অনুভব ক'রে তাঁর স্বরূপের অনুভূতি আত্মায় জাগ্রত করতে চেষ্টা করি, আর যখনই নিকটস্থ একটি বিশ্বাসী উপাসকের অন্তরে এবং আচার্য্যের ভিতরে একটু ভক্তির উচ্ছ্বাস হয়, তখনি এক আধ্যাত্মিক গূঢ় নিয়মে আমাদের আত্মায় অপর আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি প্রবেশ করে, আমরা উপাসনারাজ্যে একটুকু অগ্রসর হ'য়ে দেবাদিদেবের একটু স্পর্শলাভ করতে সমর্থ হই। সেই স্পর্শটুকু আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে কতই আবশ্যক!

শুধু কি তাই? আমরা এক এক দিন মন্দিরের উপাসকবৃন্দের সহিত মিলিত হ'য়ে, উপাসনা ও উপদেশের মধ্য দিয়া কত কি যে লাভ করি, আত্মচিন্তা ক'রে তা কি ডায়েরিতে লিখে রাখি? তা যদি লিখে রেখে দিতাম, তা হ'লে অনেক দিন পরে সেই ডায়েরি প'ড়ে বুঝতে পারতাম, মিলিত উপাসনায় আমি দুর্ব্বলতার মধ্যে কত বল, শুষ্কতার মধ্যে কত সরস ভাব, অশান্তির মধ্যে কত শান্তি, অজ্ঞতার মধ্যে কত জ্ঞান লাভ করেছি; এবং ধীরে ধীরে একটু একটু ক'রে আমাদের কত পরিবর্ত্তন হয়েছে, অন্তরে কতটা পবিত্র সংকল্প জেগেছে। নিশ্চয়ই আমার সম্মুখের উপাসকমণ্ডলী এ বিষয়ে কিছু না কিছু সাক্ষী দিতে

পারেন। আপনারা কি যথার্থই মন্দিরের এই মিলিত উপাসনায় উপস্থিত থেকে আত্মার সম্বল কিছু কিছু সংগ্রহ করতে সমর্থ হন নাই? আমাদের বাহিরের অর্থ ও সম্মানের চেয়ে সেই সম্বলেরই মূল্য কি অধিক নয়? বাইরের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই বাইরের ভোগ্যবস্তুর সম্পর্ক। ইন্দ্রিয়গুলি নিস্তেজ হ'য়ে পড়লে, তার শক্তি নষ্ট হ'লে ঐ সকল ইন্দ্রিয়ভোগ্যবস্তু থাকা না থাকা আমার কাছে উভয়ই সমান। কিন্তু উপাসনা-মন্দিরের মিলন হ'তে যে একটু একটু ক'রে জ্ঞান, বিশ্বাস, পবিত্রতা ও প্রেম এবং নিঃস্বার্থ ভাব সংগ্রহ করি, উহাতেই ত আমার আত্মা শক্তিশালী হয়, উহাই ত আমার জীবনের চিরসম্বল।

পরলোকগত গগনচন্দ্র হোম

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ময়মনসিংহে থাকিতে উপেন্দ্রকিশোরের ব্রাহ্মসমাজে আসা হয় নাই—কলিকাতা আসিয়া তিনি আর অনেকদিন আমাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপেন্দ্র আদর্শ-জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। একাধারে তিনি আমার পিতা, পুত্র, সখা, সুহৃদ-স্থানীয় হইয়াছিলেন। তাঁহার বিবাহের অল্প দিন পরে আমি কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হই। তখন তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে আমাকে আপন গৃহে আনিয়া পিতৃমাতৃ স্নেহে সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। আমার বিবাহের পর তাঁহারাই স্বগৃহে নববধূ ও আমাকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। উপেন্দ্র ও আমাতে বাক্যালাপ বড় অধিক হইত না,—উভয়ে উভয়ের নিকট বসিয়া থাকিয়া শান্তি ও আনন্দ অনুভব করিতাম। মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে, রুগ্ন দেহে, গিরিধি হইতে যখন উপেন্দ্রকিশোর ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার কান্না পাইতে লাগিল। আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"মামা, তুমি কাঁদছ কেন? আমাদের তো যাওয়ার বয়স হইয়াছে; এই যে তোমার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-পরিবার, ইহা দেখিয়া আনন্দ কর।" তার পর মৃত্যুর প্রাক্কালে আমার স্ত্রীকে তিনি বলেন,—"তুমি আমার মামী নও, আমার মা,—মামা আমার বাবা।" উপেন্দ্রকিশোরের পরিবার আমাদের বড় আপনার,—তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পরলোকগত সুকুমার আমাদের বিশেষ প্রিয় ছিল, তাঁহার পরিবারস্থ সকলে আমাদের কত আপনার জন;—ব্রাহ্মসমাজে আমাদের এমন আপনার জন আর কেহ নাই।

শ্রদ্ধাস্পদ হেডমাষ্টার রতনমণিবাবু ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। নবকুমার, গুরুদাসবাবু আর আমি তিনজনে তাঁহার বাসায় থাকিয়া অবাধে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায়, ব্রাহ্ম-বাসাতে সঙ্গত সংকীর্ত্তনে নিয়মিতরূপে যোগ দিতে পারিতাম। ব্রাহ্মদের একটা বাসা ছিল,—সেখানে পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ, কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ বাস করিতেন। তখন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও প্রেমিক বঙ্গচন্দ্র রায় প্রমুখ প্রচারক মহাশয়গণ বৎসরে প্রায় এক এক মাস সেই বাসাতে থাকিয়া প্রকাশ্যে বক্তৃতা, ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা এবং সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ও আলোচনা করিতেন। আমরা তিনজনে তৎসমুদয়ে যোগদান করিতাম। তাঁহাদের উপদেশ, ধর্ম্মালোচনা ও আরাধনা প্রার্থনাতে যোগ দিয়া জীবনে কত বল ও শিক্ষালাভ করিয়াছি! আমার ধর্ম্মজীবনে আমি প্রধানতঃ ভক্তিভাজন শ্রীনাথ চন্দ-মহাশয়ের নিকটেই অধিকতর ঋণী। আমি ময়মনসিংহে থাকিতে তাঁহার জীবনের প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুভব করিয়াছি। তাঁহার উপাসনা ও উপদেশ, সঙ্গতের আলোচনা আমার বড়ই [illegible] হইত।

ময়মনসিংহের শরৎচন্দ্র রায়-মহাশয় দূরবর্ত্তী সম্পর্কে আমার মা-র খুড়া ছিলেন,—তাই আমি তাঁহাকে "দাদামহাশয়" ডাকিতাম। আমার ডাকে তিনি ছাত্রমহলে সরকারী "দাদা-মহাশয়" হইয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহ-ভালবাসা সমস্ত ছাত্রমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; তাঁহার প্রেমিক জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া, তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে, আমরা, ময়মনসিংহের তৎকালীন ব্রাহ্ম-সমাজের যুবকগণ, কত ওলাউঠাক্রান্ত রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছি! ব্রাহ্ম বলিয়া যাঁহারা আমাদিগকে দূরে পরিহার করিতেন, তাঁহাদের বাড়ীতেও কেহ পীড়িত হইলে রোগীর সেবার জন্য আমাদের ডাক পড়িত। তাঁহারা আমাদের "দাদামহাশয়কে" সংবাদ দিতেন,—তিনি আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া রোগীর বাড়ীতে উপস্থিত হইতেন; দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, আমরা পালা করিয়া রোগীর সেবা করিতাম, ঔষধ পথ্য দিতাম। ময়মনসিংহে থাকিতে ব্রাহ্মসমাজের কি আনন্দের ও গৌরবের দিনই দেখিয়াছি! ময়মনসিংহের তৎকালীন ছাত্রবৃন্দ আমাদের দলকে কি শ্রদ্ধা, প্রীতির চক্ষেই দেখিত, তাহাদের উপর আমাদের কি প্রভাবই ছিল!

ময়মনসিংহে থাকিতেই কোচবিহারের রাজার সহিত ভক্তি-ভাজন আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহোপলক্ষ্যে ব্রাহ্মসমাজে দলাদলির সৃষ্টি হইয়া ময়মনসিংহের ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল, প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হইয়া বিবাদ বাঁধিয়াছিল। এই দলাদলির সময় আমি "দাদামহাশয়ের" সঙ্গে কলিকাতা আসিলাম। তখন ১৪ নম্বর কলেজ ষ্ট্রীট আমার আত্মীয় শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত (তত্ত্বভূষণ) থাকিতেন;—তাঁহাদের বাসাবাটীতে আসিয়া উঠিলাম। সেখানে তখন ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল আর সুন্দরীমোহন দাস। তাঁহারা উভয়ে আমাকে কনিষ্ঠ ভাইয়ের মত গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের স্নেহ, মমতা হইতে একদিনের জন্যও আমি বঞ্চিত হই নাই। আমি তাঁহাদের সঙ্গে, তাঁহাদের পরিবারেরই একজনের মত, কতকাল বাস করিয়াছি; বিপিনবাবুর প্রথমা স্ত্রী, নিত্যকালী দেবী, আমার রুগ্নাবস্থায় কত সেবা যত্ন করিয়াছেন। তিনি এখন পরলোকে, তাঁহার স্নেহ ভালবাসার কথা মনে হইলে প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠে। আর সুন্দরীবাবুর স্ত্রী, হেমাঙ্গিনী আমার আর বিপিনবাবুর কত অত্যাচার, উপদ্রবই না অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে কত কটুবাক্য বলিয়াছি, তিনি আমাদের প্রতি স্নেহবশতঃ কখনও তাহা গায়ে মাখেন নাই—এখনও আমাকে "ঠাকুরপো" বলিয়া সম্ভাষণ করেন। এই দুই রমণীর সন্তানগণ আমার বড় প্রিয়, বড়ই স্নেহভাজন। এই দুই পরিবারের নিকট আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধনীয়।

আমি যখন ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করি, তখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে ছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। আমার দাদা, সীতানাথ দত্ত মহাশয়, আমাকে প্রতি সপ্তাহে মজুমদার-মহাশয়ের প্রদত্ত উপদেশের সারমর্ম্ম লিখিয়া পাঠাইতেন। আমি তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। আমার ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পূর্ব্বে সাধু অঘোর-নাথ গুপ্ত-মহাশয় একবার প্রচারার্থ ময়মনসিংহে আসেন। তখন সঙ্গতে যে সকল গভীর ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা হইয়াছিল, শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় তাহা একখানা খাতাতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে শরৎবাবু সেই খাতাখানা আমাকে দান করেন। আমি তাহা পাঠ করিয়া ভক্ত অঘোরনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের স্বাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম।

১৪নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে ৯নং নিমু খানসামার লেনে উঠিয়া আসিলাম; তখন সেখানে শ্রদ্ধাস্পদ কৃষ্ণকুমার মিত্র ও রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় বাস করিতেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় একবার আমার জন্মস্থানে প্রচারার্থ গিয়াছিলেন। আমাদের পরিবারের কথা তিনি তখন ভক্তিভাজন কালীকিশোর বিশ্বাস আর চন্দ্র-

মোহন বিশ্বাস মহাশয়দিগের নিকট শুনিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমাকে কনিষ্ঠের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে আমি পরে আসামের চা বাগানের "কুলিকাহিনী" প্রকাশ করি। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পত্নী ব্রাহ্ম-সমাজে আসিলে, তাঁহার গৃহ আমার আরামের স্থান হইয়াছিল, তিনি আমাকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিতেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া গেলেও আমি তাঁহার স্নেহ ভালবাসা হইতে কোনদিন বঞ্চিত হই নাই।

কলিকাতা আসিবার পরই শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেনের সহিত আমি সৌহার্দ্দ্য-সূত্রে আবদ্ধ হই। সেই সৌহার্দ্দ্য এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাঁহার মাতার উদারতা ও স্নেহপ্রবণতা, পরেশ-বাবুর বন্ধু আমাদের অনেককে এমনি আকর্ষণ করিয়াছিল যে, আমাদের অবসর সময়ের অধিকাংশকাল তাঁহার আবাসেই কাটিত, তাঁহার গৃহ আমাদের আপন গৃহস্বরূপ হইয়াছিল;—আমরা সে গৃহে কত আব্দার করিয়াছি, তাঁহার পরিবারস্থ সকলে আনন্দচিত্তে তাহা সহ্য করিয়াছেন। কলিকাতায় যখন প্রথম প্লেগ রোগের আক্রমণ হয়, তখন প্লেগের টীকা দিতে সহরের প্রায় সমস্ত লোকই ভয় পাইয়াছিল। বীরপুরুষ দ্বারকা-নাথ গাঙ্গুলী মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে টীকা লইয়া সকলকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দলে পরেশবাবু, আমি ও আরও কেহ কেহ ছিলেন। প্লেগের টীকা লইয়া আমরা ১৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে শয্যা লইলাম। জ্বরের ঘোরে ও টীকার যন্ত্রণায় আমরা কয়জনে কয়দিন তাঁহার গৃহে কি আর্ত্তনাদ ও অত্যাচারই না করিয়াছিলাম! পরেশবাবুর ন্যায় অকৃত্রিম সুহৃদ,—এমন সুখ-দুঃখে, হর্ষ-বিষাদে, রোগে-শোকে, সকল সময়ের বন্ধু আমার অতি অল্পই আছে।

পরেশবাবু, নবকুমার আর আমি বিভিন্ন স্থানে বাস করিতে-ছিলাম। ৫০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাড়ী ভাড়া করিয়া সকলে একত্রিত হইলাম। উপেন্দ্রকিশোর রায়, হেমেন্দ্রমোহন বসু, প্রমদাচরণ সেন, মথুরানাথ নন্দী, কালীপ্রসন্ন দাস এবং আরও কতিপয় ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগী যুবক আসিয়া সেখানে জুটিলেন। স্বর্গীয় মধুসূদন সেন মহাশয়ও কিছুকাল এখানে আমাদের সহিত বাস করিয়াছিলেন। ৫০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট শীঘ্রই এক "ব্রাহ্ম-কেল্লা" হইয়া উঠিল। এখানে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী-মহাশয় আমাদের নেতা হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি প্রায় প্রতিদিন প্রাতে আমাদের সঙ্গে মিলিয়া রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি আলোচনা করিতেন। মাঝে মাঝে ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের এই আবাসে আসিয়া উপাসনাদি করিতেন। গোস্বামী-মহাশয় এখানে কয়েকজন যুবককে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

দেশহিতৈষী সুরেন্দ্রনাথের কারামুক্তির পর, "সখা"-পত্রিকার সম্পাদক বন্ধুবর প্রমদাচরণ সেনের উদ্যোগে, আমাদের এই বাসায় এক অভিনয়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণ-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভাগমন হইয়াছিল। এ-বাটীতেই শাস্ত্রী-মহাশয়ের চেষ্টায় "Indian Messenger" প্রথম প্রকাশিত হয়। আমরা এখানে থাকিতেই, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেরণায়, সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সঞ্জীবনী' প্রচারিত হয়। পরেশ বাবুর প্রদত্ত একশত টাকার দ্বারাই এই সংবাদ-পত্রের সূচনা। তখন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীশঙ্কর সুকুল, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, দ্বারকানাথ গঙ্গুলী মহা-শয়ের সঙ্গে পরেশ বাবু এবং আমিও "সঞ্জীবনীর" স্বত্বাধিকারী ছিলাম। পরেশবাবু অল্পদিন পরেই স্বত্বাধিকারিত্ব পরিত্যাগ করেন,—আমিও কয়েক বৎসর পরে ছাড়িয়া দিই। ক্রমশঃ

ব্রাহ্মসমাজ

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য—ঢাকায় পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে প্রতিদিন প্রাতে উপাসনা হয়। প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে সঙ্গত সভায়, সঙ্গীত, সংক্ষিপ্ত উপাসনা, গ্রন্থপাঠ ও আলোচনা হইয়া থাকে। প্রতি শনিবার রাত্রে ছাত্র-সমাজের অধিবেশনে বক্তৃতা, প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা ও উপাসনাদি হয়। প্রতি রবিবার সকালের উপাসনার পরে সাড়ে আটটার সময়, নীতিবিদ্যালয়ের বালক ও বালিকাগণ মন্দিরে মিলিত হয়, তাহাদিগকে নানা বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। রবিবার রাত্রে সহরের নানা শ্রেণীর পুরুষ ও মহিলা ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া উপাসনায় যোগদান করিয়া থাকেন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ৭ই অগ্রহায়ণ বরিশাল ব্রহ্মমন্দিরে ছাত্র সমাজের পক্ষ হইতে আচার্য্য গিরিশ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্মরণার্থ একটী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিলে সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক বরিশালে গিরিশচন্দ্রের স্থান বিষয়ে মুখবন্ধে কিছু বলিলে, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস এবং শ্রীযুক্ত নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায় তাঁহার বহুমুখীন কর্ম্মজীবন বিষয়ে বিশদ ভাবে প্রসঙ্গ করেন। তৎপরে, মৌলবী মফিজুদ্দিন আহাম্মদ, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাস, মন্মথমোহন দাস এবং পূর্ণচন্দ্র দে এই বিশ্বাসী সাধক জীবন বিষয়ে প্রসঙ্গ করেন। সভাপতির মন্তব্য ও প্রসঙ্গান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১৭ই নবেম্বর বাণীবন গ্রামে শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বিতীয় জামাতা বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অল্প কয়েকদিনের অসুখে পরলোক গমন করিয়াছেন। বিগত ২১শে নবেম্বর কটক নগরীতে তাঁহার কন্যা শ্রীমতী করুণা রাও কর্ত্তৃক ও কলিকাতা নগরীতে অন্যান্য আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ২৩শে নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত কালী-কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অপর এক পুত্র বাবু জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাতৃহীন এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ইহলোক ত্যাগকরিয়াছেন। তিনি বেশ সুস্থকায় ছিলেন।

বিগত ২৬শে নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অন্যতম পুত্র বাবু অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্পদিনের অসুখে পরলোক গমন করিয়াছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুধীন্দ্রনাথ বাবুর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি কলিকাতা আসিয়াছিলেন।

বিগত ১৭ই নভেম্বর পরলোকগত জ্যোতির্জীবন পালের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ধুবড়ী ব্রাহ্ম-সমাজে ১৲ ও প্রচার বিভাগে ১৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্তহৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

দান—শ্রীযুক্ত গোপীকান্ত বাগচী তাঁহার পরলোকগত ভ্রাতা মুকুন্দকৃষ্ণ বাগচীর দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ২৲ও সাধনাশ্রমে ৩৲প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শশি-ভূষণ বসু ও শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র বসু পরলোকগত কেদারনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। এ সমস্ত দান সার্থক হউক এবং পরলোকগত আত্মাসকল চিরশান্তি লাভ করুন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৭ই অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রী[illegible] বসু, বি এ।

যাইতে পারে। সাংসারিক বিষয়ে যাহা সত্য, ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। আমরা যে এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদের সুদূর পিতৃপুরুষদের অপূর্ব্ব ধর্ম্মসম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়াছি, ইহা নিতান্তই সৌভাগ্যের বিষয়। তদপেক্ষাও অধিকতর সৌভাগ্যের কারণ, আমরা অতি নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মসমাজের পিতৃপুরুষগণ হইতে অতুলনীয় ধর্ম্মসম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে ধর্ম্মজীবন গঠনে বিশেষ সহায়তাই পাইয়াছি। মনে রাখিতে হইবে, প্রকৃত পক্ষে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে কি পাই আর না পাই, তাহা সম্যকপ্রকারে বুঝিতে না পারিলে আমরা কখনও সত্য সৌভাগ্যলাভে সমর্থ হইব না। যেমন স্বাস্থ্য বিদ্যা অর্থাদি, তেমনি ধর্ম্ম সম্বন্ধেও কতকগুলি সুযোগ সুবিধা ব্যতীত অতি অল্প আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইতে পারি—সমস্তই আমাদের নিজ ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা যত্ন দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয়। তাহা ব্যতীত উহারা কিছুতেই স্থায়ী ও নিজস্ব হইতে পারে না, অল্প দিনের মধ্যেই সব নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব এত অধিক, সাধনের প্রয়োজন এত বেশী। সাধন বিনা কিছুই লাভ করা যায় না। একমাত্র সাধনবলেই আমরা সিদ্ধিলাভ করিতে পারি, ব্রহ্মকৃপার কোনও প্রয়োজন নাই, আমরা কখনও এরূপ ভ্রমাত্মক কথা বলিতেছি না। ব্রহ্মকৃপা সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ করিবার জন্যও সাধন একান্ত আবশ্যক। আমরা কোনও অস্বাভাবিক কৃত্রিম সাধনের কথা মোটেই বলিতেছি না, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সাধনের কথাই বলিতেছি। সাধন ব্যতীত যেমন ব্যক্তিগত জীবন উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে পারে না, তেমনি সামাজিক জীবনও পারে না। সাধনহীন জীবন যেমন শুষ্ক মৃতপ্রায় হইয়া অবনতির দিকে গমন করে, যে সমাজের অধিকাংশ লোক সাধনহীন তাহারও তদ্রূপ অবস্থাই হয়। পিতৃপুরুষদের অতুল ধর্ম্ম-সম্পদ্‌ও তাহা কিছুতেই নিবারণ করিতে পারে না। শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাঁহার সম্ভাষণে সত্যই বলিয়াছেন, "পূর্ব্ববর্ত্তীদের চিন্তা ও ভাবের পুনরাবৃত্তি করিয়া আমরা কখনই বাঁচিতে পারিব না। সত্য চির-পুরাতন বটে; কিন্তু উপলব্ধির যোগে আত্মায় আত্মায় নূতন হইয়া প্রকাশিত হয়। এইরূপ তাজা সত্য ভিন্ন ধর্ম্মজীবনও বাঁচে না, ধর্ম্মসমাজও থাকে না।" প্রত্যেককেই সত্য স্বানুভূতি অর্জ্জন করিয়া, খাঁটি প্রেম ভক্তি ঈশ্বরানুগত্য লাভ করিয়া, নিজের ধর্ম্মজীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং সমাজের অন্ততঃ বহুসংখ্যক লোক সেই শ্রেণীর হইবে। তাহা না করিয়া শুধু ফাঁকা কথায় পূর্ব্বপুরুষদের গৌরব ঘোষণা করিতে গেলে আমাদের দৈন্য ও অপদার্থতাটাই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। তাহা অপেক্ষা পিতৃপুরুষদের সম্পদের কথা না বলাই ভাল। চেষ্টা যত্ন সাধন দ্বারা পূর্ব্ব সম্পদ্‌ বৃদ্ধি করিলেই তাঁহাদের গৌরব রক্ষা পায়, আর আমরাও তাঁহাদের সন্তান বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য হই। যাহারা পূর্ব্বপুরুষের সম্পদ্‌ রক্ষণে ও বর্দ্ধনে সমর্থ না হয়, তাহাদিগকে লোকে কুপুত্র বলিয়াই গণ্য করে। সাধনের একান্ত আবশ্যকতা বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিবার দরকার নাই। তাহা আমরা সকলেই বেশ ভালরূপে জানি। এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে জ্ঞানের যে বিশেষ অভাব আছে তাহা কিছুতেই বলা যায় না। তদনুসারে কার্য্য করিবার লোকেরই একান্ত অভাব। এবিষয়ে আলোচনা উপস্থিত হইলেই আমরা তত্ত্বাঙ্গের আলোচনাতে ডুবিয়া যাই, কি প্রকারে কি করিতে হইবে সে বিষয়ে নানাজনে নানা আলোক দিতেই নিযুক্ত হই। ভুলিয়া যাই, এ বিষয়ে জ্ঞানের যে বেশী অভাব আছে তাহা নহে। এত দিনে এ সম্বন্ধে বহু তত্ত্বই সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তদনুসারে কার্য্য করিবার, তাহার দ্বারা নিজ জীবন ও সমাজ গঠন করিতে নিযুক্ত হইবার লোক বেশী দেখা যায় না। কি প্রকারে সত্যদর্শীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহার আলোচনা করিতে যাইয়া অমরবাবু তাঁহার অভিভাষণে অতি সত্য কথাই বলিয়াছেন—"এই প্রশ্নের উত্তর নানা জনে, নানারূপ দিতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হয়, সেই ব্যক্তির উত্তরই যথার্থ উত্তর হইবে, যিনি বাক্যে কিছু না বলিয়া উঠিয়া যাইবেন, এবং গৃহে গিয়া নীরবে সত্যের সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন।" বাস্তবিক নীরব সাধকের অভাবই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভাব। এক সময় ব্রাহ্মসমাজে বহু সংখ্যক সাধক ছিলেন। তাই তাঁহারা পিতৃপুরুষদের ধর্ম্মসম্পদ্ শুধু রক্ষা করেন নাই, নানা প্রকারে বহু পরিমাণে বর্দ্ধিতও করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে সেরূপ সাধকের সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। তাই আমরা অনেকে মিথ্যা বাক্যাড়ম্বর দ্বারা আমাদিগকে সেই গৌরবে মণ্ডিত করিতে যাইয়া কেবল উপহাসাস্পদই হইতেছি। মানুষ মিথ্যা অপেক্ষা সত্যকে অধিকতর সম্মান দেয়। অতি দীন দরিদ্রও যদি তাহার সত্য অবস্থার অনুরূপ দীনভাবে চলিয়া ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হয়, তবে লোকে তাহাকে ঘৃণা না করিয়া সম্মানই করে। আমরা যখন অনেকে পিতৃপুরুষদের অতুলনীয় ধর্ম্মসম্পদ্ হারাইয়া অতি দীন হইয়া পড়িয়াছি, তখন আমাদিগকে সেই দীনতার বোঝা মস্তকে বহন করিয়া অক্লান্ত সাধনার দ্বারা ধীরে ধীরে তাহা পুনরুদ্ধার এবং পরিশেষে বর্দ্ধিত করিবার জন্যই নিযুক্ত হইতে হইবে। উহাই আমাদের সকলের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে সত্য ও জীবন্ত করিতে না পারিলে আমাদের কল্যাণ নাই, এই দেশেরও কল্যাণ নাই। এ বিষয়ে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। আমরা সকলে বৃথা কথা পরিত্যাগ করিয়া সকলে এই সাধনে নিযুক্ত হই। করুণাময় পিতা আমাদিগকে বল ও শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। আমরা সকলে পিতৃপুরুষদের সত্য সম্পদে সম্পদ্‌বান হই। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের প্রতি-জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সম্মিলনীর ৩৯তম অধিবেশন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৩ই অক্টোবর প্রাতঃকালে উপাসনা।

১৩ই অক্টোবর রবিবার প্রাতঃকালে রাস্তায় উষাকীর্ত্তন ও তৎপরে মন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি উদ্বোধনে বলেন, সেই পরম প্রভু নানাভাবে আমাদের ডাকৃছেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়ে

এ দেশকে ডেকে তিনি বল্‌চেন, সব কলুষ হইতে মুক্ত হও, নবজীবনে জাগরিত হও। আবার বল্‌চেন, দেখ, তোমাদের আমি কেমন আনন্দময় ধর্ম্ম দিয়েছি। আকাশ গিরি নদী সাগরকে বন্ধু ক'রে দিয়েছি; পরিবারকে পবিত্র তীর্থে পরিণত ক'রে দিয়েছি; পূর্ব্ব পশ্চিম সব দেশকে স্বদেশ ক'রে দিয়েছি। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কখনও বজ্রগম্ভীর স্বরে তিনি বলচেন, ওরে আমার সন্তান, তুই মনুষ্যত্ববিহীন হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌বি? তুই সুখের কীট হ'য়ে মাটিতে গড়াবি? তুই না আমার সন্তান? তুই ওঠ; তুই আমার আদেশ নে; তুই আমার কাজে লাগ্‌। আবার কখনও মিষ্টি ক'রে মায়ের মতন তিনি ডাকচেন। মা যেমন ডাকেন, ওরে দেখ্‌বি আয়, তোদের জন্ম কত কি রেখেছি। মা যেমন সন্তানকে ভাল ক'রে খাইয়ে, ভাল ক'রে সাজিয়ে নিজের সঙ্গে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে সুখী হন। মায়ের কাজ সন্তানকে মুগ্ধ করা; সন্তানের কাজ মুগ্ধ হওয়া। এই সহরে এসে দুদিন প্রভাতে শরতের কি সুনির্ম্মল আকাশ দেখ্‌লাম। পৃথিবীতে কত রঙ্গের খেলা। এ সকল যেন তাঁরই যাদুমন্ত্র। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর এই যাদুতে মুগ্ধ হ'তে বেশ জানতেন। তিনি যে ফল খেতেন, তারও সৌন্দর্য্য তিনি আগে দেখ্‌তেন; তার গন্ধ নিতেন; তাকে ভাল ক'রে স্পর্শ ক'রে মায়ের করুণার অনুভবে মগ্ন হ'তেন। এ উৎসবে আমাদেরও মায়ের দয়ায় মুগ্ধ হওয়া চাই, খুব কৃতজ্ঞ ও প্রফুল্ল হওয়া চাই।

সতীশ বাবুর উপদেশের মর্ম্ম এইরূপ ছিল।—সংসারে মানুষে মানুষে যত ব্যবহার, তার মধ্যে দুই প্রকারের দৃশ্য সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম দৃশ্য, এক ইচ্ছার সম্মুখে অপর এক ইচ্ছা দণ্ডায়মান। দ্বিতীয় দৃশ্য, একজন আর একজনের মনের উপরে মৃদু স্পর্শ দিয়া, তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া, কাজ করাইতেছে। ধর্ম্ম রাজ্যেও এই দুই দৃশ্য সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা বা knightএর মধ্যে যিনি জয়ী হইতেন, তিনি পরাজিতের বুকে পা দিয়ে, কণ্ঠে নিষ্কোষিত অসির অগ্রভাগ রেখে, বল্‌তেন, yield or die, হয় পরাজয় স্বীকার কর, নয় আমার হাতে মরিতে প্রস্তুত হও। মহম্মদকে একবার এক শত্রু অপ্রস্তুত অবস্থায় হঠাৎ আক্রমণ করে ও আস্ফালন করিয়া বলে, এখন তোকে কে রাখে? মহম্মদ সতেজে বলিলেন, ঈশ্বর রাখিবেন। সেই শত্রু মহম্মদের হাতে পরাস্ত হইল। তখন মহম্মদ তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন তোকে কে রাখে? সে কাতর হইয়া বলিল, আপনি যদি দয়া করিয়া জীবন দান করেন। মহম্মদ বলিলেন, ধিক্ কাপুরুষ, এমন সময়েও যার মুখে ঈশ্বরের নাম বাহির হয় না, তাহার রক্তপাত করিয়া আমার অসি কলঙ্কিত করিব না।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা ছাড়িয়া দিয়া দেখিতে পাই, সংসারে পিতা পুত্র, গুরু শিষ্য, প্রভু ভৃত্য, সেনাপতি ও সৈনিক, ইঁহাদের মধ্যে একজন আদেশ দেন, অপর জন তাহা পালন করেন। কখনও বা এমন tensionএর মুহূর্ত্ত আসে, যখন বড়'র ইচ্ছার সম্মুখে ছোট'র ইচ্ছা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়, সহজে নত হইতে পারে না। তখন অধীন জনের ইচ্ছাকে সবলে চূর্ণ করিতে হয়। আবার, কখনও বা সে আপনা হইতে প্রভুর অতি কঠিন কঠোর আদেশের সম্মুখে অবিচারে আত্মসমর্পণ করে। টেনিসনের Light Brigade সৈনিকগণের কথা, "Their's not to make reply, their's not to why, their's but to do and die," স্মরণ করুন।

ধর্ম্মজগতে যখন আমরা ঐ ভাবে নিজ ইচ্ছাকে প্রভুর ইচ্ছার কাছে তৎক্ষণাৎ বিসর্জ্জন দি, তখন আমরা ধন্য। কতবার রিপুর সংগ্রামে প'ড়ে বল্‌তে ইচ্ছা হয়, "প্রভু আমাকে চূর্ণ কর; আমার বুকে পা দিয়ে, কণ্ঠাগ্রে নিষ্কোষিত অসি রেখে, আমার বিদ্রোহী ইচ্ছাকে বিনাশ কর।" প্রবৃত্তি-সংগ্রামে বারবার পরাস্ত হ'য়ে মৃত্যুর প্রার্থনা ক'রে কখনও ব'লেছি, "প্রভু, আমি কি এতই কলঙ্কী যে আমাকে তুমি হত্যাও করবে না?"

সংসারে ও ধর্ম্মজগতে, দুই ক্ষেত্রেই, ইচ্ছার সম্মুখে দণ্ডায়মান ইচ্ছা,—ইহা একটি দৃশ্য। কিন্তু দয়ালের দয়ার এমনি বিধান যে, ইহাই একমাত্র দৃশ্য নয়; এমন কি, ইহা সকলের চেয়ে বড় ব্যাপারও নয়।

বড় ব্যাপার,—পবিত্র প্ররোচনার হাতে আত্মসমর্পণ। যে ধরা দিতে চায় না, বন্ধু তাকে ভালবাসার টানে টেনে লন। একজন মুখ ফিরিয়ে থাকে, আর একজন তার বিমুখতাকে জয় করে। একজন রাগ করে, অভিমান করে, আর একজন স্নিগ্ধ স্পর্শের দ্বারা তার রাগ অভিমান ভুলাইয়া দেয়।

যদি এইরূপ ভুলাইয়া দেওয়ার ব্যাপারই অধিক না হইত, তবে আমরা বাঁচিতাম না। যদি ঘটনাক্রমে এমন বাড়ীতে কাহাকেও দুদিনের জন্য অতিথি হইতে হয়, যেখানে কেবল দিন রাত্রি শাণিত তীক্ষ্ণ আদেশ দিয়ে সব কাজ করানো হয়, তবে সেখান হইতে সে পলাইতে পারিলে বাঁচে। তেমনি আমাদের জীবনস্বামী যদি পদে পদে একবার ক'রে আমাদের ইচ্ছাকে জাগাইবার, এবং তার পরে তাকে চূর্ণ করিবার বিধি রাখিতেন, তবে কি আমরা বাঁচিতাম?

সংসারে এই দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাপারই বেশী ঘটে। ধর্ম্মরাজ্যেও পরমেশ্বর কেবল আদেশ করেন না; তিনি ভুলাইয়া আমাদিগকে সৎপথে নিয়ে যান। কাম ক্রোধের সহিত কয়টা সংগ্রামে আমরা প্রতিজ্ঞার বলে জয়ী হই? বিধাতা অন্য উপায়ে আমাদের জয়ী করেন। স্নেহ, দয়া, প্রেম, ভক্তি জাগিয়ে, প্রাণকে পবিত্র ও কোমল ক'রে দিয়ে, তিনি কতবার এসব সংগ্রামে জয়ী করেন। সেই সুকৌশলী কৌশল ক'রে আমাদিগকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে শিক্ষা দেন। ভুলিয়ে তিনি আমাদের অহঙ্কৃত মস্তককে নত করেন। এইরূপ পবিত্র প্ররোচনার কত দৃষ্টান্ত আছে!

মন যখন কঠিন থাকে, একজন সাধু মানুষের সঙ্গ দিয়ে তিনি সেই কঠিন মনকে [illegible] কোমল ক'রে দেন। হয়তো আমি মনে করেছিলাম, টাকা দেব না; কেউ ভাল কাজে টাকা চাইতে এলে [illegible] ধারণ কর্‌ব। বন্ধুরা টাকার জন্য আস্‌তে সাহস পেতেন না। কিন্তু পরম জননী একজন সাধুর সংস্পর্শে আন্‌লেন। সেই ব্যক্তির এমন বশ হ'য়ে

Registered No 6:

অসতো মা সদ্গময়,

তমসো মা জ্যোতির্গময়,

মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫২ম ভাগ। ১৭শ সংখ্যা।

১লা পৌষ, সোমবার, ১৩৩৬, ১৮৫১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০০

16th December, 1929.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

যন্ত্রীরূপে।

জাগরণ স্বপ্ন সুপ্তি ত্রিতন্ত্রীর বুকে,
যন্ত্রী হ'য়ে এ জীবন বাজাও সুখে দুখে।
জাগরণে জানি শুধু ধর যন্ত্রী রূপ,
রূপের জগতে ঢাকি' আপন স্বরূপ।
কত গান কত তান বিচিত্র মধুর,
আপনি বাজা'য়ে তাতে হও ভরপুর।
স্বপনে আপন রূপ যাই হারাইয়া,
কিসে তবু ভাঙ্গি গড়ি না পাই ভাবিয়া।
স্বপন ভাঙ্গিলে দেখি তুমি আছ চাহি',
"নমিহে চৈতন্য"—ব'লে উঠি গান গাহি'।
সুপ্তি-মায়া নিয়ে বুকে করিছে অজ্ঞান—
শোক তাপ ঘুচাইতে বিচিত্র বিধান!
প্রতিদিন শুনি তাই নবীন উদয়,
মরণ-বিজয়ী তান উঠিছে ধরায়।
মধুর গভীর তানে উৎসারি' অমৃত,
হৃদয় রাখগো মোর চির সঞ্জীবিত।

হে করুণাময় বিধাতা, তোমার করুণার যে সীমা নাই—অজস্রধারে তুমি আমাদের উপর তোমার করুণা বর্ষণ করিতেছ, সকল ঘটনাতেই তোমার করুণা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সর্ব্বত্রই তোমার করুণা। তোমার প্রেম আমদিগকে তো পরিত্যাগ করে না! আমরা কত সময় তোমায় ভুলিয়া থাকি! কিন্তু তুমি যে তোমার প্রেমস্পর্শে আমাদিগকে জাগ্রত করিয়া তোমার দিকে নিয়তই আহ্বান করিতেছ! সংসারের নানা কোলাহলের মধ্যে নিমগ্ন থাকি বলিয়াই সকল সময়ে আমরা তাহা শ্রবণ করিতে সমর্থ হই না। অদ্যকার এই প্রভাত তুমি আমাদের চক্ষে কি সুন্দর, উজ্জ্বল করিয়া, অবা কি মোহনস্বরে তুমি আমাদিগকে ডাকিতেছ! এই পৌষের আগমনে তুমি আমাদিগের প্রাণে কি নব আশা জাগাইয়া দিতেছ! আমাদের যাহা ছিল তাহা যে আমরা নিজ বুদ্ধির দোষে সব হারাইয়া ফেলিয়াছি! কি লইয়া তোমার দ্বারে উপস্থিত হইব? হে উৎসবদেবতা, তোমার পুণ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার মত তো কোন সম্বলই আমাদের নাই। তোমার করুণার উপর নির্ভর করিয়া, তোমারই আহ্বানে আসিয়াছি। তুমি কৃপা কর। যে ভাবে আমাদিগকে তুমি তোমার উৎসব সম্ভোগ করাইতে চাও, সেই ভাবে আমাদিগকে গঠিত কর। তোমার আদর্শে তুমি আমাদিগকে প্রস্তুত কর। যদি তাহাতে সংসারের সব ধন জন সম্পদ ত্যাগ করিতে হয়, তবে তাহা করিবার জন্য তুমি আমাদিগকে বল দাও। তোমার হাতের দেওয়া দুঃখ আমরা তোমার প্রেমের দান বলিয়া যেন গ্রহণ করিতে পারি। তোমার করুণার উপর নির্ভর করিয়া, তোমারই ইচ্ছার অধীন হইয়া চলিবার শক্তি তুমি আমাদিগকে দাও। তোমারই ইচ্ছা আমাদের জীবনে তুমি পূর্ণ কর।

নিবেদন।

প্রিয়জনের উপেক্ষায়—তোমার প্রিয়জন যে, যাকে তুমি অতি নিকট আপনার জন মনে কর, প্রাণভরা স্নেহধারা ঢেলে দাও, সে যদি তোমার স্নেহ প্রীতিতে সাড়া না দেয়, সে যদি তোমাকে উপেক্ষা করে, সে যদি তোমার অনিষ্টচেষ্টা করে, সে যদি তোমার দুর্নামও রটনা করে, তবুও তাকে প্রাণ ভ'রে প্রীতি করবে, তোমার স্নেহ অটুট রাখবে, তার অনাদর উপেক্ষা মস্তক পেতে গ্রহণ করবে। তার নিন্দা গ্লানি, তার অনিষ্টচেষ্টার প্রতিবাদ করবে না। কাহারও

নিকট এ সব কথা বল্‌বে না, অভিযোগ কর্‌বে না। তুমি তার কল্যাণচিন্তা কর্‌বে, কল্যাণচেষ্টা কর্‌বে; অপ্রেমের প্রতিদানে প্রেম দিবে। প্রিয়জন যে, তার সম্বন্ধে অভিযোগ কর্‌তে নাই। বেদনা পাবে, প্রাণ ভেঙ্গে পড়্‌বে; তবুও কল্পনাতেও তার অনিষ্টচিন্তা কর্‌বে না; তার এই কঠোর ব্যবহারের কথা কাহাকেও জানাবে না। নিজে নীরবে সহ্য কর্‌বে, অন্তর্য্যামীর নিকট তার জন্য প্রার্থনা কর্‌বে, অন্তরদেবতার চরণে অশ্রুপাত কর্‌বে। তিনি তার কল্যাণ কর্‌বেন, তার হৃদয় বদলিয়ে দিবেন। তুমি তাকে স্নেহ প্রেম দিয়েই যাবে, সে যদি তোমার প্রীতি-উপহার গ্রহণ কর্‌তে অস্বীকার করে, তবুও অন্তরে অন্তরে তাকে প্রীতি কর্‌বে, তার কল্যাণকামনা কর্‌বে, প্রভুর চরণে প্রার্থনা জানাবে।

প্রাণ কাঁদে কেন?—প্রভু, তুমি যে আমাকে এত সংগ্রাম ও পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছ, সেজন্য আমি তেতটা দুঃখ করি না। আমার যত আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল সব ভেঙ্গে গেছে; আমি যে অসহায় নিঃস্ব হ'য়ে পড়েছি; আমার উপর যে অপ্রত্যাশিত ভাবে বোঝার উপর বোঝা চাপিতেছে, সে জন্যও আমি দুঃখ করি না। আমার প্রিয়জনসকল ক্রমে ক্রমে যে আমাকে ত্যাগ করিতেছে, আমার স্নেহ প্রীতিতে সাড়া দিতেছে না, সে জন্যও আমি দুঃখ করি না। আমার দুঃখের কারণ, আমার বিষাদের কারণ, আমার যে প্রাণ ভেঙ্গে পড়েছে তার কারণ তুমি ত জান, প্রভু। ঐ যে কতজন তোমা হ'তে দূরে চ'লে গেল, আমার প্রিয়জন, আপনার জন, যাদের এত স্নেহ করি, তারা যে বিপথে চ'লে গেল, তারা যে অমৃতময় জীবন ছেড়ে মৃত্যুর পথে চলিল, এখানেই যে আমার ব্যথা। প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটিলে বেদনা পাই; কিন্তু সে বিপথে গেলে যে ব্যথা, তার তুলনা নাই। তাই প্রভু, অশ্রুজল ফেল্‌তে ফেল্‌তে তোমাকে প্রাণের ব্যথা জানাই—তুমি ডেকে আন যে দূরে গিয়েছে, তু'লে ধর যে প'ড়ে গিয়েছে। আর যে সইতে পারি না! তারা কি আর ফিরে আস্‌বে না? হে দয়াল প্রভু, তুমি তাদের করুণা কর; তোমার করুণাই আমাদের আশা ও নির্ভর।

তাঁকে কতটা দিবে?—প্রিয়তম যিনি, প্রাণের দেবতা যিনি, তাঁকে কতটা দিবে, এই কথা তুমি ভাব্‌ছ? তুমি ভাব্‌ছ, তাঁর জন্যত এত ত্যাগ কর্‌লাম, এত কষ্ট সইলাম, আর কি কর্‌ব? ভ্রান্ত তুমি; তোমার ত্যাগের গর্ব্ব হয়েছে। তুমি অবিশ্বাসের পথে চলেছ। তাঁকে কতটা দিবে? তিনি যাহা চাবেন, তাহাই দিবে; তাঁকে ধন দিবে, মান দিবে, শরীরের সকল শক্তি দিবে, হৃদয়ের সমগ্র ভক্তি দিবে। তোমার তনু মন প্রাণ সর্ব্বস্ব তাঁর চরণে অর্পণ কর্‌বে। তুমি বল্‌বে, প্রভু, দাস সর্ব্বদা প্রস্তুত, কি আদেশ হয়, বল। তিনি যে জীবন-স্বামী; তিনি যে তোমার সমগ্র হৃদয় মন চান; তিনি যখন চাহিবেন, তখন কি বল্‌বে, প্রভু এতটা দিলাম, আর এটুকু আমার নিজের সম্ভোগের জন্য রেখে দিলাম? তা হবে না। তোমার চোখের সম্মুখে তাঁর সন্তান ক্লেশ পাচ্ছে, অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, অথচ তোমার অর্থ সিন্দুক থেকে বের হবে না? তোমার ধর্ম্মসমাজের কাজ বন্ধ হচ্ছে, অথচ তুমি সুখে আহার বিহার কচ্ছো? তা হবে না; তিনি তোমাকে চান, তোমার সর্ব্বস্ব চান; তাঁর জন্য একটু নয়, সব দিতে হবে। সর্ব্বত্যাগী হ'তে হবে। তার পর তিনি দয়া ক'রে তোমাকে যদি কিছু দেন, তাহা সম্ভোগ কর্‌বে।

সম্পাদকীয়

ব্রহ্মোৎসবের বাণী—ব্রহ্মোৎসবের মঙ্গলবীণা আবার বাজিয়া উঠিয়াছে—আর একমাস পরেই আমাদের প্রিয় মাঘোৎসব আরম্ভ হইবে। সংসারের নানা দুঃখ তাপ ও সংগ্রামের মধ্যে অনেক সময়ই ব্রহ্মপূজার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে; নব বল ও উৎসাহ লাভ করিবার জন্য প্রাণ স্বতঃই আকাঙ্ক্ষিত হয়। মহোৎসবের এই বাণী আমাদের কর্ণে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে অধিকতর জাগ্রত করিয়া তুলে—নিদ্রিত আত্মাগুলিকে সচেতন করিয়া দেয়। আর একমাস পরেই আমরা আমাদের প্রিয় মাঘোৎসবে প্রবৃত্ত হইব। ঐ সেই দিন আসিতেছে, যেদিন স্বয়ং ভগবান মানবের পরিত্রাণের জন্য এই উদার বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ংই আসিয়া আমাদের কর্ণে কর্ণে আশার বাণী শ্রবণ করাইতেছেন। আমরা উৎকর্ণ হইয়া তাহা শ্রবণ করি। সংসারের অসার কোলাহলে যেন কর্ণপাত না করি। আজ সকলে আশান্বিত হই। উৎসবে তাঁহার করুণা লাভ করিবার জন্য এখন হইতে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হই। দুঃখী হই, তাপী হই, পাপীই হই না কেন,—ব্রাহ্মণই হই আর চণ্ডালই হই—তাঁহার চরণ আশ্রয় করিবার অধিকার আমাদের প্রত্যেকেরই রহিয়াছে। তিনি সকলকেই অসীম স্নেহভরে ডাকিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে যদি আমাদের মনগুলিকে তাহার অনুকূল করিয়া বিশেষ ভাবে প্রস্তুত না হই, তাহা হইলে এই উৎসব আমাদের জীবনে কিছুতেই সফল হইবে না। যদি সম্বৎসর কেবল সংসারেরই সেবা করিয়া থাকি ও বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া থাকি, তথাপি ভীত হইব না। সকল বোঝা লইয়া ব্যাকুল ভাবে ও অনুতপ্ত চিত্তে উৎসব-মন্দিরে তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইব। হৃদয়কে প্রেমে সিক্ত করিয়া সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া সেই দিনের জন্য প্রস্তুত হইব। ঐ সেই মাঘের একাদশ দিবস আসিতেছে। ঐ দিন কি শুভ দিন! একশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে চলিল, ঐ দিনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জগতের সমক্ষে কি মহাবাণীই ঘোষণা করিয়াছিলেন! ভাবিতে দুঃখ হয় যে, এতদিনেও আমরা ঐ দিনের মর্য্যাদা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। আমাদের চক্ষের সম্মুখে চতুর্দ্দিকে প্রতিকূল আদর্শসকল দেখিতেছি। মানব দলে দলে কোন্ মরুভূমির দিকে ছুটিতেছে! আজ আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে সে পথ পরিত্যাগ করিতে হইবে। দেবাদিদেবের উৎসবে যাইতে হইলে আমাদিগকে সংযমের পথ অবলম্বন করিতে হইবে।

তাঁহাতেই সমগ্র হৃদয় মন অর্পণ করিতে হইবে। এবং তাঁহারই আদর্শে জীবন নিয়মিত করিতে হইবে। চারিদিকের নিরাশার বাণী শ্রবণ করিয়া চঞ্চল হইলে চলিবে না। আশান্বিত হৃদয়ে প্রেমময়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে, জীবনের স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এবং তাঁহারই আদর্শকে জীবনের সকল বিভাগে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহার জন্য যদি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হয় তাহাও মানিয়া লইতে হইবে। এখন হইতে এই ভাবে জীবন চালিত করিবার জন্য অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে হইবে। প্রাণকে তাঁহার দিকে উন্মুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে করুণাময়ের একবিন্দু করুণাও আমরা গ্রহণ করিতে পারিব না। এমন যে জীবনপ্রদ উৎসব, তাহা আমাদের নিকট ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমরা সকলে এই ভাবে উৎসবের জন্য প্রস্তুত হই। তিনিই আমাদের প্রাণে বল দিবেন, আশা জাগাইয়া দিবেন। আমরা এ উৎসবে সম্পূর্ণ নূতন হইয়া যাইব। তিনি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন ও এই উৎসবের মধ্য দিয়া তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের সমাজের জীবনে পূর্ণ হউক।

তরুণদিগের প্রতি নিবেদন।

যৌবনের বাসনাস্রোত।

যাঁহারা তরুণবয়স্ক, শরীরধর্ম্মবশেই তাঁহাদের সেই বয়সে মনে নানা বাসনা কামনার উদয় হইতে আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক সুস্থহৃদয় তরুণের মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, এই সকল বাসনা কামনাকে আমি কি চক্ষে দেখিব? ইহাদের প্রতি আমার মনের ভাবটি কিরূপ হওয়া উচিত?

ধর্ম্মপ্রাণ পিতামাতা ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া ব্যাকুল প্রার্থনাপূর্ণ অন্তরে আশা করেন ও প্রতীক্ষা করেন যে, তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণ কৈশোরের খেলাধূলার সময়ে যেরূপ নির্ম্মল ও সুন্দর ছিল, একদিন সেই বাল্যলীলা সমাপ্ত করিয়া তেমনই নির্ম্মল ও সুন্দরভাবে তাহারা যৌবনে প্রবেশ করিবে। পিতামাতার হৃদয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানের জন্য যে ব্যাকুল মঙ্গলকামনা জাগে, ধার্ম্মিক মার্কিন কবি লংফেলো (Longfellow) তাহা একটি সুন্দর কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতাটির নাম "কুমারী-জীবন" (Maidenhood)। তাহাতে যৌবনসীমায় উত্তীর্ণা একটি কুমারী কন্যাকে তিনি পরম স্নেহভরে a smile of God অর্থাৎ ঈশ্বরের একটি নির্ম্মল হাসির সহিত তুলনা করিয়াছেন। তাঁহার এই কবিতাটি পৃথিবীর সহস্র সহস্র ধর্ম্মপ্রাণ পিতা মাতার হৃদয় কাড়িয়া লইয়াছে, নয়ন অশ্রুসিক্ত করিয়াছে। কবির কয়েকটি উক্তি এইরূপ,—

> Maiden, with the meek brown eyes,
> In whose orbs a shadow lies,
> Like the dusk in evening skies,—* *
> Standing with reluctant feet,
> Where the brook and river meet,
> Womanhood, and childhood fleet!
> Gazing, with a timid glance,
> On the brooklet's swift advance,
> On the river's broad expanse! * *
> O thou child of many prayers!
> Life hath quicksands, Life hath snares!
> Care and age come unawares!

ইহার মর্ম্ম এই:—"হে কুমারি, তোমাকে দেখিয়া মনে হয়, তোমার চক্ষে যেন কি ভবিষ্যৎ ভাবনার ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। তোমার বালিকাজীবনের ক্ষীণ স্রোতস্বতীটি যেখানে নারীজীবনের বেগবতী নদীর সহিত মিলিত হইবে, সেই বয়ঃসন্ধিস্থলের সম্মুখে আসিয়া তোমার চরণ যেন অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইতেছে। তুমি চকিতনেত্রে দেখিতেছ, শৈশবের ক্ষীণ স্রোতস্বতী কত দ্রুতগতিতে বহিয়া চলিয়া যাইতেছে, এবং সম্মুখে যৌবনের যে বেগবতী নদী, তাহা কত বিশালকায়া! হে স্নেহের কন্যা, হে বহু প্রার্থনার ধন! তুমি মনে রাখিও, জীবনস্রোতের মধ্যে অনেক ভয়ানক চোরাবালি প্রচ্ছন্ন থাকে, মানবজীবনে ইতস্ততঃ অনেক ফাঁদ পাতা থাকে! মনে রাখিও, অশান্তি ও সংগ্রাম অতর্কিত ভাবে জীবনে আসে; মনে রাখিও, অলক্ষিত ভাবে যৌবন চলিয়া যায়, জরা আসিয়া উপস্থিত হয়।"

কবি এখানে একটি কুমারী কন্যার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সব ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধেই তাহা সত্য। যৌবন মানবজীবনে নানা প্রখর স্রোত ও প্রবল তরঙ্গ লইয়া আসে; এবং সে স্রোতের বেগ, সে তরঙ্গের প্রবলতা, প্রত্যেক সুস্থহৃদয় যৌবন-প্রাপ্ত মানুষের মনকে নিশ্চয়ই চিন্তাকুল করে।

কিন্তু এই সুন্দর কবিতাটি পড়িতে পড়িতে এ কথা মনে করিয়া অন্তরে গভীর খেদের উদয় হয় যে, আজকাল কয়টি ছেলে মেয়েকে "বহু প্রার্থনার ধন" (child of many prayers) বলিয়া সম্বোধন করা যাইতে পারে? আজকাল কয়জন তরুণ তরুণীর এমন সৌভাগ্য, যে, তাহাদের জীবনগুলি পিতামাতার ও অভিভাবকের হৃদয় হইতে উত্থিত অসংখ্য ব্যাকুল প্রার্থনার দ্বারা নিরন্তর বেষ্টিত হইয়া অগ্রসর হইতেছে? এবং কয়জন তরুণ তরুণীর মনই বা কবি-বর্ণিতা কুমারীর ন্যায় যৌবনের আরম্ভকাল হইতে অন্তরের নূতন বাসনাস্রোত সম্বন্ধে সজাগ, সতর্ক, সাবধান অবস্থায় থাকে?

প্রথম হইতে সজাগ ও সতর্ক থাকিবার বিষয়েই আজ আমি তরুণদিগের নিকটে কিছু নিবেদন করিতে চাই। আমার বক্তব্য কথাটি আমি ক্রমে ক্রমে কয়েকটি তুলনার সাহায্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। পার্থিব তুলনার দ্বারা আত্মিক বিষয়ে অনেক আলোক লাভ করিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন, বিষয়টি এমন যে ইহার অনেক কথা আমাকে উপমা ও ইঙ্গিতের সাহায্যেই বলিতে হইবে।

ধর্ম্মের পরামর্শ।

"যৌবনের সতেজ বাসনা কামনা সকলকে আমি কি চক্ষে দেখিব?" এই প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্ম বলেন, "উহাদের উপরে নিত্য সতর্ক দৃষ্টি রাখ; উহাদিগকে শাসন কর, ও আয়ত্ত করিয়া রাখ।

[সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ১৭ই নবেম্বর ১৯২৯ রবিবার সায়ংকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক নিবেদিত]

যেন উহারা অন্তরের ধর্ম্মবুদ্ধির নিকটে সর্ব্বদা মাথা নত করিয়া থাকে। পরাজিত ও বশীভূত হইলে, ধর্ম্মবুদ্ধির অধীন হইলে, উহারা তোমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইবে, এবং একদিন হয়তো তোমার মিত্রেও পরিণত হইবে। কিন্তু যদি প্রথম হইতেই উহাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি ও শাসনের ভাব না রাখ, তবে ক্রমে উহারা তোমাকে পরাভূত করিবে, এবং তোমার পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে।"

আজকাল এক শ্রেণীর লোক তরুণদিগকে বলিতেছেন, "এই সতর্কতার কোন প্রয়োজন নাই। প্রবৃত্তিসকলকে অন্তরে স্বচ্ছন্দে জাগিতে ও খেলিতে দাও। উহাদিগের সঙ্গে প্রথম হইতেই বন্ধুতা কর, জীবনে সুখের অনেক দ্বার খুলিয়া যাইবে। ধর্ম্মের পরামর্শটি কঠোর, সুখহীন, শুষ্ক; তাহা শুনিও না।" এই শ্রেণীর পরামর্শদাতাদিগের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। তরুণগণ তাঁহাদিগের নিকট হইতে প্রতিদিন যে ইঙ্গিত, যে প্রভাব, যে পরামর্শ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা অনুভব করিয়া আমাদের মন দুঃখে ও আশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠে। তরুণগণ, তোমরা আমার কথাগুলি শুনিয়া একবার ভাবিয়া দেখিও, ধর্ম্মের পরামর্শ গ্রহণ করিবে, না, এই নূতন পরামর্শ-দাতাগণের পরামর্শ গ্রহণ করিবে।

"রিপু"।

প্রাচীনকালের ধর্ম্মসাহিত্যে মানব-মনের বাসনা কামনা সকলকে, বিশেষতঃ শরীরজাত প্রবৃত্তিকুলকে 'রিপু' নামে অভিহিত করা হইত। 'রিপু' শব্দের অর্থ শত্রু। প্রবৃত্তিকুলের সম্বন্ধে মানুষের মনে প্রথম হইতেই একটি সজাগ সতর্ক ভাব উদয় করিয়া দিবার অভিপ্রায় ছিল বলিয়া প্রাচীনগণ এই নামটি ব্যবহার করিতেন। যে মানুষটি ঘোর অনিষ্টকারী, যাহার সঙ্গ ও প্রভাব একান্তই পরিত্যাজ্য, যে মানুষ হাজার সৌজন্য প্রকাশ করিলেও অথবা মিষ্ট কথা বলিলেও তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা কর্ত্তব্য নয়, এমন মানুষকেই সংসারে 'শত্রু' বলা হয়। রূপক আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্তিসকলকে এই অর্থেই 'রিপু' বলা হইত।

'রিপু' শব্দের এই ব্যবহারের ভিতরে যে রূপকটি নিহিত আছে, একটী তুলনামূলক কাহিনীর দ্বারা তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখা যাক্। এক স্থানে একটি ভদ্র সচ্চরিত্র যুবক ছিল। একবার এক বন্ধুর বাড়ীতে একটি নূতন মানুষের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হইল। সে মানুষটি খুব মিশুক ও আকর্ষণশক্তিসম্পন্ন। যে দলে সে দু-দণ্ড গিয়া বসে, হাসিতে কৌতুকে আমোদে গল্পে গানে সে-দলের সকলকে সে একেবারে মাতাইয়া রাখে। কিন্তু যুবকটি ক্রমশঃ লক্ষ্য করিতে লাগিল যে ঐ লোকটির মনের গতি নিম্নমুখীন ও তাহার রুচি প্রকৃতি অপকৃষ্ট। সে নিকৃষ্ট আমোদ আহ্লাদই ভালবাসে। তাহার সঙ্গে যুবকটির নানা ক্ষেত্রে বারবার সাক্ষাৎ হওয়াতে, অবশেষে যুবকটি তাহার নমস্কার গ্রহণ করিতে ও তাহাকে প্রতি-নমস্কার করিতে লাগিল। এই ভাবে পরিচয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া যুবকের মনটা কিঞ্চিৎ অসুখী হইল বটে; কিন্তু মনে জোর করিয়া তাহার সঙ্গ বর্জ্জনের জন্য সে কোনও উদ্যোগ করিল না। ক্রমে সেই লোকটি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ন্যায় আচরণ করিতে লাগিল। যুবকটির সহিত হাসিয়া কথা কয়, পথে দেখা হইলে রাজপথ পার হইয়া ছুটিয়া নিকটে আসে। তখনও যুবকের অন্তরে এই দ্বিধা আসিতে লাগিল যে, ঐরূপ একটি লোকের সহিত এতটা অন্তরঙ্গতা করা কি ভাল হইতেছে? কিন্তু তখনও সে উহা নিবারণের কোন উদ্যোগ করিল না। ক্রমে সে লোকটি ঐ যুবকের খেলার স্থানে দৈনিক সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে নানা আমোদের স্থলে যাইতে লাগিল। তখন যুবকের মনের সতর্কতার বাঁধ একেবারে শিথিল হইয়া গেল। তখন হইতে সেই মানুষটিই যুবকের প্রধান পরামর্শদাতা, এবং তাহার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব-সম্পন্ন বন্ধু হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে সে আপনার সঙ্গে জড়াইয়া তাহাকে অধঃপাতের পথে লইয়া গেল।

প্রবৃত্তির প্রথম উদয়েই সতর্ক হও।

যদি প্রশ্ন করা যায় যে সেই লোকটি ঐ যুবকের জীবনে সর্ব্বনাশকারী শত্রুরূপে অভ্যুদয় লাভ করিতে পারিল কেন? তবে তাহার উত্তর এই যে, প্রথম হইতেই যুবকটি তাহার সম্বন্ধে মনের ভাবটি ঠিক করিয়া লয় নাই বলিয়া; প্রথম হইতেই সজাগ সতর্ক সাবধান হইয়া তাহাকে বর্জ্জন করে নাই বলিয়া। সংসারে এইরূপ নিকৃষ্ট প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে আমাদের যে কখনও সাক্ষাৎ হইবে না, ইহা অসম্ভব। হয়তো কার্য্যসূত্রে এইরূপ মানুষের সঙ্গে স্বয়ং গিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিবার ও কথা কহিবার প্রয়োজনও উপস্থিত হয়। কিন্তু সাবধান মানুষ প্রথম হইতেই মনকে বাঁধিয়া লয়। সে মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করে, "এই লোকটির সহিত ঘনিষ্ঠতা কখনও জন্মিতে দিব না। মানুষটিকে সর্ব্বদা দশ হাত দূরে রাখিব। সে কখনও আমার সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশিতে আসিবার সাহসই পাইবে না।" সাক্ষাৎকার নিবারণ করিতে না পারিলেও এরূপ মানুষকে দূরে রাখা নিশ্চয়ই সম্ভব। সর্ব্বদা আমাদিগকে সংসারে মানুষ সম্বন্ধে এ ভাবে চলিবার শিক্ষাটি গ্রহণ করিতে হইতেছে।

এই তুলনামূলক গল্পটিতে মানুষসম্বন্ধে যাহা বলা হইল, অন্তরের প্রবৃত্তিকুল সম্বন্ধে যৌবনে তাহাই করিতে হয়। যৌবন সেই কাল, যখন প্রবৃত্তিকুলের সহিত মানবমনের সাক্ষাৎ হওয়া অনিবার্য্য হয়। প্রবৃত্তিকুলের সহিত সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই হইবে, প্রবৃত্তিকুলের মধ্যে প্রবল আকর্ষণশক্তি আছে, এবং সে আকর্ষণটি নিম্নাভিমুখীন, এই সকল কারণেই প্রবৃত্তিকুল রিপুর সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে। প্রত্যেক সুস্থহৃদয় তরুণের মনে একবার অন্তরের প্রবৃত্তিকুল সম্বন্ধে এই প্রশ্ন ও দ্বিধা আসে,—ইহাদিগকে লইয়া আমি কি করিব? ইহাদিগকে কতটা প্রশ্রয় দিব? যে আপনাকে ঈশ্বরের ও সাধুচরিত্র মানুষদের প্রভাবের মধ্যে রাখে, যে প্রথম হইতেই সজাগ ও সতর্ক থাকিবার পরামর্শটি পায় ও তাহার অনুসরণ করে, সে বাঁচিয়া যায়। যে অসতর্ক থাকে, তাহার জীবনের গতি অন্যরূপ হয়। তাহার পক্ষে, প্রথম সাক্ষাতের পর ভাল লাগা, ভাল লাগার পর সেই সুখের প্রভাবের অধীন হইয়া পড়া, এবং অবশেষে তাহার হাতে আত্মসমর্পণ,—এই রূপে এক এক পা অগ্রসর হইয়া এই পিচ্ছিল পথের শেষ সীমা পর্য্যন্ত গিয়া পৌছিতে অধিক বিলম্ব হয় না।

প্রবৃত্তি যেন বলে, "দেখ্‌ছ না, আমি এসেছি।" তার পর

বলে, "তুমি যখন একা থাকবে, তোমার মনের ঘরে মাঝে মাঝে আমি উঁকি দিয়ে যাব, আমাকে এই অধিকার টুকু দিও।" তার পর বলে, "খেলার সময়ে ও আমোদের সময়ে, যখন তোমার কাছে গুরুজনের প্রভাব থাকবে না, যখন তোমার আত্মার শক্তি সকল শিথিল (relaxed) অবস্থায় থাকবে, তখন আমাকে তোমার মনের ভিতরে গোপনে একটু স্থান দিও; দেখো, তাতে বিশ্রামের ও আমোদের স্বাদ কত বেড়ে যাবে।" তার পর বলে, "এইবার তোমার মনে আমাকে স্থায়ী বাসা বাঁধ্‌তে দাও; আমিই এখন থেকে তোমাকে চালাব।" পথ এত পিচ্ছিল, এবং প্রবৃত্তিসকলের দাবী এইরূপ দূরগামী, তাই তাহারা রিপুপদবাচ্য হইয়াছে।

তাই ধর্ম্ম বলেন, "যদি অসতর্ক হও, প্রশ্রয় দাও, বাসনা মাত্রই রিপু হইয়া দাঁড়াইবে।" ইহার বিরুদ্ধে নবযুগের নূতন পরামর্শদাতাগণ নানা কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের দুইটি মাত্র কথাকে আমি আজ পরীক্ষা করিব। তাঁহাদের সব কথা এখানে আলোচনা করিবার যোগ্য নহে।

নূতন পরামর্শ।—(১) সতর্কতার প্রয়োজন নাই; স্বাভাবিক থাক।

এই নূতন পরামর্শদাতাদিগের মধ্যে একদল স্বাভাবিকতা-বাদী। তাঁহাদের কথা এইরূপ:—"মানুষকে স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতে দাও। প্রবৃত্তি সকলকে স্বাভাবিকভাবে অন্তরে আসা যাওয়া করিতে, উদয় ও বিলয় হইতে, দাও। যাহা স্বাভাবিক তাহা নির্দ্দোষ ও নিরাপদ। প্রবৃত্তিকুলের বিষয়ে বিশেষ করিয়া দৃষ্টি রাখিবার ও আত্মপরীক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? স্বাভাবিক জীবন যাপন করিয়া যাও; তাহাতেই সব ঠিক থাকিবে, জীবন নিরাপদ থাকিবে।"

কিন্তু, যুগে যুগে, দেশে দেশে, মানুষের অভিজ্ঞতা এই কথাই বলিতেছে যে, ঐ প্রণালীতে চলিলে মানব জীবনে সব ঠিক থাকে না; কিছুই নিরাপদ থাকে না। অসতর্ক জীবনে প্রবৃত্তির স্পর্দ্ধা অতি শীঘ্রই বাড়িয়া যায়। আবার একটি গল্প বলি।

এক গ্রামে একজন চরিত্রবান্ ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করেন। চরিত্রসম্পদকেই তিনি জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন বলিয়া গণনা করেন। তিনি সহজে বড়লোকদের বাড়ী যান না; বড় মানুষদের সব চালচলন তাঁহার ভাল লাগে না। গ্রামের জমিদারের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুতা হইল; তাঁহার শ্রদ্ধার দান একখণ্ড ভূমি তিনি গ্রহণ করিলেন। জমিদার একদিন সেই পণ্ডিতের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে নিজের ভবনে একটি নাচের মজলিসে একবার পদধূলি দিবার জন্য সানুনয়ে অনুরোধ করিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতটির সে স্থানে যাইবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তাই তিনি যখন বুঝিলেন, এতক্ষণে নাচ গান হয়তো শেষ হইয়া আসিতেছে, সেই সময়ে একবার ওথায় গিয়া দাঁড়াইলেন। নাচ গান শেষ হইল। স্বভাবসিদ্ধ স্পর্দ্ধা সহকারে বাই-ওয়ালী একে একে জমিদারের ইয়ারগণের নিকটে আসিয়া তুমি-তুমি বলিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিল। সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "তোমার বাড়ীতে আমি কবে যাব?" শেষে সেই পণ্ডিতের নিকটে আসিয়াও সে সেই বাক্য উচ্চারণ করিল! ক্রোধে ব্রাহ্মণের সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; মুখ দিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এখনই পায়ের চটি খুলিয়া উহার স্পর্দ্ধার প্রতিফল প্রদান করি। কিন্তু একে স্ত্রীলোক, তায় সম্ভ্রান্ত বন্ধুর বাড়ী। তিনি অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিলেন। জমিদার তাঁহার ভাব বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি স্ত্রীলোকটিকে অন্য দিকে পাঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ বাড়ী চলিয়া গেলেন। একজন পতিতা নারীর মুখ হইতে "তোমার বাড়ীতে আমি কবে যাব" এই কথা কর্ণে শুনিতে হইল বলিয়া আত্মগ্লানিতে ক্ষোভে অনুতাপে তখন তাঁহার অন্তর জর্জ্জরিত হইতেছে। কর্ণ ও অন্তর দুই-ই যেন অশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, যেন এখনও জ্বলিতেছে। মনে মনে বলিতেছেন, "আমি নিজ আদর্শ হইতে নামিয়া যে এমন স্থানে গিয়াছিলাম, তাহার উপযুক্ত শাস্তি আমার হইয়াছে। এ জীবনে এমন ভুল আর কখনও করিব না।"

এই তুলনামূলক দৃষ্টান্তটিকেও অন্তরের জীবনে প্রয়োগ করা যাক্। অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটি পতিতা নারীর সহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুদ্ধচিত্ত মানুষের মাঝে মাঝে নিজ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যায়। ঘটনাচক্রে শুদ্ধচিত্ত লোকেরও সংসারের পাপমূলক নানা ব্যাপারের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে। যে মানুষ সাবধান সে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরায়। সে এমন করিয়া পশ্চাৎ ফিরে, যে, জীবনে আর কখনও সে-পাপ তাহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হয় না।

নূতন পরামর্শদাতাগণ বলেন, "অত খুঁতখুঁতে হ'লে কি চলে? সংসারে চল্‌তে হবে তো? একা একধারে গিয়ে কুণো হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে পার্‌বে না তো? তবে অত বাছা-বাছি ক'রো না। সকলে যা করে, তাই কর। নিজে ভাল থাক্‌লেই হ'ল।" তাঁহারা দু-একটি বিজ্ঞতার বাণীও তরুণ-দিগকে শুনাইয়া দেন,—"সংসারে চল্‌বে, যেন ধরি মাছ, না ছুঁই পানী"; অথবা, "বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।"

কিন্তু আমি বলি, এ পদ্ধতিতে চলিবার ফল কি হয়, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। একদিন সেই পাপ, সেই রিপু,—সৌজন্যের খাতিরে যাহার সহিত একবার সাক্ষাৎমাত্র করিতে তুমি সম্মত হইয়াছিলে, সংসারে দশের সঙ্গে চলিবার খাতিরে যাহাকে তুমি বর্জ্জন করিলে না,—সে তোমাকে বলিয়া বসিবে, "আমাকে তোমার আত্মার অন্তঃপুরে লইয়া যাইবে কবে?" তখন তোমার সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দশা হইবে। যে-প্রবৃত্তিকে পদতলে রাখিতে হয়, সে তোমার মাথায় চড়িতে চাহিবে! কত সে এমন কথা বলিবে, কত শীঘ্র প্রবৃত্তির স্পর্দ্ধা এত দূর পর্য্যন্ত বাড়িয়া যাইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। অতএব বলি, হে তরুণ, যদি তোমার এ ইচ্ছা থাকে যে প্রবৃত্তির মুখ হইতে ঐরূপ মলিন কথা শুনিয়া অন্তরের কর্ণকে কোনও দিন কলঙ্কিত হইতে দিবে না, তবে প্রথম হইতেই সজাগ থাক, সতর্ক হও। যাঁহারা বলেন, "স্বাভাবিক ভাবে চলিলেই সব ঠিক থাকিবে, অন্তরের শুভ্রতা নিরাপদ থাকিবে," তাঁহাদের কথা কাণে তুলিও না। তাঁহারা সর্ব্বনাশের বাণী বলিতেছেন।

নূতন পরামর্শ।—(২) স্বাধীনতা ও আনন্দই জীবনের পথ।

নূতন পরামর্শদাতাদিগের মধ্যে দ্বিতীয় এক শ্রেণী আছেন, তাঁহারা অবাধ স্বাধীনতাবাদী এবং আনন্দবাদী। আজকাল "স্বাধীনতা" কথাটিকে মানুষ বড় গৌরবের চক্ষে দেখে; তাই ইঁহারা সেই নামের দোহাই দিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা স্বাধীনতার নামে প্রবৃত্তিকুলকে প্রশ্রয় দিবার পক্ষপাতী। ইঁহাদের কথা এইরূপ:—"প্রবৃত্তিসকলকে, বিশেষতঃ যৌবনে উদিত প্রবৃত্তিসকলকে, বাধা দিবে কেন? যৌবনে যে সকল সতেজ কামনা মানব-অন্তরে উদিত হয়, তাহারাই তো মানুষের জীবনকে ও জনসমাজকে উন্নতির পথে লইয়া যায়। তাহাদিগকে বাধা দিলে জীবন সতেজ হয় না, উন্নতি সম্ভব হয় না। অতএব, অবিচারে উচ্চ নীচ সকল প্রবৃত্তিকে অন্তরে অবাধে বাড়িতে খেলিতে দাও, জীবন সতেজ হইবে। তদ্ভিন্ন, আনন্দের জন্যও ইহা প্রয়োজন। সাহিত্য, কবিতা, অভিনয়, অচল ও সচল উভয়বিধ চিত্র,—ইহারা সকলে মানবমনের ঐ সকল প্রবৃত্তিকে স্পর্শ করুক; তাহাতে বাধা দিও না। ঐ প্রবৃত্তিসকলের উপরে মৃদু স্পর্শ দিয়া তাহাদিগকে অর্দ্ধ-জাগরিত অবস্থায় রাখিলেই সাহিত্যে, কবিতায়, অভিনয়ে, চিত্রে স্বাদ আসে; নতুবা সে সকল আনন্দবিহীন ও বিস্বাদ হইয়া যায়। জীবন হইতে আনন্দ কাড়িয়া লইলে, জীবন ভরিয়া কেবল কতকগুলি শুষ্ক নিষেধমূলক উপদেশ গলাধঃকরণ করিতে হইলে, বাঁচিয়া থাকা তো মরিয়া থাকার সমান হইয়া যায়।"

ইঁহারা শুধু এখানেই শেষ করেন না। তরুণদিগকে শুধু নিজ অন্তরের নবোদিত প্রবৃত্তিকুলের প্রশ্রয় দিতে শিক্ষা দেন না। কিন্তু সমাজের অঙ্গে গলৎকুষ্ঠবৎ যে পাপ-ব্যবসায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার সহিত তরুণদিগের ঘনিষ্ঠতা জন্মাইয়া দিবার জন্যও ইঁহারা ব্যস্ত!

ইঁহারা তরুণদিগকে বলেন, "বাসনাসকলকে শত্রু বলিয়া দেখিয়া, তাহাদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, কেন জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করিবে? তাহাদিগকে প্রথম হইতেই বন্ধু বলিয়া দেখ; তাহাদের সঙ্গে বেশ মাখামাখি ভাব রাখ; তাহাদিগকে খেলার ও আমোদের সহায় করিয়া লও। তাহাদিগের সঙ্গে বন্ধুতা রাখিয়াও জীবন বেশ ভালভাবেই কাটিয়া যাইবে।" এবং ইঁহারা বলেন, "মানুষ অত অধিক শুদ্ধতাবাদী না হইলেও জনসমাজ বেশ চলিয়া যাইবে।"

আমরা বলি, যতদিন হইতে মানুষ রক্তমাংসের জীব, এবং যতদিন হইতে মানুষ আপনার মনের কথা ভাষায় লিখিয়া রাখিয়াছে, ততদিন হইতে জগতে একই সাক্ষ্য প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। সে সাক্ষ্য এই যে প্রবৃত্তিসকলকে পরাজিত শাসিত ও শৃঙ্খলিত করিতে পারিলেই জীবন নিরাপদ। সে সাক্ষ্য এই যে, প্রশ্রয়-প্রাপ্ত প্রবৃত্তি কখনও সীমার মধ্যে থাকে না। সে সাক্ষ্য এই যে, নিরন্তর আত্মদৃষ্টি আত্মশাসন ও বাসনা-সংযমের দ্বারাই অন্তরকে শুভ্র রাখিতে হয়।

প্রবৃত্তিসকলকে দমন করিয়াই মানবাত্মা স্বাস্থ্য শক্তি ও স্ফূর্ত্তি লাভ করে। সাধু আত্মা সে সকলকে এমন বশীভূত করিতে পারে, যে, প্রবল উত্তেজনার মুহূর্ত্তেও ঈশ্বরের নামে তাহারা তৎক্ষণাৎ পোষা কুকুরের মতন মাথা নোয়াইবে। ইহারই জন্য ঈশ্বর মানুষের অন্তরে বিবেকরূপ জাগ্রত প্রহরীকে দণ্ডায়মান রাখিয়াছেন, এবং ইহারই জন্য তিনি মানুষের ইচ্ছাতে আত্ম-সংযমের অপূর্ব্ব শক্তি বিধান করিয়াছেন। ইহারই জন্য মানুষকে তিনি পিতামাতার গুরুজনের ও সাধুভক্তগণের দৃষ্টির মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। ইহারই জন্য মানুষকে তিনি তাঁহার দিকে স্বীয় কাতর দৃষ্টি উত্তোলন করিয়া প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছেন।

এই অতি আধুনিক যুগে কি মানুষের প্রকৃতি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, অথবা ঈশ্বরের শাশ্বত নিয়মসকল স্থগিত হইয়া গিয়াছে? না, তাহা হয় নাই। অবাধ প্রশ্রয়ের পরামর্শটি "স্বাধীনতার পূজা," "যৌবনের পূজা," প্রভৃতি নব উদ্ভাবিত যে কোন নামের দোহাই লইয়া আসুক না কেন,—কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী বা জননায়ক যাহারই মুখ দিয়া উচ্চারিত হউক না কেন, উহা ভ্রান্ত, উহা সর্ব্বনাশের বাণী।

সাধকের সহজাবস্থা, ও বিনা সাধনে তাহার দাবী।

সত্য বটে, মানব-অন্তরের কোনও স্বাভাবিক বৃত্তিই মূলতঃ তাহার শত্রু নহে; কিন্তু প্রশ্রয় পাইলেই তাহা শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে,মানুষের মনোবৃত্তি সকল একদিন তাহার পরম বন্ধুরূপে পরিণত হইতে পারে কিন্তু তাহা কাহার জীবনে হয়? সুখলোলুপ মানুষের জীবনে তাহা হয় না; সংযমী সাধকের জীবনেই তাহা হয়। ধর্ম্মরাজ্যেই এই অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটে যে পরাজিত শৃঙ্খলিত চূর্ণীকৃত শত্রু ক্রমে আজ্ঞাবহ ভৃত্যে পরিণত হইয়া যায়। আমাদের গানে আছে, "আমার রিপু-পরিচারিকাদল, আনন্দে মিলে সকল, অনুদিন করিবে প্রভুর সেবার আয়োজন।" বশীকৃত প্রবৃত্তি শুধু আজ্ঞাবহ ভৃত্যই হয় না, তদপেক্ষাও অধিক হয়; এমন আনন্দের দিনও আসে যখন পরাজিত ও বশীকৃত প্রবৃত্তি, সাধকের পরম মিত্র হইয়া দাঁড়ায়। "তাপসমালা" গ্রন্থে দেখিতে পাই, তাপসী রাবেয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর-প্রেমের বশ হওয়াতে পাপদৈত্যের সঙ্গে আমার সংগ্রাম ও শত্রুতা নাই।" কি আশার বাণী! আত্মজিৎ সাধকের কাছে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ সকলই পরম বন্ধু হইয়া যায়। এই জড়জগতের রূপরাশি তাঁহাকে সেই পরমসুন্দরের লাবণ্য দেখাইয়া দেয়। রসনায় সুমিষ্ট ভোজ্যের স্বাদ তাঁহাকে পরম আনন্দময়ের মাধুর্য্য আস্বাদন করায়। মানব-হৃদয়ের এমন অসুর যে ক্রোধ, তাহাও সাধকের চিত্তে অগ্রে তাঁহার ধর্ম্মশক্তিতে বশীকৃত হইয়া, পরে জগতের অকল্যাণ দমনে, পাপ দুর্নীতি ও অন্যায়রূপ অসুরের দলনে, মহাশক্তিশালী ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করে। পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধও যে ভক্তের চিত্তে ভগবানের মধুময় প্রেমের ছবি আনিয়া দেয়, ভারতের ভক্তিধর্ম্মের সাধকগণ, ইস্‌লামের সুফী সাধকগণ, এবং পশ্চিমের প্রেমিকা মাদাম গেয়োঁ, তাহার জলন্ত সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কাহার জীবনে ইহারা এমন বন্ধু? যিনি অগ্রে ইহাদিগকে দমন করিয়াছেন, বশ করিয়াছেন, আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহারই জীবনে। ভগবানের নিয়ম এই যে, যদি পরিণত বয়সে ইহাদিগকে বন্ধুরূপে লাভ করিতে চাহ, তবে প্রথম যৌবনে

ইহাদিগকে পরাস্ত কর। যৌবনের পরাজিত ও শৃঙ্খলিত রিপু পরিণত বয়সে মিত্র হয় বটে; কিন্তু অপরাজিত অশাসিত কেবল-লালিত রিপু চিরদিনই রিপু রহিয়া যায়। ষাট বৎসরের বৃদ্ধের পক্ষেও তাহা রিপু, যদি তিনি যৌবনে আত্মশাসনের শিক্ষাটি গ্রহণ না করিয়া থাকেন।

হে তরুণ, হে তরুণী, তোমরা যদি মনে করিয়া থাক যে কুড়ি বাইশ বৎসর বয়সেই তোমরা প্রবৃত্তিসকলকে বন্ধুভাবে দেখিবার অধিকার লাভ করিয়াছ, কবিকল্পনার মোহে পড়িয়া যদি তোমরা মনে করিয়া থাক যে সেই প্রার্থিত অবস্থা তোমাদের জীবনে এখনই আসিয়াছে, তবে তোমরা আত্মপ্রতারিত; তবে তোমরা পদে পদে আপনাদিগকে কেবল ঘোর বিপদের মধ্যে লইয়া যাইবে।

নব যুগের নব প্রলোভন। তরুণদের সম্মুখে প্রশ্ন।

চারিদিক হইতে নব নব প্রলোভনময় বাক্যস্রোত ও আমোদস্রোত তোমাদিগকে ঘিরিতেছে। তোমরা যদি ধর্ম্মে ও পবিত্রতায় দৃঢ় থাকিতে চাও, তবে অগ্রে তাহার আদর্শ দিয়া সকল বস্তুকে পরীক্ষা করিতে অভ্যাস কর, এবং নব যুগের প্রলোভন সকল সম্বন্ধে মনের চিন্তাকে স্পষ্ট ও পরিষ্কার করিয়া লও। আমরা জানি, আমরা তোমাদিগকে যে সকল বস্তুর সংস্রব হইতে দূরে রাখিতে চাহিতেছি, অনেকে সে সকলকে তোমাদের নিকটে নানাভাবে সমর্থন করিতেছে। য়ুরোপের ball নাচ, স্নান বেশে সজ্জিত নরনারীর সাগরতীরে ভ্রমণ ও রৌদ্র সম্ভোগ, য়ুরোপ এবং এদেশ উভয় স্থানে কলঙ্কিত অথচ আকর্ষণশক্তিসম্পন্ন পুরুষ ও নারীর চরিত্র লইয়া রচিত গল্প ও নাটক, ঐরূপ বিষয়-ঘটিত অভিনয় ও চলচ্চিত্র, আমোদের জন্য চরিত্রহীন মানুষের সংস্রবে গমন,—এ সকলের সমর্থনসূচক অনেক উক্তি তোমাদের কর্ণে আসিয়া পৌছিতেছে। যদি জিজ্ঞাসা কর, এ সকলের দ্বারা কি জনসমাজ নষ্ট হইয়া যায়, ভগ্ন হইয়া যায়? তবে আমি বলি, জনসমাজকে রাখিবার কিংবা ভাঙ্গিবার মালিক আর একজন আছেন। যুগে যুগে মানুষের মনের সকল স্রোতকে নিজ নিগূঢ় নিয়মে নানাভাবে নিয়মিত করিয়া তিনি মানব-সমাজকে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তোমার ভাবিবার বিষয় তো তাহা নহে! তোমার ভাবিবার বিষয় এই যে, ঐরূপ দৃশ্য দেখিয়া, ঐরূপ পুস্তক পড়িয়া, ঐরূপ অভিনয়ে যোগ দান করিয়া, তোমার অন্তরের নিকৃষ্ট বৃত্তির সঙ্গে তোমার মাখামাখি ভাব, বন্ধুতার ভাব, দাঁড়াইয়া যায় কি না? তোমার হৃদয়ের অন্তঃপুরে, যেখানে কেবল তোমার ঈশ্বরের ও তোমার পবিত্র সঙ্কল্প-সকলের প্রবেশাধিকার, সেখানে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসকলকে গোপনে-দেখা দিবার অধিকার দান করা হয় কি না? ক্রমশঃ সে অন্তঃপুর দখল করিয়া লইবার জন্য শত্রুকে নিমন্ত্রণপত্র দান করা হয় কি না? বল পুত্র, বল কন্যা, তুমি কি তোমার অন্তরের সেই অন্তঃপুরকে পরমেশ্বরের ও সাধুভাবসকলের বিহারভূমি করিয়া রাখিতে চাও? তাহাকে শুভ্র ও নিষ্কলঙ্ক রাখিতে চাও? তবে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে শত্রু বলিয়াই জান; তাহার সহিত মাখামাখি করিও না; তাহাকে মনের দরোজা হইতেই ঘৃণার সহিত ফিরাইয়া দাও।

ব্রাহ্মসমাজের পুত্র কন্যাগণের প্রতি।

ব্রাহ্মসমাজের পুত্রকন্যাগণ, তোমাদিগকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কোন্ পথ ধরিবে? "প্রবৃত্তিসকলকে লইয়া খেলা করা নির্দ্দোষ ব্যাপার," এরূপ কথা যদি কাহারও নিকট হইতে তোমাদের কর্ণে পৌছিয়া থাকে, তবে বলি, এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের পূজনীয় গুরুজনগণের সাক্ষ্যও একবার শ্রবণ কর। শোন, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাহিতেছেন,—

"মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়?
পারে কি তৃণ পশিতে জলন্ত অনল যথায়!
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম,
আমি পাপী তৃণ সম কেমনে পূজিব তোমায়?
অভ্যস্ত পাপের সেবায় জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয়?
এ পাতকী নরাধমে তার যদি দয়াল নামে,
বল ক'রে কেশে ধ'রে দাও চরণে আশ্রয়।"

শোন, আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন,—"সহে না সংগ্রাম, আমি নারিনু রোধিতে দুরন্ত প্রবৃত্তিকুলে মোর!" শোন, শিবনাথ প্রার্থনা করিতেছেন, "দাও শক্তি শক্তিশালী-প্রবৃত্তি দলনে; দাও জ্যোতি, জ্যোতির্ম্ময়, এ অন্ধ নয়নে!" শোন, শিবনাথ নিজে কাঁদিয়া ও সকলকে কাঁদাইয়া গাহিতেছেন,—"ভাইরে! গভীর পাপের কালি ঘুচিবার নয়, বিনা তাঁরি কৃপাবারি জানিও নিশ্চয়।"

কত আর বলিব? ধর্ম্মজগতের ইতিহাস এই সাক্ষ্যে পরিপূর্ণ। পবিত্র জীবন যাপনের জন্য যেখানে যিনি আকাঙ্ক্ষিত, তাঁহাদের সকলেরই জীবন এই প্রবৃত্তি-সংগ্রাম অনুতাপ ও ক্রন্দনের সাক্ষ্যে পরিপূর্ণ। নূতন যুগে কি পবিত্রতার পথ পুষ্পাস্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে? তাহা হয় নাই। তোমরা অনেকে ভক্ত বিজয়কৃষ্ণকে দেখ নাই, আচার্য্য শিবনাথকে দেখ নাই। আচ্ছা, তোমরা তোমাদের এই অধম দাসের সাক্ষ্য শুনিবে? তবে শোন। যখন তোমাদের মতন বয়স আমার ছিল, আমাকে এক-দিন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে হইয়াছিল,—"এখন যে যৌবনের প্রবৃত্তির অমানিশা, এখন চলিতে পথ আঁধারে পাই না দিশা, (কবে) ঘুচিবে এ অন্ধকার, ঘুচিবে এ হাহাকার? পবিত্র জীবনে কবে গাহিব তোমারি জয়?" স্নেহভাজন পুত্রকন্যাগণ, "প্রবৃত্তি-কুলের সঙ্গে খেলা করা চলে,"—এমন সাংঘাতিক কথা কখনও বিশ্বাস করিও না।

অর্দ্ধ-জাগরিত প্রবৃত্তি।

যে শ্রেণীর সাহিত্য কবিতা চিত্র ও অভিনয় সম্বন্ধে আমি তোমাদিগকে আজ সাবধান করিতেছি, তাহাতে মানব-মনের নিকৃষ্ট বৃত্তিসকলকে অর্দ্ধ-জাগরিত করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে যেন খেলা করা হয়। এই ঈষৎ জাগরিত অস্পষ্ট ভাবটি থাকে বলিয়া অনেক অভিভাবক নিজ নিজ পুত্রকন্যাগণকে ঐ সকল বিষময় বস্তু সম্বন্ধে সাবধান করিতে ভুলিয়া যান। কত সময় তাঁহারা নিজেরা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, অথবা নিজেদের সঙ্গে লইয়া গিয়া, পুত্রকন্যাগণকে সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর করিয়া দেন। প্রবৃত্তির ধর্ম্মই এই যে,

উহা প্রথমতঃ খেলার বস্তু হইয়া মনকে আকর্ষণ করে; কিন্তু অধিক দিন আর উহা খেলার বস্তু হইয়া থাকে না। অতি শীঘ্রই শত্রু নিজ মূর্ত্তি ধরে, আত্মা কে আক্রমণ করে, ভূপতিত করে, তাহার রক্ত চুষিয়া খায়।

আর একটি গল্প বলি। একজন ভারতবাসী ইংরেজ একটি বাঘের ছানা পুষিয়াছিলেন। সেটি বেশ পোষ মানিল। অতি সুন্দর লীলাময় ভঙ্গীতে সে নানা খেলা করিত, সর্ব্বদা সাহেবের কাছে কাছে থাকিত। অভিজ্ঞেরা সকলেই সাহেবকে বলিলেন, "ইহাকে লইয়া খেলা করিবেন না। হঠাৎ ইহার হিংস্র প্রকৃতি জাগিয়া উঠিবে। তখন আপনাকে বিপন্ন হইতে হইবে।" কিন্তু সাহেব তাহা শুনিলেন না; তিনি উহার খেলা ধূলায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। কয়েক মাস এই ভাবে কাটিয়া গেল। তার পর একদিন সাহেব ঈজিচেয়ারে বসিয়া পড়িতেছেন, তাঁহার বাঁ হাতখানি পাশে ঝুলিয়া রহিয়াছে, বাঘের ছানা সেই হাতখানি চাটিতেছে, মাঝে মাঝে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া হাতখানি মুখের ভিতরে লইয়া কামড়াইবার ছল করিয়া খেলা করিতেছে। ক্ষণকাল পরে সাহেব হাতের এক স্থানে একটু বেদনা অনুভব করিলেন। দেখিলেন, হাতের এক স্থান দিয়া রক্ত পড়িতেছে, বাঘের ছানা সেই রক্ত চাটিয়া খাইতেছে। হাত টানিয়া লইবার উপক্রম করিতেই বাঘ ঘোঁ ঘোঁ শব্দ করিয়া অসন্তোষ জানাইল; তাহার লেজ দুলিয়া উঠিল, চক্ষু জ্বলিতে লাগিল। সাহেব বুঝিলেন, এই মুহূর্ত্তে আমার খেলার সাথীটি রক্তের স্বাদ পাইয়া সত্যকার বাঘে পরিণত হইয়া গিয়াছে। আর ইহাকে রাখা নয়! এই মুহূর্ত্তেই ইহাকে নিঃশেষ করা দরকার, নতুবা এখনই বাঘে ও আমাতে রীতিমত লড়াই বাধিয়া যাইবে। সাহেব প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হারাইলেন না; হাত সরাইয়া লইলেন না। চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, ভরা বন্দুক লইয়া আমার পশ্চাতের দরোজায় দাঁড়াও; ঠিক নিশানা কর, গুলি কর, (take good aim, and shoot!)—সাহিত্যে, অভিনয়ে, চিত্রে, প্রবৃত্তির খেলা দেখিবার আয়োজন যাঁহারা করেন, অন্তরের সুপ্ত ব্যাঘ্রপ্রকৃতির শত্রু কোনও দিন অতর্কিত ভাবে জাগিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে, আত্মার রক্ত শোষণ করিবে।

প্রার্থনা-রক্ষিত জীবন।

তাই বলি, স্নেহের পুত্র কন্যাগণ, সুখপূজার কোন মন্ত্রণা শুনিও না। এই যৌবনেই, অন্তরে যাহা সত্য শিব সুন্দর, তাহাকে বিকশিত কর; মানব-জগতে যাহা সত্য শিব সুন্দর, তাহার অনুচর হও; এবং সেই সত্যং শিবং সুন্দরমের সহিত আত্মাকে মিলিত কর। তোমাদের হৃদয় হইতে পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা নিরন্তর তাঁহার দিকে উত্থিত হউক।

কবি সেই কুমারীকে "বহু প্রার্থনার ধন" (child of many prayers) বলিয়াছিলেন। তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের পিতামাতাকে বলিও, অভিভাবককে বলিও, বন্ধুজনকে বলিও, "যৌবনের পথে চলিলাম, প্রার্থনার দ্বারা আমার জীবনকে ঘিরিয়া রাখ।" এবং, তোমরা অনুভব করিও, সকল সাধু ভক্তগণের প্রার্থনা, ব্রাহ্মসমাজের অতীত যুগের শুদ্ধচরিত্র সেবকগণের প্রার্থনা,—যাঁহারা অমরলোক হইতে ব্যাকুল নয়নে আপনাদের উত্তরবংশীয় বলিয়া তোমাদিগকে দেখিতেছেন, তাঁহাদের প্রার্থনা,—তোমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে। মধ্যে তোমার নিজের অন্তরের প্রার্থনার অগ্নি, চারিদিকে তোমার পূজ্যগণের প্রার্থনার অগ্নি,—এই ভাবে প্রার্থনা-বেষ্টিত হইয়া তোমরা প্রতি জন মঙ্গলের পথে নিত্য অগ্রসর হও।

রাজা রামমোহন রায়।

মহাপুরুষেরা তাঁহাদের সময়ের বহু অগ্রবর্ত্তী। তাঁহাদের সমসাময়িকেরা ত দূরের কথা, পরবর্ত্তী যুগের লোকেরাও তাঁহাদিগকে ভালরূপ বুঝিতে পারে না। রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে এই কথা বিশেষরূপেই খাটে। কারণ, রাজার বিরাট ও বিচিত্র ব্যক্তিত্ব এবং তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও চরিত্র লোককে একেবারে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলে। অনেকে তাঁহাকে হিন্দু, অনেকে মুসলমান এবং অনেকে তাঁহাকে খৃষ্টান বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। আবার অনেকে তাঁহাকে ধর্ম্ম-সংস্কারক, শিক্ষা ও ভাষাসংস্কারক, সমাজসংস্কারক, এবং অনেকে তাঁহাকে রাজনৈতিক সংস্কারক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ একাধারে সবই তিনি ছিলেন। লোকে তাঁহার এই অদ্ভুত জীবনের সামঞ্জস্য দেখিতে পায় না। তাই একশত বৎসর হইল তিনি কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইয়াছেন, তবু দেখিতেছি তাঁহাকে ভুল বুঝাই হইতেছে। বোধ করি সেই জন্যই একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক তাঁহাকে "হাজার বছরের মানুষ" (a man of a thousand years) বলিয়াছেন। তবে আনন্দের বিষয় এই যে, তাঁহাকে বুঝিবার ও শ্রদ্ধা করিবার আগ্রহ দেশে দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। সাময়িক পত্রিকা ও বক্তৃতাদিতে তাঁহার সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনাই তার প্রমাণ। ইহাও দেশের পক্ষে একটা খুব শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। কারণ, যে জাতি তার মহাপুরুষদের শ্রদ্ধা দিতে ও ভালবাসিতে পারে না সেই জাতি কখনও উন্নত ও বড় হইতে পারে না। সেই হিসাবে রামমোহনকে এই জাতির বিশেষ প্রয়োজন আছে। তিনি শুধু এই যুগের প্রবর্ত্তক নহেন, এই যুগের নায়কও তিনি। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই এই জাতি জাগিয়াছে, আপনাকে চিনিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়াই এই জাতি স্ব-প্রতিষ্ঠও হইবে। এই যুগের এবং ভবিষ্যৎ বহু যুগের অবিসম্বাদী আদর্শ ও একচ্ছত্র নায়ক হইয়া থাকিবেন তিনিই।

কিন্তু মহাপুরুষকে বুঝিবার ও শ্রদ্ধা করিবার এই আগ্রহও যদি ঠিক পথে পরিচালিত না হয়, তবে তাহাও দেশের কল্যাণ না করিয়া অকল্যাণই করিবে। কারণ, আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে অতীতে ও বর্ত্তমানে মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি অন্ধ নরপূজায় পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে, এবং দেশের মহা অকল্যাণ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। মহাপুরুষেরা তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই অবতার বলিয়া পূজিত ও প্রচারিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের দেহত্যাগের পর তাঁহাদের মহৎ জীবনাদর্শের অনুসরণ না করিয়া ঘনঘটার সহিত তাঁহাদের

নখ দন্ত ও খড়মের পূজা চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানেও দেখিতেছি যে, "ঠাকুর" নামধারী ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠা ভুঁইফোঁড় তথাকথিত কতকগুলি বুজরুকের কথা বাদ দিলেও, দুইজন সত্যিকার সাধুপুরুষকে লইয়া মহাপুরুষপূজার অতি বিকৃতি ও অপব্যবহার চলিতেছে। আমি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথাই বলিতেছি। তাঁদের পট বা ছবির সম্মুখে ভোগ আরতি ত হয়-ই, তাহা ছাড়া আরো কিছু অভিনবত্ব চলিতেছে। বিজয়কৃষ্ণ সকালে চা হালুয়া খাইতেন, সেজন্য এখন প্রতিদিন প্রাতে তাঁহার ছবির সম্মুখে চা ও হালুয়া ভোগ দেওয়া হয় এবং কিছুদিন পরে হয়-ত শুনিতে পাইব যে ঐ সঙ্গে মরফিয়া-ভোগও দেওয়া হইতেছে। আর রামকৃষ্ণ তামাকু সেবন করিতেন ও শনি মঙ্গলবার মাংস খাইতেন, সেইজন্য এখন তাঁহার ছবির সম্মুখে প্রতিদিন তামাক ও শনি মঙ্গল বারে মাংস-ভোগ দেওয়া হয়। কিন্তু এ সকলের চেয়েও অদ্ভুত কথা এই যে, রামকৃষ্ণের ছবিকে মলমূত্র পরিত্যাগের জন্য একটা "শৌচাগারে" লইয়া গিয়া কিছুক্ষণ রাখা হয়। এতদিন দেব-দেবীর মূর্ত্তিকে লইয়া যাহা হইয়া আসিয়াছে, এখন সাধু-পুরুষদের ছবি লইয়া সেই অভিনয়ই চলিতেছে এবং ইহারই নাম নাকি অবতার-লীলা!

রামমোহন সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা চলিলেও তাঁহাকেও কিরূপ ভুল বুঝা এবং প্রচার করা হইতেছে তারই তিনটী দৃষ্টান্ত এখানে আমি উপস্থিত করিতেছি।

১ম—"হিন্দুমিশন" নামক পাক্ষিক পত্রিকার ১৩৩৫ সালের মাঘ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মৈত্রের লিখিত "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও হিন্দুমিশন" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এই পুনর্মুদ্রণের অর্থ এই যে, উহা একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ এবং উহার খুব চাহিদা আছে। বেশ মনোযোগের সহিত প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াও কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ অন্যরূপ ধারণা হইয়াছে। কারণ, বীরেন বাবু রামমোহনের জীবনী হইতে বাছিয়া তাঁহার মনোমত কতকগুলি কথা সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারা রামমোহনের একটী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, যাহা একটী সম্পূর্ণ চিত্র ত নয়ই, কিন্তু অত্যন্ত আংশিক, কাজেই একটী বিকৃত চিত্রই হইয়াছে। হিন্দুমিশনের পক্ষ টীর মূল্য থাকিতে পারে, বিশেষতঃ একজন ব্রাহ্মের লেখা বলিয়া। কারণ, রামমোহন একান্তভাবে হিন্দুই ছিলেন, ইহা কোনরূপে প্রতিপন্ন করিতে পারিলে মিশনের হয়ত কিছু সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে সত্যকে গোপন করা হইয়াছে। তবে অত্যন্ত আনন্দ ও সান্ত্বনার বিষয় এই যে, রামমোহন এতদিন বেওয়ারিশ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, বীরেন বাবু অন্ততঃ শিক্ষিত হিন্দু-সমাজ ও হিন্দু মিশনের পক্ষ হইতে ধর্ম্ম-সংস্কারকরূপে তাঁকে একটা ঠাঁই দিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইয়াছে যে, অদৃষ্টের কি অদ্ভুত পরিহাস! সর্ব্বপ্রকার পৌত্তলিকতা, বাহ্য পূজা ও বহুদেবতার পরম শত্রু যে রামমোহনকে বিধর্ম্মী ও অহিন্দু বলিয়া সমগ্র দেশ এক সময়ে নানারূপ অপমান ও নির্য্যাতন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে নাই, এবং যাঁহাকে প্রাণেই বধ করিতে চাহিয়াছিল, সেই রামমোহনকেই এক্ষণে খাঁটি হিন্দু বলিয়া দাবী করা হইতেছে!!

বীরেন বাবু তাঁহার হিন্দুত্বের ভাবাবেগে রামমোহন যে একজন multi-personality ছিলেন তাহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন মহাশাস্ত্রজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিত শুধু ছিলেন না, তিনি একজন জবরদস্ত মৌলবী ও একজন খুব বড় পাদ্রীও ছিলেন। বীরেনবাবু তাঁহার একটী মাত্র দিক দেখিয়াছেন, তাই তাঁহাকে ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহার জীবনের বিশেষত্বই ধরিতে পারেন নাই। রামমোহন হিন্দু দর্শনের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করিলেও সেই সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টীয় নীতির শ্রেষ্ঠতাও প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি যেমন বেদান্ত প্রচার করিয়াছিলেন এবং নিজে একটী বেদ-বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছিলেন, তেমনি Prince of missionaries Dr. A. Duffকেও তিনিই ডাকিয়া আনিয়া ইংরেজী স্কুল খুলিতে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং শুধু সংস্কৃত ও বেদান্ত শিক্ষার পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য তিনিই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। তিনি যেমন গায়ত্রী মন্ত্রের সাহায্যে উপাসনা করিতেন, তেমনি খৃষ্টানদের গির্জ্জায় গিয়া শ্রদ্ধার সহিত উপাসনায় যোগদান করিতেন এবং হাফেজ, রুমী প্রভৃতি সুফী কবিদের কবিতাও সর্ব্বদা আবৃত্তি করিতেন। তিনি প্রথম জীবনে তন্ময় হ'য়ে শুধু রামায়ণ পাঠ করিতেন না, অতি নিষ্ঠার সহিত গৃহ-দেবতা "রাধাগোবিন্দের" পূজাও করিতেন এবং ভাগবত পাঠ না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না, আবার ষোল বৎসর বয়সে "হিন্দুদের সর্ব্বপ্রকার পৌত্তলিক পূজাপ্রণালীর" তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গ্রন্থ লিখিয়া পিতা কর্ত্তৃক গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন এবং পরে ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণপ্রাপ্তির ব্যবস্থাও তিনিই করিয়াছিলেন। তিনি মূর্ত্তিপূজা ও অবতারাদির সম্পূর্ণ বিরোধীই ছিলেন এবং অকাট্য ও নির্ম্মম যুক্তি দ্বারা সে সমুদয়ের মূলে সাংঘাতিক আঘাত করিয়া গিয়াছেন, তবুও তিনি কিরূপে নিজ যুক্তি অনুসারে রাম কৃষ্ণ অবতারাদিতে বিশ্বাসী ছিলেন বুঝিতে পারিলাম না। তবে ইহা অতি সত্য যে তিনি যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষদের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

২য়—১৩৩৬ সালের বৈশাখের "মাতৃমন্দির" নামক মাসিকে শ্রদ্ধেয় ডাঃ চুনীলাল বসু মহাশয় লিখিত "রাজা রামমোহন রায় ও একেশ্বরবাদ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দেখিয়া একেশ্বরবাদের নূতন কোন ব্যাখ্যা তাতে পাইব আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রবন্ধটী পড়িয়া দেখিলাম যে প্রচলিত মূর্ত্তিপূজা বা পৌত্তলিকতা সমর্থনই লেখাটীর মুখ্য উদ্দেশ্য। মূর্ত্তিপূজা বা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রাজার ভীষণ প্রতিবাদের পরেও ডাঃ বসুর ন্যায় একজন সুধী ব্যক্তি তাহা সমর্থন করিয়া বর্ত্তমান কালে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন, ইহা আমার ধারণাই ছিল না। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একশত বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন রায়ের সহিত তর্কযুদ্ধে হিন্দু পণ্ডিতেরা যে সব যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং যাহা রাজা অতি অসার বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, ইহা সেই সব অকিঞ্চিৎকর ও মামুলী যুক্তিরই কতক চর্ব্বিত-চর্ব্বণ মাত্র।

চুনীবাবু শ্রীভাকারের উদারতায় অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছেন,

কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে রাজা গীতাকারের অনেক পরবর্ত্তী এবং গীতায়ও তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। গীতাকার যদি কোনরূপ উদারতা দেখাইয়া থাকেন তবে, রাজাও সেইরূপ উদারতা দেখাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। চুনী বাবু সেই খবরও রাখেন না দেখিতেছি। রাজাও সম্পূর্ণ অজ্ঞান এবং অক্ষমের জন্য মূর্ত্তিপূজার বিধান দিয়াছেন। কিন্তু তিনি ভাবিতেই পারেন নাই যে, একশত বৎসর পরেও সেই অজ্ঞানত ও অক্ষমতা দেশে সম্পূর্ণ অটুটই থাকিয়া যাইবে।

বসু মহাশয় তৎকর্ত্তৃক উদ্ধৃত ভক্ত তুলসী দাসের বচনটির ব্যাখ্যায়ও গোলে পড়িয়াছেন। তিনি সেখানে "সগুণে" ও "সাকারে" একেবারে একাকার করিয়া ফেলিয়াছেন।

আমরা এতদিন জানিতাম যে, রাজাই প্রথম সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়-কারী (Father of comparative religions); এখন কিন্তু কাহারো কাহারো কাছে (এবং তাঁদের মধ্যে চুনী বাবুও একজন) শুনিতেছি যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নাকি এই যুগের সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়কারী। ঐতিহাসিকগণ যে যুগকে 'রামমোহন রায়ের যুগ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই যুগের প্রায় প্রথম ভাগেই জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং রামমোহনের ধর্ম্মপৌত্র সমন্বয়-পাগল ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সঙ্গ লাভ করিয়া রামকৃষ্ণের ধর্ম্ম-সমন্বয়ের ভাব প্রাপ্ত হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় পরমহংসদেবের নব-সমন্বয়ের "যত মত তত পথ" এই উক্তিটীকে পৌত্তলিকতার স্বপক্ষে একটী মস্ত যুক্তিরূপে উপস্থিত করা। ঐ উক্তিটী যতই শ্রুতিমধুর হউক না কেন, একটু অনু-ধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে তাঁহার প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক বেদান্তব্যাখ্যায় প্রযুক্ত প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের "সব ধর্ম্ম সত্য" উক্তিটীরই আর এক পিঠ মাত্র। সেই একই "ঢিলা ঔদার্য্য" উভয়েতে বিদ্যমান। ধর্ম্ম বহু নয়, পথও বহু নয়। সত্য ধর্ম্ম এক, সত্য পথও এক। এই বিষয়ে রাজার অলঙ্ঘনীয় যুক্তিসকল যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

ব্রাহ্ম বীরেন বাবুও তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে রামকৃষ্ণের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"রূপকল্পনা করিয়া প্রচলিত ব্রহ্মপূজা এবং মূর্ত্তির সাহায্যে পরমহংসদেবের চিন্ময়ী ধ্যানের পার্থক্য কি তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর বুঝিবার সময় আসিয়াছে।" এই ভারতবাসীর মধ্যে মূর্ত্তিপূজার বিরোধী মুসলমান সম্প্রদায় এবং কবির ও নানকপন্থীদের তিনি ধরেন নাই বোধ করি। তাহা ছাড়া প্রচলিত মূর্ত্তিপূজা ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়াই হইয়াছে আমরা শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু প্রচলিত ব্রহ্মপূজাও যে রূপকল্পনা করিয়াই হয়, ইহা আমরা তাঁহার কাছেই প্রথম জানিলাম। তবে পার্থক্য যে কি তাহা রামকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন। পরলোকগত ত্রৈলোক্যনাথ দেবের "অতীতের ব্রাহ্ম সমাজ" গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই সকলে অতি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে-পারিবেন। আর মূর্ত্তিপূজা যদি অতি সহজ ও স্বাভাবিকই হইবে, তবে দক্ষিণেশ্বরের কালীর পূজারী রামকৃষ্ণের আবার নানা জনের কাছে অত সাধন গ্রহণ ও অত কৃচ্ছ্রব্রতপালনেরই বা দরকার কি ছিল, যার জন্যে তাঁহার স্বাস্থ্য চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া গেল?

৩য়—১৩৩৫ সালের চৈত্র সংখ্যা "শনিবারের চিঠিতে" "বাঙ্গালীর অদৃষ্ট" শীর্ষক একটী প্রবন্ধকে প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। লেখক প্রবন্ধটীতে বাঙ্গালীর অদৃষ্ট বিষয়ে এক অতি অভিনব রকমের গবেষণা করিয়াছেন। লেখকের নাম না থাকিলেও তিনি বাঙ্গালী নিশ্চয়ই, কারণ, তিনি নিজেই ঐ প্রবন্ধে বাঙ্গালীর যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাতে সেই মনোভাবেরই পরিচয় পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যায়। বাঙ্গালী জাতি যে শুধু ভাবপন্থী—একান্ত ভাববিলাসী—ইহাই তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সিদ্ধান্তও করিয়াছেন,—"একটা সুবিচারিত সত্যের কঠিন বন্ধনে তাহার (বাঙ্গালীর) মন কখনও ধরা দিতে পারে না।" এখন কথা এই যে, তাঁহার এই গবেষণাটা ভাবের না আর কিছুর। তাঁহার মতে বাঙ্গালীর ত ভাব ছাড়া আর বিশিষ্ট কোন অবলম্বনই নাই, তাঁর বাঙ্গালী-য়ানার অর্থও ভাবুকতা এবং তাহা লইয়াই তিনি গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু ভাবের গবেষণা! এ সোনার পাথর-বাটী!! কাজেই তাঁহার গবেষণা যে কেবল অনধিকার চর্চ্চাই হইবে এবং তার ফলও যে পর্ব্বতের মূষিকপ্রসবের ন্যায় একটা কিম্ভূত-কিমাকার কিছু হইবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তবু এই অত্যদ্ভুত গবেষণার একটু আলোচনার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅনঙ্গমোহন রায়

উষাকীর্ত্তন। (পৌষ, ১৩৩৬)

বিভাস মিশ্র—কাওয়ালী

("ব্রহ্মনামসুধা-রস কর পান"—গানের সুর)

জাগ আনন্দে আনন্দ ভুবনে;
থেক না আর ঘুম-ঘোরে মিছে স্বপনে।
কাননে জাগিল পাখী, আনন্দ-আলোকে ডাকি',
শোন সে আনন্দ-ধ্বনি উঠে গগনে।
(জেগে শোন শোনরে) (কি বা মধুর মধুর, বড়ই মধুর)
এ আনন্দরূপে যিনি, বিশ্ব-প্রাণাধার তিনি,
আনন্দ-বারতা তাঁরি বহে পবনে;
দেখরে দেখ তাঁহারে, উদয়-অচলদ্বারে
(দেখ) কি মহা প্রাণ-তরঙ্গ প্রাণে প্রাণে।
(জেগে দেখ দেখরে) (অন্তরে বাহিরে দেখ)
নাহি মৃত্যু, নাই শোচনা, গেছে দূরে ভয় ভাবনা,
প্রভাতে মুক্তি-ঘোষণা এসেছে নামে;—
"অমৃতের অধিকারী" "জাগ জাগ নরনারী!"
ব্রহ্মরূপ প্রাণে হেরি' ভোর সাধনে।
(অমর হইবে যদি) (আনন্দ অমৃত তিনি)
"ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান," "ব্রহ্মানন্দরস-পান";—
সকলি মঙ্গল ব্রহ্মনামকীর্ত্তনে;
সুখে দুঃখে জপরে নাম, এ নামে হবে পূর্ণকাম,
মৃতসঞ্জীবন নাম মরত ধামে।
(ব্রহ্মনাম বিনে আর কি ধন আছে)
(এ নাম বলরে বলরে বল)

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

পরলোকগত গগনচন্দ্র হোম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্বত্বাধিকারিত্ব ছাড়িয়া দিলেও ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সহকারী সম্পাদক ও প্রধান প্রবন্ধ-লেখকরূপে এই সংবাদ-পত্রের সহিত আমি সংসৃষ্ট ছিলাম। "সঞ্জীবনীর" প্রথম কার্য্যাধ্যক্ষও ছিলাম আমি। "সঞ্জীবনীর" সেবায় আমার বন্ধু বিনিদ্র রজনী কৃষ্ণকুমার বাবুর সাহচর্য্যে কাটিয়াছে। ময়মনসিংহে পাঠ্যাবস্থায়, "ভারতমিহির"-সম্পাদক অনাথবন্ধু গুহ-মহাশয়ের নিকট, আমার সংবাদপত্রে লেখার হাতে-খড়ি হইয়াছিল। যখন ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে পড়ি, তখন পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের সাহায্যে, "সঞ্জীবনী" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করি; আমিই তাহার প্রধান লেখক ছিলাম। ময়মনসিংহের "সঞ্জীবনী"কে কলিকাতার "সঞ্জীবনী"র অগ্রজ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন "প্রচার" মাসিক-পত্র সম্পাদন করিতেছিলেন, তখন বন্ধুবর বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের নেতৃত্বে আমরাও "আলোচনা" প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই মাসিক পত্রিকার পরিচালনাভার ছিল আমার উপর। সেই সূত্রে অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের সহিত আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ঘটে। রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি বিশ্বব্যাপী এমন কি দেশব্যাপী হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই আমি তাঁহার কাব্যের অনুরাগী ছিলাম। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর, জোড়াসাঁকোস্থ ঠাকুর-ভবনে, তাঁহার সাহিত্য-আলোচনায় ও সঙ্গীতচর্চ্চায় যোগ দিবার সুযোগ আমার বিশেষ ভাবে ঘটিয়াছিল। সেই সব দিনের সুখসমুজ্জ্বল স্মৃতি হৃদয়ে আঁকা রহিয়াছে। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের "আলোচনা" পত্রিকার লেখক ও বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। "আলোচনা" কিন্তু কয়েক বৎসর চলিবার পর উঠিয়া যায়। ক্রমশঃ

ব্রাহ্মসমাজ।

শততম মাঘোৎসব—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে শততম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে ইহার কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারে। ব্যাকুল-প্রাণ নরনারীর সম্মিলনের উপরই উৎসবের সফলতা বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। সেজন্য উৎসবে সম্মিলিত হইবার জন্য সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে—

১লা হইতে ৩রা মাঘ (১৫ই হইতে ১৭ই জানুয়ারী) বুধ হইতে শুক্রবার—ব্রাহ্মপরিবারসমূহে এবং ছাত্রাবাস ও ছাত্রী-নিবাসে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা।

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) শনিবার—প্রাতে ব্রাহ্ম পরিবার-সমূহে এবং ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা। সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন।

৫ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) রবিবার—প্রাতে ব্রাহ্মযুবকদিগের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় যুবকদিগের আলোচনা। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় বরাহনগর শ্রমজীবিগণের নগর-সঙ্কীর্ত্তন। সায়ংকালে শ্রমজীবিগণের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা।

৬ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) সোমবার—(মহর্ষির মৃত্যুদিন) প্রাতে উপাসনা। সায়ংকালে আলবার্ট হলে স্মৃতি সভা।

৭ই মাঘ (২১ শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা। সায়ংকালে বক্তৃতা।

৮ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) বুধবার—প্রাতেউপাসনা। সায়ংকালে তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব।

৯ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—প্রাতে মহিলা-দিগের উৎসব (ও পুরুষদিগের জন্য সিটি কলেজগৃহে পৃথক উপাসনা।) সায়ংকালে ইংরাজীতে উপাসনা।

১০ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) শুক্রবার—প্রাতে কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। অপরাহ্ণ ১ ঘটিকায় নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিসভা। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় নগর সঙ্কীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা।

১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) শনিবার—**সমস্তদিন-ব্যাপী** উৎসব। প্রাতে কীর্ত্তন ও উপাসনা। অপরাহ্ণ ১ ঘটিকায় উপাসনা। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় পাঠ ও ব্যাখ্যা। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সম্মিলিত উপাসনা। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় সংকীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা।

১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) রবিবার—প্রাতে সাধনাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় আলোচনা। ঘটিকায় ইংরাজীতে উপাসনা। সায়ংকালে

১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) সোমবার—প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় মেরী কার্পেণ্টার হলে রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের উৎসব। সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা।

১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্ণে বালক বালিকা সম্মিলন। সায়ংকালে ছাত্রসমাজের উৎসব।

১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) বুধবার—প্রাতে উপাসনা। সায়ংকালে সঙ্গত সভার উৎসব।

১৬ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—প্রাতে উপাসনা। সায়ংকালে কীর্ত্তন।

১৭ই মাঘ (৩১শে জানুয়ারী) শুক্রবার—প্রাতে উপাসনা। সায়ংকালে উপাসনা।

১৯শে মাঘ (২রা ফেব্রুয়ারী) রবিবার—তিন সমাজের মিলিত উদ্যান-সম্মিলন।

আন্দুল ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ৮ই ডিসেম্বর আন্দুল ব্রাহ্মসমাজের সভ্য পরলোকগত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর আদ্য-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অর্পণাচরণ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য, পুত্র শ্রীযুক্ত অনাথনাথ চক্রবর্ত্তী সংক্ষেপে জীবন-চরিত পাঠ ও শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে সঙ্গীত করেন। এ উপলক্ষে আন্দুল ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

উৎসব—পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের ত্র্যশীতিতম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে :—

২০শে অগ্রহায়ণ (৬ই ডিসেম্বর), সন্ধ্যা—উৎসবের উদ্বোধন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত। ২১শে অগ্রহায়ণ (৭ই ডিসেম্বর)—মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিন—প্রাতঃকালে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু; সন্ধ্যায় বক্তৃতা, বক্তা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, বিষয়—"ধর্ম্মসমাজে আদর্শ জীবন।" ২২শে অগ্রহায়ণ (৮ই ডিসেম্বর)—সমাজপ্রতিষ্ঠার দিন—প্রাতঃকালে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য; অপরাহ্নে পাঠ ও ব্যাখ্যা, বিষয়—"ব্রাহ্মবন্ধুর ব্রহ্ম-মীমাংসা," ব্যাখ্যাতা—শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ; তৎপর উক্ত বিষয়ে আলোচনা। সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত। ২৩শে অগ্রহায়ণ, (৯ই ডিসেম্বর)—প্রাতঃকালে ইষ্টবেঙ্গল ইন্‌ষ্টিটিউসন স্থাপনের দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ।

উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ—উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চম বার্ষিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী মতে সম্পন্ন হইবে:—শনিবার ২১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় সংকীর্ত্তনে উপাসনা। রবিবার ২২শে ডিসেম্বর প্রাতে ৮ টায় উপাসনা (আচার্য্য শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস) ও বৈকালে ৩ টায় বালক-বালিকাদিগের উৎসব। সোমবার ২৩শে ডিসেম্বর রাত্রি ৬॥০ টায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোকচিত্রে বক্তৃতা। মঙ্গলবার ২৪শে ডিসেম্বর (সর্ব্বদিনব্যাপী উৎসব), সকালে ৬॥০ টায় উল্টাডাঙ্গা বাজার হইতে উষাকীর্ত্তন, ৮॥০ টায় উপাসনা, তৎপর পরলোকগত কানাইলাল সেনের স্মৃতিসভা। মধ্যাহ্নে প্রীতি-ভোজন; অপরাহ্ণ ৩ টায় বার্ষিক সভা; ৪॥০ টায় শাস্ত্র পাঠ; সন্ধ্যা ৬ টায় উপাসনা।

নিখিল ভারতীয় একেশ্বরবাদীদিগের সম্মিলন—নিখিল ভারতীয় একেশ্বরবাদীদিগের সম্মিলনের এক ত্রিংশ অধিবেশন আগামী ২৬শে ডিসেম্বর হইতে লাহোর নগরীতে সম্পন্ন হইবে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। নিম্নলিখিত প্রণালীতে কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে :—

২৬শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রারম্ভিক উপাসনা। ১০ ঘটিকায় বিষয় নির্ব্বাচন কমিটির অধিবেশন। অপরাহ্ণ ২॥০ ঘটিকায় লাজপত নগরে ধর্ম্মসম্মিলন। ২৭শে ডিসেম্বর, শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় উপাসনা, ৯॥০ ঘটিকায় সম্মিলনের অধিবেশন; অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় অভ্যর্থনা সমিতির ও সম্মিলনের সভাপতিদ্বয়ের অভিভাষণ। ২৮শে ডিসেম্বর, শনিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় উপাসনা, ৯॥০ ঘটিকায় সম্মিলনের অধিবেশন; অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তা বিষয়ে প্রসিদ্ধ বক্তাগণের বক্তৃতা। ২৯শে ডিসেম্বর রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় ইংরাজীতে উপাসনা। ১০ ঘটিকায় সম্মিলনের অধিবেশন। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় ব্রহ্মমন্দিরে হিন্দীতে উপাসনা।

প্রতিনিধিবর্গকে ২৲ টাকা করিয়া ডেলিগেসন ফি দিতে হইবে। আহারের ব্যয় বাবদ পূর্ণ বয়স্কদিগের নিকট হইতে দৈনিক ১৲ টাকা ও ১২ বৎসরের নিম্ন বয়স্কদিগের নিকট হইতে ॥০ হিসাবে গ্রহণ করা হইবে। লাহোরে এই সময়ে খুবই বেশী শীত। সকলকে যথেষ্ট গরম কাপড় লেপ কম্বল প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। যাঁহাদের জন্য আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, তাঁহারা পূর্ব্বেই যেন সম্পাদককে জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল, নূর কটেজ, ম্যাক্লিওড রোড, লাহোর (Noor Cottage, Macleod Road, Lahore এই ঠিকানায় পত্রাদি লিখিতে হইবে।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

শ্রীযুক্ত পাণ্ডবচন্দ্র সিংহের পালিত পৌত্র সান্ত্বনাকুমার সিংহ আঠার বৎসর বয়সে কলেরা রোগে বিগত ৪ঠা নবেম্বর উলুবেড়িয়াতে পরলোক গমন করিয়াছেন। বিগত ৮ই ডিসেম্বর তাহার আদ্যশ্রাদ্ধ বাণীবনে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৩০শে কার্ত্তিক কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত ভবতারণ ভড়ের মাতা পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ৩রা ডিসেম্বর পরলোকগত জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন, পুত্র শ্রীমান সন্তোষকুমার প্রার্থনা পাঠ করেন। এই উপলক্ষে ৪৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ২রা অগ্রহায়ণ ঢাকা নগরীতে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র নন্দীর কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শীলা ও শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান অমলকুমারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জির কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া মীরা ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ হালদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সমরেন্দ্রনাথের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত ভুবনমোহন চাটার্জ্জির কন্যা কল্যাণীয়া সুলেখা ও পরলোকগত পুণ্যদাপ্রসাদ সরকারের পুত্র শ্রীমান ব্রহ্মবিহারীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১৪ই ডিসেম্বর বালীগঞ্জ উপনগরীতে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ নন্দীর কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া সুপ্রীতি ও বগুড়া-সেরপুর নিবাসী পরলোকগত মহিমচন্দ্র সিংহের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান মাধবচন্দ্রের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময়ে গিরিডি ব্রহ্মমন্দিরে গিরিডি ব্রাহ্মসমাজের অষ্টচত্বারিংশত্তম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। তাহাতে নিম্নস্থ কার্য্যসকল সম্পন্ন হইবে। ইহাতে উক্ত সমাজের সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

১। ১৯২৯ অব্দের কার্য্য বিবরণ ও আয় ব্যয় পাঠ। ২। আগামী বর্ষের জন্য কর্ম্মচারী এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য নির্ব্বাচন। ৩। কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রতিনিধি মনোনয়ন। ৪। আচার্য্য নিয়োগ। ৫। বিবিধ।

গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ নিবেদক

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৯ উপেন্দ্রচন্দ্র নাগ, সম্পাদক।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশনাথ রায় দ্বারা ৩রা পৌষ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—[illegible]

সন্তানদের মাথায় মোট দেখিয়া বড়ই আমোদ করিয়াছিলেন। তিনিও বাঁশবেড়িয়া-নিবাসী ছিলেন। গৃহে নগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী আমাদের জন্য অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার মধ্যম পুত্রের শোকে তখন তিনি কাতর ছিলেন, আমাদের পাইয়া কত আনন্দিত হইলেন। তাঁহাদের গৃহে উৎসব আরম্ভ হইল;—দু'বেলা কীর্ত্তন, সঙ্গীত, উপাসনা ও উপদেশ চলিতে লাগিল; অপরাহ্নে আলোচনা হইত। বাঁশবেড়িয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গ্রাম; পণ্ডিত-মহাশয়েরা আসিয়া নানা কূট প্রশ্ন করিতেন, নগেন্দ্রবাবু তাহা খণ্ডন করিতেন; গোঁসাই ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন। এইভাবে তিন চারি দিন পরম আনন্দে কাটিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মসমাজ।

শতত্তম মাঘোৎসব—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে শততম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে ইহার কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারে। ব্যাকুল-প্রাণ নরনারীর সম্মিলনের উপরই উৎসবের সফলতা বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। সেজন্য উৎসবে সম্মিলিত হইবার জন্য সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে—

১লা হইতে ৩রা মাঘ (১৫ই হইতে ১৭ই জানুয়ারী) বুধ হইতে শুক্রবার—ব্রাহ্মপরিবারসমূহে এবং ছাত্রাবাস ও ছাত্রী-নিবাসে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা।

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) শনিবার—প্রাতে ব্রাহ্ম পরিবার-সমূহে এবং ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা। সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

৫ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) রবিবার—প্রাতে ব্রাহ্মযুবক-দিগের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় যুবকদিগের আলোচনা। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় বরাহনগর শ্রমজীবিগণের নগর-সঙ্কীর্ত্তন। সায়ংকালে শ্রমজীবিগণের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—ডাঃ হেমচন্দ্র সরকার।

৬ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) সোমবার—'মহর্ষির পরলোক গমনের দিন) প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। সায়ংকালে আলবার্ট হলে মহর্ষি স্মৃতি সভা।

৭ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী। সায়ংকালে ছাত্র সমাজের উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা।

৮ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) বুধবার—প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস। সায়ংকালে তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা—বিষয়—"ভক্তি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা"। বক্তা—পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

৯ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—প্রাতে মহিলা-দিগের উৎসব ও পুরুষদিগের জন্য সিটি কলেজগৃহে পৃথক উপাসনা। সায়ংকালে সম্মিলিত উপাসনা।

১০ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) শুক্রবার—প্রাতে কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়। অপরাহ্ণ ১ ঘটিকায় নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিসভা। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়; বক্তাগণ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্তা সুবালা আচার্য্য। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় নগর সঙ্কীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য।

১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) শনিবার—**সমস্তদিন-ব্যাপী উৎসব।** প্রত্যূষে ৫ ঘটিকায় উষাকীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। অপরাহ্ণ ১ ঘটিকায় উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় পাঠ ও ব্যাখ্যা। পাঠকগণ:—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, ভাই সীতারাম, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ইংরাজীতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ। অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকায় সংকীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) রবিবার—প্রাতে সাধনাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় আলোচনা। বিষয়—"ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার"। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার। সায়ংকালে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়।

১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) সোমবার—প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় মেরী কার্পেণ্টার হলে রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের উৎসব। সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা। (কেবল সভ্য-দিগের জন্য)।

১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত। অপরাহ্ণ বালক বালিকা সম্মিলন। সায়ংকালে বক্তৃতা; বক্তা—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ।

১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) বুধবার—সায়ংকালে সঙ্গত সভার উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা; বিষয় "নিগূঢ় ধর্ম্ম—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য"। বক্তা—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

১৬ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—সায়ংকালে কীর্ত্তনে উপাসনা।

১৭ই মাঘ (৩১শে জানুয়ারী) শুক্রবার—প্রাতে উপাসনা। সায়ংকালে বক্তৃতা; বক্তা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

১৮ই মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী) শনিবার—সায়ংকালে ইংরাজীতে বক্তৃতা; বক্তা—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়।

১৯শে মাঘ (২রা ফেব্রুয়ারী) রবিবার—প্রাতে উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন। তিন সমাজের মিলিত উদ্যান-সম্মিলন। সায়ংকালে উপাসনা; আচার্য্য—পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

মফঃস্বল হইতে যাঁহারা উৎসবে যোগদান করিতে আসিবেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পূর্ব্বেই উৎসবকমিটির সম্পাদককে তাঁহাদের কলিকাতা পৌঁছিবার নির্দ্দিষ্ট তারিখ জানাইলে অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত হইতে পারে।

উৎসব—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপাসনা সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে—৪ঠা ভাদ্র সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় উপাসনা করেন। ৫ই ভাদ্র প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী উপাসনা করেন। অপরাহ্নে বার্ষিক সভা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় সভাপতি হন ও সমাজের বার্ষিক রিপোর্ট পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত মেঘনাথ চৌধুরী পুনরায় সমাজের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন, সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত মেঘনাথ চৌধুরী তৎপরে একটী বক্তৃতা পাঠ করেন ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত মহাশয়ের স্বাস্থ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় কথকতা করেন। ৬ই ভাদ্র প্রাতে মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা হইয়া উৎসব শেষ হয়; বরদা বাবু উপাসনা করেন।

প্রচার—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিয়া ৬ই ভাদ্র অপরাহ্নে গঙ্গাসাগরে উপস্থিত হন। ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে ত্রিপুরার মহারাজার স্থানীয় কাছারি কম্পাউণ্ডে "দেবর্ষি নারদের সাধনা" বিষয়ে কথকতা করেন। ৭ই ভাদ্র প্রাতঃকালে মহারাজার এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার

শ্রীযুক্ত তড়িৎমোহন গুপ্তের বাটীতে পারিবারিক উপাসনা করেন। সন্ধ্যাকালে রাজ কাছারি কম্পাউণ্ডে "বুদ্ধের জীবনী" সম্পর্কে কথকতা করেন। ৮ই ভাদ্র প্রাতঃকালে পুনরায় তড়িৎবাবুর বাটীতে পারিবারিক উপাসনা। তিনি ৯ই ভাদ্র গঙ্গাসাগর হইতে নোয়াখালী গমন করিয়া রায় রাধাকান্ত আইচ বাহাদুরের ভবনে উপস্থিত হইয়া প্রাতে পারিবারিক উপাসনা করেন। সায়ংকালে কথকতা করেন। পরদিন নোয়াখালী ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে কথকতা করেন। তৎপর বরিশাল গমন করিয়া ১৬ই ভাদ্র বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে উপাসনা করেন। একদিন তথাকার উকিল শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ সেনের বাড়ীতে কথকতা করেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের প্রকাশ করিতে হইতেছে যে,—

বিগত ১৭ই ডিসেম্বর দমদম ক্যাণ্টনমেণ্টে শ্রীযুক্ত স· রায়ের কন্যা (শ্রীযুক্ত মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের দৌহিত্রী) হঠাৎ কয়েক ঘণ্টার অসুখে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১৬ই ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ নগরীতে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সেনের পত্নী (পরলোকগত কৈলাসচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের অন্যতমা কন্যা) হেমন্তকুমারী দীর্ঘকাল রোগ শয্যায় শায়িত থাকিয়া পরলোক-গমন করিয়াছেন।

বিগত ১৬ই ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত ভবতারণ ভড়ের মাতার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য ও ভবতারণ বাবু প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৩৲ দাতব্য বিভাগে ২৲, উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজে ২৲ ও উল্টাডাঙ্গা উৎসব ফণ্ডে ১৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে প্রবীণ ব্রহ্মোপাসক বাবু ক্ষুদিরাম বসু পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নিয়মিত-রূপে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনায় যোগ দিতেন।

বিগত ৮ই ডিসেম্বর ধুবড়ী ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রভা বড়া তাঁহার পিতা পরলোকগত ধনীরাম দাসের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৪৲, গৌহাটী ব্রাহ্মসমাজে ২৲, গোয়ালপাড়া ব্রাহ্মসমাজে ২৲ ও ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

বিগত ৩০শে নবেম্বর কাকিনাতে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্তের শাশুড়ী স্বর্ণময়ী সেনগুপ্ত ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদিতে নিয়মিতভাবে যোগদান করিতেন।

বিগত ২৯শে ডিসেম্বর তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ২৲ ও সাধারণ বিভাগে ২৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ২৬শে ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত লাবণ্য-কুমার সিংহের একটা কন্যা পরলোক গমন করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দান করুন।

শুভ বিবাহ—বিগত ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ীর জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া জ্যোৎস্নাময়ী ও শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুধাংশুমোহনের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রেমময় পিতা নব দম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ—গত ৩রা পৌষ সন্ধ্যাকালে পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পূর্ব্ববঙ্গে ব্রহ্মোপাসনার প্রথম প্রবর্ত্তক এবং পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে অগ্রগণ্য পরলোকগত ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের স্মরণার্থ বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন।

দান—শ্রীমতী সুবালা বসাক পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ২৲ দান করিয়াছেন। এ দান সার্থক হউক এবং মঙ্গলময় শিশুকে কল্যাণের পথে বর্দ্ধিত করুন।

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী পিতা পরলোকগত শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৩৲ ও সাধনাশ্রমে ২৲ মোট ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্র পত্নী সুনীতিবালা মিত্রের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দুঃস্থ-ব্রাহ্মপরিবারভাণ্ডারে ২৲ দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র নাগ কন্যা অশোকা নাগের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজে ২৲ দান করিয়াছেন। এই সমস্ত দান সফল হউক এবং পরলোকগত আত্মাসকল শান্তি লাভ করুন।

শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২রা কার্ত্তিক শনিবার শ্রীহট্ট ব্রহ্মমন্দিরে "শ্রীচৈতন্যদেবের ভাব ও প্রভাব" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন এবং রবিবার সায়ং-কালীন উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম কার্য্য উপলক্ষে বহু বৎসর পর শ্রীহট্টে গমন করিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে কয়েক সপ্তাহ সায়ংকালীন উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং সহরস্থ ভদ্রলোকদিগের সঙ্গে আলাপাদি করেন। এক দিবস মন্দিরে সম্মিলিত বন্ধু-দিগের সঙ্গে ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ২১শে নভেম্বর "গীতার কর্ম্মতত্ত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

আসামের শিক্ষা বিভাগের সহকারী ইনিসপেক্‌ট্রেস কুমারী সুশীলা সেন অল্পদিবস পূর্ব্বে বিলাত হইতে শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। মহিলা সমিতির সম্পাদিকা এবং ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়ের উদ্যোগে ব্রহ্মমন্দিরে সমবেত মহিলাদিগের মধ্যে তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

বিগত ২০ অগ্রহায়ণ সমাজের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সেনের অষ্টাদশ বর্ষীয় পুত্রের পরলোক গমনের প্রথম বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার গৃহে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্তা নলিনীবালা চৌধুরী উপাসনার কার্য্য করেন। জানকী বাবু প্রার্থনা করেন এবং এই উপলক্ষে শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজে একটী স্থায়ী ফণ্ডের জন্য ২৫৲ টাকা এবং ছাত্রদের ক্রীড়ার একটী সিল্ডের জন্য অর্থ দান করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৭শে জানুয়ারী সোমবার সন্ধ্যা ৬।০ ঘটিকার সময় সমাজের উপাসনামন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সভ্যদিগকে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

আলোচ্য বিষয় :—

১। বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী ও হিসাব। ২। সভাপতির অভিভাষণ। ৩। কর্ম্মচারী নিয়োগ। ৪। অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ। ৫। সৌভ্রাত্রসূচক অভিবাদন ও ধন্যবাদ প্রদান। ৬। বিবিধ।

২১১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
৩০শে নবেম্বর, ১৯২৯

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৯শে পৌষ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ।

সম্পূর্ণ নির্ভর ও আশা, যেখানে সকল বাধাবিঘ্নের মধ্যে একমাত্র সাধনবলেই উচ্চজীবন লাভ করা যায় এরূপ বিশ্বাস, সেখানে তাহা আন্তরিক হইলেও অহঙ্কার জন্মিবার পূর্ণ সম্ভাবনা। সাধন ভজনের অহংকার হইতে মুক্ত হওয়া সহজ নহে। কথায় বলে, অহঙ্কার স্বর্গের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছে এবং সেখান হইতেও নরকে পাতিত করে। এ কথার মধ্যে যে গূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অহঙ্কারের ন্যায় ধর্ম্মজীবনের ভীষণ শত্রু আর কিছুই নাই। অনেক সময় ইহা এত সূক্ষ্ম আকারে থাকিয়া ধর্ম্মজীবনের মূলকে ধীরে ধীরে শিথিল করিয়া দেয় যে, তাহা প্রখর আত্মদৃষ্টি ও গভীর আত্ম-পরীক্ষা ব্যতীত কিছুতেই ধরা যায় না, উন্মুলিত করা ত দূরের কথা। এরূপ জীবনে যে প্রকৃত আত্মসমর্পণ ও আত্মোৎসর্গ জন্মিতে পারে না তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আর, তাহা ব্যতীত যে উচ্চ ধর্ম্মজীবনলাভ কিছুতেই সম্ভবপর নয়, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। এই জন্যই এই শ্রেণীর লোকের পক্ষে উন্নত ধর্ম্মজীবনের বিকাশসাধন, প্রকৃত পরিত্রাণলাভ, প্রথম শ্রেণীর লোক অপেক্ষা কঠিন, দীর্ঘতরকালসাপেক্ষ।

ইহা হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারিতেছি যে, দুই কথার মধ্যে কোনই বিরোধিতা নাই, উভয়ে একই সত্য প্রকাশ করিতেছে, উভয়ত্র ধর্ম্মরাজ্যের একই অমোঘ নিয়ম কার্য্য করিতেছে। পরিত্রাণের একটি গূঢ় তত্ত্ব—আপনার দীনতা ও অক্ষমতা অনুভব করিয়া, পাপ মলিনতা ও অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া, মানুষ যখন অহঙ্কারবিবর্জ্জিত হইয়া, অনুতপ্ত চিত্তে, ব্যাকুল প্রাণে, অনন্যগতি হইয়া, একান্ত ভাবে কাতর হৃদয়ে ভগবানের শরণাপন্ন হয়, আপনার শক্তি সামর্থ্যের উপর কোনও প্রকার আশা ও নির্ভর রাখিতে না পারিয়া একমাত্র তাঁহারই নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে, তাঁহার মঙ্গল ব্যবস্থার উপরই আপনাকে একেবারে ছাড়িয়া দেয়, তাঁহার দয়া ও প্রেমে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার প্রদত্ত দুঃখ ক্লেশ দণ্ডও অকুণ্ঠিত চিত্তে বহন করিতে প্রস্তুত হয়, তখনই তাঁহার পরিত্রাণ উন্নতি ও বিকাশ, সর্ব্ব প্রকার বাধামুক্ত হইয়া, দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়, অন্যথা নিয়মিত সাধন ভজন সত্বেও তাহা কোনক্রমেই সম্ভবপর হয় না, দীর্ঘকালসাপেক্ষই থাকিয়া যায়। অধ্যাত্ম-রাজ্যের এই অমোঘ নিয়মটি সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়া যেন আমরা জীবনপথে চলি। আমাদের সকল অহঙ্কার ও উদাসীনতা বিদূরিত হউক। আমরা একমাত্র তাঁহারই কৃপার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার অনুগত জীবন যাপন করি। তাঁহার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি পূর্ণ হউক।

রাজা রামমোহন রায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক আর্য্য কৃষ্ণের প্রতি অতিশয় বীতরাগ এবং বাঙ্গালি-য়ানার প্রতি অতিরিক্ত মোহগ্রস্ত। তাঁহার এই অত্যধিক মোহের জন্যই তিনি বাঙ্গালী জাতি এবং সেই সূত্রে বিশেষ ভাবে এ যুগের শ্রেষ্ঠতম বাঙ্গালী রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করিয়াছেন। তাঁহার ব্যবস্থানুসারে রামমোহন ভাবপন্থী নহেন বলিয়া বাঙ্গালীর অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া সম্পূর্ণ অ-বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মুস্কিল এই, রামমোহন যে একেবারে বাঙ্গালারই বুকে, বাঙ্গালীরই ঘরে, জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াই উঠিতে পারেন নাই যে, রামমোহন এইরূপে বাঙ্গালীর ঘরে জন্মিয়া বাঙ্গালিয়ানাকে এমন সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিলেন কিরূপে। রামমোহনের বিচিত্র ও অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁহার নিকট মহা সমস্যা এবং সেই সমস্যার অতি সহজ সমাধান তিনি করিয়াছেন, তাঁহাকে বাঙ্গালী শ্রেণীর বহির্ভূত ও আর্য্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া! বাঙ্গালী কি তাহা হইলে অনার্য্যই? তবে "আর্য্য, আর্য্য" করিয়া দেশে এত হৈ চৈ কেন? আর, পবিত্র আর্য্যরক্তের মহিমায় এত স্ফীত হওয়াই বা কেন? তিনি "হিন্দুধর্ম্ম" ও "হিন্দুয়ানী" বলিয়া দুই একটী কথারও উল্লেখ করিয়াছেন। আর্য্য কৃষ্ণের সহিত এই "হিন্দুধর্ম্ম" ও হিন্দুয়ানীর কি সম্বন্ধ? হিন্দু আর্য্য না আর কিছু? প্রবন্ধে এই সব কথার কোন উত্তর নাই, তবে আর্য্য কৃষ্ণ এবং হিন্দুধর্ম্ম, ভারতীয় জাতি, বাঙ্গালিয়ানা ও হিন্দুয়ানীর একটা অদ্ভুত জগাখিচুড়ি আছে।

তিনি রামমোহন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"রামমোহন বাঙ্গালীর ধর্ম্মবিশ্বাস ও সমাজব্যবস্থার অবনতির দিকটাই দেখিয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন বেদ-উপনিষদের সত্যধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই তাহার এই দশা হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির রক্তের ধর্ম্ম যাইবে কোথায়? ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বাঙ্গালীর একটা সংস্কার মাত্র, তাহার জাতিধর্ম্মই তাহার নিয়তি। তাহাকে সে কেমন করিয়া লঙ্ঘন করিবে? এজন্য রামমোহনের ঈপ্সিত বা ইঙ্গীকৃত যে আদর্শ, বাঙ্গালীর চিন্তাধারায় তাহা কতক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিলেও তাহার প্রাণমূলে শক্তি সঞ্চার করিল না। ষড়দর্শন যেমন তাহার কীর্ত্তি নহে, বেদান্ত উপনিষদও তেমনই তাহার মনোধর্ম্ম নহে। নব হিন্দুধর্ম্মের পুরাণ-উপপুরাণের মধ্যে সে কতকটা আত্মতৃপ্তির উপায় করিয়া-ছিল, তথাপি কোন একটা তত্ত্বকে সে প্রাণ সমর্পণ করে নাই,—সে ভাবপন্থী, জ্ঞানপন্থী নয়। রামমোহন এই পুরাণ উপপুরাণের মূলোচ্ছেদন করিয়া, হাজার বছরের সংস্কারকে উৎপাটন করিয়া যে প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মকে আধুনিক যুক্তিবাদ ও সেমেটিক ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সুকঠিন একেশ্বরবাদের দ্বারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতের সহিত বহির্জ্জগতের এবং পুরাকালের সহিত আধুনিক কালের একটা রফা মীমাংসার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু ধর্ম্ম ত একটা চিন্তাপ্রণালীর সিদ্ধান্ত নয়, উৎকৃষ্ট উপদেশ বা চরিত্রসংগঠনী শিক্ষাই ধর্ম্মের সার মর্ম্ম নয়, যুগপ্রয়োজনই তার সর্ব্বস্ব নয়। ধর্ম্ম জাতির স্বভাবের অনুকূল হইয়াই তাহার প্রাণের শ্রেষ্ঠ প্রয়াসের প্রতিরূপ হিসাবে সত্য ও সার্থক হইয়া উঠে।"

রামমোহন রায় যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন এদেশ সর্ব্ব-প্রকার দুর্গতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল, ইহা ইতিহাসের সাক্ষ্য। তাঁহার জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁহার চারিদিকে এই অধোগতির নানা পরিচয় পাইয়াছিলেন। তখন

"বাঙ্গালীর জাতিধর্ম্ম বা বাঙ্গালী জাতির রক্তের ধর্ম্ম"—তথা "বাঙ্গালী জাতির নিয়তি" কোথায় ছিল? আসল কথা এই যে, পুরাণ উপপুরাণের ঘোলা জল সাময়িক তৃপ্তি দিলেও তাহা মানুষের সত্যিকার আত্মার পিপাসা মিটাইতে পারে নাই, এবং তাতে বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব বজায় থাকিলেও বাঙ্গালী মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত হইয়াছিল, ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই। রাজা অতি পরিষ্কাররূপেই দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, এদেশ "সোণা ফেলিয়া আঁচলে গিরো দিয়াছে," আসল ভুলিয়া নকলেই মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সেই জন্য তার এত দুর্গতি। সেই মোহ হইতে মুক্ত না হইলে দেশের কল্যাণ নাই। তাই তিনি অতি কঠিন আঘাতে সেই মোহপাশ ছিন্ন করিয়াছিলেন, এবং সেই আঘাতেই পুরাণ উপপুরাণের নামে হাজার হাজার বছর ধরিয়া যে আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইয়া, দুর্ব্বিষহ ভারে জাতিকে প্রতিমুহূর্ত্ত পিষিয়া মারিতেছিল, তাহা যে ছিন্নমূল হইয়া একেবারে ধরাশায়ী হইল, ইহা সত্যই। লেখক যে ডালে বসিয়াছেন সেই ডালই কাটিয়াছেন। বেদ বেদান্ত ছাড়িয়া তাঁহার পুরাণ উপপুরাণের ঠাঁই কোথায়? আর্য্যধর্ম্ম বেদান্ত উপনিষদ্ বাদ দিয়া তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম কোন্‌টুকু এবং কতটুকু? এদেশের লোক কখন এবং কেনই বা "হিন্দু" নাম পাইয়াছিল তাহা তিনি ভুলিয়াই গিয়াছেন। আর বেদান্ত উপনিষদ্ যদি বাঙ্গালীর মনোধর্ম্ম না হয় তবে তাহা কি? বাঙ্গালীর মনোধর্ম্ম কি শুধু ভাবে গড়াগড়ি দেওয়া? রামমোহনেরও তিনশত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালী 'তার জাতির স্বভাবের অনুকূল ও তার প্রাণের শ্রেষ্ঠ প্রযাসের প্রতিরূপ' এই ভাবে গড়াগড়ি দিয়াই ত আসিতেছিল, যার ফলে ঐতিহাসিক হিন্দুসাধনার লক্ষণ যে mysticism তাহা শুধু sensuous হয় নাই, তাহা একেবারে sensualityতে পরিণত হইয়াছিল—লেখকের 'নরত্বমহিমারই' অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। সেই জন্যই রামমোহন তাহা হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। "সত্যকে সুন্দরের রূপেই বাঙ্গালী চিরদিন আরাধনা করিয়াছে।" ইহা ঠিক নহে, অন্ততঃ রামমোহন তাহা দেখেন নাই। তিনি দেখিয়াছিলেন যে বাঙ্গালী সত্যভ্রষ্ট হইয়াই সুন্দরের পূজা করিয়াছে, তাই তাহা অসুন্দরের—কুৎসিতের—পূজাই হইয়াছে এবং সেই জন্যই তাহা তাহার কল্যাণ না করিয়া তাহার অধোগতিরই কারণ হইয়াছে। তবে "যে প্রতিভা পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে সেই একবার বাঙ্গালীকে নূতন স্বপ্নে বিভোর করিয়াছিল, সেই প্রতিভাই উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর ভাব-জীবনে আর এক রূপের সন্ধান পাইল।" সেইরূপের সন্ধানটী কিন্তু রামমোহন পান নাই, পাইয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ। আর তাঁহারা নাকি সেই সন্ধানটী পাইয়াছিলেন কৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণের মধ্যে। "মানবত্বের এই যে নূতন আদর্শ একই কালে দুই যুগন্ধর বাঙ্গালীর চিত্তে স্থান পাইয়াছিল, ইহা হইতে আমরা বাঙ্গালী জাতির গভীরতম প্রবৃত্তির পরিচয় পাই।" নীলমণি গোস্বামী হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত এত জনের ঘসামাজা সত্ত্বেও যে শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব ঘুচিল না, সেই কৃষ্ণকেই আবার রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত টানিয়া আনিবার দরকার কি ছিল আমরা বুঝিলাম না। তবে তাহা না হইলে বুঝি অবতারত্ব সংঘটন হয় না! কিন্তু দুঃখের বিষয় বিংশ শতাব্দীতে অবতারের অবতরণের তেমন সুবিধা নাই, কাজেই সহজ সরল সাধুপুরুষ রামকৃষ্ণের অবতারত্বের বিড়ম্বনা, একদলের আত্মতৃপ্তির কারণ হইলেও, অনেকের কাছে তাহা বিড়ম্বনা বলিয়াই বোধ হইবে।

মানবত্বের এই নূতন আদর্শের মধ্যে লেখক বাঙ্গালী জাতির গভীরতম প্রবৃত্তির যে পরিচয় পাইয়াছেন তার সহিত রামকৃষ্ণের কামিনীকাঞ্চনত্যাগ ও বিবেকানন্দের সন্ন্যাসের কিছু সম্বন্ধ আছে কি? এই কামিনীকাঞ্চনত্যাগ তথা সন্ন্যাসও কি বাঙ্গালী জাতির রক্তের ধর্ম্ম, না, বাঙ্গালী জাতির নিয়তি? না, ওগুলি তাঁদের ব্রাহ্মণ্যসংস্কার মাত্র? এ যে উনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যযুগের পুনরভিনয়! তিনি বৌদ্ধ খৃষ্টীয় প্রভৃতি ধর্ম্মের ইতিহাসের কথাও বলিয়াছেন, কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ তথা সন্ন্যাসরূপ অস্বাভাবিক জীবনযাপনের ব্যবস্থা কিরূপ কদর্য্যরূপে বার বার ঐসব ধর্ম্মের ইতিহাসকে মসীলিপ্ত করিয়াছে তাহাও তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

তিনি অরবিন্দকে 'বাঙ্গালী' বলিবেন কি 'আর্য্য' বলিবেন জানি না। শুধু "ভাবে" যে চলে না, সেই বিষয়ে তাঁহার কয়েকটী উক্তি তুলিয়া দিতেছি—

"কাজতো কেবল দারিদ্রনারায়ণের সেবা নয়, আর বন্যায় দেশ ডুবে গেলে, ঘরে ঘরে দুমুঠা চাউল বিলান নয়। শুধু ঐসব করে' নিখুঁত সৃষ্টি কিছু গড়ে' উঠবে না।"

"..... পূর্ণ জ্ঞান না এলে স্থায়ী কিছু বড়' ওঠা যাবে না।... ...কর্ম্ম ও ভক্তি বাংলার মাটীর গুণ, মানুষের দোষ এক্ষেত্রে কিছু নেই; সেইজন্য মাঝে মাঝে এই দুটোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জ্ঞানের সাধনা করতে হবে। বাংলায় ক্ষাত্রত্বই ফুটে উঠেছে—কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের পরিস্ফুরণ এখনও হয়নি। তোমরাও আজ কর্ম্মোন্মাদ হ'য়েছ, ভক্তির প্রবাহে হাবুডুবু খাচ্ছ—কিন্তু জ্ঞানের অভাবে সব যে ব্যর্থ হবে।"

"ভক্তি আর কর্ম্ম সৃষ্টির উৎস নয়। চাই জ্ঞান, বাংলায় জ্ঞানের সাধনা প্রধান ক'রে তুলতে হবে।...জ্ঞান না এলে বৃহৎ সৃষ্টি অসম্ভব, জ্ঞানেই ভগবানকে অনন্তভাবে অবধারণ করা যায়, অনন্ত বৈচিত্র্য, একত্র সমাহার না করতে পারলে ক্ষুদ্র সৃষ্টিই অনিবার্য্য হয়ে উঠে।..... তোমরা বৃহৎ হও, জ্ঞানকে পুরোভাগে ধারণ কর।"

বাঙ্গালী যে একান্ত ভাববিলাসী নয় এবং একটা সুবিচারিত সত্যের কঠিন বন্ধনে যে তাহার মনও সত্যই ধরা দিতে পারে, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ, অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্র, মহেন্দ্রলাল সরকার, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র, শিবনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, অরবিন্দ প্রভৃতিই তার অকাট্য দৃষ্টান্ত।

যে বেদান্ত রামমোহন সমগ্র জীবন দিয়া প্রচার করিলেন, বিবেকানন্দ রামমোহনের পদানুসরণ করিয়া সেই বেদান্তই সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত প্রচার করিলেন এবং সেখানে বেদান্ত-সমিতি, বেদান্ত-মঠ প্রভৃতিও স্থাপন করিলেন, কিন্তু লেখকের ভাবের বিচারে রামমোহনের বেলায় তাহা হইল সম্পূর্ণ আর্য্যসংস্কৃতি,

আর বিবেকানন্দের বেলায় তাহা হইল তাঁহার সংস্কার মাত্র! আর সেই কারণেই রামমোহন অবাঙ্গালী ও পর, এবং বিবেকানন্দ খাঁটি বাঙ্গালী ও আপনার জন; কেন না, "তাঁহার (বিবেকানন্দের) প্রধান লক্ষ্য ছিল, জাতিকে ধর্মবিশ্বাসী নয়, আত্মবিশ্বাসী করিয়া তোলা। তিনি জানিতেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে, কারণ The soul may be trusted to the end. এইজন্য রামমোহনের মত সংস্কারপ্রবৃত্তি থাকিলেও—পাছে জাতির নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়, এ জন্য তাহার সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রাণের আকূতির দিকটাকে তিনি শ্রদ্ধা করিয়াছিলেন, পূজা পার্ব্বণ, ব্রত উপবাস, তীর্থযাত্রাদির মধ্যে যেখানে যেটুকু প্রাণের সত্য রহিয়াছে সেখানে বুদ্ধিভেদ ঘটিতে দেন নাই।" "তাহার (জাতির) প্রাণের ভুল ও অভ্যাসের মোহ—এ সকলের প্রতি তাঁহাদের (বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের) একটী শ্রদ্ধা ও মমত্ব বোধ ছিল; এক কথায়, তাঁহারা জাতিরই একজন হইয়া তাহারই ভাবনা-ভার লইয়াছিলেন।"

আমরা এখানে ধর্মবিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্যটা ভাল বুঝিলাম না। আত্মবিশ্বাস বাদ দিয়া ধর্মবিশ্বাসটা কিরূপ? আর, তিনি বিবেকানন্দকে পুরাপুরি আত্মবিশ্বাসী বলিয়া যেরূপ ঘোষণা করিয়াছেন সেই বিষয়েও ঐ উক্তিকেই আমাদের গভীর সন্দেহ জন্মিয়াছে, কারণ, তাহা হইলে জাতি বা ব্যক্তি সম্বন্ধেই হউক বুদ্ধিভেদের কোন আশঙ্কাই মনে জাগিত না, তাহা হইলে জাতির প্রাণের ভুল ও অভ্যাসের মোহের প্রতিও এমন শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ থাকিত না। জগতের মহাপুরুষেরা কোনরূপ বুদ্ধিভেদের ভাবনা কখনই ভাবেন নাই, তাঁহারা জানিতেন সত্যের জয় হইবেই হইবে, এবং সেইজন্যই তাঁহারা কোন অসত্য, অন্যায় বা ভুলের প্রতি বিন্দুমাত্র দরদ ত দেখানই নাই, কিন্তু অতি তীব্র ও জ্বলন্ত ভাষায় তার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং যাহা সত্য বলিয়া অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাই সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে প্রচারও করিয়াছেন; আর তাহাতেই জগতের কল্যাণও হইয়াছে। রাজার সহিত বিবেকানন্দ প্রভৃতির পার্থক্য এইখানেই। রাজার জাতির প্রতিই মমত্ববোধ ছিল—জাতির কোন ভুল বা অভ্যাসের মোহের প্রতি তাঁহার কোনই মমত্ববোধ ছিল না। রাজার মমতা অন্ধ ছিল না, তাহা যথার্থ কল্যাণই দেখিয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, নানা ভুল ও মোহই জাতির আত্মাকে মৃত্যু-পাশে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে হইবে—নইলে বিনাশ ছাড়া গত্যন্তর নাই। সেজন্য মোহান্ধ ও আতুরে মায়ের মত, পাছে সন্তানের দেহে ব্যথাটুকু লাগে এই ভয়ে, মৃত্যুর নাগ-পাশে আবদ্ধ সন্তানের দেহ হইতে তাহা কঠিন আঘাতে ছিন্ন করিতে তাঁহার প্রাণে একটুও দরদ লাগে নাই এবং সেই কার্য্যের জন্য জ্ঞানের ক্ষুরধার অস্ত্রেরই একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল—যার অভাব প্রায় একশত বৎসর পরেও অরবিন্দ এমন তীব্র ভাবে অনুভব করিয়াছেন। যিনি হিন্দুর পরম ধন ব্রহ্মজ্ঞানকে নবযুগের উপযোগী করিয়া এ দেশে ও জগতে জলদগম্ভীর স্বরে প্রচার করিলেন, যিনি হিন্দুর হইয়া খৃষ্টধর্মের আক্রমণ হইতে হিন্দুদের রক্ষা করিলেন এবং যিনি দেশের কল্যাণের জন্য সমগ্র দেহ মন প্রাণ, অর্থ বিত্ত সমুদয় আনন্দের সহিত বিসর্জ্জন করিলেন, তিনি জাতির আপন ছিলেন কি পর ছিলেন, ইহা যাহারা বুঝিতে পারে না তাদের বুদ্ধি বিবেচনা সম্বন্ধেই সন্দিহান হইতে হয়।

এই দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণসম্পাদনে রাজার নানারূপ চেষ্টা লেখকের নিকট রাজার একশত বৎসর পরেও অসাধ্য-সাধন মনে হইতে পারে, কিন্তু তিনি সেই অসাধ্যসাধনই করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার সকল গ্রন্থি খুলিয়া একটী গ্রন্থি বাঁধিয়া দিতে চাওয়া নয়—সকল গ্রন্থির মধ্যে গ্রন্থি যে কেবল একেরই, ইহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া এবং উদাত্তস্বরে জগতে ঘোষণা করা। আর এই কাজটী তিনি শুধু তত্ত্বের দ্বারা করেন নাই, তিনি করিয়া গিয়াছেন ব্রহ্মোপাসনাপ্রতিষ্ঠা ও লোক-শ্রেয়ঃসাধন দ্বারা। এই অক্ষয় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই লেখক যেমন আক্ষেপ করিয়াছেন—"গত ১০।২৫ বৎসরের মধ্যে তাঁদের (বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের) এই সাধনা-সূত্র যেন কতকটা ছিন্ন হইয়াছে, আধুনিকতম বাঙ্গালীর চিত্তক্ষেত্রে তাঁহাদের সেই ভাব-প্রতিমা যেন ম্লান হইয়া আসিয়াছে"—রামমোহনের সাধনা সম্বন্ধে তেমন হয় নাই, দিন দিন তাহা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়াই উঠিতেছে এবং দেশ ক্রমেই তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া চলিয়েছে।

যে রামমোহনকে না হইলে শুধু বঙ্কিম বিবেকানন্দ নয়, এ যুগের কোন বাঙ্গালীই তাহার বাঙ্গালীত্বের কোন প্রতিষ্ঠা-ভূমি পাইতেন না, তাঁহার মধ্যে বাঙ্গালীয়ানা না থাকিলেও বাঙ্গালীত্ব পরিপূর্ণরূপেই ছিল। জ্ঞানপন্থী হইয়াও যথার্থ বাঙ্গালীই তিনি ছিলেন। তাই এই সেই দিনও বঙ্গীয় হিন্দু-সম্মিলনের সভাপতিরূপে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় "নবযুগে বঙ্গমনীষার বরণীয় আদর্শ" বলিয়া রাজার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করিয়াছেন।

প্রেম তাঁহারও ছিল; কারণ, প্রেম হইতেই প্রকৃত সেবার আকাঙ্ক্ষা জন্মগ্রহণ করে। তিনি প্রিয়কার্য্য বা লোকশ্রেয়ঃকে ভগবানের উপাসনা বলিয়াই জানিতেন এবং তাঁহার সর্ব্বস্ব দিয়া তাহা করিয়াও গিয়াছেন। তাঁহার মত প্রেমিক প্রাণ কমই দেখা গিয়াছে। কি স্বদেশে কি বিদেশে দেশের কথা মনে হইলেই তাঁর চক্ষু হইতে দর দর ধারায় অশ্রু বিগলিত হইত। এই অশ্রুধারা বিগলিত স্নেহধারা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু তিনি শুধু বাঙ্গালা ও ভারতের ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশ্বের। কি অপরিমেয় প্রেম, কি বিশাল হৃদয়ই তাঁহার ছিল, যাহা সর্ব্বদেশ ও জাতির দুঃখে অভিভূত হইত এবং আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইত! বিশ্বের চৌমাথায় তিনি ছিলেন উন্নতশির বিরাট আলোকস্তম্ভের ন্যায়—যেখানে দিকে দিকে প্রসারিত বড় বড় সভ্যতার পথগুলি আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। তাই তাঁহার পূজা ছিল ভূমার—ব্রহ্মের—উপাসনা, এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য ছিল লোকশ্রেয়ঃ বা আর্ত্তবিশ্বমূর্ত্তিরই সেবা। আর রাজার প্রতিভা যে শুধু প্রতিভাই রহিয়া যায় নাই, তাহা যে জাতির চিরমুক্তির পথ নির্দেশ করিয়া জাতির মুক্তির পথ নির্ম্মাণও করিয়া গিয়াছে, ব্রাহ্মসমাজ ও দেশের গত শত বর্ষের ইতিহাসই

তার জীবন্ত প্রমাণ। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে—

"রাজা হিন্দু জাতির, হিন্দু-সমাজের, হিন্দুর শিক্ষা দীক্ষা সাধনার মধ্যে যে অমর প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছেন, তাহা কালের সঙ্গে গুণান্বিত সমগ্র জাতিকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, সে অমর বীর্য্য ধ্বংশ হইবার নহে।"—মতিলাল রায়।

"রাজা রামমোহন রায় নবযুগের প্রবর্ত্তক। তিনি যে বিপ্লবের সূচনা করেন তাহা মানসিক বিপ্লব। সে আন্দোলন ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করিয়া এ দেশে আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। সেই পরিবর্ত্তনের ফল—নূতন সাহিত্য, মনের নূতন বিশ্বাস, সমাজের নূতন গঠন, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে নূতন জীবন—এক কথায়, ভারতের নূতন সভ্যতা।"—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"অতীতের যুগ হইতে, প্রাচীনতা হইতে, আধুনিক যুগের মুক্ত আলোক বাতাসে তিনিই (রামমোহনই) সর্ব্বপ্রথম দেশের চেতনাকে টানিয়া আনিয়াছেন, নূতন যুগের নূতন ধর্ম্মে প্রথম দীক্ষা দিয়াছেন; তাঁহারই মধ্যে সকল ভবিষ্যৎ-সৃষ্টির বীজরূপ দেখা দিয়াছে—তাঁহার প্রজ্ঞায় যে একটী ভাব-ঘন চৈতন্যকণা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই ক্রমে লতা পাতা ফুলে ফলে মুঞ্জরিত বিকশিত হইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, ভাষা প্রভৃতি জাতির সমষ্টিগত জীবনের প্রধান যত ক্ষেত্র, সর্ব্বত্র তিনি আনিয়া দিয়াছেন একটা নূতন জন্ম, নূতন জীবন, নূতন সৃষ্টি। দেশের ভাবী সার্থকতার মূল ছক তিনিই আঁকিয়া গিয়াছেন।......তিনিই আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন মূলসূত্র সব—পরবর্ত্তী কালের স্রষ্টারা তাহাকেই পাকা বনিয়াদরূপে গ্রহণ করিয়া তবে নূতন নূতন গঠনের আয়োজন করিয়াছেন।"—নলিনী গুপ্ত।

"......রামমোহন ভারতে একটী আকস্মিক উপদ্রব নহেন—তাঁহার পূর্ব্বে যুগে যুগে যুগধর্ম্মের মন্ত্রে দীক্ষিত মহাপুরুষেরা ভারতের সাধনাকাশে উদিত হইয়াছেন। সর্ব্বতোভাবে বিচিত্র এই মহাযুগের প্রারম্ভে এত বড় বিরাট ও সমস্যাবহুল যুগের উদ্বোধক প্রবর্ত্তক ও যুগধর্ম্মসাধনার মহাগুরু রামমোহনের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সাধনা-গুরু সকল মহাপুরুষেরই সার্থকতা, তাঁহাতেই সকল পূর্ব্বগুরুর পরিপূর্ণতা।"—ক্ষিতিমোহন সেন।

শ্রীঅনঙ্গমোহন রায়।

সাগর-বাণী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৭)

কিসের টানে যেন দিশাহারা হ'য়ে সাগর অমন ক'রে ছুটে চলেছে—তার গতিরোধ করে কার সাধ্য—উন্নতশির পর্ব্বতও তার সম্মুখে পড়িলে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যায়—যতই বাধা পায় সাগর ততই উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আরও প্রবল বেগে চলিতে থাকে। কিন্তু ভূমি কেবলই তাহাকে কোল পাতিয়া দেয়—আর সাগর এই কোমল ব্যবহারে শান্ত হইয়া ফিরিয়া যায়। ঐ দুর্জ্জয় আকর্ষণে তার ত স্থির থাকার যো নাই—পর মুহূর্ত্তেই সে আবার দৃঢ়তর সংকল্প লইয়া ছুটে আসে—তাকে যে যেতেই হবে—তাকে যে পেতেই হবে।

তেমনি ক'রে শুভ মুহূর্ত্তে প্রেম যখন প্রাণ অধিকার ক'রে বসে, কা'র সাধ্য তাকে স্থির রাখে—বরং যতই বাধা পায় ততই সে আরও অদম্য হইয়া উঠে। ক্ষুদ্র মানবপ্রাণ এই অসীম বস্তুকে ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া বলিয়া উঠে, "তোমার প্রেমের ভার সহিতে পারি না যে গো আর"—আর অমনি "লজ্জা ভয় ত্যজিয়ে আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে" নৃত্য আরম্ভ ক'রে—এ দৃশ্য কি মধুর! এ ভাবের ভাবুক যে নয় সে ইহার ভিতর কেবল মাদকতা ও বহির্ম্মুখীনতাই দেখিবে—আর বে-রসিক জন ইহা'তে শ্লীলতার অভাব দেখিয়া ঘৃণায় দূরে পলায়ন করিবে। প্রেম ত কোন বাঁধা-বাঁধির মধ্যে থাকিবার বস্তু নয়—ইহাকে গণ্ডীর ভিতর রাখিতে গেলেই ইহার মরণ।

(৮)

ঐ টানে সাগরের জলরাশি সর্ব্বত্র কি প্রবল বেগেই অনুক্ষণ কম্পিত হইতেছে—ইহার যেন আর ক্লান্তি নাই—আকর্ষণ যতই জোরে হইতে থাকে তার উল্লাসও ততই বেড়ে যায়—আর ঢেউগুলি তালে তালে একটার উপর একটা গড়াইয়া যেয়ে পড়ে—তখন যদি কোন বাধা পায়, অমনি বেতাল নৃত্য আরম্ভ করে।

তেমনি ভগবৎ কৃপায় প্রেম প্রাণে প্রবেশ করিলে, দেহ ও মনের ভিতর কি অপূর্ব্ব পুলকই সঞ্চারিত হয়—দেহ আর তখন রক্ত মাংসের থাকে না—উহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন সুধাধারা প্রবাহিত হয়—অণুতে অণুতে মধুর স্পন্দন হইতে থাকে, আর মন তখন এ মর্ত্ত্যলোক ছাড়িয়া যেন এক সঙ্গীতের রাজ্যে বিচরণ করে—তার সকল চিন্তা সকল কল্পনা স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হইয়া যায়। এ প্রেমে নাই বিকার, নাই বিরহ—কেবলি প্রিয়তমের সঙ্গে হৃদয়-নিভৃতে ওতঃপ্রোতঃ মাখামাখি। কোন অন্তরায় বা আবরণ তখন একেবারেই অসহ্য।

(৯)

অখণ্ড জলরাশি উন্নতভূমিদ্বারা স্থানে স্থানে বিভক্ত হইয়া মহাসাগর, সাগর, উপসাগর ইত্যাদি বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে। কিন্তু ইহারা ত এরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবার নয়—তাই নানা দিক দিয়া নানা উপায়ে পুনর্ম্মিলিত হওয়ার জন্য নিয়ত ছুটাছুটি করে—এই মিলনই ইহাদের লক্ষ্য—যে পর্য্যন্ত ইহা লাভ না হয় ইহাদের চেষ্টার কিছুতেই বিরাম নাই। ভূমিই যে ইহাদের অন্তরায়—তাই সাগরজলের ইহার উপর এত আক্রোশ। কঠোর আঘাতে যদি এক জায়গায় ভাঙ্গিয়া দেয়, চূর্ণীকৃত বালুকণাগুলি মথা নীচু ক'রে ভেসে ভেসে অন্যত্র যেয়ে স্তূপীকৃত হ'য়ে জেগে উঠে। এই ভাবে সে জলকে বারংবার বাধা দিতে থাকে।

আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মাগুলি সেই অখণ্ড পরমাত্মারই খণ্ড খণ্ড প্রকাশ—শরীর ও সংসার ইহাদিগকে কেমন বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে চায়। আমরা এই আবরণ দ্বারাই একে অন্য হ'তে পরস্পর পৃথক হইয়া রহিয়াছি—পরমাত্মার সঙ্গে যে আমাদের অচ্ছেদ্য যোগ তাহাও সকল সময় উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু স্বভাবতঃই মানবপ্রাণ একে অন্যকে চায়—তাই দৈহিকত্ব ও ঐহিকত্বার বন্ধন ছিন্ন করিয়া সে ঐ মিলনের জন্যই নিয়ত ধাবিত হইতেছে—আমাদের যত অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, যত্ন প্রয়াস ও প্রচেষ্টা, সকলেরই ঐ একই লক্ষ্য—পরকে আপন করা,

পরের ভিতর আপনাকে পাওয়া, আপন পর ভেদ ভুলিয়া যাওয়া। সজ্ঞানে অজ্ঞানে সে এই মুক্তিরই প্রয়াসী। চতুর্দ্দিক হ'তে তার কত বিঘ্ন ও বাধা—একটাকে যদি অতিক্রম করা য'য় আর একটা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়—এ সংগ্রামের কখনও শেষ নাই। প্রেমময় দেবতা প্রত্যেকের আত্মায় নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া অনুক্ষণ এই খেলাই খেলিতেছেন—অনন্ত তিনি, অনন্তকালব্যাপী তাঁর এই প্রেমের লীলা। ইহার ভিতরই মানবের সকল আশা নিরাশা, জয় পরাজয়, উত্থান পতন, সুখ দুঃখ।

পরলোকগত গগনচন্দ্র হোম

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমাদের "দাদামহাশয়" শরচ্চন্দ্র রায় সময় সময় ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতায় আসিলে আমাদের ৫০ নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। তাঁহার আগমনে আমাদের বাসাবাটী আনন্দভবনে পরিণত হইত। তাঁহারি উদ্যোগে ও শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেনের সাহায্যে "ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউসন"-এর প্রতিষ্ঠা হয়। সেই উচ্চ-শ্রেণীর বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান নাম—সিটি কলেজিয়েট স্কুল, ময়মনসিংহ শাখা। এই স্কুলের মন্ত্রণা-সভাতে আমি ছিলাম না,—তবে প্রতিষ্ঠার দিনে আমাকে কলিকাতা হইতে যাইয়া উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল, আমাকেই ছাত্র-ভর্ত্তির কার্য্য করিতে হইয়াছিল। সে দিনের আনন্দ, উৎসাহ বড়ই সুন্দর স্মৃতি। তাহার পর যখন অনাথবন্ধু গুহ মহাশয় সেই স্কুলের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন, "দাদামহাশয়" ও বন্ধুবর অমরচন্দ্র দত্তের অনুরোধে, আমাকেই ঐ বিদ্যালয়ের ভার সিটিকলেজের হস্তে ন্যস্ত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। আনন্দমোহন বসু এবং উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয় তখন এ-ব্যাপারে সাহায্য ও সহানুভূতি না করিলে আমার কৃতকার্য্যতা লাভ অসম্ভব হইত। ময়মনসিংহ জেলায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের অভিপ্রায়ে ও কলিকাতা-সহরে ময়মনসিংহের অধিবাসীগণের পরস্পরের মেলামেশার সুযোগ ব্যবস্থা করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে যখন "ময়মনসিংহ সম্মিলনী"র প্রতিষ্ঠা হয়, তখন আমি তাহার উদ্যোগকর্ত্তাদের একজন ছিলাম। বহু বৎসর আমাকে সম্মিলনীর সম্পাদকের কাজ করিতে হইয়াছিল।

যখন সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে ছিলাম, তখন আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার একজন উৎসাহী সভ্য। সে সময়ে উক্ত সমাজের মন্দিরে গোস্বামী-মহাশয় প্রাতে আর শাস্ত্রী-মহাশয় রাত্রিতে আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। উভয়ের উপাসনাই অতি লোভনীয় জিনিষ ছিল। তথাপি রাত্রিতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে ব্রহ্মানন্দের উপাসনাতে যোগদানের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতাম না। তখন তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ "জীবন-বেদ" বিবৃত করিতেছিলেন। কেশবচন্দ্রের আরাধনা, প্রার্থনা ছিল,—যেন মায়ের সঙ্গে ছেলের কথোপকথন।

৫০ নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে থাকাকালীন একদিন, উপাসনান্তে ব্রহ্মমন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া, পরেশনাথ সেন ও আমি আহারে বসিয়াছি, এমন সময় প্রমদাবাবু বলিলেন,—শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট একটি মেয়ে ভবানীপুর হইতে এই মর্ম্মে একখানা চিঠি লিখিয়াছে যে,—সে এক রক্ষিতা পতিতা নারীর কন্যা, অল্প বয়সে তাহাকেও মাতার পথাবলম্বিনী হইতে হইয়াছে; তাহার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী আছে, সে তখনও পাপের পথে যায় নাই;—তাহাকে যদি ব্রাহ্মসমাজ আশ্রয় দিয়া পাপের পথ হইতে রক্ষা করেন। প্রমদাবাবুর প্ররোচনায় আমরা আহারান্তেই ভবানীপুরের দিকে চলিলাম—তখন বোধ হয় রাত্রি ১০টার কম নয়। তিনজনে চৌরঙ্গি পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গিয়া একখানা গাড়ী পাইলাম; তাহাতে চড়িয়া ভবানীপুরে সাউথ সুবার্ব্বন্ কলেজের পূর্ব্ব দিকে, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের বাসাবাটীতে উপস্থিত হইলাম,—তখন রাত্রি প্রায় ১২টা। অনেক ডাকাডাকির পর, কাহারও সাড়া না পাইয়া, আমরা তিনজনে আঙ্গিনার প্রাচীর টপ্‌কাইয়া বাড়ীর দরজায় ঘা দিলাম। এত রাত্রিতে বিপিনবাবু আর তাঁহার স্ত্রী নিত্যকালী দেবী আমাদের দেখিয়া অবাক ও স্তম্ভিত হইলেন। আমাদের এই অভিযানের উদ্দেশ্য জানিয়া, পরদিন প্রাতে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের ব্যবস্থা করিয়া, বিপিনবাবু আমাদের তাঁহারই গৃহে রাত্রি যাপন করিতে বলিলেন। প্রত্যুষে স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত (এখন রায় বাহাদুর) যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ-মহাশয়ের নিকট বিপিনবাবুকে সঙ্গে করিয়া যাওয়া গেল,—পথে পরলোকগত শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তীকেও জোটান হইল। যোগেনবাবুকে সঙ্গে করিয়া পত্রলেখিকাদের বাড়ীর দরজার নিকট উপস্থিত হইলাম, কিন্তু ভিতরে প্রবেশের সাহস প্রথম কাহারও হইল না। অনেক-ক্ষণ ইতস্ততের পর আমাকেই সর্ব্বাগ্রে বাটীর ভিতর ঢুকিতে হইল,—সঙ্গে প্রমদাবাবু আর শ্রীচরণবাবু আসিলেন। পত্র-লেখিকার সহিত প্রথমে তাহার ভগ্নীর সম্বন্ধে দুই একটি কথা হইল, পরে তাহার ভগ্নীকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইল,—ব্রাহ্মসমাজে আসিতে প্রস্তুত কিনা? বালিকা উত্তর করিল,—"মা আসিতে দিলে আসিব"। সেদিন এ-পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হওয়ার পর আমরা চলিয়া আসিলাম।

চলিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু তখন প্রাণে আতঙ্ক জন্মিল—গাঙ্গুলী-মহাশয়কে না জানাইয়া আমাদের এ-কাজ করা সঙ্গত হয় নাই। না জানি, আমাদের এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তিনি আমাদিগকে কতই তিরস্কার করিবেন। পরদিন আহারান্তে পরেশবাবু তাঁহার কার্য্যস্থান বেথুন স্কুলে গেলেন—আমি, আমার কার্য্যস্থান সিটি কলেজে যাইবার পূর্ব্বেই, গাঙ্গুলী-মহাশয়ের নিকট গেলাম। ভয়ভীতচিত্তে তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি আমাদিগকে ভর্ৎসনা না করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায়, আমাদের অবিমৃষ্যকারিতা স্নেহের চক্ষে গ্রহণ করিলেন, এবং বলিলেন,—"এখন আর আপনারা কিছু করিবেন না, যাহা করিতে হয়, আমি করিব"। আমি ত হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তখন সিটি কলেজে আসিয়া পরেশ-বাবুকে, গাঙ্গুলী-মহাশয়ের সস্নেহ ব্যবহারের কথা জানাইয়া নিরুদ্বেগ করিলাম। পরদিন গাঙ্গুলী-মহাশয় আমাদের দুই একজনকে সঙ্গে করিয়া সেই বালিকার বাড়ী গেলেন, এবং প্রস্তাব করিলেন, যদি তাহার মাতা ব্রাহ্মসমাজের হাতে তাহার ভরণপোষণ ও বিদ্যাশিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন দেন, তবে বালিকার ভার ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিতে পারেন।

বালিকার মাতা তাহাতে স্বীকৃত না হওয়াতে আমরা চলিয়া আসিলাম। পরে ব্রাহ্মসমাজের অনেক শ্রদ্ধেয় বন্ধু বালিকাকে তাঁহার গৃহে আনিয়া লালনপালন করেন ও অপর এক বন্ধুর সহিত মিলিয়া, তাহার বিবাহ দেন। সেই বিবাহের বর আমাদের বাসাবাটী, ৫০ নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, হইতে বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন, আমরা সকলে বরযাত্রী ছিলাম। সেই নারীর একটী কন্যা ও একটী পুত্র জন্মগ্রহণের পর তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়। কন্যাটীর গুণে ও চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া এক সাধু ও সচ্চরিত্র ব্রাহ্মসন্তান তাহাকে বিবাহ করেন। পুত্রটি তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা ও সাধুচরিত্রের বলে ব্রাহ্মসমাজের গৌরব-স্থানীয় হইয়াছে; রাজকার্য্যোপলক্ষ্যে যেখানে যান, সেখানেই লোকে তাঁহার গুণে মুগ্ধ হয়। ব্রাহ্মসমাজের এক সুপরিচিত লোকের সুশিক্ষিতা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে।

৫০ নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে আমি যে-ঘরে বাস করিতাম, তাহার নিকটে আর একটি ঘরে প্রমদাবাবু বাস করিতেন। তিনি সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন। একদিন হিন্দু স্কুলের থিয়েটারে ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছেন; সেই দিনই গভীর রাত্রিতে প্রমদাবাবু আমার ঘরের দরজায় আসিয়া ডাকিলেন,—"শীঘ্র উঠে আসুন"। যাইয়া দেখি, তাঁহার রক্তবমন হইতেছে। দৌড়িয়া গিয়া পরেশবাবুকে ডাকিয়া আনিলাম। প্রমদাবাবুর বিশেষ বন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন। ভয়ে, আশঙ্কায় রাত্রি কাটিল। প্রত্যুষে শাস্ত্রী-মহাশয়কে সংবাদ দেওয়া হইল। ডাক্তার করুণাচন্দ্র সেন মহাশয়কে আনা হইল। তিনি আসিয়া রোগীর বুক পরীক্ষা করিয়া এবং রক্ত দেখিয়া বলিলেন,—"এ রোগে সারিবার নয়"। বিধিমত চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা চলিতে লাগিল, জলবায়ু পরিবর্ত্তন করা হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আমাদের বাসাবাটী হইতে বিপিনবাবু আর তাঁহার স্ত্রী প্রমদাচরণকে তাঁহাদের নিকট লইয়া গেলেন। পরেশনাথ সেন, কালীপ্রসন্ন দাস, উপেন্দ্রকিশোর রায় ও আমি পালা করিয়া রাত্রিতে তাঁহার নিকট থাকিতাম, পাখার হাওয়া করিতাম। প্রমদাচরণ যখন, মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে, খুলনায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনও পরেশবাবু ও আমি তাঁহাকে সেখানে দেখিতে ও সেবাশুশ্রূষা করিতে গিয়াছিলাম,—আমাদের পরস্পরের মধ্যে এমনি সদ্ভাব ও ভালবাসা ছিল। সেই ভালবাসার আকর্ষণে আমরা ক্ষয়রোগে আসন্নমৃত্যু-শয্যাশায়ী রোগীর পাশে, মশারীর মধ্যে বসিয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, পাখার হাওয়া করিতে ভীত বা কুণ্ঠিত হই নাই।

সৌভাগ্যক্রমে আমি ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-মহাশয়ের স্নেহের অধিকারী হইয়াছিলাম। একাধিকবার তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের ও তাঁহার নিজের জন্মস্থান শান্তিপুরে এবং দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট লইয়া গিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরে উভয় ভক্তের প্রেমালিঙ্গন, ভাবাবেশে সমাধি দেখিয়া ধন্য হইয়াছি,—পরমহংসের অমৃতবাণী কর্ণকে পবিত্র করিয়াছে, প্রাণকে শান্ত ও সমাহিত করিয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন পূজনীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। সেদিন প্রাতে, ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসকে অগ্রণী করিয়া, আমরা ৪৫ নং বেণেটোলা লেনের বাড়ী হইতে প্রমত্ত কীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরে আসিয়াছিলাম,—জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ শ্রদ্ধাস্পদ শিবচন্দ্র দেব-মহাশয় মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। সেদিনকার উপাসনা, উপদেশের স্মৃতি এখনও আমার প্রাণে জাগ্রত আছে। সেদিন আমি প্রথম বেদীর পশ্চাৎভাগে বসিতে পাইয়াছিলাম। তাহার পর হইতে বরাবর সেই স্থান আমার উপাসনার পক্ষে বড়ই অনুকূল হইয়া রহিয়াছে। গোঁসাই যে-দিন ১১ই মাঘের প্রাতের উপাসনাতে, বাক্য বন্ধ করিয়া কেবল "মা," "মা" ধ্বনিতে উপাসকমণ্ডলীর প্রাণে গভীর ভাবসঞ্চার করিয়াছিলেন, সেদিন সেই স্থানে বসিয়া আমিও তাঁহার ভক্তিপূর্ণ জীবনের প্রভাব অনুভব করিয়াছিলাম,—তাঁহার ভক্তির বিদ্যুৎপ্রবাহ সেদিন আমার প্রাণেও সঞ্চারিত হইয়াছিল। সেদিন আমার জীবনের এক চিরস্মরণীয় দিন।

সাধক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এক বাড়ীতে চারি বৎসরকাল বাসের সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছিল। তিনি আমার স্ত্রীকে আদর করিয়া "মা" বলিয়া ডাকিতেন, আর তাঁহার স্ত্রী, মাতঙ্গিনী দেবী, তাঁহাকে ডাকিতেন—"শাশুড়ী"। তাঁহাদের কি জীবনই না দেখিয়াছি! সেই জ্ঞানী পুরুষ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জ্ঞানচর্চ্চা ও অধ্যয়নে নিরত থাকিতেন—স্নানাহার ও বিশ্রামে অতি অল্প সময়ই ব্যয় করিতেন। একবার গাড়ী চাপা পড়িয়া তাঁহার একখানা পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, মাসাধিককাল শয্যাশায়ী ছিলেন; তখন তিনি কি যে ধৈর্য্য, বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছিলেন বলিতে পারি না; যাতনায় অস্থিরতা নাই, বিধাতার বিধানে অটল নির্ভর। চিরদিন দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিয়াছেন,—একদিনের জন্যও তাঁহার কিম্বা তাঁহার স্ত্রীর মুখ ম্লান দেখি নাই। ঘরে অন্নসংস্থান নাই,—তথাপি ভিখারী আসিলে কখনও ফিরাইতেন না। যৎকিঞ্চিৎ যা-কিছু ঘরে আছে, তাহার সবটুকু দিয়াই তৃপ্তি,—কালকার ভাবনা নাই। স্বামী জ্ঞানে বিভোর, স্ত্রী ভক্তি-প্রেমে অধীরা। ব্রাহ্মসমাজে এমন নরনারী দেখিয়া ধন্য হইয়াছি।

একবার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়দের সঙ্গে আমি ও মহেন্দ্রনাথ মিত্র নগেন্দ্রবাবুর জন্মস্থান বাঁশবেড়িয়াতে গিয়াছিলাম। হাটখোলার ঘাট হইতে প্রাতে ষ্টীমারে যাত্রা করা গেল। যাত্রীতে ষ্টীমার পরিপূর্ণ, আমরা ডেকের উপর কম্বল পাতিয়া বসিলাম। ষ্টীমার খুসুড়ির টেক পার হইয়া গেলেই আমরা ব্রহ্মসঙ্গীত আরম্ভ করিলাম। গোঁসাই আর নগেন্দ্রবাবুর ভক্তিমিশ্রিত সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া যাত্রীদল কোলাহল ছাড়িয়া নিস্তব্ধ হইল,—গোঁসাই উপাসনা করিলেন ও উপদেশ দিলেন; গানের পর গান চলিতে লাগিল। এই ভাবে বাঁশবেড়িয়ার ঘাটে পৌঁছান গেল। আমি আর মহেন্দ্রবাবু মোট মাথায় করিয়া নগেন্দ্রবাবুর বাড়ী চলিলাম। মনে পড়ে, পথে খৃষ্ট-প্রচারক প্যারীচরণ কর মহাশয় জন-

Registered No 65

তত্ত্ব-কৌমুদী

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫২ম ভাগ
১৯শ সংখ্যা।

১লা মাঘ, বুধবার, ১৩৩৬, ১৮৫১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০০
15th January, 1930.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় উৎসবদেবতা, তুমিই তোমার অসীম প্রেমে আমাদিগকে উৎসবদ্বারে ডাকিয়া আনিয়াছ। আমরা যে যথেষ্ট ব্যাকুলতা লইয়া, উপযুক্ত ভাবে প্রস্তত হইয়া, আসিতে পারি নাই, তাহা তুমি দেখিতেছ। আমাদের সকল অযোগ্যতা তুমিই ভাল-রূপে জান। আমরা তাহা সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, অনেক সময় আপনাদের আয়োজন উদ্যোগের উপরই নির্ভর করি,—যেরূপ দীনতা লইয়া তোমার দ্বারে আসিতে হয় তাহা আমাদের অন্তরে থাকে না। তাই আমাদিগকে কত সময় ব্যর্থমনোরথ হইয়া দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইতে হয়। এবার তুমি আমাদিগকে যথার্থ ভাবে প্রস্তত করিয়া লও। আমাদের যে অন্য সম্বল নাই, তোমার কৃপার উপর আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোনও উপায় নাই, তাহা ভাল করিয়া অনুভব করিতে দেও। কত উৎসব আসিল গেল, তোমার কত করুণাস্রোত জীবনের উপর দিয়া বহিয়া গেল, অথচ আমরা প্রায় যেখানকার সেইখানেই পড়িয়া রহিলাম,—আমাদের যেরূপ ভাবে তোমার হওয়া উচিত ছিল এখনও তাহা হইতে পারিলাম না! দিন ত চলিয়া যাইতেছে। তুমি এবার কৃপা করিয়া আমাদের সকল ত্রুটি দুর্ব্বলতা, উদাসীনতা, অবহেলা দূর করিয়া, সমস্ত বাধা বিঘ্ন চূর্ণ করিয়া, আমাদিগকে তোমার প্রেমের স্রোতে ভাসাইয়া নিয়া চল। আমরা চিরদিনের তরে তোমার হইয়া, যথার্থ ভাবে তোমার উৎসব সম্ভোগ করিয়া, ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া যাই। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রত্যেক জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

উৎসবে—ব্রহ্মের উৎসব আস্‌ছে ব'লে কি প্রাণ নেচে উঠ্‌চে? আনন্দে কি প্রাণ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌চে? তাঁর আহ্বান-বাণী কি শুনেছ? তাঁর আগমনের বার্ত্তা কি তোমার কাণে এসে পৌঁছেছে? যদি এখনও প্রাণের তার বেজে উঠে না থাকে, তবে কাণপেতে থাক, উৎকর্ণ হ'য়ে থাক। তিনি কত ভাবে আসেন—

সে যে আসে আসে আসে,
কত কালের ফাগুন দিনে, বনের পথে,
সে যে আসে আসে আসে।
কত শ্রাবণ-অন্ধকারে, মেঘের রথে,
সে যে আসে আসে আসে।

তাঁর জন্য পথপানে চেয়ে থাক, উৎকর্ণ হ'য়ে প্রতীক্ষা কর। তিনি যখন আস্‌বেন, তখন যেন তাঁকে চি'নে নিতে পার, তাঁর বাণী যেন কোলাহল ভেদ ক'রে তোমার কাণে পৌঁছায়। উৎসবের তীর্থক্ষেত্রে, পুণ্য ভূমিতে তিনি আসেন; যেখানে ভক্তগণ তাঁর নাম গান করেন, সেখানে তিনি আসেন; যেখানে ব্যাকুল হৃদয় হ'তে আকুল প্রার্থনা-ধ্বনি উঠে, সেখানে তিনি আসেন; যেখানে পাপগ্রস্ত নর নারী অনুতাপের অশ্রুতে বক্ষ ভাসায়, সেখানে তিনি আসেন। যেখানে দীন হীন কাঙ্গাল হ'য়ে তাঁর করুণার ভিখারীসকল এসে দাঁড়ায়, সেখানে তিনি আসেন। উৎসবে তাই তিনি আস্‌বেন। তাঁকে দেখ্‌বে, তাঁর বাণী শুন্‌বে, তাঁতে আত্মসমর্পণ কর্‌বে, এই আশায় প্রস্তুত থাক, পথপানে চে'য়ে থাক, কাণ পেতে থাক।

মন্দির কি শূন্য?—উৎসবের সাড়া পেয়ে আজ দলে দলে লোক মন্দিরে আস্‌ছে। কত সুন্দর সুন্দর পোষাকে সজ্জিত

হ'য়ে লোক আসছে, কত পুষ্পে পত্রে মন্দির সাজান হয়েছে! কত বক্তৃতা, উপদেশ, সঙ্গীতের বন্দোবস্ত হয়েছে! কত সুন্দর সুন্দর বচন-অঙ্কিত পতাকা উড়ান হয়েছে! সকলের মুখে হাসি, প্রাণে আনন্দ। উৎসব-দেবতা যে এসেছেন। মন্দির কি তাঁর আগমনে নব সৌন্দর্য্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে? কৈ তিনি ত এখনও আস্ছেন না। ঐ দ্বারে কাহারা রয়েছে? ওখানে কোলাহল কেন? ঐ প্রহরী কা'দের বাধা দিচ্ছে! ঐ যে ছিন্ন মলিন বসনপরিহিত ভিখারীর দল—ঐ যে দুঃখে শোকে সারা বছর কেটেছে যাদের তারা—ঐ যে পাপে কলঙ্কিত মোহে অভিভূত যারা তাদের দল—তারাও আজ আশার বাণী শু'নে আসতে চাচ্ছে। তাদের আস্তে দিবে না? তোমরাই মন্দিরে আসবে, দেবতার সিংহাসনপাশে বস্বে, আর ওরা আস্তে পাবে না! তা হ'লে ত পাপীর বন্ধু, দুঃখীর আশ্রয় যিনি, সেই দেবতা এই মন্দিরে আস্বেন না। মন্দির যে শূন্য প'ড়ে থাক্বে। তোমাদের এই যে ধনগর্ব্ব, বিদ্যা-বুদ্ধির গর্ব্ব, সভ্যতার গর্ব্ব, আভিজাত্যের গর্ব্ব, পোষাক পরিচ্ছদের গর্ব্ব, ধার্ম্মিকতার গর্ব্ব, উচ্চপদের গর্ব্ব, এই গর্ব্ব ছাড়িতে হইবে, মাথা নীচু করতে হবে। ঐ যারা আস্তে চাচ্ছে, দীন হীন মলিন যারা, তাদের সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে এক আসনে বস্তে হবে, প্রভুর চরণে। নতুবা তিনি আস্বেন না, মন্দির শূন্য প'ড়ে থাক্বে। ফুল পাতা শুকিয়ে যাবে; সঙ্গীত বক্তৃতা উপদেশ শুষ্ক নীরস হবে; উৎসব ব্যর্থ হবে।

কার স্পর্শ?—নিবিড় অন্ধকার—কিছুই দেখা যায় না, পথ কোন্ দিকে জানি না, জন মানব নাই। কে প্রাণে সাহস দিল? কে নিরাশায় আশা দিল? কার মৃদুস্পর্শ অনুভব করলাম? মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, আকাশে ঘন-ঘটা, সঙ্গী কেহ নাই, তবু ত চল্‌ছি, মরিয়া হ'য়ে চল্‌ছি। কে যেন সঙ্গে সঙ্গে আসছে। দেখ্‌তে পাই না, কিন্তু প্রাণে অনুভব করি, কাহার শ্বাস যেন গায়ে লাগে; কার স্পর্শ যেন আমি অনুভব করছি। এই ভাবেই ত তিনি আসেন। কখন কি ভাবে তিনি আস্‌বেন, তা ত জানা নাই। যখন আমি তাঁকে চাই, তখন হয় ত তিনি আসেন না; যখন নিরাশ হ'য়ে পড়ি, তখন তিনি প্রাণে এসে আশা দেন। যখন একাকীত্ব অনুভব করি, তখন এসে তিনি প্রাণ স্পর্শ করেন। আমি জানি না, আমি বুঝি না; কিন্তু দেখি, কার স্পর্শ যেন পাচ্ছি। কে যেন প্রাণের অন্তস্তলে ছুঁয়ে দিচ্ছেন। তিনিই যে সঙ্গে থেকে এক একবার ছুঁয়ে দেন, ভীত সন্ত্রস্ত প্রাণে আশা জাগ্রত করেন, অভয় বাণী শুনান!

সম্পাদকীয়।

উৎসব দ্বারে—আমরা ত প্রেমময় উৎসব-দেবতার আহ্বানে উৎসবদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু আমরা উৎসবগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভে কৃতার্থ হইতে পারিব, না, আমাদিগকে দ্বার হইতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইবে, সে কথা আমাদিগকে কে নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দিবে? তাঁহার অসীম প্রেম ও করুণা সত্ত্বেও ত অনেক সময় আমাদিগকে আপনার দোষে তাহা লাভে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, প্রথমেই দেখিতে পাইব, আমাদের যদি যথেষ্ট আগ্রহ ও ব্যাকুলতা না থাকে, উৎগ্রীব হইয়া তাহা গ্রহণ করিবার জন্য আমরা সর্ব্বদা প্রস্তুত না থাকি, তবে তাহা কোন্ মুহূর্ত্তে আমাদিগের জন্য আসিয়া চলিয়া যাইবে আমরা জানিতেই পারিব না, সুতরাং সে সুযোগ আমরা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব না। আবার, যদি আমরা অতিরিক্ত ব্যস্ত ও অস্থির হইয়া ধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতে না পারি, আপনার চেষ্টাতেই সেখানে প্রবেশ করিতে চাই, তাহা হইলেও আমাদিগকে নিশ্চয়ই বিফল হইতে হইবে। নিজের শক্তিতে, কৃত্রিম উপায়ে সে রাজ্যে প্রবেশের কোনই সম্ভাবনা নাই। এক দিকে উদাসীনতা অপর দিকে অতিরিক্ত ব্যস্ততা, উভয়ই পরিত্যাগ করিতে হইবে। তদুপরি, আপনার সাধন ভজন শক্তি সামর্থ্যের উপর নির্ভর যে সম্পূর্ণরূপেই ছাড়িতে হইবে তাহা বলা বাহুল্য। কেন না, স্বপ্রকাশ দেবতার প্রকাশ আমাদের আয়ত্তাধীন নহে, আর, যে অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আপনার উপরই সকল নির্ভর স্থাপন করে, সে কখনও কৃপার ভিখারী হইয়া তাঁহার প্রেমের দান গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না, সে জন্য প্রতীক্ষাও করিতে পারে না। নিজেদের দীন হীন অকিঞ্চন বোধ না করিলে, অনুগত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া যায় না, তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করা যায় না; সুতরাং তাঁহার দ্বারা চালিত হইয়া, তাঁহার প্রেমের স্রোতে ভাসিয়া, কল্যাণের পথে অবিরত অগ্রসর হওয়াও সম্ভবপর হয় না। এইজন্যই যাহারা "দীন হীন কাঙ্গালের বেশে" "এক পাশে" বসিয়া থাকে তাহারাই সর্ব্বাগ্রে সে দ্বারে প্রবেশ করিতে পারে। যাহারা পশ্চাতে থাকিতে চায় তাহারাই সকলের আগে যাইতে পারে। যাহারা ত্যাগ করে তাহারাই পায়—একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বার্থপরের স্বার্থই সর্ব্বাগ্রে বিনষ্ট হয়, পরার্থপরের স্বার্থ কিছুতেই নাশ প্রাপ্ত হয় না। কেন না, যে-কাহারও কল্যাণ লাভ হইলেই পরার্থপর ব্যক্তি নিজের কল্যাণলাভ হইল বলিয়া অনুভব করিবে, আর স্বার্থপর ব্যক্তি মনে করিবে, তাহার প্রাপ্য অংশটাই যেন অপরে পাইয়া গেল, তাহা না হইলে যেন সে আরও অনেক পাইতে পারিত; সুতরাং সে কিছু পাইলেও তাহাতে আর তৃপ্ত হইতে পারে না, তাহার অতৃপ্তি কিছুতেই বিদূরিত হয় না,—বরং অনেক সময় ঈর্ষা ও অপ্রেমে দগ্ধ হইয়া সে অশান্তিই ভোগ করে। স্বার্থপর ব্যক্তির হৃদয়ে প্রেম থাকিতে পারে না। যে শুধু আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত, তাহার মধ্যে আর প্রেম থাকিবে কি প্রকারে? আর, যাহার মধ্যে অপরের জন্য, আপনার ভাই বোনের জন্য প্রেম নাই, ভালবাসা নাই, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের জন্য প্রেমই বা আসিবে কি প্রকারে? তাহা কোনও প্রকারেই সম্ভবপর নহে। প্রেম ভিন্ন প্রেমময়ের সঙ্গে যে যোগের অন্য কোনও উপায় নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই জন্যই প্রেমময়ের নিকট যাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রেমই একান্ত আবশ্যক। সে প্রেম বলিতে মানব-

-প্রেম ও ঈশ্বরপ্রেম উভয় প্রকার প্রেমই বুঝিতে হইবে। এই জন্যই ভক্ত গাহিয়াছেন "প্রেমের অনলে নিজে না দহিলে সে দ্বারে পশিতে পারে না। (জেনো জেনো মনে)" কাজেই হৃদয় হইতে সর্ব্বপ্রকার অপ্রেম দূর না করিয়া উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে কোনও প্রকারেই সে দ্বারে প্রবেশ করিতে পারিব না, সত্য উৎসব, পূর্ণ উৎসব, সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইব না। শুধু অপ্রেম নয়, সকল প্রকার মলিনতা দূর করিয়া শুদ্ধ পবিত্র হইয়াই পবিত্রস্বরূপের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। মলিন পঙ্কিল মনে তাঁহার পূজা করা যায় না। সাধক জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই গাহিয়াছেন,"মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে পূজিব তোমায়? পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়?" আমরা যে সম্পূর্ণরূপে পাপমলিনতামুক্ত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিব, তাহার কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না। কিন্তু তাহা না পারিলেও অন্ততঃ এই বেদনার ভাবটি লইয়া না আসিলে যে চলিবে না, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অপর দিকে, প্রাণে এই ভাবটি জাগিলে তৎসঙ্গে হৃদয়ে স্বভাবতঃই অনুতাপের আগুন জ্বলিবে এবং সে আগুনে পাপরাশিও বহু পরিমাণে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। সুতরাং উৎসবদ্বারে প্রবেশ করিতে হইলে, আমাদের সমস্ত পাপ মলিনতা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত চিত্তেই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইবে। আমরা যে শুধু আত্মচিন্তা ও আত্মপরীক্ষার দ্বারা হৃদয়ের সকল গোপন পাপ ধরিতে পারিব তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই। তাহাদের অনেকগুলি এত সূক্ষ্ম আকারের হইয়া থাকে যে, আমরা তাহা কিছুতেই ধরিতে পারি না। সে জন্য আমাদিগকে তাঁহারই নিকট হৃদয়ের প্রার্থনা লইয়া উপস্থিত হইতে হইবে।"কেড়ে লও, কেড়ে লও,আমারে কি দা'য়ে, আমি যার লাগি' যেতে নারি তোমার ঐ আলয়ে"—এই প্রার্থনা যদি আমাদের হৃদয় হইতে সরল ভাবে উদিত হয়, তবে দেখিতে পাইব তাহা নিশ্চয়ই সফল হইবে, সকল বাধা বিঘ্ন তাঁহার কৃপায় আপনা হইতেই বিদূরিত হইবে, উৎসবদ্বারে প্রবেশ করা সহজ হইয়া যাইবে। সুতরাং আমাদের নিরুৎসাহ বা নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। আমরা প্রার্থনাপূর্ণ হৃদয়ে, দীনহীন কাঙ্গালের বেশে, দ্বারে উপস্থিত হইয়া, আশা ধৈর্য্য ও নির্ভরের সহিত এক পাশে বসিয়া থাকি, অনন্যগতি ও অনন্যশরণ হইয়া তাঁহার হাতে আপনাদিগকে অর্পণ করি। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইবে না। করুণাময় পিতা আমাদিগকে সে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন এবং সেভাবে প্রস্তুত করিয়া লউন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের সকলের জীবনে জয়যুক্ত হউক। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

চিন্তার ভয় ও হৃদয়ের অভয়।

চিন্তার স্বভাবই এই যে তাহা মানুষের মনে নানা প্রকার সংশয়ের উদয় করে। বিশেষতঃ যিনি চিন্তার অগম্য, সেই অনন্ত পরমেশ্বরের বিষয়ে ভাবিতে গিয়া মানব-চিন্তা অনেক সময়ে ভয় সংশয় ও সঙ্কোচের মধ্যে পড়িয়া যায়। মানুষকে কেবল যদি চিন্তার আলোকে ঈশ্বরের মুখ দেখিতে হইত, তবে আমরা তাঁহার কি প্রকার মুখ দেখিতে পাইতাম, তাহা জানি না। তিনি দয়া করিয়া হৃদয়ের আলোকেও তাঁহার মুখ দেখিবার অধিকার আমাদিগকে দিয়াছেন। তাই চিন্তা হইতে উত্থিত অনেক ভয় দূর হয়, অনেক সংশয় নিরস্ত হয়, অনেক সঙ্কোচের স্থলে সাহসের উদয় হয়।

অনন্ত।

ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞানময়, অনন্ত শক্তিময়, অনন্তক্রিয়াবান্। তিনি তাঁহার অনন্ত সৃষ্টির অনন্ত ব্যাপারে নিরন্তর ব্যস্ত। তাঁহাকে এত বড় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চালাইতে হয়। তিনি এমন সকল মহানিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যাহার ক্রিয়া কোটি কোটি যোজনে কোটি কোটি বৎসরে প্রসারিত হইবে। যাহাতে প্রতি নিমেষে, প্রতি অণুতে, সেই সকল মহানিয়মের কার্য্য অমোঘ ভাবে সম্পন্ন হয়, তাহার লেশমাত্র ব্যতিক্রম না হয়, সেদিকে তাঁহাকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। এইরূপে যাঁহাকে সমগ্র জগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হয়, তিনি কি আবার বিশেষ ভাবে এক এক করিয়া প্রত্যেক মানুষের সুখ-দুঃখের খোঁজ লইতে পারেন, ও তাহার জন্য ব্যবস্থা করিতে পারেন? আমি কীটাণুকীট; আমি কোথায় পড়িয়া আছি! আমার দুঃখের বেদনা বুঝিবার জন্য কি সেই অনন্তস্বরূপ মন দিতে পারেন? মানবের চিন্তা এই ভাবে ঈশ্বরের অনন্ততা ও আপনার ক্ষুদ্রতা অনুভব করিয়া যেন ভীত ও নিরাশ হইয়া পড়ে।

কিন্তু মানুষের হৃদয়ের কথা অন্যরূপ। হৃদয়ের দাবী অনেক অধিক; হৃদয়ের সাহসও অনেক অধিক। সে অনন্তকে দেখিয়া ভয়ে ফিরিয়া আসে না। সাধারণ আলোক যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না এমন বস্তুকেও আজকাল বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত অভিনব রশ্মিসকল বিদ্ধ করিতেছে। মানুষ তাহার হৃদয়ের আলোককে যেন বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত সেই অদৃশ্য নূতন রশ্মির ন্যায়, অনন্তের মর্ম্মস্থান পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিয়া দেখিবার আশায় তুলিয়া ধরে। চিন্তার আলোক যেন ব্রহ্মস্বরূপের উপরিভাগ মাত্র আলোকিত করিয়া ফিরিয়া আসে; হৃদয়ের আলোক যেন ব্রহ্মস্বরূপের মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া অনন্তের হৃদয়কেও দেখাইয়া দেয়।

হৃদয় বলে,—"এ কি সম্ভব যে তুমি আমার পিতা হবে না, মা হবে না, আমার সুখ-দুঃখকে তুমি তুচ্ছ ক'রে যাবে? তুমি শুধু অনন্ত স্রষ্টা হ'য়ে বিশ্বনিয়ন্তা হ'য়ে, আমার কাছ থেকে অতখানি দূরে থাক্‌বে, এতে কি আমি তৃপ্ত হ'তে পারি?"

রাজরাজেশ্বরী রাজ-সিংহাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার মস্তকে স্বর্ণ-কিরীট; পদতলে রত্নপীঠ। ঐশ্বর্য্যে মহিমায় শক্তিতে তিনি গৌরবময়ী। তাঁহার প্রত্যেক দৃষ্টিপাতে যেন প্রতাপের প্রভুত্বের ও শাসনের তীক্ষ্ণ জ্যোতি খেলিতেছে। তাঁহার বিশাল রাজ্যের নানা প্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণ চতুর্দ্দিকে করযোড়ে দণ্ডায়মান। এমন সময়ে তাঁর ক্ষুদ্র শিশুটি তাঁহার সম্মুখে আসিল। আসিয়া মা বলিয়া তাঁহাকে ডাকিল; মার কোল

[৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯ রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সায়ংকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্তৃক নিবেদিত।]

চাহিল। মা কি আর তখন রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে সজ্জিত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন ? মা তখনই উচ্চ সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন। ব্যস্ত হইয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যে, মার বুঝি ঐ সন্তানকে স্নেহ দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজই নাই। কোথায় রহিল তাঁহার সিংহাসন, কোথায় তাঁহার প্রতাপপূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কোথায় মুকুটে ঢাকা মাথায় অসংখ্য রাজ্যের অগণ্য ভাবনা !

চিন্তা বলে, "তুমি রাজ-রাজেশ্বর।" হৃদয় তাহা অস্বীকার করে না ; কিন্তু তবু বলে, "তুমি আমার মা !" চিন্তা যেন সেনাপতি ও সামন্তের মত' দূরে দূরে দাঁড়াইয়া থাকে। হৃদয় যেন ক্ষুধিত শিশুর মত' একেবারে কোলের দাবী লইয়া মার কাছে চলিয়া যায়। হৃদয়ের সাহস কত !

ভক্ত কেশবচন্দ্র একদিন তাঁহার অমৃতময় উপাসনার মধ্যে এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন, "তুমি কি আমাকে নাম ক'রে চেন ? তুমি কি আজ সকাল থেকে ভাব্‌চিলে যে ঐ কলুটোলায় একজন মানুষ বড় বিষণ্ণ হ'য়ে প'ড়ে আছে, তাকে প্রফুল্ল ক'রে তুল্‌তে হবে ?" ভক্ত-প্রাণের কথা ঠিক এই ধরণের। তুমি কি আমাকে চেন ? আজ উষাকালে যখন পূর্ব্বাকাশ সোণার আভায় রঞ্জিত হইয়া আমাকে মুগ্ধ করিতেছিল, তখন কি তুমি আমাকেও মনে করিয়া, আমারও নয়ন মন হরণ করিবার অভিপ্রায়টি মনে রাখিয়া, ঐ শোভা বিস্তার করিয়াছিলে ? তুমি যখন দক্ষিণ সমুদ্র হইতে মলয়পবনকে যাত্রা করাইয়া দিয়াছিলে, তখন কি তাহাকে এই কথাও বলিয়া দিয়াছিলে যে, "অমুক সহরের অমুক লোকটিকে যেন শীতল ক'রে দিস্ ?"—হৃদয়ের দাবী এইরূপ।

একদিন রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ হইতেছে। একটি বাড়ীর নারী ও পুরুষ সকলেই শিক্ষিত ; সকলেই চন্দ্রগ্রহণদর্শনে কুতু সকলেই উপরের ঘরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন। সকলেরই বিস্মিত ও পুলকিত নেত্র চন্দ্রের দিকে উত্তোলিত। কেমন ঠিক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর ছায়াটি আসিয়া চন্দ্রমণ্ডলের প্রান্তকে স্পর্শ করিল ; কেমন ধীরে ধীরে তাহা চন্দ্রের উপর দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। সকলেই নীরবে এই দৃশ্য দর্শন করিতেছেন। সকলেই যেন পৃথিবীকে ভুলিয়া গিয়াছেন ; যেন পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবনা ও কর্ম্ম তুচ্ছ হইয়া কোথায় তলাইয়া গিয়াছে ; যেন অনন্ত মহাকাশে সকলের মন ভাসিতেছে। সকলেরই চিত্তে যখন এইরূপ তন্ময় অবস্থা, এমন সময়ে একটি কক্ষ হইতে একটি শিশুর কান্নার রব আসিল। যত জন সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জনের কর্ণকে তাহা অধিক বিদ্ধ করিল, এক জনের মনকে তাহা অধিক আকুল করিল। তিনি নিমেষের মধ্যে ছুটিয়া গেলেন, নিমেষের মধ্যে নিজ সন্তানকে বুকে তুলিয়া লইলেন। তৎক্ষণাৎ শিশুর কান্না থামিল।

এই যে ব্যাপারটি ঘটিয়া গেল, ইহার মধ্যে কি দেখিতে পাই ? মায়ের কাছে তাহার শিশুর কান্নার তুলনায় আকাশের এত বড় দৃশ্যটিও কত তুচ্ছ ! মায়ের কর্ণে বিশ্ব-সঙ্গীতের আহ্বান অপেক্ষাও সন্তানের ক্রন্দনধ্বনির আহ্বান কত অধিক প্রবল ! মায়ের মনের পক্ষে আকাশ-রঙ্গভূমির এই মহা অভিনয়ে মুগ্ধ থাকা অপেক্ষাও সন্তান-স্নেহের হস্তে আত্মসমর্পণ করা কত অধিক পবিত্র কার্য্য ! বল দেখি, ভাই, মানুষের কোন্ ছবিটি ঐশ্বরিক ভাবকে অধিক প্রকাশ করে ? যখন কোনও বিশাল চিন্তায় অথবা বিরাট অনুভূতিতে কোনও মানবের মন ও মুখ যুগপৎ উদ্ভাসিত হয়, তখন অধিক ? না, যখন স্নেহে ও দয়ায় তাহার মন ও মুখ রঞ্জিত হয়, যখন স্নেহে ও দয়ায় সে আত্মবিস্মৃত অবনত ও আকুল হয়,—তখন অধিক ?

বিচারক।

ঈশ্বর ন্যায়বান্, ঈশ্বর নিরপেক্ষ বিচারক, ঈশ্বর পুণ্যের পুরস্কারদাতা ও পাপের দণ্ডদাতা। আমাদের গানে আছে, "পরম ন্যায়বান্, করেন ফল দান পাপ পুণ্য কর্ম্ম অনুসারে।" সংসারে মানুষ দেখে, কর্ত্তব্যে অবহেলার দণ্ড আছে ; কর্ত্তৃপক্ষের নিয়ম ভঙ্গ করার দণ্ড আছে, পরস্ব অপহরণের দণ্ড আছে। সংসারে মানুষ দেখে, অপক্ষপাত বিচারক অতি দুর্লভ। অপরাধের গুরুত্ব ভিন্ন আর কোন ভাবনা কোন ভয় বা লোভ যাহার মনকে টলাইতে পারে না, এমন বিচারক অতি দুর্লভ। এজন্য মানব-মন ঈশ্বরকে যত ভাবে চিন্তা করিতে চায়, তন্মধ্যে একটি এই যে, তিনি নিরপেক্ষ বিচারক এবং অমোঘ দণ্ডদাতা।

কিন্তু এইটুকুতে মানবচিন্তা তৃপ্ত হইলেও মানবের হৃদয় তৃপ্ত হয় না। প্রথম বিষয়টিতে যেমন হৃদয় বলে, "তুমি রাজ-রাজেশ্বর তাহা অস্বীকার করি না ; কিন্তু আমি আরও কিছু চাই,"—এখানেও তেমনি। হৃদয় বলে, "ঈশ্বর বিচারক, তাহা মানি। ঈশ্বর তাঁহার অমোঘ শাসনে আমার প্রত্যেকটি কর্ম্মের উপযুক্ত ফল আমাকে দিবেন, তাহাও জানি। কিন্তু বিচারক, অপরাধীর নিকট হইতে অথবা বিবদমান পক্ষদ্বয়ের নিকট হইতে যেরূপ দূরে অবস্থিত, তাহাদের সুখ দুঃখে তিনি যেরূপ নির্লিপ্ত, তাঁহার সমগ্র মনোযোগটি বিচারের শাণিত অস্ত্রে অপরাধীর কর্ম্মের বিশ্লেষণ করিতে ও আইন অনুসারে তাহা কি পরিমাণে দণ্ডনীয় তাহা নির্দ্ধারণ করিতে যেমন ব্যস্ত, ঈশ্বরও যদি মানব সম্বন্ধে শুধু তাহাই হন, তবে মানুষ বাঁচিতে পারে না।" মানুষের হৃদয় আরও কিছু চায়। মানুষের হৃদয় বিচার লইতে প্রস্তুত, কিন্তু সে স্নেহের বিচার চায়। সুদূর বিচারাসনে উপবিষ্ট নির্লিপ্ত বিচারকের দণ্ড নয়, মায়ের হাতের দণ্ড, পিতার হাতের দণ্ড সে প্রার্থনা করে।

বিচার সম্বন্ধে আর একটি দেখিবার বস্তু আছে। সংসারের আদালতে বিচারের একমাত্র বিষয়, মানুষের এক একটি বিচ্ছিন্ন কর্ম্ম। হৃদয়ের আদালতে বিচারের প্রধান বিষয়, মানুষের মনের ভাব, যাহা হইতে কর্ম্ম প্রসূত হয়। প্রত্যেক ভাল পরিবারের পিতা মাতা, ভাল বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্ত্তৃপক্ষ, এই পার্থক্য মনে রাখেন। কাজের বিধি-নিষেধ বিনা সংসার চলে না, ইহা সত্য বটে। "দরোজাটা প্রত্যেক বার ভেজাইয়া দিয়া যাইও ; আমার সাম্‌নের বারান্দা দিয়া চলিবার সময় শব্দ করিও না, আস্তে আস্তে পা ফেলিও ; জামাটি এক সপ্তাহের আগে ময়লা করিও না ; জুতাযোড়া যেন এক বৎসরের আগে ছিঁড়িয়া ফেলিও

না; এক একটা কলম এত দিন চলা চাই; তুমি রোজ এত লাইন করিয়া হাতের লেখা লিখিবে, এতগুলি করিয়া অঙ্ক কষিবে,"—কাজের বিষয়ে এইরূপ কত আদেশ পুত্র-কন্যাদিগকে দিতে হয়; এবং মাঝে মাঝে এই সকল আদেশের পালন ও লঙ্ঘনের বিচারও করিতে হয়। কিন্তু যে পিতা বা মাতা, যে অভিভাবক, যে শিক্ষক এই বিচার কার্য্যকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাধান্য দেন, এবং এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ের নানা ত্রুটির বিচার-সূত্রেই ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে অধিক সময়ে কথা কহেন, তাঁহার হাতে পড়িয়া পিতা-পুত্র, গুরু-শিষ্য প্রভৃতি পবিত্র সম্বন্ধসকল ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া যায়। শিশুরা তাঁহার বিচার মানিয়া লয় বটে, তাঁহার দণ্ডও মাথা পাতিয়া গ্রহণ করে বটে, কিন্তু এমন অভিভাবককে শিশুরা হৃদয় দিতে পারে না, তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারে না। ভাল বাড়ীতে, ভাল শিক্ষালয়ে এ সকলের বিচার-কার্য্যকে কখনও সর্ব্বপ্রধান স্থানে রাখা হয় না। সেখানকার প্রধান কথাবার্ত্তা অন্যরূপ। "ভাইকে বোন্‌কে ভাল বাসিও, স্বার্থপর হইও না, সন্দিগ্ধচিত্ত হইও না, পরের ভাল ভাবকে অবিশ্বাস করিও না, পরের সুখ দেখিয়া হিংসা করিও না, কাহাকেও জব্দ করিতে চাহিও না, নিন্দুক হওয়াকে ঘৃণা করিও,"—এই প্রকার হৃদয়-গুণের আদর্শসকল শিশুদের সম্মুখে ধরা, এই সকল হৃদয়-গুণের একটি আবেষ্টন শিশুদিগের জীবনের চারিদিকে রচনা করিয়া দেওয়া,—ইহার জন্যই ভাল বাড়ীর ও ভাল শিক্ষালয়ের অভিভাবকের মন অধিক ব্যস্ত হয়। এই আদর্শে ও এইরূপ আবেষ্টনে শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের মনগুলি নিজ অপরাধের স্থলে কি কথা বলে? বলে, "আমার ব্যবহারটা নিশ্চয়ই বড় স্বার্থপরের মতন হ'য়েছে, আমার নিজের মনই সে ক্ষুদ্রতার জন্য আমাকে ছি ছি বল্‌চে। দাও বাবা, দাও মা, আমায় শাস্তি দাও; আমি সে শাস্তি নিজেই চেয়ে নেব। কিন্তু আমি অবোধ ব'লে, দুর্ব্বল ব'লে, বাড়ীর স্কুলের বা বোর্ডিংএর সব নিয়ম যে সর্ব্বদা মনে রাখ্‌তে পারি না, অনেক সময়ে যে অপরাধ ক'রে ফেলি, আমার কৃত সেই সব অপরাধ গণনা ক'রে ক'রে যদি তুমি তার প্রত্যেকটির দণ্ড দিতে থাক, তবে সে দণ্ডও আমি ল'ব। কিন্তু সে-দণ্ড আমি বাধ্য হ'য়ে ল'ব। আর তার সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে গেলে শেষে আমার মনে আর শান্তি থাক্‌বে না; ভাল হবার জন্য সে দণ্ড আর আমাকে সাহায্য কর্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু ভালবেসে, ভাল আদর্শ সম্মুখে ধ'রে, তুমি যখন আমাকে লজ্জা দাও বা তিরস্কার কর, তখন আমার মন আরও তোমাকে জড়িয়ে ধর্‌তে চায়।"

আমাদের বৃহৎ জীবনেরও সেই কথা। সেই পরম পিতা পরম মাতা নিঃস্বার্থতার, উদার ব্যবহারের, কর্ত্তব্যনিষ্ঠার, সাধুতার, পবিত্রতায় যে-আদর্শ আমাদের প্রাণে দিয়া দিয়াছেন, আমাদের হৃদয় স্বতঃই তাহাদ্বারা নিজের নিজের বিচার করে। আমাদের প্রাণ সেই পরম প্রভুকে বলে, "প্রভু, আমার স্বভাব যে এখনও এত স্বার্থপর রয়েছে, আমার প্রকৃতিতে যে এখনও এত ক্ষুদ্রতা রয়েছে, আমার বাসনাকুলের মধ্যে যে এখনও এত অসংযম রয়েছে, তার দণ্ড আমাকে পেতেই হবে, তা তো আমি জানি। তার দণ্ড যে আমার জীবনে আমি এখনই ভোগ কর্‌চি, তাও বুঝ্‌তে পারি। তার জন্যই আমার জীবন এত শুষ্ক; তার জন্যই আমার প্রকৃতি এত বিশৃঙ্খল; তার জন্যই আমার পরিবারটি একটি ফুলের বাগানের মত' না হ'য়ে কণ্টকারণ্য হ'য়ে র'য়েছে; তার জন্যই আমি তোমার ধর্ম্মসমাজে এত বিরোধ উৎপন্ন করি; তার জন্যই আমি ধর্ম্মরাজ্যের অমৃতরসে এত বঞ্চিত। প্রভু, আমি কি তোমার এই সকল দণ্ড বুঝি না? আমি বুঝি, আমি জানি। আমি ইহারই যোগ্য। এ দণ্ড আমি ল'ব। আমি নিজ অন্তরকে শৃঙ্খলিত ক'রে, সংশোধন ক'রে, সুসজ্জিত ক'রে, উন্নত ক'রে, তোমার চরণে ধর্‌বার জন্য এখনও প্রাণপণ কর্‌ব। অন্তর-রাজ্যে তোমার দণ্ড তোমার বিচার, আমি মাথা পেতে ল'ব। কিন্তু আমার কর্ম্মের অপরাধ দিয়ে আমার বিচার ক'রো না, প্রভু! আমি তোমাকে যেমন ভাল ক'রে ডাক্‌ব ব'লে মনে ভেবেছিলাম, তা যে পারি নাই; তোমার উপাসনা প্রার্থনায়, তোমার স্তুতি বন্দনায়, যেমন নিষ্ঠা অর্জ্জন কর্‌ব ব'লে ভেবেছিলাম, তা যে পারি নাই; আমি সফল হব ব'লে আশা ক'রে সংসারের যত শ্রেষ্ঠ কাজ হাতে ক'রেছিলাম, তাতে যে সফল হ'তে পারি নাই; শরীর মনের শক্তির ব্যবহার ক'রে তোমার ধর্ম্মসমাজের যে যে কাজ গ'ড়ে রেখে যাব ব'লে সঙ্কল্প ক'রেছিলাম, তার যে কিছুই পার্‌লাম না; আমার এ জীবনখানি যে কেবল ভগ্ন-সাধনার ও ভগ্ন-আকাঙ্ক্ষার স্তূপ মাত্র, হে দেবতা, আমার জীবনের এই দিকটির প্রতি আমার নিজেরই তাকাতে ইচ্ছা হয় না। সেই দিকেই কি তুমি তাকাবে? আমার অক্ষমতা, আমার নিষ্ফলতা, আমার ব্যর্থতা, আমার দোষ দুর্ব্বলতা হ'তে প্রসূত তোমার কাজের শত ক্ষতি, ও আমার প্রতিদিনের জীবনের শত ত্রুটি,—তাই কি শুধু তুমি দেখ্‌বে? হে দেবতা, আমার এই মিনতি, আমি যে অন্তরে তোমার আদর্শসকল রক্ষা কর্‌বার জন্য প্রাণপণ কর্‌চি, তুমি তাই দেখো। আর সেখানে এখনও আমাতে যে-হীনতা যে-নীচতা যে-অক্ষমতা রয়েছে, তার জন্য আমায় প্রতিদিন ভৎর্সনা ক'রো, দণ্ড দিও।" আমাদের মন এই কথা বলে। আমরা বিচার চাই বই কি? নির্লিপ্ত নির্ম্মম কর্ম্ম-পরিদর্শকের বিচার চাই না বটে, কিন্তু মায়ের বিচার চাই। পূজার সাধনের কিংবা কার্য্যের সফলতা বিফলতার বিচার প্রার্থনা করি না বটে; কিন্তু হৃদয়ের উচ্চ ভাবের কিংবা নীচ ভাবের সম্বন্ধে বিচার নিশ্চয়ই প্রার্থনা করি।

মানবীয় দুর্ব্বলতা প্রসূত দোষ-ত্রুটির বিচারের যে আদর্শটি এখানে আমি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছি, Leigh Hunt রচিত একটি ইংরেজী কবিতা পড়িয়া আমি তাহার ধারণা মনে উজ্জ্বল করিয়া লইতে বড় সাহায্য পাই। সেই কবিতাটির মর্ম্ম এই:—

"আমার একটি পুত্র আছে। তাহার মাতা যতদিন জীবিতা ছিলেন, সহিষ্ণু হইয়া তাহাকে পালন ও শাসন করিতেন; আমার সেরূপ ধৈর্য্য নাই। একদিন পুত্রটি সাত বার আমার আদিষ্ট একটি নিয়ম ভঙ্গ করিল। সেদিন সন্ধ্যাকালে আমি

তাহাকে মারিলাম, বকিলাম; এবং শুইতে যাইবার আগে তাহাকে প্রতিদিন যে চুমো দিতাম তাহা না দিয়াই তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিলাম।

ক্ষণকাল পরে আমার মনে হইল, হয়তো সে মনের কষ্টে ঘুমাইতে পারিতেছে না। যাই, একবার গিয়া দেখিয়া আসি। গিয়া দেখি, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বুঝিলাম, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সে কাঁদিয়াছিল, কারণ তার চোখের পাতা তখনও ভিজিয়া রহিয়াছে। আমি চুম্বন করিয়া তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিলাম। কিন্তু আমার নিজেরও অনেক অশ্রু তাহার মুখের উপর পড়িল।

কারণ, দেখি যে, নিজের মনের কষ্ট ভুলিবার চেষ্টায় সে বিছানার কাছে ছোট একটি টেবিলে কয়েকটি রঙীন কাচের টুকরা, কয়েকটি কড়ি, কয়েকটি বিদেশী মুদ্রা প্রভৃতি নিজের খেলিবার তুচ্ছ জিনিসগুলি সাজাইয়া রাখিয়াছে।

সেদিন রাত্রিতে আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবার সময় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, হে পিতা, সারাদিন পুত্রটি আমাকে কত বিরক্ত করিয়াছিল, এখন নিদ্রিত হইয়া আর তাহা করিতেছে না। এমনি করিয়া হে দেব, তোমার চির-অপরাধী পুত্র আমি, আমার চঞ্চল জীবনের অবসানে, মরণের নিদ্রায় যখন শান্ত হইব, তখন অপরাধ করিয়া করিয়া আর তোমাকে বিরক্ত করিব না। আমার অবোধ পুত্রটি হৃদয়ের বেদনার উপশমের জন্য কি-তুচ্ছ খেলনার সাহায্য লইয়াছিল! আমিও এ জীবনে শিশুর মত' কিরূপ তুচ্ছ পার্থিব বস্তুসকল লইয়া হৃদয়ের গভীর অতৃপ্তি নিবারণের জন্য চেষ্টা করি! আমার পুত্রটি আমার আদেশ পালন করিতে বার বার ভুল করিতেছিল; হে পিতা, তোমার সুমহান্ আদেশসকল বুঝিতে ও পালন করিতে আমিও তেমনি কত ভুল করি! যে-আমাকে তুমি পৃথিবীর ধূলি হইতে সৃষ্টি করিয়াছ, সেই-আমারই হৃদয় যখন নিজ পুত্রের অপরাধকে এত ব্যথিত হইয়া ও এত সদয় ভাবে বিচার করিতেছে, তখন তুমি আমার অপরাধকে নিশ্চয় আরও কত অধিক সদয়ভাবে বিচার করিবে।"

হৃদয়ের স্পর্শ।

চন্দ্রগ্রহণের দৃষ্টান্তসূত্রে বলিয়াছিলাম, শিশুটিকে মা কোলে তুলিয়া লইলেন, আর তাহাতেই শিশুর কান্না থামিয়া গেল। ইহাও হৃদয়রাজ্যের এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে মায়ের কোলের স্পর্শটি কেবল শরীরের স্পর্শমাত্র নয়; এটি হৃদয়ের স্পর্শ। হৃদয়ের স্পর্শের বিশ্লেষণ অসম্ভব। মায়ের স্পর্শটি শিশুর পক্ষে যে কি বস্তু, তাহা কি কেহ জ্ঞানের দ্বারা বিশ্লেষণ করিতে পারে? মায়ের সান্নিধ্য মানুষের মনের উপরে যে কি ভাবে ক্রিয়া করে, কেহ কি তাহা বুঝাইয়া দিতে পারে? রোগের যন্ত্রণায় শরীর অস্থির। মা কাছে আসিলে যে যন্ত্রণা থামিয়া যায়, তা নয়; কিন্তু তাহা সহিবার জন্য আশ্চর্য্য ও নিগূঢ় ভাবে মন প্রস্তুত হইয়া যায়! কিছু হারাইয়া গিয়াছে, বা কেহ কিছু কাড়িয়া লইয়াছে। মার কাছে গেলাম। সে বস্তুটি যে ফিরিয়া পাইলাম, তাহা নয়; কিন্তু তবু সেই হারানোর শোকটি ধীরে ধীরে ভুলিয়া গেলাম। "আমার মা তো আছেন," এই অনুভূতিতে যেন সব ক্ষতির পূরণ হইয়া গেল! সংসারের কত ব্যাপারের অর্থ বুঝিতে পারি না। অতর্কিত ভাবে কত বিপদ কত আঘাত আসে; তাহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া মন হতবুদ্ধি হইয়া যায়। এইরূপ ভীত ও বিষণ্ণ মন লইয়া মার কাছে গেলাম। মা যে কিছু বুঝাইয়া দিতে পারিলেন, তা নয়; কিন্তু "আমার মা আছেন," এই জ্ঞানে যেন সব না-জানার না-বোঝার অভাব পূরণ হইয়া গেল; যেন সব আঁধার কাটিয়া গেল! প্রতিদিন এই সকল ব্যাপার ঘটিতেছে। কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হয়? বেদনা যায়, অভিযোগ যায়, অন্ধকার যায়, ভয় চলিয়া যায়, একটি মাত্র স্পর্শে! কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হয়? হৃদয়ের স্পর্শের কথা ভাবিতে গিয়া চিন্তা থই পায় না।

ধর্ম্মরাজ্যেও তেমনি। যীশুর কাছে গিয়া বসিলেই জুডিয়ার দুঃখীদের দুঃখ দূর হইত,—হৃদয়ের স্পর্শের এমনি গুণ! লোকে বলে, তিনি গায়ে হাতখানি রাখিলেই মানুষের শরীরের রোগও দূর হইত। শরীরের কথা বলিতে পারি না; কিন্তু মনের যাতনা, মনের ক্লেশ, অন্তরের রোগ, এমন সহৃদয় মানুষের হৃদয়ের স্পর্শ লাভ করিতে পারিলে যেন মায়ামন্ত্রে ভাল হইয়া যায়। কেহ কি বুঝাইয়া দিতে পারেন যে কিরূপে তাহা হয়? মনের রোগের নিদানতত্ত্ব এবং মাতৃস্পর্শের ন্যায়, সাধুর করুণ হৃদয়ের স্নিগ্ধ স্পর্শে তাহার উপশমতত্ত্ব,—ইহার মর্ম্ম আজ পর্যন্ত কে বুঝিয়াছে?

প্রার্থনা করিয়া যে আমরা বল পাই, তাহাও তো হৃদয়ের স্পর্শেরই ব্যাপার। প্রার্থনা হইতে কেন বল আসে, তাহার ব্যাখ্যা কি কেহ করিতে পারিয়াছেন? আমরা যা চাই তাই দিবেন বলিয়া তো সেই পরমজননী বলেন না। তিনি কি করেন? "এই যে সন্তান! এই যে আমি আছি!" এই বলিয়া যেন নিজের স্পর্শ দেন, যেন বুকে তুলিয়া লন। বিপদে ভয় পাইয়া যখন তাঁহার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি তো এ কথা বলেন না যে "আচ্ছা, রোস, বিপদ দূর করিয়া দিব।" তিনি কেবল বলেন, "ওরে সন্তান, ভয় নাই, এই যে আমি আছি!" এই বলিয়া আমার কম্পিত হাতখানি ভাল করিয়া ধরেন। রোগের যাতনায় যেমন পৃথিবীর মা কাছে আসিয়া বলেন, "এই যে আমি কাছে এসেছি," সেই পরমজননীও তেমনি বুকে লইয়া বলেন, "এই যে বাছা, আমি কাছে আছি।" প্রার্থনার অর্থ কি? প্রার্থনার অর্থ কাতর মানবাত্মার ক্রন্দন,—"মা তোমার কোলে থাকব!" আর, প্রার্থনার উত্তরের অর্থ কি? —মার আসিয়া সন্তানকে কোলে করা, নিজ স্পর্শ দেওয়া। ইহাতেই সব হইয়া যায়! ইহাতেই নূতন বল পাই। ইহাতেই মন বলিয়া উঠে, "আর ভয় নাই! না-বোঝা প্রশ্নের বেদনা আর নাই! কষ্টের জন্য অভিযোগ আর নাই! আমি সব সহিব, আমি তোমার দেওয়া সব বিধি মাথায় পাতিয়া লইব।"

যাঁহারা এই হৃদয়ের স্পর্শের ব্যাপারটিকে বাদ দিয়া যান, তাঁহারা উপাসনার ও প্রার্থনার আসল মর্ম্মটিতেই গিয়া পৌঁছেন না। উপাসনার প্রাণ কি? হৃদয়ে ঈশ্বরের স্পর্শলাভ। কেবল আলো নয়, কেবল জ্ঞান নয়; তার চেয়ে বেশী, হৃদয়ে দয়ালের

দয়ার স্পর্শ, এবং তাহার আনন্দ বল ও শান্তি। এমন কি, পরিণত বয়সে ক্রমে দেখিতে পাই, দিবানিশি এই এক প্রার্থনাই প্রধান হইয়া উঠে,—"মা, তুমি কাছে থাক।" অন্ধকার রাত্রিতে শিশু শয্যায় হাত বাড়াইয়া দেখে, "মা, তুমি কি আছ?" একবার মায়ের গায়ে হাত ঠেকিলেই শিশু নিশ্চিন্ত। তেমনি, "মা, তুমি কাছে আছ," এই অনুভূতিতেই আমাদের মন নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত হয়। মরণের অন্ধকারে কি করিব? "মা তুমি আছ তো?" বলিয়া হাত বাড়াইব। তাঁহার কোলে আছি, ইহা জানিতে পারিলে নিশ্চিন্ত মনে সে আঁধার পার হইয়া যাইব।

ব্যথার ব্যথী।

উপাসনা প্রার্থনার ভিতরে হৃদয়ের স্পর্শের ব্যাপারের নিগূঢ় কথাটি কি? সে কথাটি এই, যে, ঈশ্বর কেবল আমাদের সুখে সুখী নন; তিনি আমাদের বাথারও ব্যথী। বল, ব্রাহ্ম, সাহস ক'রে কি এ কথা বল্‌বে? দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জুডিয়ার পুরাতন শাস্ত্রযোগ বলিত, তিনি ন্যায়বান্ বিচারক মাত্র; দাঁড়িপাল্লায় ওজন ক'রে ক'রে তিনি কেবল পাপীর দোষের বিচার করেন। তার পরে একদিন একজন হৃদয়বান্ পুরুষ সেই দেশে দাঁড়িয়ে, হৃদয়ের কথার উপরে ভর দিয়ে বল্‌লেন, হৃদয়ের সাহসে সাহসী হ'য়ে বল্‌লেন, "না, না! ঈশ্বর শুধু নির্ম্মম বিচারক নন; তিনি র প্রতি দয়ালু। তিনি পাপীর জন্য ব্যাকুল। তিনি ৯৯টি মেষকে ছেড় করিয়া বেণে একটি হারানো মেষকে খুঁজে ফিরিন হন্।" পণ্ডিতেরা ও পুণ্যবানেরা হয়তো এ কথা সহজে বোঝেন নাই, কিন্তু দুঃখীরা পাপীরা বুঝেছিল। এ দেশের এক শ্রেণীর জ্ঞানীরা, ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্বের পাছে বা হানি হয়, এই ভয়ে তাঁহাতে ব্যক্তিত্ব দয়া প্রেম কিছুই আরোপ করতে সাহস করেন নি। তাঁদের প্রাণ হয়তো বল্‌তে চেয়েছে, ব্রহ্ম প্রেমময়; কিন্তু হৃদয় হ'তে উদ্গত সেই কথাটিকে অতি সভয়ে, অতি সাবধানে, প্রায় চাপা দিয়ে, তাঁরা ব'লেছেন, যে, "তিনি আনন্দস্বরূপ।" পৃথিবীর দুঃখী পাপী! ভারতের দুঃখী পাপী! আজ কি তোমরা সাহস ক'রে বল্‌বে, ঈশ্বর যেমন আমাদের হাসিতে হাসেন, তেমনি তিনি আবার আমাদের ব্যথায় ও ব্যথিত হন্? তোমরা কি সাহস ক'রে বল্‌বে,—মায়ের হাসি যেমন সত্য, মায়ের অশ্রুও তেমনি সত্য? ব্রহ্মের আনন্দ যেমন সত্য, ব্রহ্মের বেদনাও তেমনি সত্য? আমি বলি, বল! দুঃখীরা, পাপীরা আগেই সাহস ক'রে বল! ক্রমে জ্ঞানীরা, সাধকেরাও তোমাদের উক্তি গ্রহণ করবেন। উপাসনার মধ্যে, প্রার্থনার মধ্যে, যে শুভ-মুহূর্ত্তে একবার মায়ের স্পর্শটি পাই, তৎক্ষণাৎ অন্তরে বুঝ্‌তে পারি, মা আমার ব্যথারও ব্যথী।

ব্রাহ্মধর্ম্ম চিন্তা ও হৃদয় দুই-ই হাত ধরাধরি ক'রে চ'লেছেন। চিন্তার কাজই হ'ল দ্বিধা করা, এক এক খানি পা কোথায় ফেল্‌চি, তা ভাল ক'রে দেখা। হৃদয়ের কাজ, সাহস ক'রে সোজাসুজি মায়ের মুখের দিকে তাকানো। তাই সাধক, তাই দুঃখী পাপী, হৃদয়ের সাহসে ভরসা রেখো; হৃদয়ের আলোকের অনুসরণ ক'রো। এই আমার আজকার নিবেদন।

পরলোকগত গগনচন্দ্র হোম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একবার কলিকাতা হইতে ময়মনসিংহে গিয়াছিলাম,—প্রাণের টানে শ্রীনাথ চন্দ ও চন্দ্রমোহন বিশ্বাস-মহাশয়দের দর্শন করিতে। সেখানে গিয়া দেখি,—চন্দ্রমোহনবাবুর গৃহে ভগবৎ-ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় বাস করিতেছেন। নামে, গানে তাঁহার পরিচয় পাইয়াছিলাম, সাক্ষাৎভাবে পরিচয় ছিল না। পরিচয় পাইয়াই তিনি দাঁড়াইয়া আমায় আলিঙ্গন করিলেন;—ভক্তের আলিঙ্গনে আমি আপনাকে ধন্য মনে করিলাম, পদধূলি লইয়া কৃতার্থ হইলাম। তারপর তাঁহার উপাসনা,—কি মিষ্ট, কি মধুর, সরল স্বাভাবিক ভাব ও ভাষা।

ভগবানের বিশেষ দয়ায়, ভক্ত ক দত্ত মহাশয়ের চতুর্থকন্যার সহিত আমার বিবাহ হয়। সেই সূত্রে সেই ভক্তের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তিনি দিবসের প্রায় অধিকাংশ সময়ই যোগযুক্ত অবস্থায় থাকিতেন, প্রতিদিন রাত্রি তিনটা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ধ্যানমগ্ন রহিতেন। তাঁহার সংবাসে আমার চিত্ত সমাহিত হইত, আমার কৃপণ প্রকৃতি শান্ত হইত। তাঁহার সাধন ভজনের কক্ষে প্রবেশ করিলে এখনও প্রাণ পবিত্র হয়। মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে তিনি কলিকাতা আসিয়া মাসাধিককাল আমাদের সঙ্গে বাস করিতেন। তখন আমাদের গৃহে কত সাধু ভক্তের সমাগম হইত; তাঁহাদের পদধূলি পড়িয়া আমাদের গৃহ যেন তীর্থস্থানে পরিণত হইত; তাঁহাদের সেবা সমাদর করিয়া আমরা স্বামী-স্ত্রীতে কত আত্মপ্রসাদ লাভ করিতাম। আমরা স্বামী স্ত্রীর ও আমাদের সন্তানদের উপর তাঁহার অশেষ স্নেহ ছিল; স্নেহাধিক্য বশতঃই তিনি বোধ হয় আমাকে উপাসনা করিতে বলিতেন। তাঁহার ও দীননাথ দত্ত-মহাশয়ের ন্যায় সাধু ভক্ত উপস্থিত থাকিতে উপাসনা করিতে আমার স্বভাবতঃই সঙ্কোচ ও অক্ষমতা অনুভব হইত, কিন্তু অব্যাহতি ছিল না। যোগে তিনি এত উন্নত ছিলেন যে, অনেক উপবীত-ধারী যোগাবলম্বনকারী ব্রাহ্মণ অনুষ্ঠিত চিত্তে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেন; রাজপথে এই দৃশ্য দেখিয়া লোকে অবাক ও বিস্মিত হইত। বিধাতার কৃপায় আমি এমন ভক্তের স্নেহ ও অনুগ্রহ-ভাজন হইয়াছিলাম, এমন ভক্তের কন্যা আমার সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন; ইহা স্মরণ করিতেও আমার প্রাণে আনন্দ হয়।

যখন সিটিকলেজে কাজ করিতাম, তখন কখন কখন গ্রীষ্মের ছুটিতে উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে ২৪ পরগণার নানা স্থানে যাইতাম—পূজার ছুটিতে পচম্বা যাইতাম। পচম্বাতে সাধু তিন-কড়ি বসু-মহাশয়ের গৃহে আমরা আতিথ্য গ্রহণ করিতাম। তিন কড়ি বাবু আমাকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন। তাঁহার স্নেহ হইতে এখনও বঞ্চিত হই নাই। এমন সাধু পুরুষ বড় দুর্লভ। তাঁহার নামে চিত্ত ভক্তিতে নত হয়। উমেশবাবু একজন সাধননিষ্ঠ ব্রাহ্ম ছিলেন। রেলগাড়ীতে উঠিয়াই, জনকোলাহলের মধ্যেও, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ইষ্টদেবতার চিন্তায় মগ্ন হইতেন। তাঁহার চরিত্রের প্রভাব এমনি ছিল যে, পথে-ঘাটে দেখিতে পাইলে কত লোকে তাঁহার পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিত, তাঁহার উপাসনাকে

যোগ দিত। পশ্চাতে তিনি প্রায় প্রতিদিন প্রাতে, জনমানবহীন, জঙ্গলাকীর্ণ শ্লেট নদীরতীরে, বৃক্ষমূলে বসিয়া, ধ্যানে রত হইতেন—আমি তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম। একটা সঙ্গীতের পর সংক্ষিপ্ত উপাসনা করিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইতেন; সেই অবস্থায় কত সময় কাটিয়া যাইত, আমি প্রহরীর স্থায় বসিয়া রহিতাম। আমার মত লোকের পক্ষে তখন আর কতক্ষণ ধ্যান করা সম্ভব ছিল? একদিন সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিবার পরই একটা বিকট গন্ধ আসিল;—বাঘের ভয়ে আমার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল, দত্ত-মহাশয়ের কিন্তু ধ্যানভঙ্গ হয় না। অবশেষে, বাধ্য হইয়া, আমাকে তাঁহার ধ্যানভঙ্গের অপরাধী হইতে হইল। তাঁহার ইচ্ছাতে ও মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টাতে মাঝে মাঝে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন বাগানে যাওয়া যাইত। আমরা সকলে কীর্ত্তনাদি করিয়া নিদ্রা যাইতাম, কিন্তু দত্ত-মহাশয় সারানিশি ধ্যানে যাপন করিতেন। গৃহে থাকিলে পাছে সাধন-ভজনের ব্যাঘাত হয়, এজন্য অনেক দিনই তিনি সিটিকলেজের বাড়ীতেই রাত্রিবাস করিতেন,—বাড়ী হইতে সন্ধ্যার সময় যৎসামান্য আহার্য্য যাইত। তাঁহার শান্ত, নীরব জীবনের প্রভাবে আমার জীবন বিশেষ উপকৃত হইয়াছে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-মহাশয়, ভক্ত কালীনাথ দত্ত এবং সাধু উমেশচন্দ্র দত্ত ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দীননাথ দত্ত মহাশয় এক গ্রামবাসী ছিলেন,—সকলেই প্রায় একই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মবিধানের অধীন হইয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের জীবনেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের প্রভাব অল্পাধিক পরিমাণে বিস্তারিত হইয়াছিল। তাঁহারা পরস্পরে গভীর ধর্ম্ম-বন্ধুতাসূত্রে আকৃষ্ট ও আবদ্ধ ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে আমি বহুদিন হইতেই শাস্ত্রীমহাশয়ের নিকট সুপরিচিত ছিলাম। তাঁহার নিকট আমি "অগ্নিমন্ত্রে" দীক্ষা গ্রহণ করি। সে এক অপূর্ব্ব অনুষ্ঠান। আনন্দচন্দ্র মিত্র, কালীশঙ্কর সুকুল, শরচ্চন্দ্র রায়, তারাকিশোর চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল ও সুন্দরীমোহন দাস তাঁহার নিকট পূর্ব্বেই এই মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আমার দীক্ষার দিনে বরাহনগরে গঙ্গাতীরে এক বাগানে, গভীর রাত্রে, তাঁহারা সকলে দীক্ষার্থী উমাপদ রায় ও আমাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন; সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করা হইল। যাহারা বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া বটপত্রে লিখিয়া নিজেদের প্রবৃত্তির মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা; ধর্ম্মবিশ্বাসে প্রতিমাপূজা; সমাজে জাতি-ভেদ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরাধীনতা অগ্নিতে আহুতি দিলাম। তাহার পর বটপত্রগুলি পুড়িয়া নিঃশেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলাম:—

(১) প্রতিমাপূজা করিব না, প্রতিমাপূজার সহিত কোনরূপ যোগ রাখিব না। (২) জাতিভেদ মানিব না, কোন প্রকারেই ব্যক্তিগত বা সামাজিক বন্ধনে জাতিভেদকে প্রশ্রয় দিব না। (৩) স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করিয়া সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিব। (৪) বাল্য-বিবাহ অশেষ অকল্যাণের আকর জানিয়া নিজেরা একুশ বৎসরের পূর্ব্বে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইব না, ষোড়শ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালিকার পাণিগ্রহণ করিব না; এবং যে বিবাহের পাত্রের বয়স একুশ এবং পাত্রীর বয়স ষোল বৎসরের কম, তেমন বিবাহে যোগদান হইতে বিরত থাকিব। (৫) নিজেদের ও স্বদেশবাসীর শক্তি ও শৌর্য্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চ্চা ও তাহার প্রচার করিব; নিজেরা অশ্বারোহণ ও আগ্নেয়াস্ত্র চালনা অভ্যাস করিব; এবং সমস্ত দেশে যাহাতে অশ্বারোহণ ও বন্দুক ছুঁড়িবার অভ্যাস প্রচলিত হয়, তাহার জন্য সচেষ্ট থাকিব। (৬) একমাত্র স্বায়ত্ত-শাসনই বিধাতানির্দ্দিষ্ট শাসনব্যবস্থা; কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিদেশীর শাসনকে স্বীকার করিব; কিন্তু দুঃখ-দারিদ্র্যদশাধারা নিপীড়িত হইলেও কদাপি এই গভর্ণমেণ্টের অধীনে দাসত্ব করিব না।

আরও দুই একটি প্রতিজ্ঞা ছিল, সব এখন ভাল মনে নাই; প্রতিজ্ঞাপত্রের কাগজটিও হারাইয়া গিয়াছে; কিন্তু আত্মপ্রসাদ আছে,—ভগবানের নাম লইয়া, ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে, যে ব্রত লইয়াছিলাম, যে সমুদয় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহার প্রায় সমস্ত গুলিই বিধাতার আশীর্ব্বাদে, জীবনে পালন করিতে পারিয়াছি। আর শুধু আমি নয়;—জীবিতদের মধ্যে বন্ধুবর বিপিনচন্দ্র, সুন্দরীমোহন, উমাপদ বাবু এবং পরলোকগতদের মধ্যে "দাদামহাশয়" শরচ্চন্দ্র রায়, কবি আনন্দচন্দ্র, কালীশঙ্কর সুকুল—সকলেই মোটের উপরে প্রতিজ্ঞাগুলি প্রতিপালন করিয়াছেন।

এই দীক্ষাবলম্বনের পর শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ যোগ হইয়াছিল। তিনি আমার বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহার বন্ধুর কন্যার সহিত আমার বিবাহ হওয়াতে আমি তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়াছিলাম। আমাদের বিবাহের পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক উপলক্ষ্যে তিনি আচার্য্যের কার্য্য করিতে আসিয়া যখন শুনিলেন যে, বিবাহের পর হইতেই আমরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে ব্রহ্মোপাসনা করি, তখন তাঁহার এত আনন্দ হইয়াছিল যে, তিনি বলিয়াছিলেন—"তোমাদের বিবাহ দেওয়া আমার সার্থক হইয়াছে।" বারো বৎসর পূর্ব্বে (১৯১৮) সালে আমি একবার মৃত্যুশয্যাশায়ী হইয়াছিলাম, তখন শাস্ত্রী মহাশয়, তাঁহার শারীরিক দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও, প্রায় প্রতিদিনই আমাকে দেখিতে আসিতেন, মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। তখন আমার জন্য তাঁহার কি উদ্বেগ ও আশঙ্কা, তাঁহার কথা ও ব্যবহারে প্রকাশ পাইত! একদিন নিয়ত সেবারতা আমার স্ত্রীকে তিনি বলিলেন,—"আর ভয় নাই, এবার গগন সারিয়া উঠিবে"; বলিতে বলিতে তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে, সিটিকলেজের বাড়ী নির্ম্মাণ কার্য্যে অত্যধিক পরিশ্রম করাতে আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য দেওঘর গিয়া সেখানকার স্কুলের তৎকালীন হেডমাষ্টার, মাইকেলের জীবনী-রচয়িতা, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলাম। যোগীনবাবু ও তাঁহার স্ত্রী আমাকে যে যত্ন-আদর করিয়াছিলেন, তাহা আমি ভুলি নাই,—কখনও ভুলিবার নয়। তখন সেখানে

পূজ্যপাদ রাজনারায়ণ বসু-মহাশয়ের সহিত প্রথম পরিচিত হই ও সেই সাধুপুরুষের স্নেহলাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করি। তিনি বলিয়াছিলেন,—"মানুষের মুখশ্রী যেরূপ বিভিন্ন, মানবের ধর্ম্মমতও তেমনি বিভিন্ন।" তাঁহার নিকটেই "সারধর্ম্মের" শিক্ষা পাইয়াছিলাম। তাঁহার গৃহ দেওঘরে "দেব-গৃহ" ছিল। দেওঘরে যত পদস্থ, সম্মানিত লোক ও সাধুসন্ন্যাসী যাইতেন, সকলেই একবার সেই মহাপুরুষকে দেখিতে আসিতেন। দেওঘরের শিবমন্দিরের বিগ্রহদর্শন যেমন পুণ্যকার্য্য বিবেচিত হয়, দেওঘরে রাজনারায়ণ বসু-মহাশয়কে দর্শনও তেমনি পুণ্যকার্য্য বিবেচিত হইত। সন্ন্যাসী পরমানন্দস্বামী তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—"রাজনারায়ণ বসুই ত প্রকৃত ব্রাহ্ম।" তিনি আমার প্রতি স্নেহবশতঃ বৃদ্ধবয়সেও, আমার পরিচালিত "আলোচনাতে" "সারধর্ম্ম" বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।"

বন্ধুবর নবকুমার সমাদ্দার তাঁহার বিবাহোপলক্ষে আমাকে দেওঘর হইতে আগ্রা লইয়া গিয়াছিলেন। রামকুমার বিদ্যারত্ন-মহাশয় সেই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন। নবকুমারের শ্বশুর ছিলেন "কত কাল পরে বল ভারতরে" এবং "নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দরী যমুনা ও" দুইটী বিখ্যাত সঙ্গীতরচয়িতা কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় একদিন জ্যোৎস্না রাত্রে, তাজের নীচে, যমুনার পাষাণ-সোপানে বসিয়া, তিনি আমাকে তাঁহার যমুনা-বন্দনা গাহিয়া শোনান,—এস্রাজে সঙ্গত করেন তাঁহার এক পুত্র। সেই রাত্রির অপূর্ব্ব স্মৃতি চিরদিন আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। আগ্রার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া বৃন্দাবন যাই। বৃন্দাবনে মদনমোহনের ভগ্নচূড় মন্দির দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র আমার ভক্তরাজ গৌরার প্রেমভক্তির কথা মনে পড়িল, আর মনে পড়িল, ভক্তিপ্রেমে বিভোর হইয়া, হরিনামকীর্ত্তনে গোরা এই বৃন্দাবনের ধূলি-রাশিকে কুমকুমে পরিণত করিয়াছিলেন। মনে হইল, এই ধূলিতে গড়াগড়ি দেই, যদি সেই ভক্তের পদরজঃ এই ধূলির সহিত মিশ্রিত থাকে আর তাহার সংস্পর্শে আমার ভক্তিহীন চিত্তে ভক্তির সঞ্চার হয়।

আমার পিতৃ পিতামহগণ শাক্ত ছিলেন; তাঁহাদের গুরুকুল ঘোর তান্ত্রিক। ত্রিপুরা জেলায় মেহের নামক স্থানে যে শ্মশানকালীর বিগ্রহ আছে, তথাকার শ্মশানে, পূর্ণানন্দ নামক শিষ্যের সাহায্যে, এই গুরুকুলের পূর্ব্বপুরুষ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন;—তাঁহারা সেই সাধকের নামে "সর্ব্ব" বলিয়া পরিচিত। শাক্তকুলে জন্মিয়া আমার মধ্যে বৈষ্ণব-ভাব কিরূপে আসিল, আমার পত্নী কখন কখন এ প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করিতে যাইয়া মনে হয়, বাল্যকাল হইতে আমি কৃষ্ণলীলার গান শুনিতে ও গাহিতে বড়ই অভ্যস্ত ছিলাম। আমাদের পাশের বাড়ীতে এক ঘর যুগী প্রজা বাস করিত। তাহারা পিতা পুত্র সকলে পরম বৈষ্ণব ছিল,—তাহাদের গৃহে চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবগ্রন্থ ছিল। আমি বাল্যকাল হইতে ১৫।১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সেই সব বৈষ্ণবগ্রন্থ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। ঐ সকল গ্রন্থপাঠে ও কৃষ্ণ-লীলা-সংক্রান্ত গানে আমার মন দ্রব হইয়া যাইত, অপ্রবুদ্ধ উপভোগে চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িত। আমার মধ্যে যদি কোন বৈষ্ণবভাব থাকে তবে ইহাই বোধ হয় তাহার কারণ।

ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া যখন আমি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা আসিলাম, তখন একদিন শ্রদ্ধাস্পদ আনন্দমোহন বসু-মহাশয় আমাকে বলিলেন, "গগন, বেকার বসিয়া আছ, অল্প কিছু কাজ কর না কেন?" আমি বলিলাম,—"অধিক পরিশ্রম করিবার বল শরীরে আমার নাই, অল্প পরিশ্রমের মত এমন কি কাজ পাব?" তিনি পরদিন আমাকে সিটীস্কুলে যাইতে বলিয়া গেলেন। আমি গিয়া দেখি, বসু-মহাশয় হাইকোর্টে যাইবার পূর্ব্বে, সিটীস্কুলের অফিসঘরে আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন এবং আমি যাইবার আগেই হেড্ মাষ্টার উমেশচন্দ্র দত্ত-মহাশয়কে বলিয়া আমার জন্য আফিসের কেরাণীর কার্য্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। কিছুকাল পরে আমি কলেজ আফিসের হেড-ক্লার্কের পদে নিযুক্ত হইলাম; মধ্যে মধ্যে স্কুল-শিক্ষতাও করিতাম। এই সূত্রে উত্তরকালে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি, যাহারা তৎকালে ছাত্র বা অধ্যাপকরূপে সিটী কলেজে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে পরিচয় ও কোন কোন ক্ষেত্রে সৌহার্দ্দ্য জন্মে। আজও তাঁহাদের অনেকের সহিত বড় প্রীতির সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া, সিটী কলেজের পুরাতন বাটীনির্ম্মাণের তত্ত্বাবধানের ভার বসু-মহাশয় আমার উপর ন্যস্ত করেন। সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বহু বৎসর পরে ব্রাহ্ম বালিকাশিক্ষালয়ের জীর্ণবাটী সংস্কারের ও মেরী কার্পেণ্টার হল নির্ম্মাণের কার্য্য-তত্ত্বাবধানের ভারও তিনি আমার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। আমার জীবনে আনন্দ-মোহন বসু-মহাশয়ের স্নেহের পরিচয় নানাভাবে এত পাইয়াছি যে, তাহা কোন দিন ভুলিতে পারিব না; আমি কতরূপে যে তাঁহার নিকট ঋণী তাহা আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকেই জানেন। তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়—শ্রদ্ধেয় হরমোহন বসু ও মোহিনীমোহন বসু-মহাশয়দের সাহচর্য্যস্মৃতি আমার হৃদয়ে অপার আনন্দ আনয়ন করে।

সুহৃদ্বর বিপিনচন্দ্র পাল যখন কলিকাতা পাব্‌লিক লাই-ব্রেরীর—এখন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী—সম্পাদক, তখন আমি সিটী কলেজ ছাড়িয়া তাঁহার সহকারীর কার্য্যগ্রহণ করি। আমার এই কর্ম্ম লইবার প্রধান প্রলোভন ছিল অধ্যয়নের সুযোগ। যে কয় বৎসর পাব্‌লিক লাইব্রেরীর কাজে ছিলাম, সে কয় বৎসর প্রাণ ভরিয়া নানা বিষয় পড়িয়া লইয়াছিলাম। আমার এ জ্ঞানচর্চ্চার সঙ্গী ও উৎসাহদাতা ছিলেন, বিপিনচন্দ্র। লাইব্রেরীর কোন নূতন বই আসিলেই তিনি নিজে তাহা না পড়িয়া ও আমাকে না পড়াইয়া ছাড়িতেন না। আমি তাঁহার নিকট এজন্য চির-কৃতজ্ঞ। পাব্‌লিক লাইব্রেরী হইতে দ্বারভাঙ্গা জেলার সমস্তিপুরে নারহাম-কোর্ট-অব-ওয়ার্ড-ষ্টেটে কাজ লইয়া যাই। তাহার পর পরলোকগত কালীনারায়ণ রায়-মহাশয় যখন পাইকপাড়ার কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের ষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হন, তখন, আমার আত্মীয় ও সুহৃৎ শ্রীযুক্ত

হরকুমার গুহের চেষ্টাতে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটার জেনারেলের অধীনে, কালী নারায়ণবাবুর আফিসে, অ্যাকাউণ্টেণ্টের পদ পাইয়া পুনরায় কলিকাতা আসি। কালীনারায়ণবাবু অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার স্থলে আমি অ্যাডমিনিষ্ট্রেটার জেনারেল ও অফিসিয়াল ট্রাষ্টির অধীনে জমিদারী বিভাগে ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হই। এ পদের জামীন দেওয়ার জন্য কয়েক সহস্র টাকার কোম্পানীর কাগজের প্রয়োজন হইয়াছিল। সে সময় আমার পরম হিতৈষী শ্রদ্ধেয় বন্ধু পরলোকগত দাশরথি লাহিড়ী মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। কত সময় আরও কত প্রকারে আমি তাঁহার সাহায্য পাইয়াছি। আজ প্রায় তের চৌদ্দ বৎসর হইতে চলিল, ম্যানেজারের কাজে, জমিদারী পরিদর্শন উপলক্ষ্যে, বাঙ্গালা ও বিহারের নানা স্থানে আমাকে সর্ব্বদাই যাইতে হয়। সেই সম্পর্কে, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ভাল মন্দ, বহু লোকের সংস্পর্শে আমাকে আসিতে হইয়াছে, এখনও প্রতিদিনই হইতেছে; ভগবানের বিশেষ দয়ায় আমি প্রায় তাহাদের সকলেরই প্রীতি ও শ্রদ্ধালাভে সমর্থ হইয়াছি। আমার সহযোগী ও অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বরাবরই বড়ই প্রীতি ও স্নেহের; একথা ভাবিতে মনে বড়ই আনন্দ হয়।

আমি ময়মনসিংহে আসিবার জন্য যে সময় বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিয়াছিলাম, আমার মাতা ঠাকুরাণী প্রতিদিনই সেই সময় আমার জন্য [illegible] করিয়া ক্রন্দন করিতেন। মাঝে মাঝে যে কয়দিন আমি বাড়ীতে থাকিতাম, সেই কয়দিন কেবল তাঁহার ক্রন্দন থামিত। মায়ের সান্ত্বনার জন্য আমি প্রথম প্রথম প্রায় প্রতি বৎসরই মাসাধিক কাল বাড়ীতে গিয়া বাস করিতাম। মা যখন তাঁহার পরলোকগমনের কয়েক মাস পূর্ব্বে কলিকাতা আসিয়া আমার গৃহে অবস্থান করেন, তখন একদিন বলিয়াছিলেন,—বহু বৎসর পরে একদিন তাঁহার হঠাৎ মনে এই ভাব আসিল যে, "আমার সন্তান কোনও কুকর্ম্ম করিয়া আমাদের হইতে পৃথক হয় নাই; ধর্ম্মের জন্য পৃথক হইয়াছে"; এই চিন্তায় তাঁহার প্রাণ শান্ত হইয়াছিল— সান্ত্বনালাভ করিয়াছিলেন। তিনি আমার স্ত্রী-পুত্রদের দেখিয়া, আমার পরিবার-মধ্যে বাস করিয়া, অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর বলিয়াছিলেন,—"আমার চারি পুত্রের মধ্যে একটী ব্রাহ্ম হইয়াছে, যদি আর একটীও ব্রাহ্ম হইত, তবে আমার আরও আনন্দ হইত।" শেষ জীবনে আমাদের প্রতি তাঁহার এরূপ স্নেহ-আশীর্ব্বাদ আমাদের কত সুখের ও আনন্দের হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া প্রাণের ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রতিদিন তাঁহার স্নেহশীল আত্মার উদ্দেশ্যে উত্থিত হয়। মা আমার পরলোক হইতে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন

শতবার্ষিক মাঘোৎসব।

'সেণ্টেনারি' মাঘোৎসব এ যে মহা মহোৎসব,
উঠিল জগতে পুনঃ জয় ব্রহ্ম রব;
জাগ জাগ নর নারী কি আনন্দ বলিহারি,
ভুঞ্জ সুখে সবে মিলে স্বর্গের বিভব।
এমন সুদিন কবে অধমের ভাগ্যে হবে,
ভাসিব আনন্দ-নীরে ভাবে হ'য়ে ভোর;
ঝরিবে প্রেমাশ্রুজল পিয়ে প্রেম-পরিমল
তাপিত তৃষিত প্রাণ জুড়াইবে মোর।
পবিত্র উৎসব-ক্ষেত্রে মিলিব সবে একত্রে,
ভ্রাতৃভাবে বিগলিত হইবে হৃদয়;
প্রেম-আলিঙ্গনপাশে, বাঁধি সবে মহোল্লাসে,
গলাগলি হ'য়ে গাব জয় ব্রহ্ম জয়।
মরতে স্বর্গের শোভা— মুনিজন-মনলোভা!
দেখাইব জগজনে উৎসব প্রাঙ্গণে;
মাতিয়ে মাতাবো সব, বিজয়-নিশান তবে
উড়াইব,—ব্রহ্ম নাম গাইব সঘনে।
করি' ব্রহ্ম জয়ধ্বনি কাঁপায়ে ব্যোম মেদিনী
মিটাইব মনোসাধ উৎসবে এবার;
দুঃখ দৈন্য পাপতাপ রোগ শোক মনস্তাপ
পাশরিব যতকিছু অনিত্য অসার।
থেকো না দূরেতে কেউ, তুলিয়ে আনন্দ ঢেউ—
ছুটে এস ভাই ভগ্নী যে যেখানে আছো;
মিলায়ে প্রেমের মেলা মহোৎসবে এই বেলা
সবে মিলে প্রেমভিক্ষা কর-যোড়ে যাচো।
বড় সাধ আছে মনে মিলি' ভাই বন্ধু সনে,
একসাথে মহোৎসব করিব সম্ভোগ;
এই ভিক্ষা বিভুপদে রাখি' দাসে নিরাপদে
করুন কামনা পূর্ণ বিতরি' সুযোগ॥

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস

ব্রাহ্মসমাজ।

শততম মাঘোৎসব

প্রেমময়ের অপার করুণায় পুনরায় আমাদের প্রিয় মাঘোৎসব সমুপস্থিত। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে শততম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবেন স্থির করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে ইহার কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। ব্যাকুল হৃদয় বিশ্বাসিগণের সম্মিলনের উপর উৎসবের সফলতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। তাই কার্য্য নির্ব্বাহক সভা উৎসবে যোগদান করিয়া উহাকে সফল করিবার জন্য সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। প্রাতে ৭ ও সন্ধ্যায় ৬॥০ ঘটিকায় কার্য্য আরম্ভ হইবে।

১লা হইতে ৩রা মাঘ (১৫ই হইতে ১৭ই জানুয়ারী) বুধ হইতে শুক্রবার—ব্রাহ্মপরিবারসমূহে এবং ছাত্রাবাস ও ছাত্রী-নিবাসে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা।

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) শনিবার—প্রাতে ব্রাহ্ম পরিবার-সমূহে এবং ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ

প্রার্থনা। সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

৫ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) রবিবার—প্রাতে ব্রাহ্মযুবকদিগের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় যুবকদিগের আলোচনা। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় বরাহনগর শ্রমজীবিগণের নগর-সঙ্কীর্ত্তন। সায়ংকালে শ্রমজীবিগণের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমচন্দ্র সরকার।

৬ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) সোমবার—(মহর্ষির পরলোক গমনের দিন) প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বেদান্তবাগীশ। সায়ংকালে আলবার্ট হলে মহর্ষি স্মৃতি সভা।

৭ই মাঘ (২১ শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী। সায়ংকালে ছাত্র সমাজের উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা।

৮ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) বুধবার—প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস। সায়ংকালে তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা—বিষয়—"ভক্তি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা"। বক্তা—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

৯ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—প্রাতে মহিলাদিগের উৎসব (ও পুরুষদিগের জন্য সিটি কলেজগৃহে পৃথক উপাসনা।) সায়ংকালে সম্মিলিত উপাসনা।

১০ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) শুক্রবার—প্রাতে কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়। অপরাহ্ণ ১ ঘটিকায় নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিসভা। সভাপতি—অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়; বক্তাগণ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্তা সুবালা আচার্য্য। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় নগর সঙ্কীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য।

১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) শনিবার—**সমস্তদিন-ব্যাপী** উৎসব। প্রত্যূষে ৫ ঘটিকায় উষাকীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। অপরাহ্ণ ১ ঘটিকায় উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় পাঠ ও ব্যাখ্যা। পাঠকগণ:—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, ভাই সীতারাম, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ইংরাজীতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ। অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকায় সংকীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) রবিবার—প্রাতে সাধনাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় আলোচনা। বিষয়—"ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার"। সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমচন্দ্র সরকার। সায়ংকালে উপাসনা। আচার্য্য—অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়।

১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) সোমবার—প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় মেরী কার্পেণ্টার হলে রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের উৎসব। সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা। (কেবল সভ্যদিগের জন্য)।

১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত। অপরাহ্ণে বালক বালিকা সম্মিলন। সায়ংকালে বক্তৃতা; বক্তা—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ।

১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) বুধবার—সায়ংকালে সঙ্গত সভার উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা; বিষয় "নিগূঢ় ধর্ম্ম—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য"। বক্তা—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বেদান্তবাগীশ।

১৬ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—সায়ংকালে কীর্ত্তনে উপাসনা।

১৭ই মাঘ (৩১শে জানুয়ারী) শুক্রবার—সায়ংকালে বক্তৃতা; বক্তা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

১৮ই মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী) শনিবার—সায়ংকালে ইংরাজীতে বক্তৃতা; বক্তা—অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়।

১৯শে মাঘ (২রা ফেব্রুয়ারী) রবিবার—প্রাতে উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন। ১ঘটিকায় তিন সমাজের মিলিত উদ্যান-সম্মিলন। সায়ংকালে উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

মফঃস্বল হইতে আগত ব্রাহ্ম অতিথিদিগের বাস ও আহারের বন্দোবস্ত করা হইবে। মফঃস্বল হইতে যাঁহারা উৎসবে যোগদান করিতে সংকল্প করিয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক উৎসব কমিটির সম্পাদককে তাঁহাদের কলিকাতা পৌঁছিবার নির্দ্দিষ্ট তারিখ জানাইলে অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত হইতে পারে।

প্রচার—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় গত ৭ই নবেম্বর ভাগলপুর গমন করিয়া ৪ দিন ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন। একদিন জলা কুঠিতে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জন্মদিন উপলক্ষে, আর একদিন পরলোকগত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে প্রার্থনা, উপাসনা ও সঙ্গীতাদি করেন। ২৫শে নবেম্বর মুঙ্গের গমন করিয়া একদিন একটী ব্রহ্মবিদ্যালয়ে এবং একদিন মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে উপাসনা ও সঙ্গীতাদি করেন। ২৭শে নবেম্বর কাশী গমন করিয়া দুই দিন উপাসনা, ধর্ম্মব্যাখ্যা, সঙ্গীত এবং দুই দিন কথকতা করেন। ২৮শে ডিসেম্বর খড়্গপুরের সন্নিকটস্থ বলরামপুর গমন করিয়া সীতানাথ বক্সীর বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানোপলক্ষে উপাসনা ও সঙ্গীতাদি করেন এবং স্কুলবাড়ীতে অপরাহ্ণকালে কথকতা করেন। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে শতাধিক গরীব লোকদের চিঁড়া গুড় বিতরণ করা হয়।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে:—

বিগত ১লা জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত মন্মথনাথ দত্তের কন্যা কল্যাণী দত্ত দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। বিগত ১২ই জানুয়ারী তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হইয়াছে। তাহাতে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১লা জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে ভাগলপুর প্রবাসী বাবু সতীন্দ্রমোহন বসু অল্পদিনের অসুখে হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১লা জানুয়ারী দিল্লী নগরীতে পরলোকগত মধুসূদন সরকারের পত্নী (শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সরকারের মাতা) পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ১১ই ডিসেম্বর ঢাকা নগরীতে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসুর মাতা ও কলিকাতা নগরীতে তাঁহার ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ৫ই জানুয়ারী দমদম ক্যাণ্টনমেণ্টে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের কন্যা দীপালীর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ১৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ৬ই জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ প্রচারক রেভাঃ ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া ৮১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নানা প্রকারে দীর্ঘকাল ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন।

বিগত ২৬শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ নগরীতে পরলোগত হেমন্তকুমারী সেনের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদিগের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ৩রা জানুয়ারী জব্বলপুর নগরীতে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র রায়ের কন্যা কল্যাণীয়া পূর্ণিমা ও ঢাকা নিবাসী শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রমোহন শীলের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ২৬শে ডিসেম্বর, দিল্লী নগরীতে, লাহোর প্রবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সরকারের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া [illegible] ও [illegible] নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] সেনের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান সুবোধকুমারের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

আন্দুল ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে আন্দুল ব্রাহ্মসমাজের ৪৬তম সাম্বৎসরিক নবনির্ম্মিত উপাসনাগৃহে সম্পন্ন হইয়াছে :—

৪ঠা জানুয়ারী উদ্বোধন উপলক্ষে আলোচনা ও বক্তৃতা হয়। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ মল্লিক, ও শ্রীযুক্ত মণি-বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন। ৫ই জানুয়ারী প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত মণিলাল দে সঙ্গীত করেন মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন ও সায়ংকালে আবার উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত অপর্ণচরণ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। আগামী বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতি, শ্রীযুক্ত, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক, শ্রীযুক্ত অভয়চরণ দাস ও শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মল্লিক সহকারী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত অপর্ণচরণ ভট্টাচার্য্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভায় আন্দুল ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

জাতকর্ম্ম—গত ২৫শে ডিসেম্বর, দিল্লী নগরীতে, কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দত্তের তৃতীয় সন্তানের (দ্বিতীয়া কন্যার) জাতকর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

যুগধর্ম্ম বার্ত্তা—লাকিনা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন প্রণীত ও উক্ত সমাজের হীরকজুবিলী উৎসব উপলক্ষে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রকাশিত। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য, ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটি বাণী, কয়েকটি কীর্ত্তন, একটি স্তোত্র ও যুগধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের সরল ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা হইবে।

২। **মৈত্র্যুপনিষদ্**—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত। মূল্য (কাপড় বাঁধান) ১৲ টাকা। ইহাতে মূল, সরল টীকা ও বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে এবং পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ লিখিত একটি ভূমিকা আছে। টীকা ও অনুবাদ দুই-ই বেশ প্রাঞ্জল হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে যে মন্তব্য আছে তাহাতে অনেক বিষয় আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে। ইহাতে মূলের মর্ম্ম গ্রহণ করা সকলের পক্ষেই বেশ সহজ হইবে। ভূমিকা হইতে এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা পাওয়া যাইবে। এই অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত উপনিষদ্ খানা প্রকাশ করিয়া ধীরেন্দ্র বাবু মহা [illegible] পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

৩। **আত্মজীবন স্মৃতি**—শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক বিবৃত। মূল্য ১৷৹ টাকা। ইহাতে তাঁহার জীবনে ভগবানের লীলা বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তৎসঙ্গে সংক্ষেপে খাসিয়া জাতির ইতিহাস ও খাসিয়া মিসনের বিবরণও আছে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি মাত্রই ইহা পাঠে উপকার লাভ করিবেন। আমরা ইহার বহুল প্রচার [illegible]।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৭শে জানুয়ারী সোমবার সন্ধ্যা ৬৷৹ ঘটিকার সময় সমাজের উপাসনামন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সভ্যদিগকে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

আলোচ্য বিষয় :—

১। বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী ও হিসাব। ২। সভাপতির অভিভাষণ। ৩। কর্ম্মচারী নিয়োগ। ৪। অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ। ৫। সৌভ্রাতৃসূচক অভিবাদন ও ধন্যবাদ প্রদান। ৬। বিবিধ।

২১১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
৩০শে নবেম্বর, ১৯২৯

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

ভ্রম সংশোধন

১৬ই পৌষের তত্ত্বকৌমুদীতে "রাজা রামমোহন রায়" প্রবন্ধের ১ম প্যারার ১ম, ১৮শ ও ২০শ লাইনে "আর্য্য-কৃষ্টের" স্থলে "আর্য্য-কৃষ্টি" হইবে।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ২রা মাঘ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি এ।

Registered No. 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫২ম ভাগ
২১শ ও ২২শ সংখ্যা।

১লা ও ১৬ই ফাল্গুন, বৃহস্পতি ও শুক্রবার, ১৩৩৬,
১৮৫১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০১
13th and 28th February, 1930.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে প্রেমস্বরূপ, তুমি ত নিয়তই কত প্রকারে আমাদিগকে তোমার অপার প্রেমের পরিচয় দিতেছ এবং উৎসবের মধ্যে আমও কত উজ্জ্বলরূপে দিয়াছ! তবুও আমাদের হৃদয় প্রেম ও কৃতজ্ঞতাতে কেন যে একেবারে পূর্ণ হইয়া উঠে না, আমরা চিরতরে তোমার কেনা হইয়া যাই না, বুঝিতে পারি না। জীবনে ত বহু বারই দেখিতেছি, তোমার এত করুণা পাইয়াও আবার ভুলিয়া যাই, অকৃতজ্ঞের ন্যায় সংসারে বিচরণ করি। আমাদের এই অপরাধ ত কিছুতেই যাইতেছে না। হে অন্তরদর্শী দেবতা, অন্তরের গোপন পাপ মলিনতা তুমিই বিশেষরূপে জান,—অনেক সময়ই আমরা তাহা ভাল করিয়া ধরিতে পারি না। আমাদের শত অপরাধ সত্ত্বেও তুমি ত আমাদিগকে কখনও পরিত্যাগ কর নাই—সকল অবস্থাতেই সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া হাত ধরিয়া নিয়া আসিয়াছ। আমরা কেন এখনও সম্পূর্ণরূপে তোমার হইতে পারিতেছি না! তুমি এবার কৃপা করিয়া আমাদিগের এই দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেও। এই উৎসবের ফল যেন আমাদের জীবনে আর ব্যর্থ না হয়, উৎসবান্তে আমাদের এই প্রার্থনা। আমরা যেন আর তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া সংসারে মজিয়া না থাকি। এবার তুমি আমাদিগকে চিরদিনের জন্য তোমার করিয়া লও, আমাদের হৃদয় প্রেমে ও কৃতজ্ঞতাতে চির অনুগত করিয়া দেও। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রত্যেক জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

শততম মাঘোৎসব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৮ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) বুধবার— প্রাতে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "সাধন সঙ্কেত" বিষয়ে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করেন:—

আজ সাধন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। এই সব কথা যে আমি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাতে লাভ করিয়াছি তাহা নহে। সাধু বাক্য শুনিয়া ও পাঠ করিয়া, এবং কতক কতক নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলাইয়া, এই সত্যগুলি সাধনপথের সহায় বলিয়া মনে করিতেছি। আমার এই কয়েকটী কথা আচার্য্যগণ নানা ভাবে এই বেদী হইতে বলিয়াছেন; আমিও মধ্যে মধ্যে বলিয়াছি; এইগুলি কোনও শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে লেখা হয় নাই। আর, সব কথা বলিবারও সময় ও সুবিধা নাই; তাই এলোমেলো ভাবে দুই চারিটি কথা বলিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করি।

ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে, ঈশ্বরের স্পর্শ প্রাণে অনুভব করিতে হইলে, তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা প্রয়োজন। অবশ্য "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্"—তাঁর কৃপাই একমাত্র সম্বল। জীবনের অভিজ্ঞতাতে আপনারাও জানিয়াছেন, আমিও জানিয়াছি, আমাদের জ্ঞান প্রেম সাধনার জোরে তাঁকে প্রকাশ করা যায় না। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ—যাকে এই আত্মা বরণ করেন, সেই তাঁকে পায়।

"তুমি যখন দেখাও তোমাকে মানুষ তখনই দেখিতে পায়।
শুধু জ্ঞান প্রেমের অভিমানে তোমায় কি দেখিতে পায়?"

তিনি মরুভূমিতে জলের স্রোত প্রবাহিত করেন, শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত করেন। তিনি কখন কোন্ অবস্থায় কোন্ পথ দিয়া আস্‌বেন, প্রাণ স্পর্শ কর্‌বেন, তা জানি না। কিন্তু আমার দিক দিয়া আমাকে প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌তে হবে; তিনি আস্‌বেনই, করুণা কর্‌বেনই, এই আশা ল'য়ে পথপানে চেয়ে থাক্‌তে হবে; আমার চেষ্টা ও সাধনায় তিনি সহায় হবেন। শুষ্ক প্রাণ ল'য়েও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে হবে।

সহসা একদা আপনা হইতে
ভরি' দিবে তুমি তোমার অমৃতে,
সেই ভরসায় করি পদতলে
শূন্য হৃদয় দান।

আমি যে তাঁর করুণার দিকে চেয়ে থাকব, তাঁর আশায় আশায় ব'সে থাক্‌ব, তার একটা মূল কথা এই—তাঁ'তেই সম্পূর্ণ নির্ভর—তাঁ'তেই আত্মসমর্পণ। কথাটার মধ্যে অনেক তত্ত্ব নিহিত আছে। আমি তাঁকেও চাহিব, তাঁরও দাস হব, আর সংসারেও সুখ অন্বেষণ কর্‌ব, তাহা হয় না। আমি যদি বলি, 'সব তুমি নেও প্রভু, কিন্তু আমার ঐ সুখটুকু ছাড়্‌তে পার্‌ব না, এখানে তুমি হাত দিও না"—তা হ'লে হবে না।

No man can serve two masters; for, either he will hate the one and love the other or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and Mammon.

কেহই দুই মনিবের চাকরী করিতে পারে না; সে এক জনকে ভালবাসিবে, আর অপর জনকে ত্যাগ করিবে; ঈশ্বর ও সংসার, এই উভয়েরই পূজা এক সময়ে হয় না।

সুতরাং ধর্ম্ম ও সংসারে সন্ধি করা চলে না; কতকটা ধর্ম্ম কর্‌ব আর কতকটা আপনার সুখের পশ্চাতে ছুটব, তা হবে না। হয় ধর্ম্ম কর, সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ কর, নতুবা দশ জনের মত সংসারের সুখলালসা ল'য়ে থাক। সুতরাং ধর্ম্মসাধনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য এই, ঈশ্বরেই সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ; আমাদের সমগ্র সাধন সেই দিকে চালিত হইবে। তবে কি সংসার হইতে দূরে চ'লে যেতে হবে? তাহা নয়; তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করলে তিনিই ব'লে দিবেন সংসারের সঙ্গে এইভাবে লিপ্ত হও, এই সব সুখ তুমি ভোগ কর, এইভাবে সংসারের কাজ কর, এইভাবে লোকশ্রেয়ঃ সাধন কর। তোমার জীবনের সব কর্ত্তব্যগুলি তিনি নিয়মিত ক'রে দিবেন। তিনি তোমাকে যাহা দিবেন তাহা তুমি আনন্দে গ্রহণ কর্‌বে। তাঁর প্রেমে রঞ্জিত হ'য়ে এই সুন্দর ধরণী সম্ভোগ করিবে। তোমার অর্থ শক্তি সময়, তোমার বিদ্যা বুদ্ধি সমগ্র জীবন তাঁহারই। তিনি তোমার প্রাণে যে ভাব জাগ্রত কর্‌বেন, তদনুসারে তোমাকে চল্‌তে হবে। তাহাতে সময় শক্তি অর্থ জীবন যৌবন নিযুক্ত কর্‌তে হবে। তাঁহার নাম করিবে, তাঁহার ধ্যান কর্‌বে, তাঁহার অর্চ্চনা কর্‌বে। তাহা নিশ্চয়ই মিষ্ট লাগ্‌বে; কিন্তু এই মিষ্টতার লোভে অনেকে তাঁর নিয়োজিত কার্য্য অনেক সময় অবহেলা করে। ম্যাডাম্ গেয়োঁ বলেছেন, এক সময়ে তিনি ঈশ্বরের সহবাসে এত আনন্দ পেতেন যে তাঁর স্বামী ও শাশুড়ীর নিকট হইতে যতটুকু সময়ের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেন তাহা অতিক্রম হ'য়ে যেত। তিনি তখনই বুঝ্‌তে পার্‌লেন, এ তাঁর অন্যায়, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। ঈশ্বরের নিকট বসাতে সুখ আছে, মিষ্টত্ব আছে, আনন্দ আছে। কিন্তু আমি যে তাঁর ভৃত্য—তাঁর Providences—আমার জন্য নির্দিষ্ট কর্ত্তব্য—তাহা তিক্ত হ'লেও, সেখানে গঞ্জনা উৎপীড়ন সহ্য কর্‌তে হ'লেও, ঐ মিষ্ট সঙ্গ ত্যাগ ক'রে তাহাও সময় মত কর্‌তে হইবে। হয় ত আমার অর্থ শুভ কার্য্যে দিতে তিনি বল্‌বেন, আমার অর্থ আছে তাহা তাঁর আদেশে ব্যয় হ'লো, আমাকে অনাহারে, অল্পাহারে দিন কাটাতে হ'লো; তিনি হয় ত আমাকে দুঃখ দিবেন, শোক দিবেন, গঞ্জনা দিবেন, উৎপীড়ন দিবেন, তাহাও আনন্দে সহ্য কর্‌তে হবে। তিনি হয়ত এমন কাজে আমাকে পাঠাবেন, যে কাজে কেহ সহায় নাই, যে কাজে প্রশংসা নাই, লোকের সহানুভূতি নাই, দুঃখে পড়লে একটু "আহা!" বল্‌বার কেহ নাই; আমাকে আনন্দে, বিনা আপত্তিতে, সেই কাজে যেতে হবে।

তুমি যদি বল, এখনই করিব
বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন।

প্রভু, আমি তোমারই দুয়ারে ক্রীত দাসরূপে দাঁড়াইয়া আছি; তুমিই আমার জীবনস্বামী; আমার এই দেহ মন প্রাণ, শক্তি সময় অর্থ, সবই তোমার চরণে দিয়াছি—আমি কাণ পেতে আছি—তোমার কি আদেশ—তাহা এখনই পালন কর্‌ব; আমি মস্তক পেতে আছি—কি ভার তুমি দিবে, তাহাই বহন কর্‌ব। তুমি যে দুঃখ দৈন্য দিবে, আনন্দে তাহা সহ্য করিব। আমি যে তোমারই। অবশ্য এই ভাব এক দিনে হয় না—কিন্তু এই দিকে লক্ষ্য রেখে সাধনপথে অগ্রসর হ'তে হইবে। প্রতিদিন পরীক্ষা কর্‌তে হবে—কতদূর অগ্রসর হয়েছি।

ধর্ম্মসাধনের একটী প্রধান অন্তরায় প্রেমের অভাব। প্রেম চাই—ঈশ্বরপ্রেম-নিঃসৃত মানবপ্রেম চাই। যীশুখৃষ্ট বলেছেন, যদি তুমি পূজার নৈবেদ্য নিয়ে বেদীর সম্মুখে এসে থাক—আর তখন যদি তোমার মনে পড়ে, কাহারও সঙ্গে তোমার মনের অমিলন আছে, তবে নৈবেদ্য রেখে যেয়ে আগে তার সঙ্গে মিলন ক'রে এস; তবে পূজার নৈবেদ্য প্রদান কর্‌বে, নতুবা তোমার পূজা গৃহীত হবে না। যীশুখৃষ্ট যাহা বলেছেন, সকল সাধুই সেই কথায়ই সায় দিবেন। কারও প্রতি বিরূপ ভাব থাক্‌লে ঈশ্বরের পূজা করা যায় না—চিত্ত তাঁর প্রেমরসে ডুব্‌তে চায় না। তুমি তাঁকে ভালবাস্‌তে চাও আর তাঁর সন্তানকে ভালবাস্‌বে না! তুমি প্রভুর কাছে ক্ষমা চাও, আর তুমি তাঁর সন্তানকে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বে না! যে তোমাকে ভালবাসে, কেবল তাকেই ভালবাস্‌লে চল্‌বে না; সেরূপ ভালবাসা ত সকলেরই আছে; যে তোমাকে ঘৃণা করে, যে তোমার অনিষ্টচিন্তা করে, অনিষ্ট-চেষ্টা করে, যে তোমার প্রেমের অপমান করে,—তুমি ভালবাস্‌তে

চাও, সে তোমাকে উপেক্ষা করে, তোমার কুৎসা করে, তাকেও ভালবাস্তে হবে, তারও কল্যাণচিন্তা ও কল্যাণচেষ্টা কর্‌তে হবে; যে হস্ত তোমাকে আঘাত কর্‌তে উদ্যত হ'য়েছে, সেই হস্ত চুম্বন কর্‌তে হবে। যীশুখৃষ্টকে যাহারা ক্রুশবিদ্ধ কর্‌ল তাদের জন্য তিনি প্রার্থনা কর্‌লেন—পিতা এদের ক্ষমা কর—কারণ এরা কি করিতেছে, তা বুঝিতে পারিতেছে না। যে অনিষ্ট করে, তাকে কেবল ক্ষমা কর্‌লে চল্‌বে না, তাকে ভাল বাস্‌তে হবে। ঐ যে প্রিয়জনও অনেক সময় উপেক্ষা করে, অনিষ্টচেষ্টা করে, তাকেও যে ভালবাস্‌বে; এখানেই তোমার প্রেমের শিক্ষা ও প্রেমের পরীক্ষা। আমরা কত অপরাধ করি, তবুও আমাদের প্রভু যিনি, তিনি কত ভালবাসেন—তিনি আমাদের জন্য কত ব্যস্ত! তোমাকেও সেইরূপ ভাল বাস্‌তে হবে। যে দূরে চ'লে গেল, যে পাপপঙ্কে ডুব্‌ল—তাহাকে আরও দূরে ঠেলে দিও না, তাকে আরও গর্ত্তে ডুব্‌তে দিও না, তাকেও টেনে আন—

প্রেমে ডাকি তারে, যে গিয়েছে দূরে,
পড়ে গেছে যে বা, তুলি স্নেহ ভরে।

অপ্রেম মনকে উত্তেজিত করে, মনের শান্ত ভাব নষ্ট করে; চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে। প্রেমের সাধন চাই। প্রেমে চিত্ত প্রসন্ন করে, মন উন্নত করে, হৃদয় বিস্তৃত করে, দৃষ্টি কোমল করে, চরিত্র শুদ্ধ করে। প্রেম অনেক সহ্য করে, অনেক বোঝা বহন কর্‌তে সমর্থ করে, প্রেম শত্রুকে মিত্র করে, দূরকে নিকট করে, অজানাকে চিনিয়ে দেয়। ধর্ম্মপথে অগ্রসর হ'তে হ'লে এই প্রেমসাধনা চাই।

ধর্ম্মসাধন কর্‌তে হ'লে সর্ব্বদা খাঁটি পথে চল্‌তে হবে, সত্যান্ন প্রমদিতব্যং—সত্য হইতে একটুও বিচলিত হবে না। কেবল বাক্যে সত্য অবলম্বন কর্‌লে চল্‌বে না, চিন্তা, ভাব, বাক্য, কার্য্য সকলই সত্য হবে। যাহা ঘটেছে, তাহা ত সত্য ভাবে চিন্তা কর্‌তে হবেই, সত্য ভাবে বর্ণনা কর্‌তে হবেই, যাহা কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে সত্য সন্ধান কর্‌তে হবে, সত্যের অনুসরণ কর্‌তে হবে। এখানে সত্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে একটু ভ্রান্ত ধারণা আছে। যে কোনও ভাব মনে আসে, তাহার অনুসরণ করাই অনেকে সত্যের অনুসরণ করা হলো মনে করেন। তাহা নহে। facts—ঘটনা, আর truths—সত্য, ইহাদের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। facts যাহা তাহা স্বীকার কর্‌তে হবে, কিন্তু truths যাহা, Eternal verities যাহা, তাহারই অনুসরণ কর্‌তে হবে। আমার মনে একটা কুবাসনা জাগ্‌ল, একজনের জিনিষে লোভ হলো—ইহা fact, ইহার অনুসরণ কর্‌তে হবে না। কিন্তু সত্যের অনুসন্ধানে যেয়ে ভগবান্ যে চিরন্তন সত্য—Eeternal verities আমার প্রাণে প্রকাশিত করেন, আমাকে তাহার অনুসরণ কর্‌তেই হবে।

কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা, নির্ভয়ে করিব তাহা,
যায় যাক্, থাক থাক্, ধন প্রাণ মান রে,
পিতাকে ধরিয়া র'ব পর্ব্বত সমান রে।

সর্ব্বদা আত্মপরীক্ষা কর্‌তে হবে, যেন চিন্তা ভাব বাক্য ও কার্য্যে একটুও সত্য হইতে বিচলিত না হই। অনেকের ধারণা এই যে, নিজের স্বার্থের জন্য অসত্য পথ অবলম্বন করা উচিত নয়, কিন্তু দেশের কাজে, দশের কাজে, যদি সত্য হইতে একটু ভ্রষ্ট হইলে কাজটা সহজ হয়, তবে সেখানে অসত্য পথ অবলম্বনে দোষ নাই—End justifies the means—উদ্দেশ্য সৎ হইলেই হলো, পন্থা যেরূপই হউক। তাহা ত ধর্ম্মের পথ নহে, উহা পাটোয়ারী বুদ্ধির কথা। আমাকে সত্য পথ ধ'রে চল্‌তে হবে। জীবনে সত্য অবলম্বন কর্‌তে গিয়া মানুষকে কত নির্য্যাতন সহ্য কর্‌তে হ'য়েছে—কত সাধু পুরুষ, কত দেশ-প্রেমিক, কত বৈজ্ঞানিক কর্ম্মীকে নির্য্যাতিত, অনেক সময় মৃত্যু-মুখে পতিত হ'তে হয়েছে। আমাদিগের মধ্যেও কত জনকে কত ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয়েছে, কত লাঞ্ছনা সহ্য কর্‌তে হয়েছে, কত জনকে গৃহ হ'তে বিতাড়িত হ'তে হয়েছে, পিতৃমাতৃস্নেহে বঞ্চিত হ'তে হয়েছে। পরিবার খেতে পায় না, একটু সত্য হ'তে বিচলিত হ'লে কেমন সুখে দিন কাটান যায়—তা হবে না—সত্য ধ'রে চল্‌তে হবে। আকাশ ভেঙ্গে পড়ুক—তবুও সত্যকে অনুসরণ কর্‌তে হবে। সত্য হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে দেশের ও দশেরও কাজ করা চল্‌বে না। জীবন দিয়া পরসেবা কর, দেশের কাজ কর, কিন্তু সত্য—খাঁটি সত্য, নিখুঁত সত্য ধ'রে চল। সত্যস্বরূপের পূজা অসত্য-দ্বারা হয় না।

চিত্তকে পবিত্র রাখ্‌তে হবে—যাদের চিত্ত চঞ্চল, যাহার মনে কলুষিত ভাব জাগে, তাহার হৃদয়ে পবিত্রস্বরূপের প্রকাশ হয় না। মলিন দর্পণে মুখ দেখা যায় না। অপরিস্কৃত জলে প্রতিবিম্ব পড়ে না। চিত্ত নির্ম্মল না হ'লে সেখানে ঈশ্বরের প্রকাশ হয় না। কেবল দুষ্কার্য্য হ'তে বিরত থাকলেই চল্‌বে না। ইহা ত সহজ; মনে একটুও কলুষ ভাব, কলুষ চিন্তা না আসে, সতর্ক ভাবে তাহা দেখ্‌তে হবে, সর্ব্বদা মনের উপর তীক্ষ্ণ রাখতে হবে। Blessed are the pure in heart, for they shall see God—যাঁদের চিত্ত শুদ্ধ তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবেন। জীবনের আরম্ভ হইতেই সংযম—ব্রহ্মচর্য্য—অবলম্বন করা প্রয়োজন। মনকে কলুষ চিন্তা দ্বারা, বিলাসবিভ্রম দ্বারা, সুখের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা বিক্ষিপ্ত করিও না। মিতাচারী হও, সংযত হও, পবিত্র হও, বিলাস ব্যসন পরিত্যাগ কর, শুদ্ধ চিত্ত হ'য়ে ঈশ্বরের নাম কর।

ঈশ্বরের দ্বারে বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার আদেশপালনের জন্য প্রতীক্ষা কর্‌তে হবে—সর্ব্বদা কাণ পেতে থাক্‌তে হবে। প্রভুর আদেশ কোন্ ভাবে কখন আসে, তাহার জন্য উৎকর্ণ হ'য়ে থাক্‌তে হবে। দুই ভাবে ডাক আসে—এক সাধারণ ভাবে—আর এক বিশেষ ভাবে। প্রভু ভিতরে আছেন, দশজন ভৃত্য বাহিরে, ভিতরে ঘণ্টা বাজ্‌ল—প্রভুর প্রয়োজন হ'য়েছে, ভৃত্যেরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে, কে প্রভুর ডাকে সাড়া দিবে। প্রত্যেকেই ভাবে—আমাকে ডাকছেন না, অন্যে ডাক শুনুক। বিশ্বস্ত ভৃত্যের এ কাজ নয়; সে যেই ঘণ্টা শুন্‌বে,

অমনি সাড়া দিবে, সেবার জন্য অগ্রসর হবে। কত ভাবে কর্ম্মের ডাক আসে—মানবের কত দৈন্য দুঃখ, দেশের কত দুর্দ্দশা! কর্ম্মক্ষেত্র কত প্রশস্ত!—সমাজের সেবা, ঈশ্বরের নাম প্রচার, কত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান! কর্ম্মীর অভাবে, অর্থের অভাবে সব নষ্ট হ'চ্ছে। তোমার কি প্রাণে ডাক আসে না? তুমি কি ভাববে—কত লোক রয়েছে, কত লোকের অর্থ আছে, শক্তি আছে, তাদের জন্য এই কার্য্যক্ষেত্র—তাদের জন্যই আহ্বান, আমি না গেলাম। বিশ্বস্ত ভৃত্যের এ কথা নয়, এ ভাব নয়। ডাক তোমার জন্যই এসেছে—ব্যথিতের ক্রন্দন তোমার কাণেই পৌঁছিতেছে, দেশ আজ তোমার সেবাই চাহিতেছে; তোমার শক্তি, অর্থই চাহিতেছে। ঈশ্বরের ডাক শোন—অন্যে কি করে না করে তাহা দেখিও না—তোমার যাহা আছে তাহা দাও; সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলি নষ্ট হ'লো—লোক নাই, অর্থ নাই, কেবল এরূপ ক্রন্দন করলে হবে না। তোমার যা আছে সব কি দিয়েছ? নতুবা তোমার কথা বল্‌বার অধিকার নাই। তারপর তোমার নিজেরও প্রাণে ডাক আসে—তখন কাণ বুজে থেকো না—ঈশ্বরের ডাক কল্পনা ব'লে উড়াইয়া দিও না। এক জন লোক—চালাক ভৃত্য ছিল—সে তার পুত্র যখন চাকরী লয়, তখন একটি উপদেশ দিয়াছিল—দেখ, মনিবের চোখের সম্মুখে কখনও থাকবে না, আর এক ডাকে সাড়া দিবে না। হয় ত কাছে থাকলে, ঠিক এক ডাকে সাড়া দিলে, অমনি সে কাজ যেয়ে করতে হবে—যদি কাছে না থাক, বা এক ডাকে সাড়া না দেও, তবে হয় ত মনিব সে কাজটি নিজেই ক'রে নেবেন। আমাদেরও অনেকেই প্রভুর নিকট হ'তে দূরে থাকতে ভাল বাসি, তাঁর ডাক প্রাণে এলেও সাড়া দেই না। প্রভু নিজের কাজ নিজে করেন—আমরা আর ডাক শুনি না; না—এরূপ নয়। কাণ পেতে থাকতে হবে—তাঁর আদেশ কত ভাবে তোমার প্রাণে আসে, তাহা কল্পনা ব'লে উড়িয়ে দিও না; তিনি ডাকলেই সাড়া দিবে—তাঁর বাণী শুনবার জন্য, আদেশ শুনবার জন্য প্রার্থনা সহকারে কাণ পেতে থাকবে। আর যখন শুনবে, তৎক্ষণাৎ তাহা করবে। নতুবা ধর্ম্মজীবনগঠন হবে না। তোমাকে সব স্বার্থ হয় ত বিসর্জ্জন দিতে হবে—সমগ্র অর্থ দিতে হবে, বিপদসঙ্কুল পথে চলতে হবে, অপমান বরণ করতে হবে, প্রভুর আদেশে সবই করতে হবে। ইহাই বিশ্বস্ত ভৃত্যের লক্ষণ।

ধর্ম্মসাধন করতে গেলে কোনও অধিকার দাবী করতে নাই; এখানে কেবল সেবার অধিকার; কোনও পদ মান, প্রভুত্বের অধিকার নাই। রাজনীতি-ক্ষেত্রে মানুষ অধিকার দাবী করে, অধিকারলাভের জন্য সংগ্রাম হয়, রক্তপাত হয়। কিন্তু ঈশ্বর-সেবক কেবল সেবাই করিবেন—আমাকে কিম্বা আমাদের দলকে অধিকার দিতে হবে—আমরা সমগ্র কর্ম্মীমণ্ডলে উচ্চপদ লাভ করব—সমাজব্যবস্থায় আমরা প্রতিষ্ঠা লাভ করব—এ ভাব, এ চিন্তা আসিলে ধর্ম্মসাধনের পক্ষে বাধা হয়। আপনাকে বিলোপ ক'রে ঈশ্বরের সেবাবোধে কর্ম্ম ক'রে যেতে হবে। আমি সকলের নীচে—

"দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া
নিত্য কল্যাণ কাজে হে।"
"দীন হীন কাঙ্গালের বেশে
ব'সে থাকব এক পাশে।"

সকল প্রকার পদ মানের আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন ক'রে সেবাব্রত গ্রহণ করতে হবে।

দেশের ও দশের কাজ করতে যেয়ে আপনার প্রতিষ্ঠা চাইবে না; আপনার শক্তি, সামর্থ্য, অর্থ, ঈশ্বরের প্রীতি-প্রেরণায়, তাঁরই নির্দ্দেশে শুভ কার্য্যে নিয়োজিত করবে; আমার দ্বারাই এই কাজটি হউক, আমার সম্প্রদায়ের দ্বারাই এই কাজটি হউক, আমার কিম্বা আমার সম্প্রদায়েরই নাম হউক, লোকে প্রশংসা করুক, তাহা লক্ষ্য থাকবে না—যে কাজ তোমার হাতে আসবে, তুমি ঈশ্বরের ভৃত্য হ'য়ে তাহা বিনীত ভাবে করবে। তুমি যে কাজের উপযুক্ত আপনাকে মনে কর, যে পদ লাভ করতে তোমার যোগ্যতা আছে মনে কর, তাহা যদি না আসে, কোনও অভিযোগ করবে না, মনে মনেও বিরক্ত হবে না; ঈশ্বরের ভৃত্য তুমি, অন্যকে উচ্চ পদ দিয়ে তুমি সামান্য কার্য্য ক'রে যাবে। ঈশ্বরের রাজ্যে অনন্ত কর্ম্মক্ষেত্র রয়েছে, কর্ম্মের জন্য, সেবার জন্য ঝগড়া করবার প্রয়োজন নাই। তুমি যদি মেথরের কার্য্যেও নিযুক্ত হও, তাহাও কৃতজ্ঞ অন্তরে গ্রহণ করবে—এবং সন্তুষ্টচিত্তে সমাধান করবে। তোমাকে কাজে নিল না ব'লে অভিমান করো না—কাজটি অসম্পন্ন থাকুক, সে ভাব তোমার মনে যেন না আসে; যখনই তোমার কোনও রূপ সাহায্য প্রয়োজন হবে, তখনই তাহা করবে। তুমি যে প্রভুর দাস—তোমার প্রতিষ্ঠা, তোমার কাজের প্রতিষ্ঠা, ইহা তোমার লক্ষ্য হবে না। ঈশ্বরের নামে এসেছ, তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করেছ, তাঁর দাসত্ব গ্রহণ করেছ, আবার তোমার মনে অভিযোগ আসছে,—আমি এত কাজ করলাম, সমাজের, দেশের, মানবের এত সেবা করলাম, এত স্বার্থত্যাগ করলাম, আমার আদর হলো না, আমার প্রাপ্য লোকে দিল না, লোকে আমায় উপযুক্ত সম্মান করল না! ইহা অবিশ্বাসীর অভিযোগ; প্রভু যাহা দিবেন, যে অবস্থায় রাখবেন, তোমার জন্য যে ব্যবস্থা করবেন, অম্লান-বদনে, সন্তুষ্টচিত্তে, তাহাই গ্রহণ করতে হবে,—অভিযোগ করবার অধিকার নাই। কেবল দিয়াই যাবে, পাবার জন্য ব্যস্ত হবে না। তোমার সেবা দিবার অধিকার আছে—কোনও কিছু পাবার অধিকার নাই। হয়ত অনেক সময় কাজ করতে যেয়ে নিন্দা নির্য্যাতন বরণ করতে হবে—তাহা ঈশ্বরের নামে মাথায় মণি ব'লে গ্রহণ করবে।

জীবনপথে চলতে যেয়ে অনেক অযথা নিন্দা গ্লানি সহ্য করতে হয়। যাঁরা আপনার লোক তাঁরাও সব সময় সব কথা না জেনে, না জিজ্ঞাসা ক'রে, নিন্দা করে। ধর্ম্মসাধনের প্রধান কথা এই—কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে না; আত্মপক্ষ সমর্থন করবে না। কেহ অভিযোগ করলে, তাহার প্রতিবাদ করবে না। অবশ্য তুমি যদি কোনও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংসৃষ্ট থাক—আর সেই প্রতিষ্ঠানের অযথা নিন্দা হয়, অথবা তার

বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়, তবে তুমি সেই প্রতিষ্ঠানের দোষ প্রক্ষালনের চেষ্টা কর্‌তে পার। অথবা তোমার ব্যক্তিগত নিন্দা সম্বন্ধে গোপনে বন্ধু ভাবে যদি কেহ কিছু জান্‌তে চায়, তাহা বল্‌তে পার। কিন্তু সাধারণতঃ কাহারও বিরুদ্ধে লোকের কাছে, সমাজের কাছে, কিম্বা রাজদ্বারে অভিযোগ কর্‌বে না, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হ'লেও, নিন্দা গ্লানি প্রচার হ'লেও, আপনার দোষক্ষালনের চেষ্টা কর্‌বে না, আত্মসমর্থন কর্‌বে না। ধর্ম্মসাধনের পক্ষে এই নিয়মটি অবশ্য প্রতিপালন কর্‌তে হবে। আত্মসমর্থন ধর্ম্মসাধনার্থীর পক্ষে সঙ্গত নহে। সকলের কথা শুন্‌বে, নানা জন নানা পন্থা বল্‌বে তাহা শুন্‌বে। কিন্তু কর্ত্তব্য ঈশ্বরের দিকে চেয়ে নিজে স্থির কর্‌বে; অন্যে কিছু বল্‌লে, নিন্দা কর্‌লে, সহ্য কর্‌বে, প্রতিবাদ কর্‌বে না।

তর্ক কর্‌বে না। জীবনের প্রথম অবস্থায় তর্ক আসে; কিন্তু তর্কে উত্তেজনা জন্মে। তর্ক সব সময় সত্যনির্ণয়ের জন্য হয় না। তর্ক হয় অনেক সময় বিতণ্ডা ও জল্পনা—আপনার মত-প্রতিষ্ঠা অথবা অন্য মতখণ্ডন—যে কোনও উপায়ে হউক। যদি কোনও কাজে তোমার মত কিম্বা অমত হয়—শুধু "হাঁ" কিম্বা "না" বল্‌লেই যথেষ্ট। যুক্তি তর্ক দ্বারা বুঝাতে চেষ্টা কর্‌বে না। অনেক সময় শুধু বা "না"রই শক্তি খুব প্রবল। অনেক সময় নীরবতার শক্তি অমুল্লঙ্ঘনীয়। তোমাকে তর্কজালে জড়িত করিতে চাহিলে তুমি তর্কে জড়িত হইবে না। নীরবে একটু হাসিবে, প্রয়োজন হইলে হয় সম্মতি না হয় অসম্মতি সূচক একটি দুইটি কথা বলিবে—তর্কে যেয়ে পড়ো না। তর্কে উত্তেজনা আসে—তর্কে মানুষকে পরাজিত করিতে পারা যায় না।

চারি দিকে তর্ক উঠে, সাজ নাহি হয়,
কথায় কথায় বাড়ে কথা,
সংশয়ের উপরেতে চাপিছে সংশয়
কেবলি বাড়িছে ব্যাকুলতা।
এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এস কেহ
পরিপূর্ণ একটি জীবন,
নীরবে কাটিয়া যাবে সকল সন্দেহ,
থেমে যাবে সহস্র বচন।
অন্ধকার নাহি যায় বিবা (বলে,
মানে না বাহির আক্রমণ,
একটি আলোকশিখা সম্মুখে ধরিলে
নীরবে করে সে পলায়ন।

তর্কজাল বিস্তার ক'রে পরাস্ত কর্‌তে চাহিও না। জীবন দেখাও—পূর্ণ জীবন, পবিত্র জীবন, ঈশ্বরানুগত জীবন, খাঁটি জীবন—দেখাও, সব কলহ, সব তর্ক, সব কোলাহল থেমে যাবে।

বহুভাষণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। বহু বাক্য বলিতে গেলে সময় নষ্ট হয়, মনের গাম্ভীর্য্য ও স্থৈর্য্য নষ্ট হয়, অনেক সময় সত্যেরও অপলাপ হয়। এমনও দেখা গিয়াছে, সম্মুখে তর্ক আলোচনা চলিতেছে, একজন সাধু ও জ্ঞানী সম্মুখে, যে বিষয়ে তর্ক ও আলোচনা চলিতেছে, সে বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ—একজন authority,—কিন্তু তিনি যেন কিছু জানেন না, এই ভাবে বসে শুন্‌ছেন। এমনি তার বাক্যসংযম ও সঙ্গে সঙ্গে চিত্তসংযম! এইরূপ বাক্য সম্বন্ধে সংযত হওয়া প্রয়োজন।

জীবনপথে অনেক দুঃখ আসে, অনেক নির্য্যাতন আসে, অনেক নিন্দা অপমান আসে, অনেক রোগ শোক আসে, প্রাণ ভেঙ্গে পড়ে। কত রকম বোঝা বহন কর্‌তে হয়! তুমি মুক্ত থাক্‌তে চাও—তুমি যে বোঝা বইতে পার না! অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহা ভগবান্ তোমার মস্তকে দেন। তুমি গরীব, তোমার উপরই দশজনের প্রতিপালনের ভার পড়্‌ল, তোমারই প্রিয়জন রুগ্ন হ'য়ে পড়িল, ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা কর্‌তে পার না, শুশ্রূষার বন্দোবস্ত হয় না। তোমারই মাথা রাখ্‌বার স্থান নাই; তখন তোমারই আশ্রয় চাহিল দশজন। তোমার প্রিয়জন ওপারে চ'লে গেল, একটি যেতে না যেতে আর একটির ডাক এল, প্রাণ ভেঙ্গে পড়্‌ল। কি কর্‌বে তুমি? এই বেদনা, এই দুঃখ কত মর্ম্মান্তিক! তার পর যখন প্রিয়জন বিগড়িয়ে যায়, তুমি কত চেষ্টা করিতেছ, কত অশ্রুপাত করিতেছ, কত প্রার্থনা করিতেছ, কিন্তু সে যে প্রাণের বন্ধন ছিন্ন ক'রে দূরে চ'লে গেল, বিপথে গেল, কোথায় যেয়ে পড়্‌ল—প্রাণ ভেঙ্গে পড়ে, আর যে পারা যায় না! তখন তুমি কি কর্‌বে? ইহাও যে ঈশ্বরের বিধান, তাঁরই মঙ্গল ইচ্ছাতে হতেছে। তুমি প্রেম ভরে তাকে ডাক্‌বে, প্রার্থনা কর্‌বে, অশ্রুপাত কর্‌বে। সকল সংগ্রাম ও পরীক্ষায় প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাক্‌বে।

Whatever a man cannot amend either in himself or in others, he ought to bear patiently, until God orders things otherw se.

Consider that it may be advantageous that it should be so, for your trial and growth in patience, without which our good deeds are of little worth.

You ought, however, when you labour under such difficulties to pray that God would vouchsafe to help you to bear them meekly.

* * *

The degree of virtue any one possesses is best manifested in times of adversity. Trials do not cause human frailty but they serve to display what a man really is.

যদি কোনও মানুষ তাহার নিজের কিম্বা অপরের জীবনে যে সকল সংগ্রাম পরীক্ষা, দুঃখ বেদনা আসে, তাহা রোধ করিতে না পারে, তবে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত তাহা তাহার সহ্য করা উচিত—যে পর্য্যন্ত ঈশ্বর অন্যরূপ ব্যবস্থা না করেন।

হয়ত তোমার পরীক্ষা ও ধৈর্য্যশিক্ষার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সংগ্রাম ও পরীক্ষা ছাড়া হয়ত আমাদের শুভ কার্য্যের কোনও মূল্যই থাকিত না।

তুমি যখন এইরূপ দুঃখ বেদনা, সংগ্রাম ও পরীক্ষার মধ্যে পড়, তখন পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও, যেন তুমি যাহাতে এই সকল শান্ত ভাবে বহন করিতে পার, তিনি তাহার সহায় হ'ন।

মানুষ যখন দুঃখে বিপদে পড়ে, তখনই তাহার ভিতরে কতটা ধর্ম্মভাব আছে, তাহার পরীক্ষা হয়। সংগ্রাম ও পরীক্ষা মানুষের দুর্ব্বলতার কারণ নহে; কিন্তু সে প্রকৃত পক্ষে কি, তাহাই উহারা প্রকাশ করে।

ঈশ্বর শিবং—মঙ্গলময়। কেবল যখন আমরা সুখে সম্পদে থাকি, মিলনের আনন্দ সম্ভোগ করি, দশজনের আদর ও প্রশংসা পাই, তখন তাঁর প্রেম ও করুণার পরিচয় পাই, তাহা নহে; ঐ দুঃখে বিপদে, ঐ শোকে তাপে, ঐ প্রিয়জনের উপেক্ষায়—ঐ প্রিয়জনের যে বিপথগমনজনিত মর্ম্মন্তুদ বেদনা, তার ভিতরেও—প্রভুর মঙ্গল অভিপ্রায় রহিয়াছে—তাঁর প্রেম ও করুণার ধারা প্রবাহিত হইতেছে। এই ক্ষুদ্র জীবনেও দেখেছি দুঃখ বিপদ, বেদনার অশ্রুজলের ভিতর দিয়াই তাঁর স্পর্শ অনুভূত হয়, তাঁর করুণা, প্রেম ও মঙ্গল ভাব প্রকাশিত হয়। তিনি দুঃখ দিয়া, বেদনা দিয়া, উপেক্ষা অপমান দিয়া, নিজে কোলে টেনে নেন—প্রেম শিক্ষা দেন, ধৈর্য্য শিক্ষা দেন, সহ্য করিবার ও বোঝা বহন করিবার শক্তি দেন। সুতরাং দুঃখ বিপদ, শোক তাপ, অপমান নির্য্যাতন, প্রিয়জনের উপেক্ষা—ইহা তুচ্ছ করিও না—তাঁর প্রেমের দান বলিয়া গ্রহণ করিবে, এর ভিতরে তাঁর প্রেমের স্পর্শ অনুভব করিবে, তাঁর মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিবে।

কর্ম্মবহুলতা ধর্ম্মসাধনের প্রতিকূল। বর্ত্তমান সময়ে কর্ম্ম-ক্ষেত্র বিস্তৃত, কিন্তু কর্ম্মীর—প্রকৃত কর্ম্মীর—সংখ্যা অল্প। যাঁরা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, তাদের উপর অনেক কর্ম্মেরই ভার আসে। কর্ম্ম করিতে করিতেই অস্থির হ'তে হয়। তাহাতে কোনও কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না। আর, স্থির হ'য়ে একটু ঈশ্বর-চরণে বস্‌বারও সময় থাকে না। কর্ম্ম কর্‌তে হবে, সকল শুভকার্য্যেই সহানুভূতি থাকবে। কিন্তু কর্ম্মের বহুলতা পরিহার কর্‌বে। প্রার্থনা সহকারে ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝে তোমার কর্ম্ম বেছে ল'বে; বেশী কর্ম্মের ভার ল'বে না। নীরবে নির্জ্জনে একান্তে ঈশ্বরচরণে বস্‌বার সময় রাখ্‌বে।

প্রতিদিন যতবার সম্ভব তাঁর চরণে বস্‌তে হবে। আমাদের যে সামাজিক উপাসনাপ্রণালী আছে—উদ্বোধন, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" মন্ত্র সাহায্যে আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা—অনেকে এই প্রণালীতে নির্জ্জনে একান্তেও উপাসনা করেন। এই প্রণালী উৎকৃষ্ট। কিন্তু এই প্রণালী ব্যতীত অন্য প্রণালীতে যে হবে না, এমন কথা কেহ বল্‌তে পারে না। ঈশ্বরের চরণে বস্‌তে হবে—তিনি এই আছেন, তিনি আমার সম্মুখে পশ্চাতে—অন্তরে বাহিরে—আমাকে দেখ্‌ছেন—ভাল বাস্‌ছেন—এই ভাবে তাঁর বিদ্যমানতা প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব ক'রে তাঁর আরাধনা ও ধ্যান কর্‌তে হবে। সব দিন সব সময় সকল স্বরূপ চিন্তা না-ও হ'তে পারে; সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন প্রার্থনা। তাঁহাকে আমি ত প্রকাশ কর্‌তে পারি না, তিনি যখন প্রকাশিত হ'বেন তখন দেখ্‌ব,—আমার সাধনায় নয়, তাঁরই অযাচিত করুণায়, তিনি—অধম, অনুপযুক্ত যে আমি, আমার প্রাণেও—এসে দেখা দিয়েছেন। আমি তাঁর চরণে প'ড়ে থাক্‌ব; বল্‌ব, প্রভু দেখা দাও, আমি দুয়ারে প'ড়ে আছি, কোলে তুলে নাও; আমি অধম, তুমি আমাকে প্রেমসলিলে ধৌত ক'রে দাও। আমাকে দয়া কর, তুমি প্রকাশিত হও। আমি সাধন ভজন জানি না, তবুও তোমার চরণে এসেছি; আমি মলিন, দুর্ব্বল, আমার এই মলিনতা ও দুর্ব্বলতা ল'য়ে তোমার চরণে এসেছি, আমার দুঃখ দৈন্য ল'য়েই তোমার চরণে এসেছি, আমার এই অশ্রুজলের অর্ঘ্য ল'য়েই তোমার চরণে এসেছি; আমার শুষ্ক হৃদয়, প্রাণে প্রেম নাই, হৃদয়ে আশা নাই, তবু ত তোমার চরণে এসেছি। দয়া কর, প্রকাশিত হও। অনেকে বলেন, প্রাণ যখন সরস থাক্‌বে, মনে যখন উপাসনার ইচ্ছা জাগ্‌বে, তখনই ঈশ্বরচরণে বস্‌বে। সাধুগণ সেরূপ বলেন না। মন যখন বিক্ষিপ্ত থাক্‌বে, চিত্ত যখন নীরস থাক্‌বে, তখনও তাঁর চরণে বস্‌তে হবে।

> গাহি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে,
> আশা করি প্রাণ পণে,
> তোমার প্রেমের সরস বরষা
> যদি নেমে আসে মনে।
> সহসা একদা আপনা হইতে
> ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে,
> সেই ভরসায় করি পদতলে
> শূন্য হৃদয় দান।——

আশান্বিত হৃদয়ে তাঁর চরণে বস্‌তে হবে। তুমি মলিন, তুমি দুর্ব্বল, কিন্তু তাঁর করুণা অসীম। তিনি সোণা ছুঁয়ে সোণা করেন। তাঁর চরণে বস্‌তে বস্‌তে প্রাণ সরস হবে, হৃদয়ে আশা জাগ্‌বে। তিনি কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। তিনি অনাথের নাথ, পাপীর বন্ধু, কাঙ্গালশরণ, পতিতপাবন। আশা ল'য়ে তাঁর চরণে বস। কেবল একবার দুইবার তাঁর চরণে বস্‌লে হবে না। আর, বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ অনিচ্ছা সত্ত্বেও, জীবনসংগ্রামের জন্য মানুষের কর্ম্মবহুলতা আসে, তাতে বেশী ক্ষণ একান্তে তাঁর চরণে বসা সকলের সম্ভব হয় না। তাই চল্‌তে ফির্‌তে কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও তাঁকে স্মরণ কর্‌তে হবে। ব্রাদার লরেন্স বলেন, তাঁহার বিদ্যমানতা অনুভব কর্‌বার সাধন কর্‌তে হবে। "এই তিনি আছেন", সব সময় এই ভাব্‌টি জাগ্রত রাখ্‌তে হবে। তুমি নিয়মিত কার্য্যের মধ্যেও, এমন কি প্রণালীবদ্ধ উপাসনার মধ্যেও, সময় সময় থেমে ভাব্‌বে এই ত তিনি রয়েছেন।

"জীবন্ত ঈশ্বর এই ত বর্ত্তমান।" চল্‌তে ফির্‌তে কর্ম্ম ব্যস্ততার মধ্যে, মনে মনে তাঁর নাম জপ কর্‌তে পার; মৃদু স্বরে তাঁর নাম জপ অথবা কোনও সঙ্গীতের পদ গান কর্‌তে পার। কিন্তু কেবল পদ আওড়াবে না, মনও যেন তাঁর দিকে ধাবিত হয়। নামের মধ্যে যে নামী সাক্ষাৎ আছেন, সেদিকে যেন লক্ষ্য থাকে। এই সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণের অভ্যাস বেশী কষ্টসাধ্য নহে। প্রথম প্রথম মন বিক্ষিপ্ত হবে, তখন মন টেনে আনতে হবে। ক্রমে সকল সময়ে তাঁহাকে স্মরণ করা সহজ হবে। এই ভাবে সজনে ও নির্জ্জনে, একান্তে ও কর্ম্মক্ষেত্রে, তাঁর চরণে বস্‌তে হবে। দশজনে মিলে তাঁর নাম কীর্ত্তন, তাঁর উপাসনা, তাঁর প্রসঙ্গ, তাঁর প্রেমের কাহিনী আলোচনা কর্‌তে

হবে। আকাশে, বাতাসে, প্রকৃতি মধ্যে তিনি প্রকাশিত—তাহা দেখতে হবে।

আছ অনল অনিলে, চির নভো নীলে,
ভূধরে সাগরে পবনে,
আছ বিটপী লতায়, জলধির গায়,
শশী তারকায় তপনে।

অন্তরে তিনি, বাহিরে তিনি, সর্ব্বত্র তিনি; সকল দৃশ্যে, সকল শব্দে, সকল স্পর্শে তাঁহারই অনুভূতি। এই ভাবে তাঁর চরণে বস্‌তে হবে। তাঁর সঙ্গ লাভ কর্‌তে হবে।

সাধনের সঙ্কেত কয়েকটি যাহা সাধুমুখে শুনেছি, গ্রন্থে পাঠ করেছি, এবং জীবনের অভিজ্ঞতাতেও যাহার একটু একটু আভাস পেয়েছি, তাহাই আমি আপনাদের সমক্ষে নিবেদন করলাম। আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। তাঁহার স্পর্শ লাভ ক'রে কৃতার্থ হই।

সায়ংকালে তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ "ভক্তিধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

৯ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—প্রাতে মন্দিরে ব্রাহ্মমহিলাদিগের উৎসব উপলক্ষে সংগীত সঙ্কীর্ত্তন ও উপাসনা। তাহাতে শ্রীমতী হেমলতা সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন। "নারীর প্রভাব" বিষয়ে তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

আজ এই উৎসবক্ষেত্রে ব্রাহ্মিকা ভগিনীগণের নিকট কি প্রসঙ্গ উপস্থিত করিব সেই চিন্তায় মন আকুল হইতেছিল। এই উৎসবক্ষেত্রে অনেক তরুণবয়স্কা কন্যারা উপস্থিত হয়েছেন—যাঁরা আজও সংসারে প্রবেশ করেন নাই কিন্তু একদিন করিবেন—আর অধিকাংশ ভগিনীই সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্তা আছেন। আমাদের দেশে সাংসারিক জীবন গার্হস্থ্যাশ্রম নামে অভিহিত। গৃহধর্ম্ম-পালন ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ। আর্য্য ঋষিগণ সমগ্র মানবজীবন ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্র বলিয়া ভাবিতেন। সাংসারিক সুখ উপভোগ মানুষের চরম নয়, ধর্ম্মসাধনই চরম। সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মানুষকে আজীবন চলিতে হইত। বর্ত্তমান কালে প্রাচীন সংস্কার শিথিল হইয়াছে—তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের বন্ধনও শিথিল হইয়াছে। ধর্ম্মের শাসন সেই শাসন যাহাতে মানুষ স্বেচ্ছা-ক্রমে আবদ্ধ হয়। তাই ধর্ম্মের অধীন হওয়া মানুষের পক্ষে পীড়াদায়ক নয়। এ সংসারে যথার্থ ধার্ম্মিকের বড় অভাব, কিন্তু ধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল নয় এমন মানুষ সংসারে কম। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ—প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে, এই সংসার-তপোবনেই সেই ধর্ম্ম সাধন করিতে হয়। এই সংসারে থাকিয়াই ধর্ম্ম লাভ করা যায়—শুধু লাভ করা যায় তা নয়—ধর্ম্মাচরণের শ্রেষ্ঠ স্থান হইল এই সংসার—অর্থাৎ আমাদের গৃহ পরিবারে ও সমাজে, পারিবারিক জীবনে এবং সামাজিক জীবনে, ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। —পরিবারে এবং সমাজে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করা বিষয়ে নারীর কত এবং নারীর প্রভাব কিরূপ—আজ আমি তাহাই বলিব।

প্রথমেই বলিতেছি আমি সেই দলভুক্ত নই, যাঁরা বলেন শিক্ষা দীক্ষা কর্ম্মে নরনারীর কোন প্রভেদ নাই। নিশ্চয়ই আছে—একের দ্বারায় যাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাহা অপরের দ্বারায় হয় না। পুরুষ যাহা পারে, নারী যে তাহা পারে না তাহা নয়—কিন্তু যাহা পুরুষের পক্ষে যোগ্য তাহা হয়ত নারীর পক্ষে শোভন না হইতেও পারে। এখানে সক্ষম অক্ষমের কথা নাই—বিধাতানির্দ্দিষ্ট কোন্ কাজ কাহার, তাহাই বিচার করা উচিত।

নরনারীর বিভিন্নতা আছে বলিয়াই বিধাতা পুরুষ নারীকে বিভিন্ন প্রকৃতি, বিভিন্ন শক্তি দিয়া সৃষ্টি করেছেন। আকৃতিগত পার্থক্য কত একবার চিন্তা করিয়া দেখি। পুরুষের আকৃতি দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ—নারী দেহের শক্তিতে পুরুষের চেয়ে কম—কিন্তু নারীর প্রাণ-শক্তি বেশী, পুরুষ যাহা সহ্য করিতে পারে না, নারী তাহা পারে। চিকিৎসকগণ জানেন, পুরুষ অপেক্ষা নারীর বাঁচিবার ক্ষমতা অধিক। প্রভেদ কেবল মানুষে তা নয়, পশু পক্ষীদের ভিতরও আকৃতি প্রকৃতিতে কত প্রভেদ! নারীর বিশেষত্ব আছে বলিয়া বিশ্বাস করি—এখানে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার নয়, বিশেষত্বের বিচার। নারী হইয়া জন্মিয়াছি বলিয়া একটুও পরিতাপ করি না, বিশেষতঃ ভগবানের কৃপায় যখন ব্রাহ্মসমাজের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করেছি। ধর্ম্মরাজ্যেও অধিকারের কোন প্রভেদ নাই—ভগবানের ঘরে পুরুষের যতখানি অধিকার নারীরও ততখানি—বেশী না হোক। মাতৃপিতৃক্রোড়ে পুত্র কন্যার সমান অধিকার। অধিকারের সাম্য যতই কেন প্রচার না করি, নারী-চরিত্রের বিশেষত্ব আছে—সেই হেতু বিশেষ অধিকারও আছে!—আর কোথায় না হোক, গৃহ পরিবারে আছে। নারীকে মধ্যবিন্দু করিয়াই গৃহের প্রতিষ্ঠা। গৃহিণীম্ গৃহমুচ্যতে—গৃহিণীই গৃহ।

যে গৃহে নারী নাই—গৃহিণী নাই—সে গৃহ গৃহই নয়। যদি এমন কোন গৃহ থাকে যাহা আহার করিবার ও শয়ন করিবার স্থান, তবে কি সে গৃহ? ইউরোপে এমন কত স্থান আছে—যেখানে মানুষ আহার করে, আরাম করে, নিদ্রা যায়—দিনের পর দিন কাটায়। সেটা বাস করিবার স্থান হ'লেও তাহা গৃহ নয়। নারীকে অবলম্বন করিয়া আমাদের গৃহ পরিবার গড়িয়া উঠে। এই গৃহ পরিবার স্বর্গের ন্যায় রমণীয় স্থান হইতে পারে, এবং নরকের ন্যায় কুৎসিৎ স্থানও হইতে পারে। জনৈক ইংরাজ কবি এ সংসারকে Vale of tears অর্থাৎ চক্ষের জলের দেশ বলেছেন। সংসারে কি মানুষ কেবল কাঁদিতেই আসে? না—মানুষ হাসিতেও আসে না বা কাঁদিতেও আসে না। মানবাত্মা এখানে শক্তি সঞ্চয় করিতে আসে, গঠিত হইতে আসে। পক্ষী-শাবক একদিন অনন্ত আকাশে পাখা দুটী মেলিয়া উড়িয়া যায়—কিন্তু তৎপূর্ব্বে বাসায় থাকিয়া পাখাতে বল সঞ্চয় করে। উড়িবার জন্য প্রস্তুত হয়। আমাদের এ জগতে বাস এখানকার ভোগ সুখে নিমগ্ন থাকিবার জন্য নয়—বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিবার জন্য নয়—কুবেরের ধন সঞ্চয় করিবার জন্য নয়—কিম্বা অর্দ্ধাশনে, অনশনে, অধোমুখে গৃহকোণে পড়িয়া কবে ভবদুঃখ মোচন হইবে, কবে যম আসিয়া সকল জ্বালা দূর

করিবে বলিয়া পড়িয়া থাকা নয়, কিন্তু অনন্ত পথের যাত্রী এই মানবাত্মাকে জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে, আনন্দে, সবল হবার জন্যই এ পৃথিবীতে বাস। অনন্ত বিমানে উড়ে যেতে হবে সে কথা ভুলে থাকলে কি হবে? যেতে যে হবে তাতে যে সংশয় নেই—আত্মাকে সবল পুষ্ট করতে হবে যে, সেই জন্য ভববাস। এই মানবাত্মা সবল পুষ্ট হবে কোথায়? এই জননীর কোলে—এই গৃহ পরিবারে, যেখানে জননী অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যেখানে নারী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী—সেখানে। উদ্যানে বৃক্ষ রোপণ ক'রে, তাহাতে দিনের পর দিন জল সেচন ক'রে, তাহার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করা যেমন মালীর কাজ, তেমনি তরুণ আত্মাগুলিকে গৃহের নিভৃত শান্তিময় ছায়ায় যত্নে প্রতিপালন ক'রে, তাহার শ্রীবৃদ্ধি ও বিকাশ-সাধন করা নারীর কাজ! যদি আর কারো সঙ্গে পারিবারিক জীবনে নারীর তুলনা করা সঙ্গত হয়, তবে সে মালির কাজের সঙ্গে। একবার ভেবে দেখি ভগবান নারীকে কি গুরুতর কর্ম্মের ভার দিয়াছেন—জগতের তাবৎ মানবাত্মার প্রতিপালন পরিপোষণ ও গঠনের ভার! কত বড় দায়িত্ব! কত বড় গৌরব ভগবান নারীকে দিয়াছেন! যথার্থ এ দায়িত্বজ্ঞান যাহার আছে, কত বড় মহিমাময়ী সেই নারী! তিনি আমাদের নমস্যা! মানবজাতির পরম বন্ধু!

ভগ্নিগণ! আজ সম্বৎসর পরে এই উৎসবক্ষেত্রে নারীর এই মহীয়সী মূর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য আসিয়াছি। নারীর প্রভাবে কি কল্যাণ সংসারে হয় তাহা দেখিয়াছি—আর নারীর দোষে কি সর্ব্বনাশ সংসারে হয় তাহাও দেখিয়াছি। একজন নারীর প্রভাবে তার পতি পুত্র কন্যা সকলের চিরজীবনের কল্যাণ সাধিত হয়—আর নারীর দোষে পতি পুত্র কন্যার দুর্গতির এক শেষ হয়। আমি একে একে নারীর প্রভাবে কি হয় তাহাই বলিতেছি। আমরা দেহ মন আত্মা সমন্বিত জীব—আমরা দেহী, আমরা আত্মিকও বটে। প্রথমে দেহের কথা বলি—শিশুর এবং পরিবার পরিজনের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার প্রধানতঃ নারীর উপর। নারী অজ্ঞ অশিক্ষিতা হইলে, স্বাস্থ্যতত্ত্ব না জানিলে, পদে পদে পরিজনদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়—গুরুতর পীড়া হয়। অবশ্য যেখানে পুরুষের উপার্জ্জনের শক্তি কম,সেখানে নারীর শত চেষ্টায়ও স্বাস্থ্যের অনুকূল আয়োজন করা সম্ভব হয় না। সুতরাং এ দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে নারীর উপর দিতে পারি না। তবে নারীর চেষ্টায় অনেক দূর হয়। অনেকে হয়ত বলিবেন, তবে কি নারী অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিবে? শিশুর জননীকে আমি বাহিরে গিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিতে বলি না। কিন্তু যেখানে কোন বাধা নাই সেখানে করিলে অর্থের আনুকূল্য হয়। নারী কি প্রকারে গৃহে বসিয়া অর্থের আনুকূল্য করিতে পারেন তাহা সত্য ঘটনা হইতে দৃষ্টান্ত দিতেছি:—

একজন ভদ্রলোক অপর এক বন্ধুর সঙ্গে চা-বাগান ক্রয় করেন—দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যবসার পতন হইল। ভদ্রলোকটীর স্কন্ধে দশ হাজার টাকার ঋণের বোঝা পড়িল—তাঁর আয় তখন মাসে ১০০৲ টাকা। তিনি ভাবিয়া আকুল, ১০০৲ টাকা হইতে স্ত্রী ও দুইটী সন্তান প্রতিপালন করিয়া কি প্রকারে দশ হাজার টাকা ঋণ শোধ দিবেন। তার মনস্বিনী পত্নী সহায় হইলেন—বলিলেন, "তুমি দশ টাকা ঘরভাড়া দিয়া মাসে মাসে ৯০ টাকা ঋণ শোধ কর, আমি সংসার চালাইবার ভার লইলাম।" কি সাহসের কথা! এই নারী কি করিলেন? কিছু টাকা ঋণ করিয়া এক-জোড়া বলদ ও গরুর গাড়ী ক্রয় করিলেন। গরুর গাড়ীর আয়ে সংসার কোন মতে চলিতে লাগিল। ক্রমে ছয় খানি গরুর গাড়ী হইল এবং মাসে ১০০ টাকা আয় দাঁড়াইল। ক্রমে পতিরও আয় বাড়িতে লাগিল। দশ বৎসরের দিবানিশি শ্রমে ও চেষ্টায় দশ হাজার টাকার ঋণ শোধ হইল, তারপর মিতব্যয়িতা ও শ্রম-শীলতার গুণে তাঁদের অর্থ সঞ্চিত হইতে লাগিল। ক্রমে বাড়ী-ঘর বিষয় সম্পত্তি সবই করিয়া বসিলেন। এখানে গৃহিণীর চেষ্টা ও শ্রমশীলতার গুণে পতি এত গুরুতর ঋণের বোঝা হইতে মুক্ত হইলেন। আর কত নারী আছেন, যাঁ'দের অভাব মিটাইবার জন্য পতিকে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। নারীর হাতে পুরুষের উপার্জ্জিত ধনের ব্যয়ভার—গৃহিণী যদি কুলাইতে না পারেন, পুরুষ শত চেষ্টা করিয়াও পারে না। যে নারী আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে জানে না, তাকে সাধ্য কি কেহ শিখায়? এই ত গেল স্বাস্থ্য এবং ব্যয়ের কথা।

তারপরে বলি সদাচার। সন্তানকে সদাচার কে শিখাইতে পারে জননী ভিন্ন? এই সদাচারের ভিতর সুঅভ্যাস—শিষ্টতা ও সত্যপরায়ণতা আসিয়া পড়ে। জননীর ঐকান্তিক যত্ন ভিন্ন এগুলি সন্তানে বর্ত্তে না। যেমন হাঁড়ির একটি ভাত টিপিয়া সে হাঁড়ির ভাত সুসিদ্ধ হয়েছে কিনা বলা যায়—তেমনি কোন পরিবারের একটী সন্তানের আচরণ দেখিলে জনক জননীর কি প্রকার প্রভাব জানা যায়। শিক্ষাব্যাপারে অনেক দিন হ'তে ব্যাপৃত আছি। পারিবারিক শিক্ষার প্রভাব কতদূর যায় তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এক এক পরিবারের বিশেষ ছাপ লইয়া সমস্তগুলি সন্তান এক বিশিষ্ট চরিত্র লইয়া মানুষ হয়। এই প্রকারে সমাজে এক এক পরিবারের খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত হয় যে, সেই পরিবারের নাম করিলেই, যেখানেই সেই পরিবারের কেহ যায় সেখানেই আদৃত হয়। এই যে শুভফল সকলে বাহিরে প্রত্যক্ষ করেন, ইহার মূলে গভীর ভাবে অনুসন্ধান করিলে নিশ্চিত জনক জননীর প্রভাব দেখিবেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর হইতেন না—যদি তিনি ভগবতী দেবীর গর্ভে না জন্মিতেন। নেপোলিয়ান কখনও দিগ্বিজয়ী বীর হইতে পারিতেন না, যদি বমোলিনী লিটিসিয়ার গর্ভে না জন্মিতেন। সন্তানের ভিতর দিয়া জনক জননী ফুটিয়া উঠেন। ইহা নিশ্চিত! নিশ্চিত! নিশ্চিত! ইহার বড় সত্য কথা আর নাই। নারী এ জগতে সুসন্তান রাখিয়া যাইতে পারেন; ইহা অপেক্ষা অধিক কল্যাণ জগতের আর কি হইতে পারে? সুসন্তান কখন হয় না, সুমাতা না হইলে। একবার সন্তানকে স্তনপান করাইতে করাইতে জননী চিন্তা করুন ত একটী অমরাত্মা কোলে করিয়া বসিয়াছেন—অনন্ত পথের যাত্রী আপনার ক্রোড়ে আজ শায়িত। আহা! কি মহান্ অধিকার ক্ষুদ্র নারীর! এত বড় অধিকার ভগবান নারীকে দিয়াছেন—অনন্ত পথের যাত্রী অমরাত্মাকে প্রতিপালন করিবার সুমহান্

দায়িত্ব। ভক্ত দাদুর বিষয় শুনিয়াছি—তিনি পথে শুনিলেন যে তাঁহার পুত্র জন্মিয়াছে, অমনি যোড়-করে বলিয়া উঠিলেন—

"এ অনন্ত পথের যাত্রী কে তুমি আজ এই দীনের গৃহে পদার্পণ করিলে? আমি কি প্রকারে তোমার অভ্যর্থনা করিব?"

এমনি শ্রদ্ধার সহিত কোলের সন্তানকে দর্শন করিতে হয়। সন্তান পরম আদরের ধন কেন? বিধাতার মহান্ দান বলিয়া। সেই সন্তানের দেহ মন আত্মার পরিচর্য্যার ভার নারীর উপর। কতখানি জ্ঞান, কতখানি বিশ্বাস, কতখানি ধৈর্য্য, কতখানি সহিষ্ণুতা, কতখানি প্রেম ভক্তি থাকিলে তবে নারী যথার্থভাবে আপন কার্য্য পালন করিতে পারেন! অনেক সুশিক্ষিতা মাতাকে দেখিয়াছি—সন্তানের স্বাস্থ্য এবং বিদ্যাশিক্ষার কথাই ভাবেন, কিন্তু দেহবাসী আত্মা দেহ হইতে কত মূল্যবান—তার কল্যাণের কথা, তার পোষণের কথা একবারও ভাবিতে হইবে না? আমরা সহজে কেহ ভাবি না। সন্তান অভুক্ত থাকিলে, পীড়িত হইলে, আমাদের দুঃখের অবধি থাকে না—কিন্তু সন্তানকে ধর্ম্মভাবশূন্য দেখিলে, বা ভগবানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ দেখিলে কাতর হই না। কয়জন জননী আছেন, যিনি সেণ্ট আগষ্টিনের মাতা মণিকা দেবীর ন্যায় প্রতিদিন ভগবানের চরণে চক্ষের জলে ভাসিয়া কাঁদিয়া বলেন, "ভগবান, আমার সন্তানের হৃদয় ফিরাইয়া দাও—তোমার প্রতি তার মতি হোক।" আমরা ঘোরতর অবিশ্বাসী, স্থূলবুদ্ধিবিশিষ্ট, তাই পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছি। আত্মার কল্যাণের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, সন্তানের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য কি করিব? আর কিছু করিতে হইবে না, নিজের জীবনে ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তি ও বিশ্বাসকে স্থান দিতে হইবে। নিজের প্রাণে ধর্ম্মের আগুন জ্বালাইতে হইবে। অনেক পরিবারে দেখিয়াছি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকবালিকাকে প্রার্থনা করিতে শেখান হয়, তাহা কদাচ উচিত নয়। ভগবান কৃপা করিয়া আমাকে যে জনক জননীর ক্রোড়ে স্থান দিয়াছিলেন, তাঁদের জীবনের দৃষ্টান্তে আমি যাহা শিখিয়াছি, তাঁদের মুখের কথায় আমি তাহা শিখি নাই। আমার পিতা আমাদের কখন উপাসনা করি কি না জিজ্ঞাসা করেন নাই, কোন দিন উপাসনা করিতে বলেন নাই। তবে ভগবানের জন্য মানুষ কতদূর ত্যাগ করিতে পারে, কত বড় কঠিন দুঃখ দারিদ্র্য বরণ করিতে পারে, প্রেমে পরকে কি করিয়া আপন করিতে পারে, তা প্রতিদিন [illegible]ত কার্য্যে দেখিয়াছি। মৌখিক উপদেশের প্রয়োজন গৃহে ছিল না, আর বেদীর উপরে বসিয়া যে বাক্য উচ্চারণ করিতেন, বুঝিতাম তাহা তাঁর জীবন্ত দৃষ্টান্তের প্রতিধ্বনি। সে বাক্য জলন্ত গোলার ন্যায় প্রাণে আসিয়া পড়িত। যার আছে সেই দিতে পারে—যা নাই ভাণ্ডে তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। সর্ব্বাগ্রে আমাদের নিজে প্রস্তুত হইতে হইবে। বাহিরের উপায়ে নয়—নয়—নয়। আমাদের চিন্তা বাক্য কার্য্য যেন এক হয়। নারীকেই নিজের সংসারটী প্রেম শান্তি ও আনন্দের আলয় করিতে হইবে। তিক্ততা কঠিন বাক্য একেবারে পরিহার্য্য—প্রাণ মধুময়, চক্ষু প্রসন্ন, বাক্য সুমিষ্ট, আচরণ শোভন, এই নারীর বিশেষত্ব। যেখানে প্রেম, সেইখানেই শান্তি এবং আনন্দ! বরং প্রেম শান্তি অনেক পরিবারে দেখি—কিন্তু আনন্দ কচিৎ কোন গৃহে দেখা যায়। গৃহে কলরব নাই, কলহ নাই, বাক্-বিতণ্ডা নাই—কিন্তু নিরানন্দ পরিবার! কাহারো মুখে প্রসন্নতার উজ্জ্বল কান্তি নাই, বাড়ীতে কোন আনন্দ উৎসব নাই—এভাব সুস্থ মানবাত্মার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা নহে। ধর্ম্মের ভিতরও আনন্দের স্থান অতি উচ্চ। ভগবানের আনন্দস্বরূপ হইতেই এই বিশ্বসংসার প্রসূত। তিনি সৎ অর্থাৎ আছেন, তিনি চিৎ অর্থাৎ চিন্ময়, প্রাণরূপে ব্যাপ্ত—তিনি আনন্দম্, পরিপূর্ণ আনন্দম্। ভক্তের প্রাণে যদি অনাবিল আনন্দ না থাকে, তবে এ সংসারে আনন্দ করিবে কে? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্মশানঘাটে আনন্দ-মন্ত্রে দীক্ষা হ'ল—এরূপ আনন্দে দীর্ঘজীবন মগ্ন রহিলেন যে চক্ষু আর কোন দিকে ফেলিতে পারিলেন না। তাঁর আত্মচরিতে দেখিতেছি তিনি বলিতেছেন—"যে রাত্রিতে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহবাস অনুভব করিতাম মত্ত হইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিতাম—'আজ আমার এ সভাতে দীপ আনিও না। আজিকার রাত্রিতে সেই পূর্ণচন্দ্র আমার বন্ধু এখানে বিরাজমান।" তিনি দিবানিশি পরমানন্দে মগ্ন থাকিতেন। ধার্ম্মিকের মত আনন্দ সম্ভোগ করে কে? আনন্দ হইল মনের খাদ্য, আনন্দ না হইলে মন বাড়ে না—মন প্রসন্ন না থাকিলে দেহ সুস্থ হয় না। শিশুর প্রাণে এত আনন্দ কেন? ভগবান তার পোষণের জন্য প্রাণে আনন্দধারা ঢালিয়া দিয়াছেন; তাই শিশু খেলা করিয়া সেই স্বাভাবিক আনন্দ ব্যক্ত করে। আনন্দ না হইলে আত্মার শ্রীবৃদ্ধি অসম্ভব—সে আনন্দ স্বাভাবিক নির্দ্দোষ হওয়া চাই। স্বাভাবিক আনন্দ? ভগবানের কৃপা অজস্রধারে উপভোগ করবার আনন্দ? আমরা অন্ধ! আমরা অকৃতজ্ঞ! তিনি অজস্রধারে কৃপা বর্ষণ করছেন, তা প্রতিদিন স্বীকার করি না, কৃতজ্ঞতাভরে প্রতিদিন তাঁকে প্রণাম করি না। সে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ পরিজনদিগকে বণ্টন করিয়া দেওয়া চাই। আমাদের এই দুঃখদুর্গতিলাঞ্ছিত দেশে আনন্দের বড় অভাব—গৃহ পরিবারের সকলকে লইয়া সে আনন্দ সম্ভোগের বড় অভাব। গৃহে নির্ম্মল, অনাবিল আনন্দ পাইবার পথ নাই, তাই বাহিরে কলুষিত আনন্দ লাভ করিবার জন্য সন্তানেরা বাহিরে ছুটিয়া যায়। থিয়েটার, সিনেমার তাই এত আদর! আমরা মনের খোরাক দিতে জানি না—মনে ভাবি, ভাল কথা শুনিলে, উপাসনাস্থলে বসিলেই বুঝি ভাল হওয়া যায়। সুশিক্ষার সেই একমাত্র উপায়। ইউরোপে যারা মনস্তত্ত্ববিদ্ এবং শিশুশিক্ষার বিষয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা করেন, তাঁরা শিশুর শিক্ষাগত জীবনে, আনন্দের বা খেলার স্থান অতি উচ্চে রাখিয়াছেন। আনন্দের ভিতর দিয়া যাহা না আসে, যাহাতে রস পাওয়া যায় না, শিশুরা তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। শিশুকে আনন্দদান শিক্ষকের অবশ্য কর্ত্তব্য—ততোধিক কর্ত্তব্য মাতার! সেখানকার মাতারা একথা বোঝেন, তাই জননী শিশুর সহিত প্রাণমন দিয়া খেলা করেন, মাঠে নিয়া শিশুর সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করেন। শিশুকে আমাদের দেশের মত অন্যায় আদর বা প্রশ্রয় দেওয়া হয় না,

আবার আমাদের মত শিশুকে অবজ্ঞাও তাঁরা করেন না। শিশুকে সঙ্গ দেওয়া, আনন্দ দেওয়া, নানা উপায়ে শিক্ষা দেওয়া জননীর কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের চেয়ে, তাঁদের দেশে শিক্ষা-পদ্ধতি তাই উৎকৃষ্টতর। শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল দেহ মন আত্মার শ্রীবৃদ্ধিসাধন। সকল দেশেই দৈহিক ও মানসিক শিক্ষার প্রচুর আয়োজন হইতেছে—আত্মার কথা ভুলিলে চলিবে কি? আমরা এই সার কথা ভুলিয়া যাই বলিয়া জীবনে সর্ব্বপ্রকার অকল্যাণ ডাকিয়া আনি। নারীজীবনে দায়িত্ব কতখানি ভুলিলে চলিবে না। যাঁহারা গৃহধর্ম্মে প্রবেশ না করিলেন, তাঁদের জন্যও এই কার্য্যের পথ পড়িয়া রহিয়াছে। নারীর হাতে অপরের ভার পড়িবেই পড়িবে। আর যদি কাহারও জীবনের সুখ দুঃখের কথা ভাবিবার না থাকে, তবে তাঁর মত আর দুর্ভাগা কার? ভগবান নিজের স্বার্থের ব্যূহে ঘুরিয়া মরিতে আমাদের এ সংসারে পাঠান নাই—নিজে বাঁচিব অপরকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিব। একজন মানুষ দশজনকে রক্ষা করে, শত জনকে রক্ষা করে। বুদ্ধ ঈশা মহম্মদ কোটী কোটী মানুষের জীবনপথে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করেছেন। নিশ্চয়ই আমরা তাঁহাদের চরণের যোগ্য নই—আমরা মৈত্রেয়ী নই, গার্গী নই, মীরাবাই নই—কিন্তু আমরা সকলে বিশ্বজননীর কন্যা। আমাদের কি তিনি প্রেম ভক্তি ভালবাসা কিছুই দেন নাই? চক্ষের উপর দৃষ্টান্ত পড়িয়া আছে—ব্রহ্মবাদিনী দেবী অঘোরকামিনী কি করিতেন? তিনি কি নিজের জীবনে, গৃহ পরিবারে, ধর্ম্মকে সর্ব্বোপরি স্থান দেন নাই? জননীকে ভুলিয়া কি কোন দিন একখানি চরণ বাড়াইয়াছেন? কোন কাজ করিয়াছেন? বা কোন কথা বলিয়াছেন? তাঁর পতি পুত্র কন্যা সকলই ছিল—কিন্তু সর্ব্বোপরি ছিলেন বিশ্বজননী তাহার হৃদয় জুড়িয়া! শত সহস্র বিপদ পার হইয়া গিয়াছেন ঐ নামের জোরে। অঘোরকামিনী একদিন ডায়েরিতে লিখিতেছেন:—"আমার প্রার্থনা এই—আমি আসিয়াছি এই জন্য যে, দুঃখকে কেমন করিয়া সুখে পরিণত করিতে হয়, তাই শিখিব ও জগৎকে শিখাইব। তবে কেন সুখ চাই? মা তাই কর যেন সুখ না চাই।" অঘোরকামিনীর জীবনসংগ্রামের সাক্ষ্য তাঁর সাধক পতি এই প্রকারে দিয়াছেন— "দেবি! চিরজীবন আমার পার্শ্বে থাকিয়া বীর নারীর মত মায়ের আহ্বান শুনিয়া চলিয়াছিলে—এ সংগ্রামে কত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছ, কেমনে দেহের শোণিত শুষ্ক করিয়া, সুখ ও আরাম বলিদান দিয়া, বিশ্বাসের, সেবার ও চিন্ময় যোগের পতাকা ধরিয়া রহিয়াছ—চিরজীবন পাশে পাশে থাকিয়া আমি তাহা দেখিয়াছি।" বাস্তবিক পতির এই সাক্ষ্য অতি বড় সাক্ষ্য! বাহিরের লোকের নিকট অতি সহজে বাহবা পাওয়া যায়—কিন্তু যার বিষয়ে পরমাত্মীয় ও নিকটতম জন এমন সাক্ষ্য দিতে পারেন তার জীবন ধন্য। অঘোরকামিনী যাহা পারিয়াছিলেন তাহা আমরা পারিব না কেন? তিনি প্রার্থনাকে জীবনের অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। বড় বড় কর্ম্ম ও বড় বড় বাক্যের সাক্ষ্য নয়—প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্ত্তের চিন্তা বাক্য কার্য্য ভগবৎভক্তি ও বিশ্বাসের পরিচয় দেয়। এ কথা কেহ বলিতে পারে না যে, ধর্ম্মসাধন করিবার সময় নাই। ধর্ম্ম বাহিরের ক্রিয়া কলাপ নয়, আচরণ নয়—তাহা অন্তরের ভাব, তাহা প্রগাঢ় অনুভূতি। আপনার জনকে ভালবাসিবার যেমন সময়ের অভাব হয় না, তেমনি বিশ্বজননীকে ভক্তি করিবার সময়ের অভাব হয় না। ধর্ম্মজ্ঞানে যে কর্ম্মই করি, তাহা আমার বিশ্বজননীর সেবা। পরিবার পরিজনের সেবাও এই শ্রেণীভুক্ত। সকল নারীই পরিজনের সেবা করেন, কিন্তু সকলেই বিশ্বজননীর সেবা করেন না। ভগবানের নাম যাহাতে স্পর্শ করান যায় তাহাই অমৃত হইয়া যায়। এই প্রকার অমৃতপান করিতে শিখিয়াছি কি? অগ্রে নিজের অন্তরের দিকে চাইতে হইবে, আত্মার কিসে সদ্‌গতি হয় সেই কথা ভাবিতে হইবে। তৎপরে গৃহপরিবার আত্মীয় স্বজনের কল্যাণচেষ্টা, তাদের দেহ মন আত্মার পরিচর্য্যা। পরিবারসকলের সমষ্টি সমাজ—নিজের এবং পরিবার পরিজনের কল্যাণের বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া কে সামাজিক কল্যাণের চেষ্টা করিতে পারে? সূত্রে যেমন রত্ন গাঁথা থাকে, তেমনি আত্ম-কল্যাণের সঙ্গে পারিবারিক, সামাজিক সকল প্রকার কল্যাণ গ্রথিত আছে। একটা ছিঁড়িয়া গেলে সবই ছিঁড়িয়া যায়। কিম্বা বৃক্ষের যেমন শিকড়, কাণ্ড, ডাল পাতা, ফুল ফল। শিকড় থাকিলে বৃক্ষ সজীব থাকে, সময়ে পত্র পুষ্প সবই দেখা দেয়। আমাদের আত্মা হইল সেই শিকড়, তাহার কল্যাণে বিশ্বের কল্যাণ, তাহার প্রসন্নতায় জগৎ প্রসন্ন, তাহার আনন্দে জগতের আনন্দ! দেবী অঘোরকামিনীর ন্যায় যেন বলিতে শিখি, "দুঃখকে সুখে পরিণত করিব বলিয়াই জগতে আসিয়াছি"। আমি বলি "নিজে বাঁচিব পরকে বাঁচাইব বলিয়াই জগতে আসিয়াছি"। নারী গৃহের কল্যাণরূপিণী অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যে স্থানে নারী পদার্পণ করিবে, আনন্দ প্রেম শান্তিতে সে স্থান পূর্ণ হইবে, এই না জগৎজননীর বিধান! নারীর প্রাণ প্রেম ভক্তিতে মাখা। কি শোভা হয় যখন বিশ্বজননী সেই সুকোমল বক্ষে আসন পাতিয়া বসেন! এমন শোভা আর কিসে হয়? ভারতের নারী চিরদিন ধর্ম্মের মহিমা বোঝে, ধর্ম্মের নামে কত আত্মনিগ্রহ কত কৃচ্ছ্রসাধনই না করে! আমি আত্মনিগ্রহের কথা বলিতেছি না—আত্মস্ফূর্ত্তির কথা বলিতেছি, নিজের অন্তরকে প্রবুদ্ধ করিতে বলিতেছি। নারীর হস্তে ভগবান মানবসমাজের কল্যাণের ভার দিয়াছেন। ভগবান আজ আমাদের অন্তরে দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞার উদয় করুন। আজ আমরা বলি, "দুঃখকে সুখে পরিণত করিব বলিয়াই এ জগতে আসিয়াছি"—দুঃখ দারিদ্র্য বিপদ কিছুতেই আমরা ভীত নই—ভগবানের হাতে আমাদের জীবন, তিনি আমাদের গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি আমাদের সমাজের নেতা, তিনি মানবজাতির কাণ্ডারী, তখন আর কিসের ভয় ভাবনা? আজ তবে সকলে এই উৎসব ক্ষেত্রে বলি:—

আমার এই যাত্রা হ'ল সুরু এখন ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস উঠুক, তুফান ছুটুক, ফিরব না গো আর,
তোমারে করি নমস্কার

আমি দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি, বিপদ বাধা নাহি মানি',
ওগো কর্ণধার।।
এখন মাভৈঃ বলি' ভাসাই তরি, দাওগো করি' পার,
তোমারে করি নমস্কার।

পুরুষদিগের জন্য সিটি কলেজগৃহে পৃথক উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

বহু বৎসর পূর্ব্বে একবার সার পি সি রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি তখন বেঙ্গল কেমিকাল ঔষধের কারখানার উপরের ঘরে বাস করিতেন। জানালা দিয়া গৃহের পশ্চাতের দিকে একটী সুন্দর গোলাপ ফুলের বাগান দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহা কাহার বাগান? তিনিবলিলেন—'আমার'। ইহা তাঁহার বাগান নয় বলিয়া কথাটা শুনিয়া আমি হাসিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ইহা যাহাদের বাগান তাহারা তো কখনও এখানে আসে না, কিন্তু আমি ঘরে বসিয়া এই সব ফুলের সৌন্দর্য্য দেখি ও উপভোগ করি। কাজেই ইহা তো আমারই।" তাঁহার কথাটা আমি অনেকবার চিন্তা করিয়াছি। আইন অনুসারে বাগানের মালিক যে ব্যক্তি তাহার দলিল আছে, তাহার স্বামীত্ব সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু বাগানের শোভা, ফুলের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ সে সম্ভোগ করিতে আসে না। যে ব্যক্তি এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে কার্য্যতঃ বাগান তাহারই। লোকে এক সুবৃহৎ ভূমিখণ্ডকে Wordsworth's Country বলিয়া নাম দিয়াছিল। কয়েকজন ব্যক্তি এই ভূমির ভিন্ন ভিন্ন অংশের অধিকারী ছিল। Wordsworth সর্ব্বদা এইস্থানে পর্য্যটন করিতেন। কোথায় কোন্ বৃক্ষলতা অবস্থিত, কোথায় কোন্ স্রোতস্বিনী প্রবাহিত, কোথায় কোন পুষ্প প্রস্ফুটিত, এবং কোন্ বন কোন্ পাখীর সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত তিনি তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন, এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তিনি সর্ব্বদা উপভোগ করিতেন, এইজন্য লোকে এই স্থানকে তাঁহার দেশ বলিত। যাহারা এই ভূখণ্ডের স্বামী তাহাদের নাম উল্লেখ করিত না।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই শ্লোকের ভাবার্থ সাধন করিয়া আপনার ধর্ম্মজীবন গঠন করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিয়া, জীবনের সকল ঘটনার মধ্যে তাঁহার করুণা উপলব্ধি করিয়া এবং আত্মায় তাঁহার প্রকাশ দেখিয়া, জীবনে তাঁহাকে উপভোগ করিয়া, তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহার আপনার হইয়াছিলেন। তিনি ব্যাকুলচিত্তে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এবং তাহার বাহিরে কোন কোন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন। বোম্বাই নগরে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার নৃত্য দেখিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া হাততালি দিতে দিতে আনন্দোৎফুল্লচিত্তে গান করিয়াছিলেন :—"চমৎকার, অপার জগতরচনা তোমার, শোভার আগার"। দাবানলে বন দগ্ধ হইতে দেখিয়া আনন্দে পরমেশ্বরকে বলিয়াছিলেন তোমার বহ্ন্যুৎসব হইতেছে। একবার সমস্ত দিন অনাহারে হিমালয় আরোহণ করিয়া সন্ধ্যাকালে অবসন্ন দেহে এক কুটীরে উপনীত হইয়া, এক ভগ্ন খট্টায় শয়ন করিয়া, অচেতনপ্রায় হইয়াছিলেন; কেবল অনুভব করিতেছিলেন যে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে এবং নিশ্বাস গ্রহণের সময় "এই তুমি" এবং প্রশ্বাস পরিত্যাগের সময় "এই আমি" এইরূপ অনুভব করিতেছিলেন,—অর্থাৎ এই অবস্থার ভিতরে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে অচ্ছেদ্য যোগ তাহা উপলব্ধি করিতেছিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারী প্রতিদিন তাঁহার ভোজ্য ফলগুলি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলে, তিনি এক একটী হাতে লইয়া দেখিতে দেখিতে তাহা পরমেশ্বরের প্রেমহস্তের দান বলিয়া অনুভব করিতেন। এইরূপে তিনি পূর্ব্বোক্ত শ্লোক অনুসারে জগতের ও নিজ জীবনের যাহা কিছু সকলই পরমেশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছিলেন এবং জগৎ-মন্দিরে প্রকৃতির সকল শোভা এবং বিচিত্রতার মধ্যে, নিজ জীবনের সকল অবস্থার ও ঘটনার মধ্যে এবং স্বীয় আত্মার হিরণ্ময় কোষে সেই পরমাত্মাকে দেখিতেন ও তাঁহাকে সম্ভোগ করিতেন। তিনি এইরূপে সকল সময় পরমেশ্বরকে উপভোগ করিতে করিতে তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এইরূপে প্রতিনিয়ত আপনার উপাস্য দেবতাকে সম্ভোগ করিতে পারেন, তিনিই বলিতে পারেন যে পরমেশ্বর আমার আপনার। আমরা সঙ্গীত, উপাসনা, প্রার্থনার ভিতর দিয়া অনেক সময় তাঁহাকে বলি "তুমি আমার"। মুখের কথায় তাঁহাকে আপনার বলিলেই তাঁহাকে আপনার করা যায় না। তাঁহাকে আপনার করিবার জন্য, জীবনে তাঁহাকে সম্ভোগ করিবার জন্য, সর্ব্বদা সাধনা করিতে হইবে। তাঁহাকে আপনার বলা সার্থক হইবে তখন, যখন গিরি নদী, বৃক্ষ লতা, ফল ফুলের সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাঁহাকে উপভোগ করিতে পারিব, যখন দেখিব যে তিনি গৃহে গৃহে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন, স্নেহময়ী জননী হইয়া আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন, যখন জীবনের সকল কার্য্যে, জগতের সকল ঘটনায়, তাঁহাকে নিকটে দেখিব, তাঁহার প্রেম উপভোগ করিতে সক্ষম হইব এবং আত্মাতে তাঁহার মধুর স্পর্শ, প্রেমের প্রকাশ সম্ভোগ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিব। এইরূপ সাধনায় যাহাতে আমরা প্রবৃত্ত হইতে পারি, পরমেশ্বর আমাদিগকে সেইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। অন্তরে ও বাহিরে তাঁহার প্রকাশ দেখি, জীবনে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করি, আত্মায় তাঁহাকে নিরন্তর সম্ভোগ করি। করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে সেই ভাবে প্রস্তুত করুন।

সায়ংকালে আলবার্ট হলে তিন সমাজের সম্মিলিত উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র উদ্বোধনে ও শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আরাধনাদিতে আচার্য্যের কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপদেশ প্রদান করেন। মুদ্রিত উপদেশ উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল।

১০ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) শুক্রবার—

প্রাতে উপাসকমণ্ডলীর সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি প্রথমে নিম্নলিখিত মর্ম্মে উদ্বোধন করেন :—

আপনাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। আপনারা আমার জন্য প্রার্থনা করুন। ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন উৎসব হইতে পারে না। তিনি একবিন্দু প্রেম দিউন, যাহাতে যে গুরুতর কার্য্যভার আপনারা দিয়াছেন তাহা যেন সম্পন্ন করিতে পারি। ভক্তি ইচ্ছা করিলেই পাওয়া যায় না। ভক্তির তুল্য বস্তু আর নাই। ভক্তিভরে পূজা করিবার অধিকার এখনও পাই নাই। সরল ভাবে প্রাণের কথা বলিবার অধিকার সকলেরই আছে। আমরা সরল অন্তরে তাঁহার পূজা করি। তাঁহার মন্দিরে দীন হীন হইয়াই উপস্থিত হইতে হয়। "শুনেছি তোমার করুণা পাপীরেও করে না ঘৃণা"। অনেক সময়ইত উপাসনার পূর্ব্বে কথা মনে হয়। মার্টিনো বলিয়াছেন, "যদি যাহারা নির্ম্মলচিত্ত শুধু তাঁহাদেরই তুমি দেখা দেও, তবে আমরা কোথায় যাই ?" এই ভাবটি মনে রাখিতে হইবে, "আমি কোথায় যাই, আমরা কোথায় যাই ?" এই বলিয়া নিজকে অতি দীন, অতি মলিন জানিয়া, তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। অনেক বার তিনি কৃপা করিয়া প্রকাশিত না হইলে বাঁচিতাম না। বার বার তিনি দেখা দিয়াছেন। অনেক উৎসব সোপানের ন্যায় হইয়া আমাদিগকে এখানে আনিয়াছে। অদ্যকার উপাসনাও তাহাই হউক। নিরাশায় উপাসনা হয় না। তাঁহার কৃপার উপরই আশা আছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে একটি সুন্দর কবিতা পাঠ করিয়াছিলাম। লেখিকা বলিতেছেন, "অন্তরের ব্যথা তুমি, যে পথ দিয়া চলিয়াছি তাহা তুমি, তুমি আমার এমন দিন আনিবে যেদিন ব্যথা থাকিবে না। যদি কোনও দিন ডাকিবার অবসর না পাই, যদি অন্তরে ব্যথা থাকে, তবে তাহাও বৃথা যায় না, তাহাও সোপান।" চার্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের জনৈক বিশপ বলিতেছেন, "সুখ শান্তিতে যেদিন গিয়াছে তাহাতে লাভবান হই নাই, দুঃখ বিপদেই লাভবান হইয়াছি।" লোয়েলও এই কথা বলিয়াছেন। "দুঃখ সন্তাপই সেই golden steps—সোণার সোপান—যাহার সাহায্যে আমরা পরম পিতার নিকটে যাই। সেণ্ট অগাষ্টাইন আরও বেশী বলিয়াছেন—"Blessed be sin"—পাপও ধন্য। পাপসন্তাপ তিনি ভিন্ন কেহ দূর করিতে পারে না, এজন্য একান্ত মনে তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হয়। সেই পতিতপাবন ভিন্ন আর গতি নাই। "গভীর পাপের কালি ঘুচিবার নয়, বিনা তাঁরি কৃপাবারি, জানিও নিশ্চয়।"

তিনিই একমাত্র আশ্রয় ও সম্বল, এইভাবে ডাকিব। যাহারা আর্ত্ত তাহারাও ডাকিতে পারে। তিনি কৃপা করিয়া এই অধিকার দিয়াছেন। তিনি দীননাথ, দীনবন্ধু, দীনশরণ, বিশ্বাসের সহিত ইহা বলিতে পারি। সরল প্রাণে যদি ডাকা যায়, তবে সে ডাক বৃথা যায় না—ভাব ভক্তি দিয়া উপাসনার সফলতা বিচার করিব না। সরল প্রাণে ডাকা চাই। তাহার পর, তাঁহার আবির্ভাব চাই। তাহা না হইলে দিন চলে না। তিনি যখন প্রার্থনা করিবার অধিকার দিয়াছেন তখন আর ভয় নাই। "অসতোমা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতম্ গময়।" এই প্রার্থনা করিতে হইবে। সরলভাবে আমাদের অভাব আকাঙ্ক্ষা জানাইবার জন্য প্রস্তুত হই। তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হই।

হে অখিলশরণ তুমি প্রকাশিত হও। দুঃখ বিপদ অতি ভয়ানক যদি তাহা তোমার জন্য ব্যাকুল না করে। আমরা তোমার কৃপা ভিক্ষা করি। তুমি আমাদিগকে তোমার উপাসনা করিতে সমর্থ কর।

"হে প্রভু পরমেশ্বর, তব করুণা" ইত্যাদি দ্বিতীয় সঙ্গীতান্তে আরাধনা ও মিলিত প্রার্থনা। অনন্তর "হৃদয়ে হৃদয়ে, জীবনে জীবনে, তুমি আপনি সবার সঙ্গী হ'লে" ইত্যাদি তৃতীয় সঙ্গীত হইলে পর তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

কয়েক দিন পূর্ব্বে ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গে সৎ প্রসঙ্গের জন্য মিলিত হইয়াছিলাম। একজন বলিলেন, "তাঁহার কৃপা অন্য স্থানে কি দেখিব ? আপনার জীবনে যেরূপ দেখিয়াছি, নানা সংগ্রাম ও সঙ্কটের মধ্যে যেরূপ পরিচয় পাইয়াছি, ইহাতে যেমন প্রাণে ভক্তির উদয় হয়, এরূপ আর কিছুতেই হয় না।" আমাকে আমার জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে বলিলাম, নিগূঢ় কথা বলিতে পারি না। এইমাত্র বলিতে পারি, জীবনে তাঁহার করুণার অনেক পরিচয় পাইয়াছি। তবু এখনও ভক্তি সম্বল পাই নাই। তাহা না হইলে কাঙ্গালের বেশে ঘুরিব কেন ? গোস্বামী মহাশয় কোনও সাধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি করিয়া ভক্তি পাওয়া যায় ?" তিনি বলিলেন, "ভক্তি ?" এই কথা বলিতেই তাঁহার মাথার শিখা খাড়া হইয়া উঠিল। একবিন্দু ভক্তি যদি পাই তবে আর কি অভাব থাকে ? তিনি কৃপা করিয়া একবিন্দু ভক্তি যদি দেন, তবে কোনও পাপ কলুষ বিষাদ থাকিতে পারে না।

নিজেদের দীনতা কখন ধরা পড়ে ? দুঃখ দুর্দ্দিনেই তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারা যায়। টমাস এ কেম্পিস্ বলিয়াছেন, "তুমি ধর্ম্মবিজ্ঞান আলোচনায় পণ্ডিত, তুমি অপরকে যাইয়া সান্ত্বনার কথা বলিতে পার, কিন্তু দুর্দ্দিনে তুমি চারিদিক অন্ধকার দেখ, তোমার মুখ শুকাইয়া যায়। এই পাণ্ডিত্যে কি লাভ হইল ?" তিনি আরও বলিয়াছেন—"অনুতাপের ব্যাখ্যা দেওয়া অপেক্ষা অনুতাপ অনুভব করাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়—I would rather feel compunction than know how to define it. এইরূপে সর্ব্বদা জানিতে হইবে জীবনে যাহা পাইয়াছি তাহাই সত্যজ্ঞান। এইরূপে যদি মঙ্গলস্বরূপকে লাভ করিতে পারি, তবেই মণ্ডলী সার্থক হয়। মণ্ডলীর অর্থ কি ? এই ক্ষুদ্র মন্দিরে যাহারা মিলিত হই, শুধু তাহারাই কি মণ্ডলী ? না। দেশ বিদেশ হইতে যাঁহারাই আমাদের একটু সহায়তা করেন, তাঁহাদের সকলকে লইয়াই এই মণ্ডলী। কোথায় ওলিভার ক্রমোয়েল আর

কোথায় যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি! উত্তরেই এক কথা বলিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "তিনি ভিন্ন আর সাধনীয় নাই। সেই পরমাত্মাকেই তোমার মধ্যে দেখি।" ক্রমোয়েল মেয়েকে লিখিলেন "আমার জামাতার মধ্যে খৃষ্টকে দেখিবে, তাহা দেখিয়া তাহাকে ভাল বাসিবে।" খৃষ্ট অর্থ সেই পুরুষোত্তম। সেই প্রেমের উৎস একই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "সেই পরমাত্মার জন্যই সকলে প্রিয়।" তাঁহারা পরামর্শ করিয়া এই কথা বলেন নাই। তিনিই সকলের প্রাণে এক সত্য প্রকাশ করেন। আমরা centenary (শতবার্ষিক) উৎসব করিলাম। পরমেশ্বরের মঙ্গল বিধানে নানা দেশের নানা কথা শিখিলাম। প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সকলকে লইয়া এই মণ্ডলী।

জগতের দুঃখ ক্লেশ দেখে প্রাণ আকুল হয়। চিনদেশে ২০ লক্ষ লোক অনাহারে মারা গেল, আরও কত লক্ষ মরিবে! Paisleyতে ছেলেমেয়েরা সিনেমা দেখিতে যাইয়া ৮০জন আগুনে পুড়িয়া মরিল! এই দুঃখ বেদনা দেখিয়া ভক্তদের হৃদয় ব্যথিত হয়। এমার্সন ডায়েরীতে লিখিতেছেন—"আচার্য্য ত বেদী হইতে ভক্তির কথা, আত্মসমর্পণের কথা, বলিলেন। এদিকে তাঁহার মণ্ডলীর অবস্থা কি তিনি ভাবিতেছেন না। আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছি, এক জনের স্ত্রী মুখরা, গৃহে গেলেই তাহাকে বাক্যবাণে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে হইবে; আর একজন কোনও প্রকারে একটি স্কুল করিয়া যাইতেছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার ছাত্র ছাত্রী চলিয়া যাইতেছে। এরূপ আরও কত জনের কত দুঃখ ক্লেশ! তাহারা কি শুধু কথায় সান্ত্বনা পাইতে পারে? Facts are stronger than words—বাক্য অপেক্ষা প্রকৃত অবস্থা অধিকতর শক্তিশালী। এই অবস্থার পীড়নে শান্ত থাকা কি সহজ?" এই কথার উত্তর তিনি অন্যস্থানে দিয়াছেন। "There is night and there is day. The night is for the day but not the day for the night"—রাত্রিও আছে দিনও আছে, কিন্তু রাত্রিটা দিনের জন্য, দিন রাত্রির জন্য নহে। জগতে দুঃখ ক্লেশ আছে স্বীকার করি, কিন্তু সে সব চলিয়া যাইবে, কেবল আনন্দই থাকিবে। তাঁহাতেই চির আনন্দ। তিনি সকলেরই অন্তরে আছেন। তাঁহাকে অন্তরে দেখিতে হইবে।

ঋষি বলিয়াছেন "তমাত্মস্থং"। ডাক্তার সাভার্ন্যাও বলিয়াছেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেই, বাহিরের কোন বস্তু লইয়া সুখী হইলেই, বিদেশে গেলে—অন্তরে কিছু পাও কি না দেখ। একমাত্র পরমাত্মাই আত্মার স্বদেশ। তাঁহাতে যাহাতে আমরা মিলিতে পারি তাহাই করিতে হইবে। এই মণ্ডলী বৃহৎ মণ্ডলী। ক্রমোয়েল, সাভার্ন্যাও, প্লেটো, দান্তে, এই মণ্ডলীর অন্তর্গত। সকল স্থান হইতে আশার কথা সংগ্রহ করিব, সকলের নিকট হইতে সহায়তা পাইব।

এখনও বাহিরেই আছি, ভিতরে প্রবেশ করিতে পারি নাই। তবে এই ভাবটি মনে রাখিব—মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন। দেখা দেওয়া না দেওয়া তাঁহার কাজ, আমার অন্য গতি নাই, অনন্যগতি হইয়া দ্বারে পড়িয়া থাকাই আমার কাজ। সেন্ট ফ্রান্সিস্ দুই বৎসর মহা শুষ্কতায় কাটাইয়াছিলেন। ম্যাডাম গিয়োঁ সাত বৎসর এইভাবে কাটাইয়াছিলেন,—বলিয়াছিলেন, আমার বাড়ীও নাই, ঘরও নাই, আমি পথে পথে বেড়াইতেছি। আমারও অনেক সময় সেরূপ ভাব মনে আসিয়াছে। আমার একজন বন্ধু বলিয়াছেন, বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে "সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বিরহরেব"—মিলন ও বিরহের মধ্যে বিরহই শ্রেষ্ঠ অবস্থা। জাহাজ চালাইবার এইরূপ নিয়ম যে, the sailor on the top mast' (সর্ব্বোচ্চ মাস্তুলের উপরিস্থিত নাবিক) নীচের দিকে চাহিবে না, উপরের দিকেই চাহিবে। নীচের দিকে চাহিলেই পড়িয়া যাইবার ভয় ও আশঙ্কায় কাতর হইতে হয়। আমাদিগকেও দুঃখ দুর্দ্দিনে সঙ্কট নীচের দিকে না চাহিয়া উপরের দিকেই চাহিয়া থাকিতে হইবে।

এতদিন পরে, ঘোর পাপ সন্তাপে দগ্ধ হইয়া নিরাশ হইতেছি এমন সময়ে, একটা সত্যের আভাস পাইলাম—অন্তরে এই ভাব আসিল, পরম পিতা আমাকে বলিতেছেন, "আমাকে বাহিরে রাখিয়াছ কেন? প্রাণের প্রাণ আমাকে পরমাত্মা বলিয়া দেখ।" এ বিষয়ে পরস্পরের সাহায্যের প্রয়োজন। নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার স্মরণে ও আলোচনায় সাহায্য পাওয়া যায়। তিনি স্বপ্রকাশ। তিনি নিজে কৃপা করিয়া সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। তিনি কখন কোথায় প্রকাশিত হইবেন তাহা তিনিই জানেন। তুমি অপরাধী, ভগবানের সঙ্গে তর্ক করিলে তোমার গতি নাই, অনুতাপে কাতর হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও।

সেক্‌স্পীয়রে বর্ণিত আছে রিচার্ড দি থার্ডের রাণী প্রাণভয়ে আশ্রয়ের জন্য sanctuaryতে (ধর্ম্মমন্দিরে) গেলেন। তখন নিয়ম ছিল ধর্ম্মমন্দিরে যদি একজন আশ্রয় লয় তবে তাহাকে কেহ আক্রমণ করিতে পারে না। অনুতাপই আমাদের sanctuary (নিরাপদ আশ্রয় স্থান), ইহাই দুর্গ। তিনি দীননাথ দীনবন্ধু, ইহা স্মরণে রাখিলে আর ভয় থাকে না।

ভিক্টর হুগো বলিয়াছেন—"অনুতাপের সময় তোমার মনে হইবে তুমি নরকে আছ, কিন্তু তাহাতে ভয় পাইও না। পরমেশ্বর তোমার নিকটেই দাঁড়াইয়া আছেন।" তিনি যখন নিকটে আছেন, তখন নরকেও ভয়ের কারণ নাই, কোনও অবস্থায়ই নিরাশ হইবার কারণ নাই।

ডাক্তার কার্পেন্টারের ২০ বৎসর বয়সে—তখন ভগবানে তাঁহার বিশ্বাস নাই—ওয়েল্‌সে বেড়াইতে গিয়াছেন, পাড়াগাঁয়ের রাস্তায় চলিতে চলিতে হঠাৎ ভগবানের অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখিতে পাইলেন, সমস্ত অবিশ্বাস মুহূর্ত্তমধ্যে চলিয়া গেল। তিনি বলিয়াছেন, I did not seek God, but God sought me—আমি ঈশ্বরকে খুঁজি নাই, কিন্তু তিনিই আমাকে খুঁজিয়াছেন। কি অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিলেন, তাহাতে অভিভূত হইয়া গেলেন, আর কোনও দিন তাহা ভুলিতে পারিলেন না। কতবার এই ব্রহ্ম-বলে বলীয়ান্ হইয়া অভিভূত হইয়াছি, কত সান্ত্বনা পাইয়াছি! এই বৃহত্তর মণ্ডলীর মধ্যে আছি, চারি দিক হইতে আশার কথা শুনিতেছি। ভক্তির কথা জানি না। আমরা আমাদের দীনতা অনুভব করি।

হরিদ্বারে সাধু নদীর তীরে পূজাতে নিযুক্ত। নদীতে প্লাবন

আসিল, কিন্তু তিনি আসন পরিত্যাগ করিলেন না। সেই অবস্থায়ই জলে ডুবিয়া গেলেন। কি নিষ্ঠা! এক নারীর কথা শুনিয়াছি। মঙ্গলস্বরূপকে কিরূপে জানা যায় এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন—"আমি আপনাকে তাহা কথায় কিরূপে বুঝাইব?" এই বলিয়া তিনি চক্ষু মুদিত করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার গণ্ডদেশ দিয়া আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল।

একবার ত্রৈলঙ্গস্বামী ও গোস্বামী মহাশয়ের মধ্যে কথোপকথন হইতেছিল। গোস্বামী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, উপাস্য কে? উত্তর—শিবং। কোন্ শিব, পার্ব্বতীপতি? উত্তর—মঙ্গলম্। তিনি অমনি চক্ষু মুদিয়া ধ্যানে ডুবিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পর চক্ষু মেলিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। পরস্পরের দুঃখে দৈন্যে বেদনা অনুভব করিতে হইবে, অপরের আনন্দে আনন্দিত হইতে হইবে। ইহা দৈনিক সাধনের বিষয় হইবে। অপরের দুঃখে বেদনা অনুভব করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু অপরের আনন্দে যদি আনন্দ না হয়, তবে কিছু হইল না। ফেনেলোঁ বলিয়াছেন, "Thine and mine (তোমার ও আমার), ক্ষুদ্রচিত্ততার পরিচায়ক।" এই ক্ষুদ্রচিত্ততা পরিহার করিতে হইবে। সকলের আনন্দে আনন্দ অনুভব করিতে হইবে। আমি যদি তরিয়া না যাই, সকলে তরিয়া গেল, ইহাতেই আনন্দ।

"Love thy God with all thy heart"—তোমার ঈশ্বরকে সমগ্র হৃদয় দিয়া ভালবাস। তাঁহাকে ভালবাসিলে তাঁহার সন্তানদিগকেও ভালবাসিতে হইবে। এক বিন্দু ভক্তি তিনি দিউন, যাহাতে জগতে প্রেম ব্যাপ্ত হয়। পিতা খোল দ্বার। তুমি অন্তরে প্রকাশিত হও। তোমার প্রকাশে সমস্ত পূর্ণ হইয়া যাউক। আমরা তোমার হইয়া যাই।

"শান্তং শিবমদ্বিতীয়ং রাজরাজচরণে বিকাইব ওহে প্রাণসখা", এই সঙ্গীত প্রাণ হইতে উঠিতেছে। "সত্যং শিবসুন্দরং রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে" এই ভাব এখনও পাই নাই। ইহার জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। তিনি প্রাণে তাঁহার বাণী শুনান। ব্রহ্ম-বাণীহি কেবলম্, ব্রহ্মপ্রকাশহি কেবলম্। এই আমাদের আশা। তিনি সর্ব্বদা আমাদের সহায় হইয়া রহিয়াছেন।

বিদেশে প্রচারে গিয়াছি। প্রাণে আশা পাইলাম, "যাও, ভয় পাইও না।" বিদেশে প্রীতি পাইলাম, বল পাইলাম, শরীর ভাল হইল। পরস্পর পরস্পরের অভিজ্ঞতা হইতে আশা ও বিশ্বাস পাই। নানা দেশ, নানা স্থান হইতে আশার বাণী আসিতেছে। কোনও অবস্থায়ই যেন নিরাশ না হই।

আমেরিকার একখানা কাগজে একটী প্রবন্ধ পড়িলাম,—How to meet a desperate situataion (ঘোর সঙ্কটের অবস্থায় কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে?) শোক দুঃখ, তাহা অপেক্ষা অশেষ গুণে ক্লেশকর, পরিবার কলুষকলঙ্কে পূর্ণ হওয়া, তখন কি উপায়? লেখক উত্তর দিতে পারেন নাই। প্রকৃত উত্তর জানেন না। আছেন অভয়দাতা, কেবল এই কথা জানিলেই প্রকৃত উত্তর দেওয়া যায়। যেন সেই বিশ্বাস আমরা লাভ করি, যাহাতে বলিতে পারি, কিছুতেই আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। তিনি যখন আছেন, তখন আর ভয় কি, ইহা যিনি জানেন তিনিই বিশ্বাসী।

একটা ভাব মনে আসিয়াছে, তিনিই তাঁহার পূজার পুরোহিত। তিনি যখন প্রলুব্ধ করিয়াছেন, তখন তিনিই পূজা করাইবেন। তাহা না হইলে "কাঙালে শাকের ক্ষেত" দেখাইলেন কেন? আপনারা পরস্পরকে সাহায্য করুন। এই দুর্ব্বল ভ্রাতাকে সাহায্য করুন। তাঁহার পূজা করিয়া ধন্য হই।

হে প্রেমস্বরূপ! একবিন্দু প্রেম দাও, যাহাতে তোমাতে সকল ভার দিতে পারি। তোমার রাজ্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত কর। আমরা সকলে তোমার হইয়া যাই।

"সবে করি আজি তাঁর গুণগান, যাবে সকল দুঃখ, সব পাপ-তাপ, ওরে সকল সন্তাপ হইবে নির্ব্বাণ" ইত্যাদি সঙ্গীত হইয়া এই বেলার কার্য্য শেষ হয়।

অপরাহ্ণ ১ ঘটিকার সময় নবদ্বীপচন্দ্র-স্মৃতিসভা। তাহাতে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় সভাপতির কার্য্য করেন। শ্রীমতী সুবালা আচার্য্য একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন বক্তৃতা করেন।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময়, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট স্থিত হৃষিকেশ পার্ক হইতে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয়। তিনটি দল গঠিত হইয়া সংকীর্ত্তন করা হয়। প্রথম দল বালিকাদের, সেখানে কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রার্থনা করেন। দ্বিতীয় দল বালকদের, তাহাতে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রার্থনা করেন। সর্ব্বশেষে মূল দল, তাহাতে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী প্রার্থনা করেন। প্রার্থনান্তে সকলে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট, বাদুর বাগান লেন, আপার সার্কুলার রোড, গড় পার রোড, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, রামমোহন রায় রোড, আপার সারকিউলার রোড, বাদুর বাগান রো, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইয়া পর পর মন্দিরে উপস্থিত হইলে, কিছু সময় সেখানে সংকীর্ত্তন চলিতে থাকে। অনন্তর উপাসনা। তাহাতে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

উত্তরায়ণ সমাগত। সকলেই জানেন এই ভারতবর্ষে এই উত্তরায়ণের একটী বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। মহাভারতের আখ্যায়িকায় দেখা যায়, ভীষ্মদেব যখন শরশয্যায় শায়িত হোলেন তখন তিনি অপেক্ষা করেছিলেন এই উত্তরায়ণের জন্য। কারণ, তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে উত্তরায়ণ না আগত হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন না। উপনিষদেও ইহার নানা গুণের বর্ণনা আছে। আমাদের এই উৎসবের যখন প্রথম আরম্ভ হয় তখন উত্তরায়ণ ছিল না। ব্রহ্মোপাসনাপ্রতিষ্ঠার যে উৎসব তাহা ভাদ্র মাসে হয়—তাহা ভাদ্রোৎসব। তৎপরে রাজা রামমোহনের পরবর্ত্তী নেতা যে উৎসবের প্রবর্ত্তন করেন তাহা

তত্ত্ববোধিনীর উৎসব। ইহা আশ্বিন মাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তদনন্তর এই ভারতবর্ষে প্রথম ব্রহ্মমন্দিরপ্রতিষ্ঠার যে উৎসব, তাহা এই উত্তরায়ণে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ইহাই আমাদের ১১ই মাঘের উৎসব। আমাদের এই উৎসবে উত্তরায়ণের যে ভাব নিহিত আছে তাহারই আলোচনা করিতেছি।

আমাদের প্রভু ভগবান "গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্"। তিনি চির পুরাতন অথচ চির নূতন। তিনি এই উদ্ভিদ ও জীবজগতে নব জীবন দান করিতেছেন। মানব সূতিকাগৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত যাহা কিছু শরীর সম্বন্ধে লাভ করিয়াছে তাহার কিছুই অপচয় হয় না। কিন্তু গীতাকার বলিয়াছেন—বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোপরাণি। অর্থাৎ মানব জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নব দেহ ধারণ করে। কেহ কেহ মনে করেন, মানব দেহ ত্যাগ করিয়া নব দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করে। সেণ্ট পল বলিয়াছেন, when this natural body is sown in the ground, the spiritual body is grown. কিন্তু ইহা সেরূপ ত্যাগ করা নয়। চির নূতন ও চির পুরাতন পরমেশ্বর তাঁহার ছাপ মানব শরীরে ও চিত্তে এবং অন্যান্য চেতন পদার্থে দান করিয়াছেন। যাঁহারা শরীর-বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, মানব প্রতি সাত বৎসর অন্তর শরীরের সমুদয় পদার্থ সম্পূর্ণ নূতনরূপে প্রাপ্ত হয়। অথচ এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাহার কাঠামো বেশ ভালই চেনা যায়। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে কি অভিপ্রায় নিহিত আছে? এই প্রশ্নের উত্তর দান করিবার পূর্ব্বে উদ্ভিদের বিষয় একবার চিন্তা করি।

প্রাকৃতিক জগতে আমরা কি দেখিয়া থাকি? এই উত্তরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষগুলি তাহাদের সমস্ত পুরাতন পত্র পরিত্যাগ করে, তৎপরে নব সাজে সজ্জিত হইয়া নব দেহ ধারণ করে। ভগবান এইভাবে সমস্ত চেতনকে নব জীবন দান করিতেছেন।

আমাদের এই মাঘোৎসব আসিয়াছে। আজ এই রাত্রির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মাঘের একাদশ দিবসের অরুণোদয়ে মহোৎসব আসিবে। আমাদের পুরাতন থাকিলে চলিবে না, নূতন জীবন চাই। সূর্য্য যখন মস্তকের উপর আসিতে থাকে বৃক্ষ যেমন তখন পত্রত্যাগ করে, তেমনই আমাদের সমস্ত পুরাতন জড়তা ও অবসাদ ত্যাগ করিতে হইবে। যাহাতে সমস্ত পত্র বিযুক্ত হইয়া বৃক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, বিশ্ববিধাতা পূর্ব্ব হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। পত্রত্যাগের পূর্ব্বে বৃক্ষগুলি এমন রসস্থ হয় যে, ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নব পত্র উদ্গমের সূচনা হইতে থাকে। তাহা দ্বারা বৃক্ষ যেমন সুন্দরতর হয়, তেমনি বৃহত্তরও হইতে থাকে।

ভাগবতকার শালতরুর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহার পত্র দেখিয়া মানবের প্রাণে ভগবৎ করুণার অনুভূতি হইয়া থাকে। শালতরু পাষাণময় ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয়। যখন তাহার নব কিসলয় বহির্গত হইতে থাকে, তখন তাহা পুষ্পের অপেক্ষাও সুন্দর দেখায়। পাষাণের উপরও বিধাতা তাহাকে কেমন সুন্দর করিয়া বর্দ্ধিত করেন! বৃক্ষ কঠিন ভূমির নিম্নেও এমন রস আহরণ করে যে, তাহা দ্বারা সে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

যখন মূলে বিশ্ব-বিধাতার করুণা আবির্ভূত হয়, তখন কোন পাষাণই তাহাকে বাধা দিতে পারে না—সে রস সংগ্রহ করিয়া তবে ক্ষান্ত হয়। কি আশার কথা আমরা এই উদ্ভিদ্‌জীবন হইতে লাভ করি!

আজ আমাদেরও সেই দিন আসিয়াছে। তরুর ন্যায় আমাদের মূলে রস আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন আমাদের পুরাতন পত্র ত্যাগ করিয়া, নূতন হইয়া, নবসাজে সজ্জিত হইবার সময় উপস্থিত।

যিনি জগতে আনন্দস্বরূপ, যিনি রসস্বরূপ, তিনি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া রস ঢালিতেছেন। সব সুন্দর হইয়া যাইতেছে। উৎসব তোমার জন্যও এই বার্ত্তা আনিতেছেন। বৃক্ষ যেমন তাহার মূলগুলিকে গভীরতম স্থানে প্রেরণ করিয়া অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ধারার ন্যায় প্রবাহিত রস আহরণ করিয়া, তাহার কাণ্ডের আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া, উচ্চতর হইতেছে,—তোমাকেও তাহাই করিতে হইবে। উৎসবের এই উত্তরায়ণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা পাতা ত্যাগ করিয়া নব পত্র গ্রহণ কর। মানব জীবনের নব পত্র কি? জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, পুণ্য প্রভৃতি মানব জীবনের পত্র। এই উৎসবের মধ্যে নবজ্ঞান, নবভক্তি, নবপ্রেম ও নবপুণ্যে সজ্জিত হইতে হইবে ও উন্নত হইতে উন্নততর লোকের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। অনেক সময় আমরা আক্ষেপের কথা শুনি—"কত উৎসব আসিল, কত গেল, কিন্তু আমাদের কিছুই হইল না।" ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। প্রভু আমাদের কথা শুনিয়াছেন। আমাদিগকে গত উৎসবে নবপত্রে সজ্জিত করিয়াছিলেন, আমাদের কাণ্ডও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। উৎসব আমাদের মস্তকের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়া আমাদিগকে বর্দ্ধিত করিয়াছিল। আমরা সেই সমস্তকে জীবনের কাজে লাগাই নাই। তাই সমস্ত নিরর্থক হইয়া গিয়াছে। বিধাতা করুণা করিয়া আমাদের জন্য আবার সময় আনিয়া দিয়াছেন—আমাদিগকে নবপত্র গ্রহণ করিতে হইবে। নবজ্ঞান, নবপ্রেম, নবপুণ্যে ভূষিত হইতে হইবে। আমাদের মূলকে দৃঢ় করিয়া সেই রসস্বরূপে নিমগ্ন করিতে হইবে। সেই রসস্বরূপের সন্ধান না পাইলে উৎসবের মধ্যে শুধু কতকগুলি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত উপদেশ প্রভৃতির দ্বারা কিছুই হইবে না। ক্রমে ক্রমে ক্লান্ত হইয়া শুষ্ক হইয়া যাইব।

বৃক্ষ যেমন চতুর্দ্দিকের আবেষ্টনের মধ্য হইতে তাহার আহার্য্য সংগ্রহ করে, আমাদেরও সেইরূপ আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এই যে উপাসক-মণ্ডলী ইহাই আমাদের আবেষ্টন। বৃক্ষ মূলের দ্বারা রস ও বায়ুর ভিতর হইতে কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস গ্রহণ করে। যাহাকে উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে chlorophyl বলে তাহার সাহায্যে বৃক্ষ তাহার সজীবতা বা হরিৎবর্ণ রক্ষা করে। আমাদেরও এই

মণ্ডলীর মধ্যে থাকিয়া জীবনের সজীবতা, নবপত্রের হরিৎবর্ণ রক্ষা করিতে হইবে। আর যদি তাহা না পাই, তাহা হইলে বৃক্ষ যেমন সূর্য্যকিরণের অভাবে আওতায় পড়িয়া শুষ্ক হইয়া মৃত হইয়া যায়, আমাদের দশাও তাহাই হইবে। আমাদিগকে সংসারের মলিনতার দিক হইতে ফিরিয়া, বিধাতার প্রসাদ-পবনের দিকে পত্রগুলিকে মেলিয়া ধরিতে হইবে। ইহার দ্বারাই জীবনতরু সজীবতা লাভ করিয়া বর্দ্ধিত হইবে ও উত্তরকালে অন্যান্য অসংখ্য জীবের আশ্রয়রূপে পরিণত হইবে। বৃক্ষের পত্র যেমন বৃক্ষ হইতে স্খলিত হইয়া নিম্নে পড়িয়া পচিয়া উঠে এবং তাহার সারে অন্য বৃক্ষ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ আমাদের এই প্রাণ দিয়া, এই জগত হইতে অদৃশ্য থাকিয়া জগতের সেবা করিয়া, অপরকে বর্দ্ধিত হইবার সাহায্য করিয়া ও জগতের উপকার করিয়া, নিজ জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিব। বৃক্ষ যেমন সর্ব্বদা তাহার অগ্রভাগটীকে সূর্য্যের আলোকের দিকে রাখিবার জন্য ব্যস্ত হয় এবং তাহার দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, আমাদিগকেও সেইরূপ জগতের আলোক যিনি, সূর্য্যকেও আলোকিত করিতেছেন যিনি, সেই সূর্য্যের যিনি সূর্য্যস্বরূপ, সেই আলোকের দিকেই আমাদের জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, পুণ্যকে ধরিতে হইবে। যাহাতে এগুলি প্রেম-সূর্য্যের আলোকে রঞ্জিত হয় তাহা করিতে হইবে। তাহা না হইলে জীবন বাড়িবে না, কোন পক্ষী আসিয়া তাহাতে বাসাও বাঁধিবে না। সমস্ত বৃথা হইয়া যাইবে। যদি দেবাদিদেবের যথার্থ ভক্ত হইতে চাও, তবে তাঁহার পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, তোমার নব-পত্রগুলি তাঁহার আলোকের দিকে মেলিয়া ধরিয়া, নবজীবনলাভে তৎপর হও। উৎসব-দেবতা এ বিষয়ে আমাদের সহায় হউন।

ক্রমশঃ

ব্রাহ্মসমাজ।

শতবার্ষিক উৎসবের পরিসমাপ্তি—১৩৩৫ সালের ভাদ্র (১৯২৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট) মাস হইতে আরম্ভ করিয়া বিগত শততম মাঘোৎসবে ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসব শেষ করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিগত ২৯শে মাঘ (১২ই ফেব্রুয়ারী) তারিখে ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনা সমাজ সমূহে বিশেষ উপাসনাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। তদনুসারে সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

সাধনাশ্রমের সাম্বৎসরিক—সাধনাশ্রমের অষ্টাত্রিংশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে:—১লা ফেব্রুয়ারী প্রাতে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনান্তে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ পাঠ করেন ও প্রসঙ্গাদি হয়; তৎপর প্রীতিভোজন। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় ভাই সীতারাম ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর ৫৷০ ঘটিকায় পুনরায় উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২রা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে কুমারী হেমপ্রভা বসু দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা উপাসক মণ্ডলীর ও রবিবাসরিক নীতিবিদ্যালয়ের সম্পাদিকা এবং অধ্যক্ষ ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যরূপে নানাপ্রকারে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনেক দরিদ্র বালিকাদিগকেও বিশেষ সাহায্য করিতেন। বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য এবং কুমারী শকুন্তলা রাও জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠা ভগিনী মিসেস এস্ এম্ বসু প্রচার বিভাগে ১০০৲ ও কলিকাতা উপাসক মণ্ডলীতে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। মিস্ বসু দশ সহস্রাধিক টাকা পিতামাতার নামে একটি স্থায়ী প্রচার ভাণ্ডার স্থাপনের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায়ের মাতা ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং ব্রজসুন্দর বাবু মাতার জীবনী পাঠ করিয়া প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ১০৲, দাতব্য বিভাগে ৫৲, দুঃস্থ ব্রাহ্ম পরিবার ভাণ্ডারে ৫৲ ও সাধনাশ্রমে ৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ১০ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাসের খুল্লতাত ভ্রাতা মনোমোহন দাসগুপ্ত দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ৩৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র মাধুরীতে পরিচিত সকলেই বিশেষ মুগ্ধ ছিলেন।

বিগত ১৪ই জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র বসুর শাশুড়ীর জননী নৃত্যমণি দাসী ৯১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি দীর্ঘকাল অধরবাবুর পরিবারে বাস করিয়া অভিভাবিকার কার্য্য করিয়াছেন। বিগত ১৩ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মিশন ফণ্ডে ১৫৲ ও দুস্থ পরিবার ফণ্ডে ১০৲ এবং অনাথাশ্রমে ২৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন শ্রাদ্ধের দিনে কাঙ্গালী-ভোজন ও তাহাদিগকে বস্ত্র ও পয়সা প্রদত্ত হয়।

বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী কোনোর নগরীতে ল্যাফ্টেনান্ট কর্ণেল নরেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি এক সময় অধ্যক্ষ-সভার সভ্য ছিলেন ও ব্রাহ্মসমাজের কাজে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।

বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে বাবু রাজকুমার

দাস তিন পুত্র, দুই কন্যা ও পত্নীকে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন ও জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।

বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার রায়ের পিতামহী মুক্তকেশী চন্দ অল্প দিনের অসুখে ৮৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে মিঃ নলিনী-ভূষণ গুপ্ত তিন দিনের বসন্ত রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বরিশালে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের জন্য ৮১,০০০ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের নানা কার্য্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ব্যারিষ্টার রূপেও তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন এবং আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

দান—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাস পিতা পরলোকগত দ্বিজদাস বিশ্বাসের ঊনচত্বারিংশত্তম বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে পিতার নামীয় স্মৃতিভাণ্ডারে ১০০৲ টাকার একখানা কোম্পানীর কাগজ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমতী সরোজিনী দত্ত কন্যা মাধুরীলতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে অশ্বিনী-মাধুরী ফণ্ডের সুদের টাকা হইতে একটি গরীব ব্রাহ্মবালিকাকে প্রায় ৪৪৲ টাকার বস্ত্রাদি এবং নিজ হইতে অপর একটি বালিকাকে নগদ ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৫৲ ও দাতব্য বিভাগে ২৲ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন ও তাঁহার পুত্রগণ পরলোকগতা বসন্তকুমারী সেনের অষ্টম বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার নামীয় স্মৃতিভাণ্ডারে ১০০৲ টাকার একখানা কোম্পানীর কাগজ প্রদান করিয়াছেন।

এ সমস্ত দান সার্থক হউক এবং পরলোকগত আত্মাসকল চির শান্তি লাভ করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ৩রা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দাঁর কন্যা কল্যাণীয়া রেণুকা ও শ্রীযুক্ত হীরালাল সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান হীরেন্দ্রনাথের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী কালীকচ্ছ গ্রামে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ নন্দীর পৌত্রী (শ্রীযুক্ত বিবেকচন্দ্র নন্দীর কন্যা) কল্যাণীয়া কমলামাধুরী ও চট্টগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ সুশান্তকুমারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী কুমিল্লা নগরীতে পরলোকগত কমনীয়কুমার সিংহের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া চিন্ময়ী ও চট্টগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ সুহাস-চন্দ্রের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যো-পাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে গিরিডি প্রবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ দত্তের তৃতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া অমিয়া ও বজবজ নিবাসী শ্রীমান্ কিশোরীমোহন সাঁতরার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নব দম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

নামকরণ—বিগত ৩০শে জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র দাসের প্রথম সন্তানের নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশুকে (জন্ম ২৯শে জানুয়ারী, ১৯২৯) অজয়কুমার নাম প্রদত্ত হইয়াছে। মঙ্গলময় বিধাতা অজয়কুমারকে নিত্য কল্যাণে বর্দ্ধিত করুন।

বর্ত্তমান বর্ষের কর্ম্মচারী—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের স্থগিত অধিবেশনে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ বর্ত্তমান বর্ষের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন:—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার—সভাপতি, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন বসু—সম্পাদক, শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন, শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—সহকারী সম্পাদক, এবং শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বসু কোষাধ্যক্ষ।

অধ্যক্ষ সভা—পূর্ব্বোক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিতরূপে বর্ত্তমান বর্ষের অধ্যক্ষ সভা গঠিত হইয়াছে:—(কলিকাতা) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর দে, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহালানবিশ, শ্রীমতী কামিনী রায়, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বনোয়ারীলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র আতর্থী, শ্রীমতী সুশীলা বসু, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায়, শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র সাধুখাঁ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রনাথ রায়, ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত শিশির কুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীমতী প্রমোদা চৌধুরী, শ্রীমতী সান্ত্বনা রায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন দত্ত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল রায়, শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(মফঃস্বল) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত—ঢাকা, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল—লাহোর, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী—বরিশাল, ভাই সীতারাম—শিয়াল কোট সিটি, শ্রীযুক্ত ভি আর সিন্দে—পুনা, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর—কটক, শ্রীযুক্ত অমলকুমার সিদ্ধান্ত—লাহোর, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ—ময়মনসিং, ডাঃ ভি রায়—গিরিডি, [illegible] সত্যানন্দ দাস—বরিশাল, শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী—

চেরাপুঞ্জি; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বরিশাল, শ্রীযুক্ত জয়কালী দত্ত—রাঁচি, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ—হাজারিবাগ, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ—ঢাকা, শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঙ্কুর দে—বাঁকুড়া, কাজী আবদুল গাফফার—খুলনা, শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন—গিরিডি, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত—লাহোর, কুমারী ভক্তিলতা চন্দ—কটক, শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত—ঢাকা, শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ—গিরিডি, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়—সিলেট্, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র-কুমার বিশ্বাস—তমলুক, শ্রীযুক্ত লালা রঘুনাথ সহায়—লাহোর, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু—ঢাকা, শ্রীযুক্ত লালমোহন চট্টোপাধ্যায়—শোণপুর, স্বামী ব্রহ্মানন্দ—মান্দ্রাজ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়—চন্দননগর, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চৌধুরী—পাটনা।

(প্রতিনিধি) শ্রীযুক্ত কালীমোহন বসু—কালীঘাট প্রার্থনা সমাজ, শ্রীমতী উমা দে—বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র—টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ নন্দী—কালীকচ্ছ ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—ময়মনসিং ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার বসু—মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত অনিল-কুমার সেন—বাণীবন ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়—কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র—ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজ, রায় সাহেব প্যারীমোহন দাস—পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ, রায় সাহেব শরৎচন্দ্র দাস—ধুবড়ি ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস—বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস—উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীমতী সুকুমারী সেন—বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্য—আন্দুল ব্রাহ্মসমাজ, মিঃ ইউ মাপ্পাপপা—ম্যাঙ্গালোর ব্রাহ্মসমাজ, ডাঃ হেমচন্দ্র সরকার—বেজওয়াদা ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম—সিলেট্ ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র চৌধুরী—বরমা ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত অতুলভূষণ সরকার—মউস্মাই ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত জয়মঙ্গল রথ—গঞ্জাম জেলা ব্রাহ্মসমাজ, রায় বাহাদুর মহেন্দ্রকুমার গুপ্ত—সিলং ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সেন—খাসিয়া হিল্স ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত মধুসূদন জানা—কাঁথি ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত এম মহাদেব মুদলিয়র—ব্যাঙ্গালোর ক্যাণ্টনমেণ্ট ব্রাহ্মসমাজ, মিঃ এ গোগালম্—কালিকট্ ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ সেন—কাওরাইদ (ঢাকা) ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সরকার—কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ।

কালীকচ্ছ ব্রাহ্মসমাজ—কালীকচ্ছ ব্রাহ্মসমাজে শততম মাঘোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে:—৬ই মাঘ সায়ংকালে মহর্ষির স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়; শ্রীযুক্ত তারিণীনাথ নন্দী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ নন্দী মহর্ষির জীবনী সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং তারিণী বাবু বক্তৃতা করেন। ৯ই মাঘ প্রাতে ব্রাহ্ম-সমাজের কল্যাণার্থে ব্রাহ্ম পরিবারে প্রার্থনা। সায়ংকালে মন্দিরে কীর্ত্তন ও উপাসনা; শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ নন্দী উপাসনার কার্য্য করেন। ১০ই মাঘ প্রাতে কীর্ত্তন ও উপাসনা; বাবু বিবেকচন্দ্র নন্দী উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় বালক-বালিকা-সম্মিলন; মৌলবী আতিকার রহমান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন; বাবু প্যারীনাথ নন্দী, বাবু তারিণীনাথ নন্দী ও বাবু শশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য্য উপস্থিত বালকবালিকাদিগকে উপদেশ দেন। সায়ংকালে মন্দিরে শ্রীমতী বিনোদিনী নন্দী উপাসনা করেন। ১১ই মাঘ উষাকীর্ত্তন ও প্রাতে উপাসনা; তারিণী বাবু উপাসনার কাজ করেন। ১০ ঘটিকায় মহেন্দ্র বাবুর পারি-বারিক মন্দিরে প্যারী বাবু উপাসনা করেন। অপরাহ্ণে পাঠ ও কীর্ত্তন। সায়ংকালে মন্দিরে প্যারী বাবু উপাসনা করেন। ১২ই মাঘ প্রাতে মন্দিরে উপাসনা; বাবু বিবেকচন্দ্র নন্দী উপাসনার কাজ করেন। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় মহিলা-উৎসব। শ্রীমতী বিনোদিনী নন্দী পাঠ ও উপাসনার কাজ করেন। ৩॥ ঘটিকায় নগর সংকীর্ত্তন; গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়ের মাতার শ্মশানে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন ও বাবু কুঞ্জবিহারী দত্তের বাড়ীতে কীর্ত্তন ও প্রার্থনা। মন্দিরে ৭ ঘটিকায় উপাসনা; বাবু প্যারীনাথ নন্দী উপাসনা করেন। ১৩ই মাঘ প্রাতে বাবু তারিণীনাথ নন্দীর বাগানে উপাসনা ও প্রীতিভোজন; তারিণী বাবুই প্রীতিভোজনের সমুদয় ব্যয় বহন করিয়াছেন। ব্রাহ্ম-সমাজের নির্দ্দেশ অনুসারে ১২ই ফেব্রুয়ারী মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল; বাবু প্যারীনাথ নন্দী উপাসনার কাজ করেন।

কলিকাতা উপাসকমণ্ডলী—কলিকাতা উপাসক মণ্ডলীর বার্ষিক সভা উপলক্ষে নিম্নলিখিতরূপে একটী বিশেষ উৎসব সম্পন্ন হয়—২২শে ফেব্রুয়ারী শনিবার অপরাহ্ণে সমাজ-প্রাঙ্গণে সান্ধ্যসম্মিলন। তাহাতে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার প্রার্থনা করেন এবং লাঠিখেলা প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যায়াম প্রদর্শিত হয়। সায়ংকালে মন্দিরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভক্তবাণী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ২৩শে রবিবার দুই বেলা উপাসনা হয়। প্রাতে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় ও সায়ংকালে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২৪শে সোমবার সায়ংকালে বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে বার্ষিক কার্য্য বিবরণী ও হিসাবাদি গৃহীত হইলে পর, পুনরায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখো-পাধ্যায় সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহ ও শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বসু সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এতদ্ব্যতীত কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত ও আচার্য্যগণ মনোনীত হন।

ঢাকায় মাঘোৎসব—পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ নিম্নলিখিতরূপে শততম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন:—২৭শে পৌষ হইতে ২রা মাঘ পর্য্যন্ত প্রতিদিন উষাকীর্ত্তনের পর প্রাতঃ-কালে এবং সন্ধ্যায় সহরের বিভিন্ন পল্লীতে বিভিন্ন পরিবারে কীর্ত্তন ও উপাসনা হইয়াছে। সকল স্থানেই শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। তিনি উৎসবের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে ঢাকায় থাকিয়া পরিবারে পরিবারে উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি করিয়া সকলের মনে উৎসবের ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র বসুও সঙ্গীত ও

কীর্ত্তনাদি দ্বারা এই কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ৩রা মাঘ সন্ধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন হয়; শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৪ঠা মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী "মাঘোৎসবের বাণী" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৫ই মাঘ প্রাতঃকালে ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত যোগজীবন পাল আচার্য্যের কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে ছাত্র সমাজের বার্ষিক সভা হয়, তাহাতে নূতন বৎসরের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হয় ও কর্ম্মচারী-বৃন্দ মনোনীত হন। সন্ধ্যায় উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৬ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় মহর্ষির স্মৃতিসভা হয়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত যোগজীবন পাল বক্তৃতা করেন। ৭ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় সঙ্গতসভার উৎসবে শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত সংক্ষিপ্ত উপাসনা করেন, তৎপর শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ "বেদান্তে আত্মানাত্ম তত্ত্ব" এই সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ৮ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত "ধর্ম্মপথে বিঘ্ন ও আত্মরক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৯ই মাঘ মহিলা-উৎসব—প্রাতঃকালে ৯ ঘটিকায় উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপরে প্রীতিভোজন; আবার অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় মহিলাদের সম্মিলন হয়। মিসেস্ চিন্ময়ী দাস সংক্ষিপ্ত উপাসনা করেন এবং শ্রীমতী রেণুকা দাস ও শ্রীমতী প্রিয়বালা গুপ্ত প্রবন্ধ পাঠ করেন। পুরুষদিগের জন্য প্রাতঃকালে ইষ্টবেঙ্গল ইন্ষ্টিটিউসন হলে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় মন্দিরে শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত "তপোবনের সংবাদ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১০ই মাঘ প্রাতঃকালে পরলোকগত আচার্য্য নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের সাম্বৎসরিক উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় নগর সংকীর্ত্তন, সন্ধ্যায় উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১১ই মাঘ সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। ১০ই মাঘ সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র থাকিয়া যুবকগণ মন্দিরটি সুন্দররূপে সজ্জিত করেন। ১১ই মাঘ প্রভাত হইতে না হইতেই দলে দলে লোক আসিতে থাকেন, অতি প্রত্যুষে কীর্ত্তন আরম্ভ হয় এবং তৎপর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত উপাসনা আরম্ভ করেন। উপাসনান্তে কয়েকজন বন্ধু কীর্ত্তন, পাঠ ও প্রার্থনায় ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত যাপন করেন; তৎপর ২॥ ঘটিকায় উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "মাঘোৎসবের উৎপত্তি ও তাহার ক্রমিক বিকাশ" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ৫॥ ঘটিকায় মন্দিরপ্রাঙ্গণে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, তৎপর ৬॥ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত উপাসনা করেন। ১২ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় বালক-বালিকাদিগের উৎসব হয়; শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বালক-বালিকাদিগের সঙ্গীত ও আবৃত্তি হইলে পর প্রায় ৪০০ বালক-বালিকাদিগকে জলযোগ করান হয়। সন্ধ্যায় উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৩ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় ইষ্টবেঙ্গল ইন্ষ্টিটিউসনপ্রাঙ্গণে দরিদ্রদিগকে চাউল ও পয়সা বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় ইষ্টবেঙ্গল ইন্ষ্টিটিউসন হলে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের একটি সম্মিলন হয়। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং রেভারেণ্ড নর্থফিল্ড খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে, অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য্য হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে, ডাক্তার মহম্মদ শহিদুল্লা ইস্‌লামধর্ম্ম সম্বন্ধে, অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং সভাপতি ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৪ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ "ধর্ম্মে সার্ব্বভৌমিকতা" সম্বন্ধে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। ১৫ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যায়ও উপাসনা হয়। নির্দ্দিষ্ট আচার্য্য মুসলমানের দাঙ্গার জন্য উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। সহরে মুসলমানের দাঙ্গার জন্য গেণ্ডারিয়া উদ্যানসম্মিলন ১২শে মাঘ তারিখে হইতে পারে নাই। ২৬শে মাঘ এই সম্মিলন হয়। ১০॥ ঘটিকায় উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বরিশালে মাঘোৎসব—উৎসবে লোক সমাগম এ বৎসর অন্য বৎসরের তুলনায় কম হইলেও একনিষ্ঠ উপাসক, গায়ক, বাদক এবং চাঁদাদাতাগণের সাহায্য ও সহানুভূতি সমানই দেখা গিয়াছে। বক্তৃতা, উপাসনা, উপদেশ, সঙ্গীত, উষাকীর্ত্তন, নগরকীর্ত্তন, প্রীতিভোজন, ছাত্রসমাজের উৎসব, বালক-বালিকা-সম্মিলন, কাঙ্গালী বিদায় অনুষ্ঠান প্রভৃতি উৎসবের সর্ব্বাঙ্গীণ কার্য্যই সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। উৎসবের প্রতিদিনের কার্য্য সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে:—

৫ই মাঘ প্রত্যুষে বগুড়াস্থ সর্ব্বানন্দ-ভবন হইতে উষাকীর্ত্তন বাহির হইয়া বড় বড় রাস্তা ভ্রমণান্তে ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইলে, উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধনসূচক উপাসনায় শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৬ই মাঘ প্রাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের মহাপ্রস্থানস্মৃতি লইয়া উপাসনা হয়। আচার্য্য ছিলেন সত্যানন্দবাবু। সায়ংকালে মহর্ষির স্মৃতিসভার অধিবেশনে সত্যানন্দবাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং বাবু যোগানন্দ দাস বক্তৃতা করেন। ৭ই মাঘ প্রাতে বগুড়া পল্লীতে উষাকীর্ত্তনান্তে সর্ব্বানন্দ-

ভবনে উপাসনা হয়। বাবু যোগানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রীতিজলযোগে উৎসবের কার্য্য শেষ হয়। সায়ংকালে ব্রাহ্মবন্ধু-সভার উৎসব সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ সেন, পূর্ণচন্দ্র দে, প্রসন্নকুমার দাস, মন্মথমোহন দাস ব্রহ্মোপাসনা এবং সাধন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনাচ্ছলে বক্তৃতা করেন। ৮ই মাঘ প্রাতে সঙ্কীর্ত্তনান্তে বাবু প্রসন্নকুমার দাস ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে পাঠ এবং বাবু ললিতকুমার বসু প্রার্থনা করেন। সায়ংকালে সঙ্গীত কীর্ত্তনান্তে বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণ সভার বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া প্রার্থনা করেন এবং কার্য্যবিবরণাদি আলোচিত হয়। ৯ই মাঘ প্রাতে আলেকান্দা পল্লীতে উষাকীর্ত্তনান্তে বাবু রসরঞ্জন সেনের গৃহে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রীতি জলযোগে উৎসব শেষ হয়। অপরাহ্নে মন্দিরপ্রাঙ্গণে ছাত্রসমাজের উৎসব সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কুমারী জুঁইফুল সঙ্গীত করিলে সভাপতি প্রার্থনা করেন। শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাস ও কুমারী নীহারকণা দাস দুইটী প্রবন্ধ এবং বাবু যোগানন্দ দাস এবং বাবু রসরঞ্জন সেন, ছাত্রগণের আদর্শ ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ দেওয়ান বাহাদুর সারদাপ্রসাদ সেন, বরিশালের রায় গণেশচন্দ্র দাশ বাহাদুর বক্তৃতা ও প্রবন্ধের প্রশংসা করিয়া ছাত্রগণকে আশীর্ব্বাদরূপে সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রদান করেন। সভাপতির মন্তব্যান্তে সন্দেশ বিতরিত হইলে উৎসব শেষ হয়। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস "জীবনের পূজা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১০ই মাঘ প্রাতে আচার্য্য নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের মহাপ্রস্থান দিনের স্মৃতিতে উপাসনা হয়। মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে নবদ্বীপচন্দ্রের স্থান বিষয়ে বিবৃত করেন। সায়ংকালে উপাসনা হয়; সতীশবাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১১ই মাঘ প্রভাত হইতে উষাকীর্ত্তন হয়। উপাসনার পূর্ব্বে এবং উপাসনায় প্রধানতঃ মনোমোহন বাবু সঙ্গীত করেন। ৮টায় উপাসনা আরম্ভ হইয়া ১০ টায় শেষ হয়। আচার্য্য ছিলেন সত্যানন্দবাবু। ১ টা পর্য্যন্ত কেহ কেহ ধ্যান, প্রার্থনা এবং সঙ্গীতে অতিবাহিত করেন। অপরাহ্নে সতীশ বাবু উপাসনা করেন। তৎপরে বাবু যোগানন্দ দাস, রসরঞ্জন সেন এবং সতীশ বাবু নানা ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে পাঠ করেন। সায়ংকাল জমাট কীর্ত্তনান্তে উপাসনা হয়। আচার্য্য মনোমোহন বাবু। সুরেন বাবু এবং ব্রাহ্মকন্যাগণ মিলিত কণ্ঠে সঙ্গীত করেন। প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত গায়ক ও উপাসকগণ সঙ্গীতাদিতে অতিবাহিত করিলে আজিকার বিশেষ দিনের উৎসব শেষ হয়। ১২ই মাঘ প্রাতে উপাসনা হয়; বাবু রাজকুমার ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে মন্দিরে ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসবে শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাস উপাসনার কার্য্য, কুমারী স্নেহলতা দাস ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, শ্রীমতী প্রফুল্লবালা দাস প্রবন্ধ পাঠ এবং কুমারী লীলাময়ী চক্রবর্ত্তী ও কুমারী শান্তিলতা দাস সঙ্গীত করেন; এদিকে অপরাহ্ণ ৪ টার পরে ব্রাহ্ম-শ্মশানক্ষেত্র হইতে নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। কীর্ত্তন আদি অত্র জমাটভাবে সহরের বড় বড় রাস্তা ঘুরিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলে উপাসনা হয়। সত্যানন্দ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৩ই মাঘ প্রাতে উপাসনা হয়। বাবু যোগানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় বালক-বালিকা-সম্মিলন উৎসব সম্পন্ন হয়। কুমারী স্নেহলতা দাস সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন; মনোমোহন বাবু প্রার্থনা করেন। বালিকাদিগের সঙ্গীত ও আবৃত্তি হইলে, বাবু কল্যাণকুমার চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাস উপদেশচ্ছলে বক্তৃতা করেন। সভানেত্রী লিখিত উপদেশ পাঠ করিলে, কমলা লেবু ও সন্দেশ বিতরিত হইলে উৎসব শেষ হয়। সায়ংকালে মনোমোহন বাবু "শত বর্ষের শ্রেষ্ঠ দান" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১৪ই মাঘ প্রাতের উপাসনায় মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে সুহৃদসম্মিলনের উপাসনায় সতীশ বাবু আচার্য্য। উপাসনান্তে পরস্পরের প্রীতি-নমস্কার ও প্রেমালিঙ্গনাদি হইলে প্রীতিভোজনান্তে রাত্রি প্রায় ১২টায় মধুর মাঘোৎসব শেষ হইয়া গেল। ১৫ই মাঘ—এই দিন উৎসবের তালিকাভুক্ত ছিল না—১০ই মাঘের নির্দ্ধারিত কাঙ্গালী বিদায় অনুষ্ঠান মন্দির-প্রাঙ্গণে সম্পন্ন হয়। তিন শতাধিক ভিখারী উপস্থিত হইলে মনোমোহন বাবু তাহাদিগকে অন্যান্য বারের ন্যায় উপদেশপ্রদানান্তে প্রার্থনা করেন। তৎপরে তাহাদিগকে পয়সা বিতরিত হয়। সায়ংকালে স্বর্গীয় আচার্য্য কালীমোহন দাস মহাশয়ের গৃহে তাঁহার পুত্র বাবু ললিতমোহন দাসের আহ্বানে উপাসনার ব্যবস্থা হয়। বাবু যোগানন্দ দাস উপাসনা করেন। প্রীতি-জলযোগে পারিবারিক উৎসব শেষ হয়।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ২৭শে মাঘ সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নির্দ্দেশক্রমে শতবর্ষোৎসবের প্রচার কার্য্য প্রভৃতির উৎযাপনরূপে বরিশাল ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং দেড় বৎসর ব্যাপী প্রচার ও উৎসবে ভগবানের করুণা ও একনিষ্ঠ কর্ম্মীদলের সেবানিষ্ঠা বিষয়ে উপদেশ দেন।

বিগত ১৫ই ফাল্গুন বরিশাল ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মিকা সমাজের ৫৩ ত্রিপঞ্চাশত্তম উৎসব সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য এবং বাবু ননীভূষণ দাস ও কন্যাগণ গান করেন। উপাসনার পূর্ব্বে কুমারী স্নেহলতা দাস ধর্ম্মগ্রন্থ এবং শ্রীমতী প্রভাময়ী দাস প্রবন্ধ পাঠ করেন।

বিগত ১লা ফাল্গুন সায়ংকালে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে, তাঁহার পুত্রবধূর ভগ্নী স্বর্গীয় মন্মথনাথ দত্তের কন্যা কল্যাণীর পরলোকগমনে জমাট কীর্ত্তনান্তে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য এবং সতীশ বাবুর কন্যা পারুলবালা কল্যাণীর জীবনকথা পাঠ করেন। জলযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এই উপলক্ষে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে ২ টাকা প্রদত্ত হয়।

বিগত ১লা ফাল্গুন অপরাহ্নে বাবু রাজকুমার ঘোষের গৃহে তাঁহার চতুর্থকন্যা শ্রীমতী মালতীর প্রথমা কন্যার (পিতা শ্রীযুক্ত শঙ্কর নাইডু) জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রীতিজলযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

১৯৩০ সনের জন্য বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মন্মথমোহন দাস, রাজকুমার ঘোষ এবং ললিতকুমার বসু সহকারী আচার্য্য নিযুক্ত হইয়াছেন। মন্মথ বাবু সম্পাদক এবং বাবু রসিকলাল সেন, জ্ঞানানন্দ দাস, বিনয়ভূষণ দাস, কল্যাণকুমার চক্রবর্ত্তী সহকারী সম্পাদক এবং বিনয়ভূষণ গুপ্ত ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। কর্ম্মচারীগণ ব্যতীত ১০ জন সভ্য লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে।

মাঘোৎসবের পরে সাণ্ডে স্কুলের কার্য্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর তত্ত্বাবধানে পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীমতী প্রভাময়ী দাস এবং কুমারী লীলাময়ী চক্রবর্ত্তী শিক্ষাদান করিতেছেন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ২৮শে ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি এ।

Registered No. 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫২ম ভাগ
২৩শ সংখ্যা।
১লা চৈত্র, শনিবার, ১৩৩৬, ১৮৫১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০১
15th March, 1930.
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে চিরমঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা, তুমি প্রতিনিয়ত এই বিশ্বের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলের সকল প্রকার কল্যাণসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছ—যাহার যাহা প্রয়োজন বিধান করিতেছ, সকলকে চির-উন্নতির পথে নিয়া চলিয়াছ। আমরা তাহা না দেখিয়া না বুঝিয়া, আপনার পথে, আপনার ভাবে, চলিতে যাইয়া তোমার মঙ্গল কার্য্যে কত বাধা উপস্থিত করি! আমাদের উন্নতি ও কল্যাণকে কত দূরে ফেলিয়া দেই! এবং কত দুঃখ বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হই! কিন্তু, হে সর্ব্বশক্তিমান্, তোমার মঙ্গল ইচ্ছাকে ব্যর্থ ও পরাজিত করিবার শক্তি ত আমাদের কাহারও নাই। তুমি সকল বাধা বিঘ্ন, সকল অবাধ্যতা ও বিরোধিতা চূর্ণ করিয়া, তোমার মঙ্গল ইচ্ছাকে জয়যুক্ত না করিয়া কখনও ক্ষান্ত হও না। তবু কেন যে আমরা তোমার হাতে আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া সকল বিষয়ে তোমার অনুগত হইয়া চলি না, অবাধ্য হইয়া কেবল দুঃখ ক্লেশ লাঞ্ছনা ভোগ করি, জানি না। তুমি ভিন্ন আর কে আমাদের মোহ দুর্ব্বুদ্ধি দূর করিবে? আমাদের অবিশ্বাস ও বিদ্রোহিতাকে, অহঙ্কার ও স্বেচ্ছাচারিতাকে চূর্ণ করিবে? আর কে আমাদের প্রাণে সে আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ে সে বল প্রদান করিবে, যাহাতে আমরা সর্ব্বদা সকল বিষয়ে তোমার জীবন্ত মঙ্গল বিধাতৃত্বের হস্তে আপনাদিগকে অর্পন করিয়া, তোমার অনুগত হইয়া চলিতে পারি? তুমিই আমাদের একমাত্র প্রভু ও চালক হও, আমাদের সকল প্রকার উদাসীনতা অবহেলা ও স্বেচ্ছাচারিতা দূর করিয়া দেও। আমাদের প্রতি জীবনে ও সমাজে তোমার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক। আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমার হইয়া যাই। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

শততম মাঘোৎসব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) শনিবার—

অদ্য উৎসবের প্রধান দিন। যুবকগণ ১০ই মাঘের রাত্রিকালীন উপাসনার পর প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া মন্দির পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত করেন। ওদিকে রাত্রি প্রভাতের বহু পূর্ব্ব হইতেই ব্যাকুলপ্রাণ উপাসকগণ আসিয়া মন্দিরে সমবেত হইতে আরম্ভ করেন, এবং সঙ্গীত সংকীর্ত্তন চলিতে থাকে। অনন্তর ৭ ঘটিকার সময় মিলিত কণ্ঠে "জাগো পুরবাসী, ভগবত-প্রেমপিয়াসী" ইত্যাদি সঙ্গীতটি গীত হইলে উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য-গণকে স্মরণ ও প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে উদ্বোধন করেন:—

শতবর্ষের কিছু বেশী হ'ল, করুণাময়ী বিশ্বজননী আমাদের জন্য পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতে অভ্যুদিত করেছেন। শতবর্ষ পূর্ব্বে ১১ই মাঘে রাজা রামমোহন রায় তাঁর প্রিয় ব্রাহ্মসমাজকে একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রেখে যান। এই দিনটি আমাদের কাছে অতি পবিত্র দিন। আজ করুণাময়ী বিশ্বজননীর অপার করুণা স্মরণ ক'রে ও স্বীকার ক'রে, তাঁর প্রেমসাগরে অবগাহন ক'রে ও তাঁর প্রেমের হাতে আত্মসমর্পণ ক'রে, আমরা ধন্য হব। সেজন্যই মা আজ আমাদের ডেকেছেন। এই উৎসব তাঁর সেই ডাক ভাল ক'রে শোন্‌বার সময়। উৎসবে আমাদের প্রত্যেকের জন্য তাঁর কিছু বিশেষ কথা আছে। প্রত্যেককে তাঁর কিছু আদেশ, কিছু ইঙ্গিত, কিছু আদর, কিছু সান্ত্বনা দিবার আছে। তাঁর প্রেমের আলোতে কাছে এসে ঘেঁষে বস্‌লে তা বোঝা যায়। এস ভাই বোন্, সকলে তাঁর খুব কাছে বসি, তাঁর দিকে প্রাণ খুলে দিই, কাণ পেতে থাকি।

আজ মা আমাদের ডাকছেন। আবার আজ আমাদেরও পরস্পরকে ডাকবার দিন। আজ সকলে সকলকে মিষ্টি ক'রে ডাকি। আনন্দোৎসবে শিশুরা যেমন পরস্পরকে মিষ্টি ক'রে ডাকে। এই ডাকটির বড়ই মূল্য। সকলে সকলকে প্রাণ দিয়ে প্রেম দিয়ে একবার ডাকি। একবার প্রাণ বলুক, "তোমরা সকলে আমার ভাই বোন্; তোমরা আমার কাছে আছ ব'লে আমি কত সুখী হ'য়েছি, কত ধন্য হ'য়েছি।"

ডাকি সকলের আগে সকল যুগের সকল দেশের সাধু ভক্তদিগকে। ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদী ঋষিগণকে ডাকি। যিনি মৈত্রী-মন্ত্র শিক্ষা দিলেন, সেই শ্রীবুদ্ধকে ডাকি। পিতার আদেশ-পালনকে ধর্ম্মরাজ্যে যিনি সর্ব্বোচ্চ স্থানে তুলে ধরলেন, সেই শ্রীঈশাকে ডাকি। বিশ্বাসের জ্বলন্ত মূর্ত্তি শ্রীমহম্মদকে ডাকি। ভক্তিতে বিগলিত বাংলার শ্রীচৈতন্যকে ডাকি। আরও যত সাধক যোগী ভক্ত তাঁদের সাধনামৃত দিয়ে জীবনামৃত দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মধারাকে পুষ্ট ক'রেছেন, সকলকে আজ ভক্তির সঙ্গে ডাকি। ব্রাহ্মসমাজ তাঁদের উত্তরাধিকারী। তাঁরা আজ কত আগ্রহে আমাদের পৃথিবীর এই শতাব্দী-উৎসব দেখ্‌ছেন। আমাদের মধ্যে আজ তাঁরা আসুন।

ডাকি এই ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীদিগকে। রাজর্ষি রামমোহন, যিনি জীবনের রক্ত দিয়ে জমি প্রস্তুত ক'রে এই ব্রাহ্মসমাজের বীজ বপন ক'রে রেখে গিয়েছেন; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, যিনি মাঘোৎসবের প্রবর্ত্তক, ৮৬ বৎসর পূর্ব্বে এই ১১ই মাঘের উৎসব প্রবর্ত্তিত ক'রে যিনি এই দিনটিকে আমাদের জন্য এমন পবিত্র ক'রে রেখে গিয়েছেন, যাঁর নিষ্ঠা ভক্তি ও তপস্যার উত্তাপ এই দিনের সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে রয়েছে; ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, যিনি অনুতাপ ও ভক্তির ধারায় নিজে গ'লে ও সকলের প্রাণকে গলিয়ে দিয়ে মাঘোৎসবকে কত অমৃতে পূর্ণ ক'রে রেখে গিয়েছেন; ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও আচার্য্য শিবনাথ, যাঁদের স্মৃতি এই মন্দিরের কত মাঘোৎসবের সঙ্গে জড়িত, যাঁদের প্রাণের ব্যাকুলতায় এই মন্দিরের আকাশ, এই মন্দিরের প্রাচীর যেন এখনও স্পন্দিত রয়েছে; সাধক উমেশচন্দ্র, প্রেমিক নবদ্বীপচন্দ্র, যাঁদের মুখগুলি স্মরণ করলেই উৎসবের ভাব প্রবল বেগে আমাদের হৃদয়ে প্রবাহিত হ'য়ে আসে,—আরও কত যোগী ভক্ত সাধক সেবক যাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করা এখন সম্ভব নয়,—আজ প্রাণ সকলকে ডাকুক। সকলের আত্মিক সঙ্গ কামনা করি, সকলকে প্রণাম করি।

আজ অন্য অন্য কত স্থানে কত মন্দিরে আমাদের কত ভাই বোন্ উৎসবে প্রবৃত্ত। সকলের সঙ্গে হৃদয়কে যুক্ত করি। যাঁরা কোনও কারণে কোনও মন্দিরে উপস্থিত হ'তে পারেন নি, একা একা রয়েছেন, তাঁদের সকলকে প্রাণে টেনে লই।

আজ বিশেষ ভাবে সকলে তাদের স্মরণ কর, পৃথিবীতে যাদের হারিয়ে জীবনটা খালি-খালি লাগ্‌ছে। স্নেহভাজন পুত্র কন্যা, অথবা জীবনপথের সহযাত্রী, অথবা বন্ধু, অথবা পিতামাতা বা গুরুজন,—যাদের জন্য হৃদয়ে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিন্দু বিন্দু স্নেহ প্রেম ভক্তি সঞ্চিত হ'য়ে হ'য়ে হৃদয়পাত্র উপ্‌চে যায়, যাদের কথা মনে হ'লেই চোখ ভেসে যায়,—আজ তাদের খুব ভাল ক'রে প্রাণে ডাক'। এই বিশেষ দিনটিতে পৃথিবীতে আমাদের প্রাণে তাদের জন্য স্নেহ ভালবাসা ভক্তি উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে; ওপারে তাদের আত্মাতেও আমাদের জন্য বিশেষ ব্যাকুলতার তরঙ্গ ওঠে। আকাশ ব্যবধান রেখে দুই মেঘে পরস্পরের জন্য তাড়িত সঞ্চিত হ'তে থাকে; শেষে বিশেষ মুহূর্ত্তে সেই সঞ্চিত দুই তাড়িত আকাশের ব্যবধান ভেদ ক'রে ছুটে গিয়ে মিলিত হয়। এই দিনে তেমনি, পরলোকগত প্রিয়জনদের জন্য প্রাণ উথ্‌লে যায়, সব আড়াল ভেদ ক'রে প্রাণ তাদের স্পর্শ করতে চায়। তাদের সঙ্গের জন্য ব্যাকুলতায় উচ্ছ্বসিত প্রাণ নিয়ে আজ সকলে উৎসবদ্বারে উপস্থিত হই।

মা আজ আমাদের চোখের জল মুছিয়ে দিবেন। গানে যে বলা হ'ল, "দুখী কে বা আছ, শোন গো বারতা, ডেকেছেন তোমারে জগতের মাতা।" আমাদের মত দুঃখী আর কে আছে? আমাদের সংসার-দুঃখ, আমাদের পাপের দুঃখ, দুইই মোচন করবার জন্য মা আমাদের কাছে এসেছেন। স্বর্গে সাড়া প'ড়ে গিয়েছে। সাধুভক্তগণ দেব-দেবীগণ উৎসুকনয়নে দেখ্‌ছেন, মা এবার কাদের তুলে কোলে নেবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পৃথিবীতে নেমেছেন! কাদের জন্য তাঁর নূতন দয়ার বিধান অবতীর্ণ! তাঁরা মাকে জিজ্ঞাসা করছেন, "মা, ব্রাহ্মরা কি তোমার খুব ভাল সন্তান? তোমার কথা খুব শুনে চলে?"

ব্রাহ্ম ভাই, ব্রাহ্মিকা ভগিনি, আজ খুব ভাল ক'রে ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আজ প্রাণ ভ'রে বলি, "মাকে খুব ভাল বাস্‌বই, মার কথা খুব ভাল ক'রে শুনবই! মার চরণে প্রাণটা লুটিয়ে দেবই! আজ বিশেষ ব্যাকুলতায় প্রাণকে কাঁপিয়ে কাঁদিয়ে তুলবই!"

মা, আজ বিশেষ ভাবে দয়া কর। তোমার দয়ার অনুভূতিতে এবং তোমার চরণে আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতায় আজ আমাদের হৃদয়গুলি পূর্ণ ক'রে দাও। তোমার আরাধনার পূর্ব্বে কাতর প্রাণে আশাপূর্ণ হৃদয়ে তোমার দয়া ভিক্ষা করি।

"প্রভাতে বিমল আনন্দে, বিকশিত কুসুম-গন্ধে" ইত্যাদি দ্বিতীয় সঙ্গীতের পর আরাধনা ও মিলিত প্রার্থনা হয়। তাহার পরে, জগতের কল্যাণের জন্য, পৃথিবীতে সকল নরনারীর মধ্যে ভ্রাতৃভাবের উদয়ের জন্য, ভারতকে দুর্নীতি কুসংস্কার ও ধর্ম্মহীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য, এবং দেশের সেবাতে যাঁহারা দুঃখ ও কারাবাস বরণ করিয়াছেন তাঁহাদের অন্তরে বিশ্বাস-বল সঞ্চার করিবার জন্য সংক্ষেপে প্রার্থনা করা হয়। অনন্তর "মোরে ডাকি ল'য়ে যাও মুক্ত দ্বারে" ইত্যাদি তৃতীয় সঙ্গীতের পর তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন:—

ব্রহ্মকৃপা ও ব্রহ্ম-অগ্নি।

সমস্ত তাজা ক'রে লওয়া।

উৎসব কি? উৎসব এক দিকে দয়ালের দয়া ভাল ক'রে দেখা, তাঁর দয়ার অনুভবে কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হওয়া; অপর

দিকে নূতন ক'রে তাঁর হাতে আত্মসমর্পণ। এই দয়ার অনুভবে অবগাহন, আর তাঁর হাতে আত্মসমর্পণ, আমরা একা একা নয়, কিন্তু সকলে মিলে করব। উৎসব সেই সময়ের নাম, যখন ব্রাহ্মসমাজের সব ভাই বোন্ একত্র মিলে, এক-হৃদয় হ'য়ে, দয়ালের দয়াতে অবগাহন করেন, ও নূতন ক'রে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করেন।

১১ই মাঘের দিনটি আর কিছুরই জন্য নয়। বৎসরের আর সব দিন ধর্মজগতের কত পবিত্র ও গম্ভীর সত্যসকল আস্বাদন ক'রে মন তৃপ্ত হয়। ধর্মরাজ্যের কত মধুময় ভাব ও রস, কত উদ্দীপনা ও অনুপ্রাণন অন্য দিন মন চায়। সে সকল তো সেই এক পরমেশ্বরেরই ভাণ্ডারের ধন। কিন্তু ১১ই মাঘের দিনটি এমন যে, এ দিনে সেই হৃদয়েশ্বরের দিকে সোজাসুজি চোখ তুলে তাকাতেই মন চায়। যিনি জীবনের স্বামী, যাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক থাকাই ধর্মজীবন, যাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ মিষ্টি থাকা তাজা থাকাই সরস ধর্মজীবন, এই দিনে তাঁর সঙ্গে সেই সম্বন্ধটাকে নূতন ক'রে নেবার জন্য, তাজা ক'রে নেবার জন্যই মন ব্যাকুল হয়।

দুই বন্ধুর সম্বন্ধের কথা, পতি-পত্নীর সম্বন্ধের কথা, গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধের কথা, পিতা-মাতা ও পুত্র-কন্যার সম্বন্ধের কথা একবার মনে মনে ভেবে দেখি। কত সময়ে এমন হয় যে, দুজনে একত্রে কাজ চল্‌চে, পরামর্শ চল্‌চে, বেড়ানো বা আমোদ করা চল্‌চে, কিন্তু তবু যেন হৃদয়ের সম্বন্ধটা তাজা হ'য়ে চল্‌চে না; পরস্পরের মধ্যে যেন সহজ ও আনন্দময় আনুগত্য নাই; পরস্পরের ভালবাসার অনুভূতিটা যেন শুষ্ক হ'য়ে গিয়েছে। তখন ঐ চলাফেরার মধ্যে ভিতরে-ভিতরে মনে একটি নিগূঢ় ক্রন্দন জাগ্‌তে থাকে। মন বল্‌তে থাকে, "এ সব তো হ'ল, কিন্তু আসল ব্যাপারের কি হ'চ্চে? দু'জনের মধ্যে মনের মিল ফিরে পাবার, ভালবাসার টানটি ফিরে আস্‌বার কি হ'চ্চে?" এই অবস্থার ভিতরে যদি কোনো উৎসবের দিন এসে পড়ে, সে দিন মনের এই ব্যাকুলতা যেন আর বাধা মান্‌তে চায় না। মনে হয়, আজ ভাল ক'রে মন মিলিয়ে নিতেই হবে। তার পর, শুভ মুহূর্ত্তে আপনাকে ভেঙ্গে চুরে প্রিয়জনের কাছে আত্মসমর্পণ করি। মনকে নত ক'রে, কাতর ক'রে, প্রেমে ও আনুগত্যে পূর্ণ ক'রে, প্রিয়জনের কাছে সঁপে ধরি। তখন আবার নূতন জীবন আরম্ভ হয়। তখন আবার তাজা প্রেমের অনুভূতি উদ্বেলিত হ'য়ে মনকে পূর্ণ করে। আবার মন বলে, "আমি যে তোমার, এতে আমি কত সুখী, কত সুখী!" ১১ই মাঘ ব্রাহ্মের পক্ষে সেই দিন। সেই জীবনস্বামীর সঙ্গে মনের মিলটি তাজা ক'রে নেবার দিন।

সারা বছর তাঁর রচিত সংসার-ক্ষেত্রে, তাঁরই হাতের দেওয়া সুখ ও দুঃখ অনেক পেলাম। তাঁর সংসারক্ষেত্রে ও তাঁর ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যক্ষেত্রে অনেক খাটলাম। কখনও বা আর্ত্ত হ'য়ে, কখনও বা কৃতজ্ঞ হ'য়ে তাঁকে অনেক ডাক্‌লাম। তাঁর প্রসঙ্গ, তাঁর নাম, তাঁর উপাসনা-অর্চনাও অনেক কর্‌লাম। কিন্তু এ দিনে আরো কিছু মন চায়। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধটাকে খুব সরস ও সতেজ ক'রে নিতে মন চায়। মন উদ্বেলিত হ'য়ে অনুভব কর্‌তে চায়, আমি তোমার হ'য়ে, তোমার ঘরে থাক্‌তে পেয়ে কত সুখী! আর মন জিজ্ঞাসা করে, "আমি কি সব বিষয়ে তোমার মনের মত হ'তে পেরেছি, প্রভু?" মন ব্যাকুল হ'য়ে ব'লে ওঠে, "যে-যে বিষয়ে আমার অন্তরের গোপনে, আমার প্রকৃতিতে, রুচিতে, ইচ্ছায়, জীবনযাত্রায়, তোমার সঙ্গে এখনও অমিল র'য়েছে, তা কি-ক'রে দূর করি, প্রভু?"

এই ব্যাকুলতা আজ এমন ক'রে আমাদের মনকে গ্রাস করুক যে, যেন আর কোনো দিকেই আমাদের দৃষ্টি না যায়। গত দেড় বৎসর ধ'রে শতাব্দী-উৎসবে আমরা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের অনেক আলোচনা ক'রেছি। দেশের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজের যে-সকল স্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত হ'য়ে গিয়েছে, তার জন্য কত গৌরব অনুভব ক'রেছি। আজ যেন তাও আর ভাল লাগ্‌চে না। অতীত-গৌরবস্মৃতি খুব ভাল বস্তু বটে, কিন্তু আজ তারও দিন নয়। যে দিন বহুদিন পরে যার সঙ্গে, ভাই-বোনের সঙ্গে, স্বামীর সঙ্গে, মনের মিল নূতন ক'রে নেবার জন্য প্রাণ কেঁদে উঠেছে, সে দিন যদি বাড়ীর লোকদের মধ্যে কেউ বলে, "আহা, একবার দেখ তো আমাদের এ বাড়ীখানি কেমন জম্‌কালো," অথবা "আমাদের নামে সংবাদ-পত্রে খুব প্রশংসার কথা লেখা হ'য়েছে," তা হ'লে মন ব'লে ওঠে, "ছি ছি! কি তুচ্ছ কথা! এমন দিনের মর্য্যাদা বুঝ্‌তে পার্‌লে না; এমন দিনে বল্‌বার আর কোনো কথা পেলে না?" ব্রাহ্মের জন্য তেমনি ১১ই মাঘে ঈশ্বরকে বল্‌বার, ও পূজ্যদের বল্‌বার বিশেষ একটু কথা আছে। অতীতের কত ১১ই মাঘে আমাদের প্রাণ তাই বলেছে। আজ এই শততম ১১ই মাঘের দিনে, অতীতের সেই সব ১১ই মাঘের ভাবধারা এসে যেন আমাদের মনকে আকুল কর্‌চে, বিহ্বল ক'রে ফেল্‌চে। যেন আজ আমাদের সমগ্র হৃদয় প্রাণ মন কাঁদিয়ে তুলে, পরমজননীকে এই কথা বল্‌বার জন্য ত্বরা দিচ্চে, "মাগো, তোমার সন্তান হ'য়ে আমি কত সুখী! আর, তোমার কাছে আমি যে কত অপরাধী, আজ তা ভেবে আমার বুক ফেটে যাচ্চে!" যেন সমগ্র হৃদয় প্রাণ মন কাঁদিয়ে তুলে পূজ্যদের চরণে এই কথা নিবেদন কর্‌বার জন্য ত্বরা দিচ্চে, "ও রামমোহন, ও দেবেন্দ্রনাথ, ও কেশবচন্দ্র, ও শিবনাথ! আমি ধন্য যে এত অপদার্থ হ'য়েও তোমাদের ঘরের মানুষ হ'বার অধিকার পেয়েছি। আর, আমার মনস্তাপের সীমা নাই যে আমার চরিত্র তোমাদের কাছে দাঁড়াবার কত অযোগ্য!"—ভাই বোন্, আজ যেন আমরা অন্য কোন কথা দিয়ে, প্রাণের এই আসল বল্‌বার কথাটিকে চাপা দিয়ে না ফেলি!

ব্রাহ্ম ভাই, ব্রাহ্মিকা ভগিনি, তোমরা কি এই উৎসবে ঐ দুটি সরল কথা দিয়ে মনকে পূর্ণ ক'রেছ? যদি না ক'রে থাক, এখনই তা কর। দয়ালের দয়া, ব্রাহ্মসমাজ-গৃহখানির মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ হয়েছে, তার অনুভূতিতে আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় প্রাণ পূর্ণ কর। আর সেই পরমপ্রভুর সঙ্গে জীবনে যেখানে যেখানে বিচ্ছেদ র'য়েছে, তার জন্য প্রাণ ঢেলে দিয়ে, প্রাণ মুচ্‌ড়ে দিয়ে অনুতপ্ত হও।

দয়ালের দয়া,—চরিত্রজ্যোতিতে।

মায়ের দয়া এই ব্রাহ্মসমাজগৃহে সব চেয়ে বেশী কিসে প্রকাশিত হয়েছে? চরিত্র-জ্যোতিতে। আমাদের মায়ের এই ঘরখানি চরিত্র-জ্যোতিতে কেমন উজ্জ্বল! রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, আমাদের শিবনাথ, নবদ্বীপচন্দ্র, প্রভৃতি কত মানুষের চরিত্র-জ্যোতিতে এই ঘরখানি উজ্জ্বল। তাঁদের এই চরিত্র-জ্যোতির সামনে আজ আর অন্য কোন জিনিসকে মনে আন্‌তে ইচ্ছাই হয় না। জগতে আর যত রকম শক্তির খেলা দেখা যায়, ভারতক্ষেত্রে আর যত রকমের প্রভাব প্রতিপত্তি কীর্ত্তি সফলতা দেখা যায়,—তা ব্রাহ্মসমাজেরই হউক, কি অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানেরই হউক,—এই চরিত্র-জ্যোতির তুলনায় সকলের দিক থেকে আমার চক্ষু ফিরে আসে। হে ব্রাহ্ম, তুমি কি ব্রহ্মার্পিত জীবনের চেয়ে বড় কোন শক্তি পৃথিবীতে আছে ব'লে দেখ? হে ব্রাহ্ম, তুমি কি কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করাকে, দেশ তোলপাড় করাকে, একটি মানুষের চরিত্র-গঠন করার চেয়ে বড় কাজ ব'লে দেখ? তা হ'লে আজ দৃষ্টিকে সংশোধন কর। তা না হ'লে তুমি আজ ১১ই মাঘে, কি দেখে, কি স্মরণ ক'রে, তোমার মনকে তৃপ্ত কর্‌বে? কিসে মনকে আনন্দে উৎসাহে পূর্ণ কর্‌বে? আজ চক্ষু পেয়ে দেখ, মায়ের এই ঘরেই দেশ তোলপাড় কর্‌বার আয়োজন সৃষ্টি হয়; কিন্তু এখানে **আগে** জীবন তৈয়ারী হয়, চরিত্র তৈয়ারী হয়, **পরে** তা দিয়ে জগৎজয় হয়। যে অল্প কয়েকজনের নাম আজ এখানে আমি উচ্চারণ কর্‌লাম, কেবল তাঁদের নয়; কিন্তু যিনি যাঁর মধ্যে ব্রহ্মগত জীবন দেখ্‌তে পেয়েছেন, তিনি তাঁদের সকলকে আজ স্মরণ করুন। আজ সকল হৃদয় হ'তে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হ'য়ে যাক্। আজ সকলের চোখগুলি একত্র হ'য়ে ব্রাহ্মসমাজ-গগনের এই চরিত্র-জ্যোতি দেখুক।

দয়ালের দয়া,—জীবনের আনন্দে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে আমাদের জীবন যে কত আনন্দে পূর্ণ হ'য়েছে, আজ মায়ের দয়া আমাদের সেই আনন্দময় জীবনে দেখি। তাঁর মুখ-আলোকে আকাশ পৃথিবী আমাদের বন্ধু; রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ আমাদের বন্ধু; সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সাধুসাধ্বীগণ আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনী; সকল দেশের সকল কালের যত ধর্ম্মামৃত, আমরা সেই সকলের উত্তরাধিকারী। আমাদের জন্য গৃহপরিবার পবিত্র, আমাদের জন্য এ সংসার প্রভুর আদেশ পালনের ক্ষেত্র। আমাদের জন্য মানবসমাজ, আমাদের অন্তরের সুকোমল সুপবিত্র ফুলগুলি ফুটিয়ে তোল্‌বার স্থান। আমাদের জন্য মানবজীবনের দুঃখ সংগ্রাম, রোগ-শোক বিপদ-মরণ, জীবনের মহত্ত্বকে জাগরিত কর্‌বার জন্য মায়ের দেওয়া অবসর। আমাদের জন্য পরলোক, মায়ের মুখ-আলোকে উদ্ভাসিত, আমাদের কত গুরুজনে কত প্রিয়জনে পরিপূর্ণ, আর একখানি বাড়ী। সেই উপনিষদ্-বেদ্য আনন্দময় ব্রহ্ম, এ যুগে তাঁর এই ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের পুত্রকন্যাগণের চক্ষে কি নব অঞ্জন দিয়ে দিয়েছেন! জগতে ও মানবজীবনে কি নব আনন্দ মাখিয়ে দিয়েছেন!

দয়ালের দয়া,—জীবন-সংশোধনে।

মায়ের সেই দয়া অনুভব কর্‌বার আরও একটি ক্ষেত্র আছে। সে ক্ষেত্রে তাঁর দয়া শুষ্ক চক্ষে দেখ্‌তে পারি না; সেই দিকে তাকালে মন আকুল হ'য়ে উঠে, চোখ জলে ভেসে যায়। তা হ'ল আমাদের জীবনসংশোধনে। একবার মনে কর তো, ভাই বোন, মা আমাদের আত্মার কত পাপ, কত গ্লানি, কত গভীর স্থানে নিহিত কত রোগ, কত যত্ন ক'রে সারিয়ে তুলেছেন! আমরা কি সহজে তাঁকে আমাদের জীবনে হাত দিতে দিয়েছি? আত্মার গোপন ক্ষত নিয়ে প'চে মর্‌বার মতন অবস্থা যখন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তখনও কি সহজে তাঁর হাতে আত্মসমর্পণ ক'রেছি? মা কত যত্ন ক'রে আত্মার এক একটি রোগকে সারিয়েছেন, একবার নিজ নিজ অতীতের দিকে তাকিয়ে আজ তা স্মরণ কর, ভাই বোন্! পৃথিবীর মার কাছে ব'সে যখন নিজের ছোটবেলার কঠিন কঠিন রোগের গল্প শুনি, ছোট বেলার ঘা-ফোড়ার গল্প শুনি, মা বলেন,—"আহা, বাছা, তুই যে তখন কত কষ্ট পেয়েছিস্, আর তোকে নিয়ে আমিও যে কত কষ্ট পেয়েছি। তখন তোর যে কি-দিন গিয়েছে, আমারও যে কি-দিন গিয়েছে!" সেই অসুখ-সারানোর মধ্য দিয়ে যেমন পৃথিবীর মার কাছে দেহ মন সব বাঁধা প'ড়ে যায়, মনে হয় যেন এক একটি অসুখের মধ্য দিয়ে এ জীবন মায়ের স্নেহের যত্নের কাছে একবারে বিকিয়ে গিয়েছে, তেমনি মনে হয়, অতীতের এক একটি সারানো পাপ-ক্ষতের দ্বারা, পাপ-রোগের দ্বারা, সেই পরম-জননীর কাছে জীবন বিক্রী হ'য়ে র'য়েছে। ভাই বোন্, আজ অনুভব কর কি, যে, এই ব্রাহ্মসমাজটা মায়ের সেই ঘর, যেখানে তিনি, তাঁর দুর্দ্দান্ত সন্তান যে আমরা, আমাদের কত পাপ-রোগ সারিয়ে সারিয়ে আমাদের জীবন কিনে রেখেছেন? চল, আজ ভাল ক'রে আবার সেই মায়ের হাতে আপনাদের সমর্পণ করি।

মনে পড়ে কি ভাই বোন্, অতীত কালের সেই সব মাঘোৎসব, যার এক একটির চাপে আমাদের জীবনে প্রভুর প্রতি বিদ্রোহের ভাব, আমাদের আত্মইচ্ছাপরায়ণতার ভাব বিধ্বস্ত হ'য়ে গিয়েছে? আমাদের উদ্ধত আত্মার অস্থি মাংস চূর্ণ হ'য়ে গিয়েছে? যে-সকল উৎসবে আমরা সারা বছরের পাপ কলুষের জন্য প্রাণ মুচ্‌ড়ে দিয়ে, ভেঙ্গে দিয়ে, ব্রহ্মচরণে ঢেলে দিয়ে, ১১ই মাঘে একত্রে ক্রন্দন করেছি? যাঁদের চরণতলে ব'সে সেই সকল মাঘোৎসব সম্ভোগ করেছি, তাঁদের বাণী আমাদের প্রাণ-মন্দিরে এখনও ধ্বনিত হ'চ্চে। যাঁদের সঙ্গে ব'সে সেই সব মাঘোৎসব সম্ভোগ ক'রেছি, তাঁদের কেহ কেহ আজও আমাদের সঙ্গে একত্রে হাস্‌বার, একত্রে কাঁদ্‌বার জন্য এই মন্দিরে উপস্থিত র'য়েছেন। সেই সকল মাঘোৎসবে আমরা দয়ালের চরণে কেমন লুটিয়ে পড়েছি, দয়াল আমাদের কেমন তুলে ধ'রেছেন! সেই সকল ব্যাপারের ভিতরে এই ব্রাহ্মসমাজে দয়ালের দয়া কেমন জল্‌জল্ কর্‌ছে—এস, ভাই বোন্, আজ তা একবার চোখভ'রে দেখি, প্রাণভ'রে অনুভব করি। আর, তেম্‌নি ক'রে আবার তাঁর হাতে আত্মসমর্পণ করি।

দয়ালের দয়া—একত্রে প্রসাদ-লাভে।

ব্রাহ্মসমাজ আরও একটি কারণে দয়ালের দয়া দেখ্‌বার স্থান হ'য়েছে। তা এই যে, এখানে আমরা পাশাপাশি ব'সে, একজনের দুঃখে সকলে কাঁদ্‌বার অধিকার পেয়েছি, একজনের সান্ত্বনায় সকলে সান্ত্বনা লাভ ক'রেছি। মা যখন উৎসব-মন্দিরে একটি অনুতপ্ত সন্তানের চোখের জল মুছিয়ে দেন, যখন তাঁর একটি ব্যথিত পুত্র বা কন্যাকে সান্ত্বনা দেন, সে দৃশ্য দেখে আর সব ক'টি সন্তানের মন উথ্‌লে ওঠে। সকলেরই চোখ মায়ের দয়ার অনুভবে জলে ভেসে যায়। আমরা সে দৃশ্য দেখি, আর আমাদের মনে হয়, যেন আমাদের জীবনেরও যত লুকানো শোক দুঃখ, সব শীতল হ'য়ে গেল, সব যেন নূতন পবিত্রতা লাভ কর্‌ল। আজ দুঃখিত শোকার্ত্ত ভাই বোন্! জেনে লও, তোমাদের ব্যথা আমাদেরও ব্যথা, তোমাদের সান্ত্বনা আমাদেরও সান্ত্বনা! এ ব্রাহ্মসমাজ কোন্ স্থান? যেখানে একজনের সান্ত্বনাতে সকলে সান্ত্বনা পাই, যেখানে একজনের অনুতাপে সকলে কেঁদে উঠি, যেখানে একজনের দীক্ষাতে সকলের প্রাণ প্রভুর চরণে আত্মদানের মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে ওঠে। আজ এস, ভাই বোন্, মায়ের সেই এক দয়া, এক স্নেহ, এক অনুপ্রাণন, প্রাণ ভ'রে অনুভব করি; আর, হৃদয়কে প্রসারিত ক'রে সকলকে আপনার ব'লে বুকে ধরি।

ব্রহ্ম-অগ্নি জলে কিসে?

আজ ১১ই মাঘের এক শতাব্দী পূর্ণ হ'ল। আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজ-বাড়ীখানির ভবিষ্যৎ কিসে ভাল হয়, সে চিন্তা আমাদের মনকে অধিকার ক'রে র'য়েছে। সকলেরই মন চিন্তাকুল। সকলেই বল্‌চেন, ব্রাহ্মসমাজের আগুনটা আবার ভাল ক'রে জলে ওঠা দরকার হ'য়েছে। আজ মনে এই কাতর প্রার্থনা নিয়ে ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্ম নরনারী উৎসবে মিলিত হচ্চেন। ব্রাহ্মসমাজের যত শাখা, আমাদের আশে-পাশে দণ্ডায়মান আমাদের যত ভাই বোন্, সকলেরই হৃদয় হ'তে এই ব্যাকুল প্রার্থনা উঠ্‌চে, ব্রাহ্মসমাজের আগুনটা আবার ভাল ক'রে জলুক।

আগুনের তুলনা দিয়ে যাঁরা ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎকে চিন্তা কর্‌চেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা কর্‌তে ইচ্ছা হয়, এই আগুনকে কি চক্ষে দেখ্‌চ, ভাই? তোমরা কি মনে কর, এক সময়ে কতকগুলি শক্তিশালী মানুষ মিলে এই আগুনটাকে জেলেছিলেন; এখন আর তেমন শক্তিশালী মানুষ নাই, তাই আগুনের তেজ নাই; এবং ক্রমে ক্রমে হয়তো এ আগুন নিভে যেতেও পারে। এ আগুনকে কি মানুষের সৃষ্ট, মানুষের দ্বারা পুষ্ট একটি আগুন ব'লে মনে ভাব? আমরা অপদার্থ হ'লেই যা নিভে যাবে, এমন একটি আগুন ব'লে একে দেখ?

আমি বলি, এ তুলনাকে মনে স্থান দিও না। ইহা অগ্নি বটে, কিন্তু ইহা অন্য শ্রেণীর অগ্নি। ইহা ব্রহ্মের প্রজ্বলিত প্রবল অগ্নি। এ অগ্নি কাতর হ'য়ে কেঁদে তোমায় বল্‌চে না, "আমায় বাঁচাও, বাঁচাও!" এ অগ্নি দাবীর সঙ্গে ডেকে তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌চে, "তুমি কি আপনাকে ইন্ধনরূপে আমাতে দান কর্‌বে?"

কোন প্রবল আগুন যখন জল্‌তে জল্‌তে একবার ক'মে গিয়ে আবার লাফিয়ে আকাশের দিকে ওঠে, সেই দৃশ্য ছোটবেলায় আমি মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌তে ভাল বাস্‌তাম। কোন পল্লীগ্রামে কিংবা বাজারে যখন আগুন লাগ্‌ত, দেখ্‌তাম, একখানা চালা শেষ ক'রে আগুনটা যেন ক্ষণকাল অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল। খানিক পরেই নূতন একখানা চালা ধরে ফেল্‌ল, আর শিখাটা আবার লাফ দিয়ে আকাশে উঠ্‌ল। দেখে মনে হ'ত, যেন সেই প্রবল অগ্নি, সেই লোলুপ অগ্নি, সেই উন্মত্ত অগ্নি, চারিদিকে ডাক দিয়ে বল্‌চে, "কই আমার জন্য আরও খাদ্য কই? আমার জন্য আরও ইন্ধন কই?" বড় বড় এঞ্জিনের জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে কয়লা দিবার জন্য যখন তার দরোজা এক একবার খোলা হ'ত, দৌড়ে গিয়ে আমি সেখানে দাঁড়াতাম। তার রক্তবর্ণ অগ্নিশিখাও যেন ঐ কথা বল্‌ত, "কই, আরও ইন্ধন কই?"

বাজারে যে আগুন লাগে, বড় বড় কলের অগ্নিকুণ্ডে যে আগুন জলে, তাকে আমরা প্রবল অগ্নি, লোলুপ অগ্নি, উন্মত্ত অগ্নি ব'লে অনুভব করি। সে আগুন যেন ডেকে বলে, "আমি আরও ইন্ধন পেয়ে, শিখার আকার ধ'রে, আকাশে উঠ্‌তে চাই; আমাকে আরও খোরাক দাও!" তেমনি, ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়ে বিধাতা ভারতের জন্য যে যুগধর্ম্মের আগুন জেলেছেন, তাও এক প্রবল আগুন, পাগল আগুন, সর্ব্বগ্রাসী আগুন। বিধাতা এ আগুনে সমগ্র ভারতকে প্রজ্বলিত না ক'রে, বিশুদ্ধ না ক'রে, বিগলিত না ক'রে, কখনও ছাড়্‌বেন না। ব্রাহ্মসমাজের কাছে এই প্রবল আগুনের এই ডাকটি আস্‌চে, "আমি ক্ষুধিত, তোমরা আমার খোরাক যোগাবে কি? আমার শিখা যাতে আবার লাফিয়ে আকাশে উঠ্‌তে পারে, তার জন্য তোমরা আমাতে কিছু ইন্ধন ঢাল্‌বে কি?"

হে ব্রাহ্ম, হে ব্রাহ্মিকা, বিশ্বাস কর, এ আগুন জল্‌বেই। এ আগুন বিধাতা প্রজ্বলিত ক'রেছেন, ইহা ক্রমশঃ ভারতকে গ্রাস কর্‌বেই। "এক ঈশ্বর, এক ধর্ম্ম, এক ধর্ম্মপরিবার," এ আদর্শ ভারতকে অধিকার কর্‌বেই। বিধাতার কাজ কেহ ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে না, ইহা নিশ্চিত। বিধাতার কাজ চল্‌বে কি না, তাঁর প্রজ্বলিত অগ্নি জল্‌তে থাক্‌বে কি না, ইহা তোমার ভাব্‌বার প্রশ্ন নয়। তোমার কাছে প্রশ্ন এই যে, তুমি কি এ আগুনে কিছু খোরাক যোগাবে? তুমি কি আগুনটাকে ভাল ক'রে জল্‌বার সাহায্য ক'রে নিজে ধন্য হবে?

আর একটি কথা মনে রাখ্‌বার আছে। যুগে যুগে মানুষ আগুন দিয়ে নিজের যুগোপযোগী নব নব কাজ কর্‌চে। এক যুগে মানুষ কাঠের আগুনের জাল দিত, এখন কয়লার আগুন হ'য়েছে। এক যুগের মানুষ ছোট ছোট উনুন গড়্‌ত, এখন কলের বৃহৎ চুল্লী হ'য়েছে, যাতে লক্ষ লক্ষ মণ লৌহ এক সঙ্গে গলানো সম্ভব হয়। কিন্তু এ পরিবর্ত্তনে আগুনের প্রকৃতি তো বদ্‌লায় নাই। আগুন পূর্ব্ব যুগে যে-বস্তু ছিল, এখনও সেই বস্তুই আছে।

ব্রাহ্মসমাজে বিগত যুগে ব্রহ্ম-অগ্নি যে প্রণালীতে যে কাজ-

গুলি ক'রেছে, এখন যদি সে-সব প্রণালী ও সে-সব কাজ অচল হ'য়ে গিয়েও থাকে, তবু বলি, আগুনের প্রকৃতিটি বদ্‌লায়নি। চিরদিন মানব-হৃদয়ে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্জলিত হ'য়েছে বিবেকানুগত জীবনের দ্বারা, শুদ্ধতার দ্বারা, আত্মোৎসর্গের দ্বারা, অনুতাপের দ্বারা। সে নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয়নি, সে নিয়ম কখনও পরিবর্ত্তিত হবে না।

ব্রহ্ম-অগ্নির আহ্বান,—নব আত্মোৎসর্গ ও পরিবর্ত্তিত জীবন।

প্রত্যেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার কাছে ব্রহ্ম-অগ্নির যে আহ্বান এসেছে, আজ তা শোন, ও তার উত্তর দাও। এ আগুন ব্রাহ্মদের কাছে কি-খোরাক চায়? পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যা চেয়েছে, তাই আবার নূতন ক'রে চায়। চায়, প্রত্যেক ব্রাহ্ম নূতন ক'রে ঈশ্বরের চরণ ছুঁয়ে দীক্ষিত হোক্। চায়, নূতন আবেগে পূর্ণ হ'য়ে তাঁর চরণে আত্মোৎসর্গ করুক। চায়, নূতন চরিত্র-তপস্যায়, নূতন প্রেমভক্তির সাধনায় নিযুক্ত হোক। চায়, প্রত্যেক ব্রাহ্ম, নিজ জীবন, নিজ দেহ মন, নিজ পরিবার, নিজ পুত্র কন্যা,—সবই ব্রহ্মের জন্য উৎসর্গ করুক। চায় নূতন ক'রে হৃদয়দান, হৃদয়পরিবর্ত্তন, আত্মসমর্পণ। চায় পরিবর্ত্তিত জীবন, converted lives। যে মানুষ আত্মমুখীন ছিল, নিজের ইচ্ছায় চল্‌ত, নিজের বাসনা কামনার পথেই চল্‌ত, সে আর নিজের থাকবে না; তার সব আপনত্ব লুপ্ত হবে; তার চিন্তা ব্রহ্মের, কামনা ব্রহ্মের, কল্পনা ব্রহ্মের, ইচ্ছা ব্রহ্মের হবে। ব্রহ্ম-অগ্নি যুগে যুগে এই দাবীই ক'রে এসেছে; আজও এই দাবীই কর্‌চে।

যে-ব্রাহ্মের জীবনে এই আত্মোৎসর্গের ভাব নাই, সে জল্‌তে পারে না, সে অগ্নি রক্ষা কর্‌তে পারে না, সে অগ্নির সাহায্য কর্‌তে পারে না। হে ব্রাহ্ম, তুমি কি মনে কর যে, তুমি পরিমিত দেবতার পূজা ছেড়ে অনন্তের পূজা কর্‌চ ব'লে, বহুর পূজা ছেড়ে একের পূজা কর্‌চ ব'লে, অথবা মার্জ্জিত সুসংস্কৃত এই সমাজে আছ ব'লে বা জন্মেছ ব'লেই তুমি ব্রহ্ম-অগ্নির অধিকারী হ'য়েছ? না, তা হও নাই। এ বিষয়ে ব্রাহ্মদের মনে যদি একটুও আত্মতৃপ্তির ভাব (self-complacency) এসে থাকে, তবে তা চূর্ণ হওয়া দরকার। যীশু আত্মতৃপ্ত ফরীসীদের কিরূপ ভর্ৎসনা কর্‌তেন তা একবার মনে ক'রে দেখ। ফরীসীদের মধ্যে নিকোডিমস্ নামক একজন তাঁর শিষ্য হ'য়েছিল। সে মনে ক'রে রেখেছিল যে, একে তো আমি শুদ্ধাচারী ফরীসী, তদুপরি আমি যীশুর অন্তরঙ্গদলের লোক; আমার পক্ষে তো স্বর্গরাজ্যের দ্বার খোলা। যীশু তার আত্মতৃপ্তিতে প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে বল্লেন, "তোমার নবজন্ম লাভ না হ'লে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই।" হে ব্রাহ্ম, তোমার মধ্যে যদি ঈশ্বরের হাতে আত্মসমর্পণের এই প্রবল অগ্নি জ'লে না থাকে, তাঁর কাছে আত্মোৎসর্গের দ্বারা তোমার জীবনে যদি নবজন্ম লাভ না হ'য়ে থাকে, তবে তুমি ব্রাহ্ম হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম্মরাজ্যে মৃত মৃৎপিণ্ড মাত্র। তোমার এই self-complacency চূর্ণ কর। ব্রাহ্ম হ'য়েও এখনও কিছুই হওয়া হয় নি, একথা বোঝ। তাঁর হাতে আত্মদানের প্রবল অগ্নি জীবনে কিসে জ'লে ওঠে, তার জন্য কাতর হও, কাঁদ, ছেলেমেয়েদের কাঁদাও। ঘোর কাতরতার অগ্নি চারদিকে জ্বলুক্। নবজীবন, নবজন্ম, হৃদয়পরিবর্ত্তন, conversion,—এ সব কথা কি তোমাদের কাছে নিস্তেজ হ'য়ে গিয়েছে? প্রাণহীন হ'য়ে গিয়েছে? এ সকল কথাই আবার জাগাও। এর একটা cry, একটা রব জাগিয়ে রাখ। যীশুর মণ্ডলীতে যেমন স্বর্গরাজ্য, পবিত্রাত্মা, নবজন্ম,—এই কথাগুলি অগ্নিময় ও অনুপ্রাণনময় বাক্য হ'য়ে উঠেছিল, তাঁদের আলাপে প্রসঙ্গে যেমন সর্ব্বদাই এই কথাগুলি এসে পড়্‌ত, ব্রাহ্মসমাজেও তাই হোক্। নিজে একা একা এসকল মন্ত্র জপ কর। পরিবারে এসকল মন্ত্র জপ কর। ছোট ছোট সাধকমণ্ডলীতে এসকল মন্ত্র জপ কর। সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে আবার এই ধ্বনি জেগে উঠুক।

ঈশ্বরের হাতে আপনার সমগ্র হৃদয়মন যে সমর্পণ করে, আত্মমুখীনতা হ'তে ব্রহ্মমুখীনতায় যে নব জন্ম-লাভ করে, তার জীবনেই ব্রহ্ম-অগ্নি প্রজ্জলিত হয়। অন্তরের বাসনা কামনা-কুলকে যে ব্রহ্ম-ইচ্ছার দ্বারা শাসিত করে, নিজ অভ্যাস রুচি আরামকে যে ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা শৃঙ্খলিত করে, মানুষের সঙ্গে সব ব্যবহারকে যে তাঁর প্রেমের নিয়মের অধীন করে, নিজ মান মর্য্যাদা, সম্ভ্রম, পদগৌরব, বিশেষতঃ কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব, যে তাঁর চরণে নিঃশেষে বিসর্জ্জন দেয়, আপনার সময় শক্তি অর্থ সবই যে ব্রহ্মচরণে উৎসর্গ করে, তার জীবনেই ব্রহ্ম-অগ্নি প্রজ্জলিত হয়। একদিন, ব্রাহ্মসমাজ যখন জনসংখ্যায় অল্প ছিল, তখন এই আদর্শটির জন্য অধিকাংশ ব্রাহ্মের মনে প্রবল ব্যাকুলতা জেগে থাকৃত। তখন সাধক ও সেবক, গৃহী ও সন্ন্যাসী, সব শ্রেণীর ব্রাহ্মই এই ব্রহ্মগত জীবনের আদর্শে জীবিত থাক্‌বার জন্য ব্যাকুল থাক্‌তেন। তখন নিরন্তর আত্মদৃষ্টি, আত্মপরীক্ষা, অনুতাপ, আত্মসংশোধন ও আত্মবিলোপের ব্যাপারসকলই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ব্যাপার ছিল। তাহার ফলে ব্রাহ্মজীবনে মহত্ত্বের আত্মোৎসর্গের ও প্রেমভক্তির জলন্ত দৃষ্টান্তসকল প্রকাশিত হ'ত; তাহার ফলে ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্ম-অগ্নি প্রজ্জলিত থাক্‌ত।

এই যে জীবনের conversion, আত্মমুখীনতা ত্যাগ ক'রে ব্রহ্মমুখীনতায় এই যে নবজন্মলাভ,—ধর্ম্মজগতে ইহার স্থান অন্য কোনও বস্তু দিয়ে, কোনও substitute দিয়ে, পূরণ করা সম্ভব নয়। যদি এটিকে অবহেলা ক'রে যাও, তবে জ্ঞানালোকের দ্বারা সমাজমধ্যে ব্রহ্ম-অগ্নিকে বাঁচাতে পার্‌বে না; ভাবোচ্ছ্বাসের দ্বারা ব্রহ্ম-অগ্নিকে বাঁচাতে পার্‌বে না; বহুল প্রচারের দ্বারা ব্রহ্ম-অগ্নিকে বাঁচাতে পার্‌বে না; হাজার হাজার সুপ্রতিষ্ঠিত কল্যাণকর্ম্মের দ্বারাও ব্রহ্ম-অগ্নিকে বাঁচাতে পার্‌বে না। কোনও ধর্ম্মসমাজে ব্রহ্ম-অগ্নি নিস্তেজ হয় কিসে? Holy Spirit ম্লান হয় কিসে? তাহার মানুষগুলির আত্মার মৃত্যু ঘটে কিসে? তারা কি কেবল দুর্নীতিতেই মরে? কেবল কি বিষয়াসক্তিতেই মরে? তা মনে ক'রোনা। যদি তারা ঐকান্তিক আত্ম-সমর্পণের সাধনে অমনোযোগী হয়, তবে ভাল ভাল কাজে

দিবানিশি মত্ত থাকলেও তারা মরে। ব্রাহ্মসমাজের কাজ করতে করতেও ব্রাহ্ম মরে, যদি তার আত্মাতে ঈশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণের ঐ ব্যাকুলতা অগ্নিসমান না জ্বলতে থাকে, কর্ম্মোৎসাহের আবেগে যদি সে ঐ ব্যাকুলতাকে পশ্চাতে রেখে কেবল কর্ম্মকেই সম্মুখে রাখে।

আজ এই নবজীবনের আলোক চক্ষে লাগিয়ে ব্রাহ্মসমাজের দিকে তাকাই। ব্রাহ্মসমাজের এখন সব-চেয়ে বেশী কি চাই, এই প্রশ্ন ভাবতে গিয়ে আমাদের চিন্তা আমাদের দৃষ্টি কোন্ দিকে ছুটে যায়? "নবজীবন" যে চিনেছে, যে বুঝেছে, তার দৃষ্টি দিয়ে কি আমরা ব্রাহ্মসমাজের অতীত ইতিহাস পড়ি এবং ভবিষ্যৎ কল্পনা করি? আমাদের চক্ষু কি বিশ্বাসীর চক্ষু? আমাদের আশা কি বিশ্বাসীর মতন আশা? আমাদের হাসি-কান্না কি বিশ্বাসীর মতন হাসি-কান্না? আজ একবার আত্ম-পরীক্ষা ক'রে দেখি।

নবজীবন ও অমর আশা।

যে নবজীবনের ও হৃদয়পরিবর্ত্তনের কথা আমি এতক্ষণ বলচি, তার এক পিঠ হ'ল আত্মোৎসর্গ, আর-এক পিঠ হ'ল আশা। আত্মোৎসর্গ ও আশাপ্রবণতা, আত্মদান ও চির-উৎসাহ, যেন একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ। যে মানুষ ঈশ্বরের হাতে আত্মসমর্পণ করে, ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ তাকে অজেয় বিশ্বাসবল ও অমর আশা দিয়ে সজ্জিত করেন। অমর আশা বিনা কোনো ধর্ম্মমণ্ডলীতে অগ্নি জ্বলে না। সে অমর আশাশীলতা কি-হ'তে আসে? তাহা কেবল আত্মোৎসর্গ হ'তেই আসে। সে অমর আশা ইতিহাস প'ড়ে আসে না। কালের ইঙ্গিতে শুভযুগের সূচনা দেখে আসে না। ইতিহাস প'ড়ে, ও বাহিরের ঘটনাধারার আলোচনা ক'রে মানুষের মনে যে আশা জাগে, তা কখনও খুব জ্ব'লে উঠে, কখনও বা নিভে যায়। অমর আশার উৎস তাহা নয়। অমর আশার উৎস,—আত্মোৎসর্গ ও নবজীবন।

সাধারণ মানুষের ও আত্মোৎসর্গশীল বিশ্বাসী মানুষের আশার ভিত্তি দুই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। সাধারণ মানুষ আশার হেতু অন্বেষণ করে চারিদিকে তাকিয়ে ও অপরের দিকে তাকিয়ে। বিশ্বাসী মানুষ আশা করেন ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে ও নিজের দিকে তাকিয়ে। সাধারণ মানুষ বলে, "হাঁ, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হবে বই কি? ঐ তো এত লোক ক্রমশঃ এর মত ও আদর্শসকল গ্রহণ করচে।" কিন্তু আবার যখন চারিদিকে তাকিয়ে সে এরূপ কোন চিহ্ন কোন প্রমাণ দেখতে পায় না, তখন সে হতাশ হ'য়ে পড়ে। তখন সে বলে, "তাইতো! এতো ভাল লক্ষণ দেখচি না! তবে কি ব্রাহ্মসমাজের কাজ ফুরিয়ে এসেছে?" ব্রাহ্ম-সমাজে এই রকম বাহিরে-তাকানো মানুষ হাজারে হাজারে লাখে লাখে এসে জুটলেও তাদের দ্বারা এর আশার আগুন একটুও বাড়বে না, একটুও জ্বলবে না। কিন্তু একজন আত্মোৎ-সর্গশীল বিশ্বাসীর বিশ্বাসে সে আগুন দশ হাত লাফিয়ে উঠবে। বিশ্বাসী বলেন, "ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় দেখতে চাও? তবে আমাতে তা দেখ! আমাকে যে-শক্তি জয় ক'রেছে, সে কি অন্যকে জয় ক'রবে না? আমার দেহ মন আত্মা সব যে-শক্তি গ্রাস ক'রতে পেরেছে, সে কি অন্যকে গ্রাস ক'রবে না? আমার সব বিদ্রোহ, সব দর্প, সব আমিত্ব যে-শক্তি চূর্ণ ক'রতে পেরেছে, সে কি অন্যকে চূর্ণ ক'রবে না?"

যদি বল, "চারিদিকে তাকিয়ে আর কি হবে? ব্রাহ্মসমাজেই তো ঘোর ধর্ম্মহীনতা, ধর্ম্মে শিথিলতা, ধর্ম্মে অবজ্ঞা রয়েছে। ব্রাহ্মসমাজেই তো সাংসারিকতা সকলকে গ্রাস ক'রে রেখেছে। ব্রাহ্মদের ছেলেমেয়েরাই তো বলতে আরম্ভ করেছে, ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে, ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মসমাজ ক'রে এত বেশী ভেবে কি হবে?" আমি বলি, আত্মোৎসর্গশীল বিশ্বাসী তাতেও নিরাশ হন না। তিনি বলেন, "পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মধ্য হ'তে, হিন্দু-সমাজের লাখ লাখ মানুষের মধ্য হ'তে, যে-ঈশ্বর একদিন আপনার অগ্নিময় বাণী পাঠিয়ে দিয়ে আপনার সাক্ষী আপনার সেবক চিনে-চিনে বেছে-বেছে টেনে-টেনে বাহির ক'রে আনতে পেরেছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের কয়েক হাজার মানুষ সবাই যদি বিষয়াসক্তিতে আরামপ্রিয়তায় ও ধর্ম্মহীনতায় নিঃশেষে নিমগ্ন হ'য়েও যায়, তথাপি তাদের দ্বারা সে-ঈশ্বর নিশ্চয়ই পরাজিত হবেন না। ব্রাহ্মসমাজের ঘরে ঘরে এখন আরামপ্রিয়তার রাজত্ব। কিন্তু কত কাল তিনি এদের আরামে থাকতে দিবেন? He may bide his time, but He is a living God, তিনি তাঁহার সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু তিনি জীবন্ত ঈশ্বর। তিনি এমন আরামপ্রিয় ও সুসভ্য মানুষদের সমাজেও আগুন লাগাতে জানেন।"

আগুনে দাহিকাশক্তি আছে কি নাই, তা বোঝবার অধিকারী কে? বলবার অধিকারী কে? যে কাঠখানা জ্বলচে, সে বলবে? না, চারিদিকে যে হাজার হাজার কাঁচা গাছ দাঁড়িয়ে আছে, তারা বলবে? বিশ্বাসী বলেন, "আমি একা আমার জীবনের প্রত্যক্ষ প্রমাণেই বলব, আমার ধর্ম্মে প্রবল দাহিকাশক্তি আছে। আমি চারিদিকে তাকাব না। আমার চিহ্ন খোঁজবার, বাহিরের প্রমাণ খোঁজবার কোন দরকার নাই। আমি যে জ্বলেছি, এতেই তো ব্রহ্মের জয় আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে। আমার জীবনে সে-জয় তো প্রত্যক্ষ করেছি!" ব্রহ্মচরণে আত্মোৎসর্গের এমনি গুণ, নবজীবনের এমনি গুণ, Holy Spiritএর দ্বারা ধৃত হওয়ার এমনি গুণ, যে, মানুষকে তা সব অবস্থায় আশায় উদ্দীপ্ত ক'রে রাখে। এমন মানুষের আশাশীলতা অজেয়। বুদ্ধিজীবী হিসাবী বন্ধুরা অনেক সময়ে আত্মোৎসর্গশীল বিশ্বাসী ব্রাহ্মের মনকে টেনে নিয়ে চারিদিককার ঘন অন্ধকার দেখতে বাধ্য করে। বিশ্বাসী তাদের বলেন, "ভাই, তোমরা যা যা বলচ, সব আমি জানি। তোমরা যা যা দেখাচ্ছ, সব আমি দেখেছি। তবু আমি নিরাশ নই। আমার মুখ দিয়ে অন্য বুলি বাহির হবে না। ব্রহ্মশক্তিতে কিছু হয় না, ব্রহ্ম-অগ্নিতে কিছু জ্বলে না, এ কথা আমি কখনও বলব না।"

তাই বলি, মানুষের আশাশীলতা কোন বিচার-আলোচনার ফল নয়; ইহা একপ্রকার স্বভাব। এই স্বভাব কে পায়? আত্মোৎসর্গপরায়ণ বিশ্বাসীরাই পায়। পরীক্ষা করলে দেখতে

পাবে, পৃথিবীর যত নিরাশাপ্রবণ মানুষ, সকলেই ভিতরে ভিতরে আত্মদান-ভীরু। ব্রাহ্মসমাজে যদি হাজারে একজন মাত্র আশাশীল আত্মোৎসর্গপরায়ণ বিশ্বাসী থাকেন, আর যদি ৯৯৯ জন নিরাশাবাদী হয়, তবে আমি বলি, হে একজন বিশ্বাসী, তুমিই জাগরিত হও; সাহসের বাণী বল; নব শতাব্দীতে ভীরুদের, নিরাশাবাদীদের, false prophetদের সব বাক্য স্তব্ধ ক'রে দাও। পরের-দিকে-তাকানো মানুষ দিয়ে পঞ্চাশ বছরেও ব্রাহ্মসমাজের আশার আগুন জ্ব'লে উঠ্‌বে না। সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে যদি আজ তিনজনও খাঁটি বিশ্বাসী থাক, তবে এস, একবার ভাল ক'রে আগুন জালাও, ধ্বনি জাগাও;—বল', বিশ্বাসের জয়, আত্মোৎসর্গের জয়, ব্রহ্মশক্তির জয়, ব্রহ্ম-অগ্নির জয়!

ব্রাহ্মসমাজে আজ সব-চেয়ে বেশী কি চাই? চাই আত্মোৎসর্গ ও তৎপ্রসূত আশাশীলতা। চাই, "আপনাকে দাও, আর জয় গাও!" ভবিষ্যৎ ঈশ্বরের হাতে ফেলে রেখে দাও। তোমার চিহ্ন-খোঁজা ভীরু দৃষ্টি দিয়ে ভগবান্ ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ দেখ্‌চেন না। হে ব্রাহ্ম, তুমি কি ভবিষ্যতের চিহ্ন খোঁজ? তবে আপনার অন্তরে তাহা খোঁজ। তোমার অন্তরে যদি সেই আত্মসমর্পণ জেগে থাকে, তবে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ তুমি উজ্জ্বল দেখবে; কারণ, তুমিই সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একজন স্রষ্টা।

নবজীবন ও হাসি-কান্না।

সংসারের বিশাল ক্ষেত্রে হার জিৎ, ওঠা পড়া, কখনও ভিড়ের আগে আগে চলা, কখনও ভিড়ের পাছে পাছে চলা,—মানবের ভাগ্যে বিধাতা এই দুইই রেখেছেন। সেই দয়াল বিধাতা, ঊর্দ্ধ হ'তে তাঁর প্রত্যেকটি মানব-সন্তানের, এবং তাঁহার এই ব্রাহ্মসমাজের পার্থিব লীলাক্ষেত্রের সব হার জিৎ, সব ওঠা পড়া, নিরন্তর দেখ্‌চেন। আজ একবার নবজীবনের দৃষ্টি স্বর্গপানে উত্তোলন কর। সেই চক্ষে আজ একবার চেয়ে দেখ তো, ব্রাহ্ম! স্বর্গলোকে বিধাতার দৃষ্টি, দেবগণের দৃষ্টি, ঋষিগণের দৃষ্টি, ভক্তগণের দৃষ্টি, আমাদের অগ্রগণিগণের দৃষ্টি, আমাদের জীবনের কোন্ বস্তুর প্রতি র'য়েছে? দেখ্‌তে পাবে, তাঁদের দৃষ্টি আমাদের কীর্ত্তির প্রতি বা কীর্ত্তির অভাবের প্রতি নয়। কিন্তু তাঁরা ব্যাকুল হ'য়ে লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌চেন, আমাদের জীবন ব্রহ্মে সমর্পিত কি না, আমাদের বিশ্বাস-বল কেমন, আমাদের নির্ভর কিসের উপর, আমরা এখানে কিসে হাসি কিসে কাঁদি।

আজ ১১ই মাঘে আমরা হাস্‌ব কি নিয়ে? আমরা নবজীবনের হাসি হাস্‌ব। অনেক ব্রাহ্ম যে ধনবান্ ও প্রতিপত্তিশালী, অনেক ব্রাহ্মের খ্যাতি যে জগদ্ব্যাপী, অনেক ব্রাহ্ম যে রাজসম্মান লাভ ক'রেছেন, দেশ যে স্বীকার ক'রেছে এবং রাজপুরুষেরাও যে স্বীকার ক'রেছেন ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব তার জনসংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক,—ব্রাহ্মসমাজ এখন যে অনেকগুলি কল্যাণকর্ম্মের পরিচালক,—এ সকলের জন্য কি আমরা হাস্‌ব? আমি বলি, তার চেয়েও হাজার গুণ বেশী হাস্‌ব, ব্রহ্মভক্তদের জীবনের প্রভাব ও সৌন্দর্য্যের জন্য; শত শত জীবন হ'তে প্রতিফলিত আত্মোৎসর্গের জ্যোতির জন্য; নিজ জীবনে, নিজ চরিত্রে যেটুকু ব্রহ্মানুগত হ'তে সমর্থ হ'য়েছি তার জন্য; যতগুলি পাপ চূর্ণ হ'য়েছে, তার জন্য; যতখানি জীবন ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হ'য়েছে, তার জন্য। হাস্‌ব,—স্বর্গের ঘরের ভাই বোনদের মুখ দেখে। হাস্‌ব,—এই মন্দিরে আমাদের উত্তোলিত মুখগুলির উপরে মায়ের হাসির ঝলক দেখে। আজ এই হাসিই সকলের প্রাণে ফুটে উঠুক।

তেমনি আজ আমরা কাঁদ্‌ব বই কি? জগতে কার জন্য কান্না নাই? ব্রাহ্মসমাজের জন্যও কান্না আছে। কিন্তু কোন্ কান্না কাঁদ্‌ব? নবজীবনের দৃষ্টি দিয়ে দেখি, বিধাতা আমাদের কোন্ কান্না কাঁদ্‌তে বল্‌চেন? লোকসংখ্যা তেমন বাড়্‌চে না ব'লে কাঁদ্‌ব? দেশের যতগুলি বর্ত্তমান আন্দোলন, তারা ব্রাহ্মসমাজকে তত আর গণনার মধ্যে আনে না, এজন্য কাঁদ্‌ব? খবরের কাগজে আমাদের নাম তত আর ওঠে না, লোকে আমাদের আর তেমন শক্তিশালী ব'লে মনে করে না, তার জন্য কাঁদ্‌ব?—ব্রাহ্মসমাজে এ রকম কান্নার রব যখনই ওঠে, মনে হয় যেন স্বর্গ হ'তে সাধুগণ ভক্তগণ ধিক্কার দিচ্চেন। আমি যেন তাঁদের ধিক্ ধিক্ ধ্বনি শুন্‌তে পাই। যেন দেখ্‌তে পাই, তাঁরা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্চেন। ছি ছি! পৃথিবীর দ্বারে মানভিখারীর এই কান্না,—এই কি ব্রাহ্মের যোগ্য কান্না? এই কি ব্রাহ্মসমাজের যোগ্য হাহাকার? হে ব্রাহ্ম, নবজীবনের কান্না কাঁদ'। পাপের জন্য কাঁদ'। পাপবোধকে এমন সূক্ষ্ম কর, যে, সামান্যতম স্বার্থপরতায়, সামান্যতম অপ্রেমে, সামান্যতম কর্কশ ব্যবহারে ও ঔদ্ধত্যে, ঈর্ষার মুহূর্ত্তের স্পর্শে, ইন্দ্রিয়াসক্তির লেশমাত্র উদয়ে, যেন মনে প্রবল কান্নার বেগ আসে। সেই কান্না কাঁদ'। এক একটি বাসনা কামনাকে চূর্ণ কর্‌বার জন্য আযৌবন আমরণ যে সংগ্রাম ও ক্রন্দন, সেই কান্না কাঁদ'। পূর্ণ ব্রহ্মার্পিত জীবন লাভের জন্য কাঁদ'। Holy Spiritএর জন্য কাঁদ'। মনকে শুদ্ধ ও আকাঙ্ক্ষাকে উন্নত কর্‌বার জন্য, হৃদয়কে ক্ষুদ্রতা ও নীচতার পাঁক থেকে তোল্‌বার জন্য, উদ্ধত মস্তক মাটিতে লোটাবার জন্য যে কান্না, সেই কান্না কাঁদ'। এই হ'ল নবজীবনের কান্না। এই কান্না, হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে একা একা কাঁদ'; পরিবারে পতি-পত্নী পুত্র-কন্যা মিলে কাঁদ'; আবার, আগের মতন সকলে এক কণ্ঠে উৎসব-মন্দির কাঁপিয়ে, একসঙ্গে হাহাকার ক'রে, সেই কান্না কাঁদ'! যে-কান্নায় দেবগণ মর্ত্ত্যে নেমে আসেন, যে-কান্না দেখে সাধু ভক্তেরা নেমে এসে আমাদের গলা ধ'রে কাঁদেন, সেই কান্না কাঁদ'। যে-কান্নায় মায়ের সিংহাসন টলে, যে কান্নায় মা ব্যাকুল হ'য়ে এসে সন্তানকে বুকে ধরেন, সেই কান্না কাঁদ'। একবার সেই কান্না জাগাও তো, ভাই বোন্! দেখি, ব্রাহ্মসমাজ আবার ওঠে কি না! দেখি, এর আগুনটা আবার জ্বলে কি না!

অনুতাপের কথা কেন?

আমার আজ বল্‌বার বিষয় ছিল, দয়ালের দয়ার কথা কৃতজ্ঞতার কথা, আনন্দের কথা, ঈশ্বরচরণে আপনাকে নূতন ক'রে সমর্পণ কর্‌বার কথা, আগুনটা ভাল ক'রে জ্বালাবার কথা। তবে এর মধ্যে এত অনুতাপের কথা কেন এল? এত কান্নার

কথা কেন এসে পড়ল? কি করব, ভাই বোন্! আপনারা আজ এমন লোককে এখানে বসিয়েছেন, যার জীবনে অনেক অনুতাপ; মাঘোৎসবের বার্ত্তা আসা-অবধি যার জীবন ক্রন্দনে পরিপূর্ণ হ'য়ে রয়েছে। আমি অনেক চেষ্টা ক'রেও এ কথা এড়াতে পারলাম না। কিন্তু ব'লে দিচ্ছি, ভাই বোন্, এ কান্না কখনও নিস্তেজ করে না, নিরাশ করে না। বরং ঠিক তার বিপরীত। সত্য পাপবোধ, পাপের সঙ্গে সত্য সংগ্রাম, অনুতাপের তীব্র ক্রন্দন,—এরাই মানবাত্মার তেজোবীর্য্য বৃদ্ধি করে, এরাই ধর্ম্মমণ্ডলীর তেজোবীর্য্য বৃদ্ধি করে। এই কাতর ক্রন্দনই নবজীবনের অগ্রদূত। ইহাই ব্রহ্ম-অগ্নির অগ্রে সঞ্চরণকারী উত্তাপ। ইহাই নবশক্তির প্রথম চিহ্ন।

হে ব্রাহ্মসমাজ, সেই আগুনটা আবার লাফিয়ে উঠে জ্বলুক, তাই চাও? তবে, অনুতাপ যার প্রথম চিহ্ন, নিরন্তর আত্মপরীক্ষা ও নিরন্তর ব্রহ্ম-ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ যার সাধন, চরিত্রে মনুষ্যত্ব লাভ, প্রকৃতিতে বিনয়-প্রেম-ভক্তি লাভ যার পরিণতি, সেই ব্রহ্মগত জীবনের জন্য আবার আপনার সকল শক্তিকে উৎসর্গ কর। জ্বলন্ত চরিত্র ও জ্বলন্ত ধর্ম্মজীবনের সাধনে আমরা আবার লাগি। যা কুড়ি বছরে হারিয়েছি, দয়ালের দয়াতে পাঁচ বছরেই আবার তা ফিরে পাব।

প্রতীক্ষার দিন।

আমি জানি, অনেক সময়ে মনের এমন অবস্থা হয়, যে, আর দেরী সহ্য হয় না। কতদিনে আবার সেই সুদিনের মুখ দেখব? কবে—কবে—কবে? এই ব'লে মন অস্থির হ'য়ে ওঠে। মনের এই অস্থিরতার মধ্যে আমি যেভাবে একটু সান্ত্বনা লাভ করি, তা আপনাদের কাছে নিবেদন করচি। আমার মনে হয়, পরম জননী যেন বলচেন, "ওরে, তোরা যত ব্যস্ত নবজীবন লাভ করতে, তার চেয়ে আমি বেশী ব্যস্ত তোদের নবজীবন দান করতে। তোরা ভাবচিস্ কেন? তোরা কেবল প্রাণ নিয়ে আয়। আর যা করবার আমি সব করব।" পরমজননী যেন বলচেন, "যতদিন দেরী হয়, তার মধ্যে তোরা প্রস্তুত হ'য়ে থাক্ না!" নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করতে হ'লে ইট পোড়াতে হয়, সুড়কি চূণ সিমেণ্ট সংগ্রহ করতে হয়; তাতে সময় লাগে। কোন পাকা কাজ তাড়াতাড়ি হয় না, হাতে-হাতে যে মসলা জোটে তা দিয়ে হয় না। অতি-বর্ত্তমান কালের প্রত্যেক নব নব আন্দোলনের সুযোগ টুকুর সদ্ব্যবহার ক'রে নেবার যে ক্ষিপ্রকারিতা, তাতে বণিকের ব্যবসায় গড়তে পারে, ধর্ম্মরাজ্যের কাজ তাতে গড়ে না। ব্রাহ্মসমাজের নবজাগরণের জন্যই বল', কিংবা ভারতের কল্যাণ-সৌধ নির্ম্মাণের জন্যই বল', কেবল মাত্র ব্যবস্থা (organisation) বিষয়ে তৎপরতা, চট্ পট্ দলগঠন, সুযোগের উদয়মাত্র তাকে গ্রাস করা,—এ সকল যথেষ্ট নয়। বিধাতা যেন ব্রাহ্মসমাজকে ভর্ৎসনা ক'রে বলচেন, "ওরে অল্পবিশ্বাসীরা, সকলের আগে যে চরিত্র চাই, সে কথা মানুষেরা ভুলে যায় ব'লে কি তোরা মনে করিস্ যে আমিও ভুলে গিয়েছি? আমি তো তোদের অপেক্ষা করাচ্ছি, তোরা চরিত্র গ'ড়ে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হবি ব'লে।" বিধাতা যেন বলেন, "ব্রাহ্মরা আমার ইচ্ছার চাপে নিজেদের জীবনকে ফেলে, আমার ইচ্ছার অনলে নিজেদের জীবনকে পুড়িয়ে, ব্রহ্মগত চরিত্রের শক্ত ইট তৈয়ারী করুক না? আমার তো ভারতের ভাবী কল্যাণ-সৌধের জন্য তাই দরকার। বর্ত্তমান বংশের লোকেরা যা করচে, করুক। আগামী যুগে আমার অধিক সারবান্ কাজ যখন হবে, তখন আমার হাতে শক্ত পোক্ত ইট হ'য়ে কে আস্বে? ব্রাহ্মরা তা হবে কি?" আমি যেন বিধাতার এই বাণী শুনতে পাই। তিনি যেন বলেন, এই অপেক্ষার কালটি ব্রাহ্মদের পক্ষে নব চরিত্র গঠনের অবসর।

অপেক্ষার কালের এই প্রকার সদ্ব্যবহার যদি করতে পারি, তবে পশ্চাতে থেকেও দুঃখ নাই; বাধাবিঘ্নে, এমন কি বাহ্য পরাজয়েও ক্ষতি নাই। বরং বলি, যেমন ভাল ইট গুঁড়ো করলে বাড়ী গাঁথবার ভাল মসলা হয়, তেমনি উচ্চ চরিত্রবান্ ব্রাহ্মকে নির্য্যাতন করলে, ব্রাহ্মদের অনেক-কষ্টে-গড়া ভাল কাজ বিরোধীদের হাতে চূর্ণ হ'লে, ভারতের ভাবী কল্যাণ-সৌধের জন্য ভাল মসলা তৈয়ারী হবে। দু বছর আগে অনেক লোকে ব্রাহ্মদের কলেজটি চূর্ণ করবে ব'লে দলবদ্ধ হ'য়েছিল। বিধাতা যেন বলেন, "আমার ব্রাহ্মদের চূর্ণ করলে পিষ্ট করলে ভারতের ভবিষ্যতের জন্য খুব ভাল মসলা তৈয়ারী হবে।" জগতের যত ভাল কাজ, বিশ্বাসীদের রক্তেই তার ভিত্তি গাঁথা হ'য়ে থাকে। দেরীতে ভয় নাই, বাধাতেও ভয় নাই, পরাজয়েও ভয় নাই, যদি আমরা ব্রহ্মগত জীবন, ব্রহ্মগত চরিত্র গড়বার জন্য প্রাণপণ সাধনায় নিযুক্ত হই।

নব মন্ত্র।

আজ তবে আমরা উৎসব-মন্দির থেকে কি মন্ত্র ঘরে নিয়ে যাব? এক বছরের জন্য ও নব শতাব্দীর জন্য, নিজেদের জন্য ও ছেলে মেয়েদের জন্য, পরিবারের জন্য ও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্রের জন্য, কি-মন্ত্র নিয়ে যাব?—আমরা খুব ভাল ক'রে মায়ের দয়া অনুভব করব। পূজ্যগণের চরিত্রে, ব্রহ্মের আনন্দে আলোকিত নূতন পৃথিবীতে নূতন মানবসংসারে, আমাদের পরিবর্ত্তিত সংশোধিত জীবনে, সে দয়ার অমৃতময় লীলা দেখব। সে কাহিনী ঘরে ও সমাজে, নিত্য বলব, শুনব। আর খুব ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর হাতে এমন ক'রে আত্মসমর্পণ করব, যাতে জীবন বদলে গিয়ে আত্মার নবজন্ম লাভ হয়। যাতে চিন্তা বদলে যায়, কল্পনা আশা আকাঙ্ক্ষা বদলে যায়, রক্ত মাংস বদলে যায়। শরীর-মন, ধন-জন-যৌবন, সব তাঁর হয়। প্রতি দিন প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি কাজে প্রতি কথায়, আমরা তাঁর হব। "তোমার মনের মত' হওয়া,"—এই আমাদের জপমন্ত্র হবে। এ মন্ত্র নিজেরা লব, এ মন্ত্র ছেলেমেয়েদের দিব, এ মন্ত্র প্রচার করব।

ভাই বোন্, মনে মনে ছবি দেখতে শিখ। বিধাতা প্রত্যেক মানুষকে কল্পনাশক্তি দিয়েছেন। ধর্ম্মজীবনের জন্য যখন সে কল্পনাশক্তির ব্যবহার করি, তখনই তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার করা হয়। কল্পনাশক্তিকে কল্পনা-দৃষ্টিকে সেইভাবে ব্যবহার কর। আমি কেমন ক'রে উঠলে বসলে, কেমন ক'রে

চল্‌লে বল্‌লে, আমার আকার ইঙ্গিত কেমন হ'লে, আমার মনের বাসনা কামনা ও ভবিষ্যৎসম্বন্ধে মনের গোপন আশা কেমন হ'লে, মানুষের সঙ্গে আমার ব্যবহার কি-রকম হ'লে, তাঁর চোখে তিনি আমায় সুন্দর দেখ্‌বেন,—প্রতিদিন, প্রতি-ঘণ্টায় তার ছবি মনে অঙ্কিত কর। অন্তরখানি তাঁর দিকে তুলে ধর, তা হ'লে তিনি যে তোমায় কেমন দেখ্‌তে চান, সে ছবি তিনি নিজেই তোমার প্রাণে অঙ্কিত ক'রে দিবেন। ব্রহ্মের মনে সে ছবি তৈয়ারী রয়েছে। আমি ভাল হ'লে কেমন হ'ব, আমার সেই ভবিষ্যৎ ভাল ছবি, আমার সেই দেব-ছবি, ব্রহ্মের মনে তৈয়ারী র'য়েছে। মন খুলে তাঁর কাছে বস্‌লেই, তাঁর দিকে চোখে চোখে তাকালেই, সেই ছবি আমার মনের পটে অঙ্কিত হ'য়ে যায়। এস, নিজেদের সেই ভাল ছবি সেই গৌরব-ছবি দেখি; এস, ব্রাহ্মসমাজের সেই গৌরব-ছবি দেখি। "এবার মায়ের মনের মতন হবই; আর চিন্তাবিহীন-ভাবে, উদাসীনভাবে চ'লে, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলভাবে চ'লে, মা'র মনে দুঃখ দিব না; এবার হ'তে মার মনস্কামনা পূর্ণ কর্‌বই,"— এস, এই প্রতিজ্ঞা করি। মায়ের সেই প্রেমমুখ দেখে, তাঁর দয়া তাঁর ভালবাসা স্মরণ ক'রে, এই ব্রাহ্মসমাজেই কত বার কত পাষাণ প্রাণ গ'লে গিয়েছে। আজ আমাদের এই পাষাণ-প্রাণগুলি কি গল্‌বে না? এস, আজ তাঁর চরণ ধ'রে খুব কাঁদি,—কৃতজ্ঞতায় কাঁদি, অনুতাপে কাঁদি, আর নবভাবে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করি।

প্রার্থনা।

মা, আজ চেয়ে দেখ, তোমার ব্রাহ্মসমাজের নরনারী তোমার চরণতলে উপস্থিত। দেখ, ব্যাকুলতায় সকলের প্রাণ কাঁপচে, কাঁদ্‌চে। তোমার দয়া, তোমার ভালবাসা অনুভব ক'রে আজ প্রাণগুলি উদ্বেলিত হ'য়ে যাচ্চে। আর কি তোমার না হ'য়ে, তোমার হাতে ধরা না দিয়ে আমরা থাক্‌তে পারি? এই ব্রাহ্ম-সমাজে তোমার দয়ার লীলা, তোমার ব্রহ্ম-অগ্নির লীলা, প্রকাশিত হবে না, তবে কোথায় তা হবে? মা, তোমার দয়ার উজ্জ্বল ক্ষেত্র, এই ব্রাহ্মসমাজ। কত সাধুর জীবন, কত ত্যাগীর জীবন, কত বিশ্বাসীর জীবন, কত পাগল ভক্তের জীবন, এখানে তোমার সেই দয়ার ঢেউ বহিয়ে দিয়ে গিয়েছে। আর দেরী সইচে না, মা! প্রাণ অস্থির। আমাদের এই অধৈর্য্যকে তুমি আত্মদানের অধৈর্য্যে পরিণত কর। মা, তুমি শীঘ্র আবার এস, আমাদের ধর, আমাদের জয় কর, আমাদের জীবন গ্রাস কর, আমাদের মাতিয়ে দাও, ক্ষেপিয়ে দাও; তোমার হাতে আত্মাহুতিদানের জন্য সকলকে নবদীক্ষা দাও। ব্রাহ্মসমাজ আবার জাগুক্। উৎসর্গীকৃত জীবনে তোমার জ্যোতির যে ঝলক ওঠে, তা এখানে আবার উঠুক। আশা ভক্তি কৃতজ্ঞতাভরে এবং দীনহীন, অকিঞ্চন হ'য়ে তোমার চরণে সকলে প্রণিপাত করি।

"কত অপরাধ গো মা দানবসন্তানে" ইত্যাদি চতুর্থ সঙ্গীত ও "পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে" ইত্যাদি ব্রহ্মসঙ্গীতের পর কিছু সময় সংকীর্ত্তন চলিতে থাকে। অবশেষে প্রায় এগার ঘটিকায় এই বেলার কার্য্য শেষ হয়। কিন্তু কেহ কেহ মন্দিরে থাকিয়া ব্যক্তিগত প্রার্থনা ও ধ্যানে নিযুক্ত থাকেন। প্রাঙ্গণে বহু লোক প্রীতিভোজনে নিযুক্ত থাকিলেও মন্দির কখনও একেবারে শূন্য থাকে না। অনন্তর এক ঘটিকার সময় মাধ্যাহ্নিক উপাসনা আরম্ভ হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল;

আমরা দেড় বৎসর যাবত ব্রাহ্মসমাজস্থাপনের শতবার্ষিক উৎসব করিয়া আসিতেছি এবং বর্ত্তমানে প্রথম মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিবস স্মরণ করিয়া শততম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিতেছি। আমাদের জীবনে এই দিনের একটা বিশেষ মূল্য আছে। আমরা মাঘোৎসব উপলক্ষে করুণাময়ের অনেক করুণা সম্ভোগ করিয়াছি এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে জীবনে অতি মূল্যবান্ সম্পদ্ লাভ করিয়াছি। আজ সে সমস্ত স্মরণ করিয়া প্রেমময় বিধাতার নিকট কৃতজ্ঞতাভরে অবনত হইবার দিন, তাঁহার এই সুমহান্ ধর্ম্ম হইতে যাহা পাইয়াছি তাহা হৃদয়ে অনুধাবন ও প্রকাশ্যে স্বীকার করিবার দিন। তাই আজ সেই বিষয়ে দুই একটি কথা নিবেদন করিতেছি। তিনিই কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার এই পবিত্র ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিয়াছেন, এবং তাঁহাকে জানিতে ও বুঝিতে দিয়াছেন। তিনি সাধারণভাবে সকলের বিধাতা, এই কথা সকল ধর্ম্মই স্বীকার করে, অনেক স্থলে পাঠও করিয়াছি; কিন্তু তিনি যে জীবনের সকল মুহূর্ত্তের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ঘটনার বিধাতা, তাহা তিনিই প্রথম সাক্ষাৎ ভাবে জানিতে ও বুঝিতে দিলেন। আর কোনও ধর্ম্ম তাহা এমন ভাবে শিক্ষা দেয় বলিয়া জানি না। পূর্ব্বে আর কোনও গ্রন্থে তাহা পাঠ করি নাই। আর কাহারও মুখে তাহা শুনিও নাই। আজকাল অবশ্য অনেকের মুখে ইহা শুনিতে পাই।

আমি যখন পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, ছুটীর সময় বাড়ীতে না যাইয়া আমার জিনিসপত্র পাঠাইয়া দিলাম এবং উৎসবে যোগ দিবার জন্য অন্যত্র গেলাম, এবং দাদা যখন আমাকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইলেন, তখন এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই, মহা সংগ্রামে পড়িতে হইবে জানিয়াও, তাঁহাদিগের প্রাণে যতটা সম্ভব কম আঘাত দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়া, তাঁহার সঙ্গে বাড়ী গেলাম। এবং শিক্ষকতা করিয়া পরীক্ষা দিব স্থির করিলে, সেই ভাবের দ্বারা চালিত হইয়াই, তাঁহার কথা অনুসারে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার কর্ম্মস্থানে যাই। সেখানে আমাকে কঠোর-তর পরীক্ষার মধ্যে পড়িতে হইবে, বন্ধুবান্ধবের সাহায্য পাইব না, জানিয়াও ভীত বা পশ্চাৎপদ হই নাই। এখানে বলা আবশ্যক যে, আমাকে কোনও রূপ অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয় নাই। আমাকে কঠিন প্রলোভনের মধ্য দিয়াই আসিতে হইয়াছে। অত্যাচার উৎপীড়ন হৃদয়ে বল আনিয়া দেয়। সুখ প্রলোভন অতিক্রম করা বড় কঠিন। অনেক সময়

মনে হইয়াছে, এই বুঝি তাঁহাদের হাতে আত্মসমর্পণ করিলাম, আর প্রাণে আকুল প্রার্থনা চলিয়াছে। সকল বিষয়ে বাস্তবঃ আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতাই দেওয়া হইত, তাহার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে যে সত্যের সঙ্গে কোন কোনও বিষয়ে একটু বন্দোবস্ত করিয়া চলা আবশ্যক হয়, তাহা সহজে বুঝা যাইত না। যাহা হউক, তিনিই কৃপা করিয়া তাহা বুঝিতে দিয়া সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিলেন, অপ্রত্যাশিত ভাবে বন্ধু এবং অপূর্ব্ব সুযোগ জুটাইয়া দিলেন এবং এমন কোন কোনও পুস্তক হাতে আনিয়া দিলেন, যাহা হইতে জীবনপথে বিশেষ সহায়তা পাইয়াছি। ইহার পূর্ব্বে ও পরে জীবনে তাঁহার জীবন্ত মঙ্গল বিধাতৃত্বের আরও অনেক পরিচয় পাইয়াছি। জীবনের কঠিন সমস্যার মধ্যে বুদ্ধি বিবেচনা চিন্তা প্রার্থনা দ্বারা কোনও কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্ধারণ করিয়া, এই বলিয়া তাঁহার বিধাতৃত্বের উপর ছাড়িয়া দিয়াছি যে, আমি যাহা বুঝিতে পারিতেছি সেই পথ অনুসরণ করিতেছি, কিন্তু ইহা যদি ঠিক পথ না হয় তবে নিশ্চয়ই তিনি অন্য ব্যবস্থা করিবেন, সেই পথ হইতে ফিরাইয়া অন্য পথে লইয়া যাইবেন এবং তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝিতে দিবেন। এবং সত্যই সেরূপ ঘটিয়াছে, দেখিয়াছি। এই সময়ই এমার্সনে প্রথম পাঠ করি—"তোমার প্রকৃত কল্যাণের জন্য যে বন্ধুটিকে পাওয়া দরকার, যে পুস্তকখানি পাঠ বা যে কথাটি শোনা আবশ্যক, তাহা ঘুরিয়া ফিরিয়া যেরূপেই হউক উপযুক্ত সময়ে তোমার নিকট উপস্থিত হইবেই; কেননা তোমার মধ্যে যে পরমাত্মা বিরাজমান অপর সকলের মধ্যেও যে অবিচ্ছিন্নভাবে তিনিই রহিয়াছেন, কোথাও একটি ছিদ্রেরও ব্যবধান নাই।" ইহাতে আমার অভিজ্ঞতাবিষয়ে সায় পাইলাম। বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল। জীবনের বহুবিবিধ ঘটনার মধ্যে এই মহা সত্যের অনেক পরিচয় পাইয়াছি। সকলগুলি উল্লেখ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহাতে সন্দেহ বা অবিশ্বাস করিবার কোন হেতুই এ পর্য্যন্ত পাই নাই। সুতরাং যদি কিছু সুনিশ্চিতরূপে জানিয়া থাকি, তবে এই মহাসত্যই জানিয়াছি।

তিনি যে শুধু বাহিরের বিষয়েই জীবন্ত বিধাতা, তাহা নহে। আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধেও তাঁহার নিত্য বিধাতৃত্ব সমভাবেই রহিয়াছে। তিনি যে সাধারণ ভাবে পাপীর পরিত্রাতা, অনেক মহাপাপীকেও তিনি আশ্চর্য্যভাবে উদ্ধার করিয়াছেন, এই কথা সকল ধর্ম্মই স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু তিনি যে প্রত্যেককে প্রতিমুহূর্ত্তে জীবন্তভাবে গড়িয়া তোলেন, সকল সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, উত্থান পতন, জয় পরাজয়ের মধ্যে, আলোকে আঁধারে, আশা নিরাশায়, সোজা বা বাঁকা পথে, হাত ধরিয়া কল্যাণের দিকে লইয়া যান; কেবল যে প্রার্থনা করিলেই তাঁহার সাহায্য পাওয়া যায় আর তাহা না করিলে তিনি পরিত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া যান, এরূপ নহে,—না ডাকিলে না খুঁজিলেও অজ্ঞাতে অলক্ষিতে তাঁহার অসীম প্রেম সকলকে সর্ব্বদা আবেষ্টন করিয়া থাকে, তাঁহার জীবন্ত মঙ্গলকার্য্য নিয়ত চলিতে থাকে,—তাঁহার নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয়ও তিনি জীবনে অনেক দিয়াছেন। প্রার্থনার উত্তররূপে দুর্ব্বলতার মধ্যে বল ও অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার প্রকাশ ত পাইয়াছিই; তাহা ব্যতীতও তিনি এমন করিয়া অযাচিতভাবে আপনার পরিচয় দিয়াছেন, আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন, হৃদয়ে কত অমূল্য তত্ত্ব উদ্ভাসিত করিয়াছেন, যাহাতে সংশয় সন্দেহের আর লেশমাত্র অবসর থাকে নাই। দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা না করিয়াছি এমন নহে। অকাট্য যুক্তি বিচার দ্বারা যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছি তাহাতেও সকল সময় সকল সংশয় বিদূরিত হয় নাই, নিঃসন্দিগ্ধরূপে সুস্পষ্টভাবে অন্তরের অন্তরে বিষয়টার ধারণা জন্মে নাই। কিন্তু তাঁহার কৃপায় উপাসনার মধ্যে বা অন্য কোনও সময়ে তাঁহার প্রকাশে এক মুহূর্ত্তে সকল পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, সকল সংশয় সন্দেহ চলিয়া গিয়াছে। আমাদের একটি সঙ্গীতে আছে—"যে জন ব্যাকুল প্রাণে তোমারে ডাকে অনায়াসে সে ত ত'রে যাবে, যে তোমারে ডাকে না তার কি গতি হবে না? চিরদিন পাপে প'ড়ে র'বে?…আমি ডুবেছি, ডুবেছি সংসারপাথারে, উঠিতে পারি না নিজ বলে, যতবার উঠিতে চাই, ততই ডুবিয়া যাই, তুমি আমায় তোল করে ধ'রে।" তাঁহার কৃপায় এমন অবস্থা গিয়াছে, যখন প্রাণের সহিত এই সুন্দর গানটি করিতে পারিতাম না,—গান করিতে গেলেই অন্তরে বাধা পাইতাম, অনুভব করিতাম, এই ত তিনি সর্ব্বদা তুলিয়া ধরিতেছেন, ডুবিতে দিতেছেন না, তাঁহার অপার করুণা ও জীবন্ত বিধাতৃত্ব দেখিয়া কি প্রকারে আর এরূপ কথা বলিতে পারি? ইহা যে এক মুহূর্ত্তের বা এক দিনের একটা সাময়িক ভাব মাত্র ছিল, তাহা নহে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, একটু দীর্ঘ কালই, পথে ঘাটে চলিতে ফিরিতে পর্য্যন্ত এই অনুভূতিটা উজ্জ্বল ছিল। পরে নিজ দোষেই তাহা হারাইয়া ফেলি। তাহা আর ফিরিয়া না পাইলেও, উহার সত্যতা বিষয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কখন সন্দেহ আসে নাই।

তাঁহার ধর্ম্মের পথ যে কত সূক্ষ্ম, আপনার উপর নির্ভর রাখিলে কত সহজে যে আমাদের পতন হয়, তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। যখন তাঁহার করুণায় জীবনে বেশ একটা সরস ভাবই ছিল, উপাসনাদি বেশ সুন্দর ভাবেই চলিতেছিল, তখন একদিন স্নানের সময় পুকুরের অপর পাড়ে পূজায় নিযুক্ত একটি ভদ্রলোককে অপর একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলিতে দেখিয়া তাহার প্রতি মনটা একটু বিরূপ হইল, ভাবিলাম লোকটা কি করিতেছে। মুহূর্ত্তের জন্য এই ভাবটা মনে আসিয়া চলিয়া গেল। আমিও গৃহে ফিরিলাম এবং সকল কথা ভুলিয়া গেলাম। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার সময় যখন নির্জ্জনে যাইয়া দৈনিক উপাসনায় বসিলাম, তখন কিছুতেই আর প্রাণে সেই সরসভাব অনুভব করিলাম না, উপাসনায় ডুবিতে পারিলাম না। বার বার দিনের সমস্ত ঘটনা পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম, বিশেষ ভাবে সেই সময়ের প্রাণের অবস্থাটা বিচার ও পরীক্ষা করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহার মধ্যে চিত্তবিকারের বিশেষ কোনও পরিচয় খুঁজিয়া পাইলাম না। এইরূপ চিন্তা ও প্রার্থনায় দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। শুধু যে দুইবেলা উপাসনার সময়ই চিন্তা প্রার্থনা আত্ম-পরীক্ষা করিতাম, তাহা নহে। পথে ঘাটে চলিতে ফিরিতেও যখন

একটু অবসর পাইয়াছি তখনই মন তাহাতে নিযুক্ত হইয়াছে—এবং বলা বাহুল্য যে, ঐ ঘটনাটির প্রতিই বার বার দৃষ্টি গিয়াছে। অবশেষে পথে চলিতে চলিতে একদিন বুঝিতে পারিলাম যে, অন্য কোনও প্রকার চিত্তবিকার না হইলেও, সেই লোকটির প্রতি একটু ঘৃণার ভাব এবং নিজের সম্বন্ধে একটু সূক্ষ্ম অহঙ্কারের ভাব ত লুক্কায়িত ছিল। যে মুহূর্ত্তে ইহা বুঝিতে পারিলাম সেই মুহূর্ত্তেই সকল মেঘ কাটিয়া গেল, সব পরিষ্কার হইল, আবার উপাসনাদি পূর্ব্বের ন্যায় সরস হইল। বাস্তবিক এ পথ যে কত সূক্ষ্ম, কত কঠিন, কত সতর্ক ভাবে যে চলিতে হয়, কত সহজে যে আমরা পতিত ও বঞ্চিত হই, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

তাঁহার করুণায় অনেক খাঁটি প্রাণপ্রদ উপাসনায় যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য হইলেও, অতি প্রথম অবস্থায়ই তাঁহার আলোকে বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, যদিও সকল প্রকার প্রাণহীন বাহ্যিক অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া সত্যে ও ভাবে পরমাত্মার আধ্যাত্মিক পূজায় নিযুক্ত হওয়াই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, তথাপি আমাদের উপাসনাপ্রণালীটাও অপরাপর পদ্ধতির ন্যায় শুধু বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্রে, বাহিরের কতকগুলি কথায় বা মন্ত্রে, পরিণত হইতে পারে। এখন অনেকের নিকট এরূপ কথা শুনিতে পাইলেও তখন শুনা যাইত না, বরং বলিলে একটু বিরক্তিভাজনই হইতে হইত। যাহা হউক, বিকৃত ভাবে সাধনের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, এই প্রণালীটা যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই এবং ইহাদ্বারা সাধনের যে একটা স্বাভাবিক পথ আছে, তাঁহার কৃপায় তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাহা ছাড়া, তিনি যে তাঁহার অসীম প্রেমে আমাদিগকে তাঁহার প্রেম ও কল্যাণের পথে লইয়া যাইবার জন্য, জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে গড়িয়া তুলিবার জন্য, নিয়ত জীবন্ত ভাবে জগতে ও প্রতি হৃদয়ে কার্য্য করিতেছেন, আমরা হৃদয় পাতিয়া তাহা গ্রহণ করিলেই, তাঁহার হাতে—তাঁহার জীবন্ত প্রেমের স্রোতে—আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিলেই, আমরা যে সহজ ভাবে স্বাভাবিক নিয়মে জীবনপথে অগ্রসর হইতে পারি, উন্নতির দিকে চলিতে পারি, তাহাও তিনি কৃপা করিয়া বুঝিতে দিয়াছিলেন। পরে, সেণ্ট ফ্রান্সিস্ ডি সেইল্‌স্ ও এমার্সনের নিকট সে কথার সায় পাইলাম। সেণ্ট ফ্রান্সিস বলিয়াছেন, বৃক্ষ যেমন তাহার ডাল বিস্তার করিয়া দেয়, আর আকাশের আলো বাতাস আসিয়া তাহাকে গড়িয়া ও পুষ্ট করিয়া তোলে, সেরূপ আমাদেরও একমাত্র কর্ত্তব্য—তাঁহাকে লাভ করিবার একমাত্র পথ—সরল ভাবে তাঁহার নিকট হৃদয় পাতিয়া দেওয়া, তিনি অন্তরে বাহিরে যাহা দেন তাহা গ্রহণ করা, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার দ্বারা চালিত হইতে দেওয়া। এমার্সন বলিয়াছেন, "আমাদের চাই একমাত্র বিশ্বাস ও প্রেম—বিশ্বাসপূর্ণ প্রেম। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রেমময় বিধাতার কল্যাণস্রোত অবিশ্রান্ত বহিয়া যাইতেছে, তাহার হাতে যে আপনাকে ছাড়িয়া দিবে সেই বিনা চেষ্টায় সত্যে প্রেমে পুণ্যে চির শান্তিতে নীত হইবে। আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য তাঁহার বাধ্য হইয়া চলা। আমরা যদি অন্যায় কর্ত্তৃত্ব করিতে যাইয়া সমস্ত পণ্ড না করি (if we be not marplots with our miserable interferences), তাহা হইলে, প্রকৃতিরাজ্যে যেমন গোলাপাদি যাবতীয় পদার্থ সুন্দর হইয়া আপনা হইতে গড়িয়া উঠে, তেমন মানবের শিল্প সাহিত্য সমাজ, ধর্মজীবন এবং যে স্বর্গরাজ্যের কথা চিরদিন সাধুগণ বলিয়া আসিতেছেন এবং এখনও মানব-অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে নিয়ত উত্থিত হইতেছে, তাহা স্বাভাবিক নিয়মে আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিবে।" বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা অধিকতর সত্য কথা আর কিছু নাই। আমাদের জীবনেও আমরা ইহার পরিচয় পাইয়াছি। এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার বিন্দু মাত্রও স্থান নাই।

দুঃখের বিষয়, জানিয়া বুঝিয়াও আমরা সকল সময় তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না, তাঁহার সম্পূর্ণ বাধ্য হইয়া চলিতে পারি না, প্রেম ও বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁহার সকল দান ও ব্যবস্থা—সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, সম্পদ বিপদ, আনন্দ নিরানন্দ, মিলন বিচ্ছেদ—হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে, সকল সময় সকল স্থানে, নিয়ত প্রাণকে তাঁহার উন্মুখীন করিয়া রাখিতে পারি না। অনেক সময়ই তাঁহাকে ভুলিয়া, নিজের ভাবে নিজের পথে চলিতে যাই, বা উদাসীন ভাবে বাহিরের স্রোতে ভাসিয়া চলি। তাই আমাদের এই দুর্গতি, তাই আমরা মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকি; আর, আমাদের জীবনেও লোকে তাঁহারে জীবন্ত ক্রিয়ার পরিচয় পায় না। আমাদিগের মলিন জীবন দেখিয়া তাঁহার প্রাণপ্রদ ধর্ম্মের শক্তিতে, তাঁহার জীবন্তবিধাতৃত্বে, লোকে সন্দিহান হয়। সুতরাং ইহাতে আমরা নিজে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি, তেমনি অপরেরও অনিষ্ট সাধন করিতেছি। এই হেতু, শুধু মুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে হইবে না, জীবনের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইবে। জীবনকে তাঁহার অপার লীলার জীবন্ত নিদর্শনরূপে, কৃতজ্ঞতার স্মৃতিস্তম্ভরূপে, ধরিতে পারিলেই বুঝিতে পারিব আমাদের উৎসব সার্থক হইয়াছে। তাহা হইলেই আমাদের দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মের আর অগৌরব সাধিত হইবে না, আমরাও যথার্থ ভাবে উৎসব সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইব। তবে, নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। আমরা আমাদের কাজ না করিলেও, তিনি তাঁহার কাজ করিতে কখনও ক্ষান্ত হইবেন না। আমাদের দোষ ত্রুটির ফল যে আমাদিগকে অনেক ভোগ করিতে হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার দ্বারা আমরা কোনও ক্রমেই তাঁহার মঙ্গলবিধাতৃত্বকে পরাজিত করিতে পারিব না—কঠোর দুঃখ বেদনা লাঞ্ছনার মধ্য দিয়াও অবশেষে তিনি আমাদিগকে তাঁহার করিয়া লইবেনই, জীবনে তাঁহার পুণ্য রাজ্য তিনি প্রতিষ্ঠিত করিবেনই।

করুণাময় পিতা কৃপা করুন, আমরা প্রেম ও বিশ্বাসের সহিত সকল বিষয়ে তাঁহার অনুগত হইয়া, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হাতে আপনাদিগকে অর্পণ করিয়া, তাঁহার দ্বারা গঠিত ও চালিত হই, তাঁহার হইয়া এ জীবনকে সার্থক করি ও তাঁহার ধর্ম্মের গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখি। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রতি জীবনে ও সমাজে, জগতে সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হউক। তাঁহার পবিত্র রাজ্য সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত হউক।

অনন্তর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও ভাই সীতারাম পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং ৪ ঘটিকার সময় পুনরায় ইংরাজীতে উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্মানুবাদ পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। এই উপাসনার পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন চলিতে থাকে এবং যথা সময়ে সায়ংকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের সার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

ব্রহ্মোৎসবে সমাগত নর নারীগণ প্রত্যক্ষ করিতেছেন ব্রহ্ম যেমন দ্যুলোকে, তেমনই ভূলোকে। তিনি কেবল সৎ নহেন, তিনি জ্ঞান ও প্রেমময় পুরুষ। তিনি যেমন বিজ্ঞজনের হৃদয়ে প্রকাশিত, তেমনই নিরক্ষরের প্রাণে আলোকরূপে প্রদীপ্ত। এই মন্দিরে মহাসমুদ্র, তড়াগ ও বাপী একত্র হইয়াছে। এই উপাসনালয়ে ব্রহ্মকে শিবং সুন্দরং ও শুভ্রং রূপে পুণ্যবান্ দেখিতেছেন, পাপী দেখিতেছেন। আতুর তাঁহাকে দেখিয়া বন্ধুবিয়োগের বেদনা ভুলিয়া যাইতেছেন, সুখী তাঁহাকে পাইয়া কৃতজ্ঞতাভরে প্রণিপাত করিতেছেন।

ধরাতলে আশ্চর্য্য ব্যাপার হইতেছে। নরনারী ঊর্দ্ধমুখে ব্রহ্মকে ডাকিতেছে। ব্রহ্ম অজস্র করুণা বর্ষণ করিয়া তাহাদের সকলের প্রাণের তৃষ্ণা দূর করিতেছেন।

ঐ দেখ একটী ভাই, বড় গরীব, কায়ক্লেশে জীবনধারণ করেন; ব্রহ্মোৎসবের নাম শুনিয়া আর বাড়ীতে থাকিতে পারেন নাই। প্রাণে তাঁহার শান্তি নাই, ব্রহ্মোৎসবে সকল বেদনা তিরোহিত হয়, তাই যদিও জীর্ণ মলিন বসন, তবু এখানে আসিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিতেছে, কিন্তু বিষাদমাখা মুখ প্রফুল্ল হইয়াছে। ব্রহ্মসম্ভোগে তাঁহার সকল জ্বালা চলিয়া গিয়াছে।

ঐ দেখ আর একটী লোক বড় দুঃখ পাইয়া উৎসবে আসিয়াছেন। তাঁহার কন্যাটী অপহৃতা হইয়াছে। কন্যার শোকে তিনি পাগল হইয়াছেন। ব্রহ্মোপাসনাতেই ভবযন্ত্রণায় অস্থির লোক শান্তি লাভ করে। সেই বার্ত্তা শুনিয়া তিনি আসিয়াছেন। দেখ, তাঁহার প্রাণে সন্তাপহরণ শান্তি দিতেছেন, বহুদিনের চক্ষের জল তিনি মুছিতেছেন।

ঐ একটী নারীকে দেখ। তাঁহার সুন্দর রূপ মলিন হইয়া গিয়াছে, তাঁহার সহাস্য মুখ হইতে আনন্দ বিদায় লইয়াছে। পুত্রের বিয়োগে তাঁহার জীবন আশাহীন, আলোহীন। অতি কষ্টে দেহখানি লইয়া উৎসবে আসিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যে মুখ নীরব হইয়া গিয়াছিল, সেই মুখ হইতে গীতধ্বনি উঠিয়াছে!

একটী যুবক পাপের সেবায় তন, মন ও ধন সমর্পণ করিয়াছিল। তাহার সমস্ত শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল। জ্ঞান বুদ্ধিদ্বারা আর আপনাকে প্রলোভনের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই। সে পাপের ভীষণ পরিণতি বুঝিয়াছিল, কিন্তু আপনাকে রক্ষা করিবার আর সামর্থ্য ছিল না। সে নিরুপায় হইয়া উৎসবে আসিয়াছে। এই উৎসবক্ষেত্রে ব্রহ্মগন্ধ পাইয়া তাহার প্রাণ সবল হইয়াছে। নিজের বলে পাপ দমন করিতে পারে নাই, ব্রহ্মস্পর্শে তাহার মনে পবিত্রতার সঞ্চার হইয়াছে।

একটী নারী অতিশয় নির্য্যাতিত হইতেছিল। স্বামী তাহার বিপথে গিয়াছে। স্বামী যদি ভাল না বাসে, বাটীর কেহই সে নারীকে সম্মান করে না। সে সুখের মুখ দেখিতে না পাইয়া উৎসবে আসিয়াছে। জগতের দুঃখীজনের প্রতি যাঁহার দয়ার পার নাই, তিনি তাঁহাকে বলিয়াছেন "আমার উপর নির্ভর কর।" তিনি এই বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়াছেন। ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া ভাবিতেছেন, জগৎপতি আমার ভার লইয়াছেন, আমার মত সৌভাগ্যশালিনী আর কে আছে?

ব্রহ্ম চৈতন্যময় পুরুষ, তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ। কেবল তাহাই নহেন। তিনি স্বয়ং অমৃতস্বরূপ ও অমৃতদাতা। তিনি মঙ্গল-স্বরূপ, সকলের মঙ্গল করিতেছেন। তিনি সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে সকলের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া অজ্ঞানকে জ্ঞানী করিতেছেন, অপ্রেমিককে প্রেমিক করিতেছেন, দুর্ব্বলকে শক্তিশালী করিতেছেন, পাপীকে পুণ্যবান করিতেছেন। এ দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের ইহাই শিক্ষা।

এই শিক্ষা শাস্ত্রের শিক্ষা বা মহা পুরুষের শিক্ষা নহে। ইহা পাপী ও পুণ্যবাণ, জ্ঞানী ও অজ্ঞানের জীবনের শিক্ষা। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন, ঈশ্বর অনুমান বা কল্পনার বস্তু নহেন। ঈশ্বর প্রত্যক্ষ পুরুষ। তিনি আত্মার পরমাত্মা, ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার বারি, জীবনের রস। শোকতাপপূর্ণ সংসারে শান্তি।

দুঃখীজন তাই ব্যাকুল হইয়া উৎসবে আগমন করে এবং নূতন জীবন লাভ করিয়া ফিরিয়া যায়।

একবার আয়র্লণ্ডে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। শত শত লোক অনাহারে ক্ষিপ্ত বা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছিল। কব্‌ডেন যাইয়া ব্রাইটকে বলিলেন "ওঠ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর।" স্ত্রীর মৃত্যুশোকে ব্রাইট অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কব্‌ডেনের ডাকে তিনি উঠিয়া বসিলেন। উৎসবে এইরূপ ব্রহ্মের ডাক স্পষ্ট শোনা যায়। শুষ্ক অবসন্ন প্রাণ জাগিয়া উঠে—ব্রহ্মবলে বলী হইয়া পাপের পাশ ছিন্ন করে, জড়তা পরিহার করিয়া ব্রহ্মের ইচ্ছাপালনে অগ্রসর হয়, জ্ঞান ও প্রেম, দয়া ও স্নেহ, বিনয় ও পুণ্য লাভ করিয়া নূতন মানুষ হইয়া যায়।

উৎসব পরমাত্মার প্রকাশ। ভক্তের ভক্তির উচ্ছ্বাস, পাপীর আকুল আর্ত্তনাদ। উৎসব আত্মার আবরণ উন্মোচন করে। আত্মার মলিনতা চক্ষুর গোচর করে। আত্মা তখন আগুনে দগ্ধ হয়। দগ্ধ আত্মা হইতেই কাতর ও সহজ প্রার্থনা ফুটিয়া উঠে। মস্‌নবী বলিয়াছেন, যাহারা দুঃখ কি তাহা জানিল না তাহাদের প্রার্থনা শুষ্ক ও প্রাণহীন। দুঃখীর যে প্রার্থনা তাহা দগ্ধ হৃদয় হইতেই উত্থিত হয়। তাই ইহার ফল হাতে হাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভক্ত ও বিশ্বাসীর সমাগমে উৎসব প্রেম ও পুণ্যে, আকুলতা ও আর্ত্তনাদে প্রাণময় হইয়া উঠে। ঈশ্বরস্বরূপপ্রকাশের সেই সুসময়

উৎসব এই জন্যই আর্ত্তের বিরামস্থান, পাপীর পরিত্রাণের

পথ, বিশ্বাসীর আনন্দধাম। ধরাতলে এমন স্থান আর নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ দেখ বিশ্বাসী বলিতেছেন, সত্যের সত্যকে পাইয়া পৃথিবীর সকল অসার পদার্থকে ছাড়িয়াছি। ভক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতেছেন, জীবন মন ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। পাপী বলিতেছে, বিশ্বাসীর সংস্পর্শে আসিয়া ব্রহ্মস্পর্শ পাইয়াছি, পাপ আর আমাকে ভুলাইতে পারিবে না। মানবপ্রাণ হইতে ব্রহ্মের জয়ধ্বনি উঠিতেছে। কৃতজ্ঞতা ও প্রণতি উৎসবকে কেমন সুন্দর করিয়াছে! ইহার মধ্যে জগজ্জননীর, আমাদের জননীর, করুণাময়ী রূপের প্রকাশ। আর কিছু চাই না। আর কোন আশা রাখি না। এই রূপসাগরে ডুবিয়া যাই। ধন্য তুমি, আমাদিগকে এই রূপ তুমি দেখাইলে।

সংগীতান্তে কিছু সময় সংকীর্ত্তন চলিতে থাকে। অনন্তর প্রণাম ও আলিঙ্গনাদিতে কিছু সময় কাটাইয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। এই ভাবে অদ্যকার উৎসব শেষ হয়। (ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মসমাজ।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা—অধ্যক্ষ সভার ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিতরূপে বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে;—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাস, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী কুমুদিনী বসু। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রচারকগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৩০শে জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের (আদি) সম্পাদক বাবু শিতিকণ্ঠ মল্লিক ৮৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নানারূপে দীর্ঘকাল ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন।

বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী বারাণসি নগরীতে বাবু মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একমাত্র পত্নীকে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বাঁকুড়াতে ও কাশীতে দীর্ঘকাল ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারী কুমিল্লানগরীতে শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্তের পত্নী মুক্তকেশী দত্ত ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। পরিচিত সকলেই তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাবের জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন।

বিগত ৬ই মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র বসুর পত্রবধূ (শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র বসুর পত্নী) প্রফুল্লনলিনী একটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া বসন্তরোগে পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কুস্থর নগরীতে পরলোকগত লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল এন পি সিংহের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র আচার্য্যের কার্য্য, কন্যাগণ জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা এবং দৌহিত্র শ্রীমান বরুণকুমার মিত্র প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে রায়পুর কুষ্ঠাশ্রমে ৬৩৲, রায়পুর ডিস্পেন্সারীতে ১০০৲ রাঁচি ব্রাহ্মসমাজে ৫০৲ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৫০৲ ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজে ৩০৲ কুস্থর হাসপাতালে ৩০৲ এবং রায়পুরে একটি পুকুরের জন্য ৩০০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রায়পুর বালিকা বিদ্যালয়ে ও সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে মহিম সিংহ বৃত্তি ও পদক প্রতিবৎসর প্রদত্ত হইবে। উক্ত তারিখে ফরিদপুর নগরীতে তাঁহার অন্যতম জামাতা মিঃ এ এন সেনের গৃহেও তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং মিঃ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাতামহের জীবনী পাঠ করেন।

বিগত ২রা মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত রামকুমার দাসের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য এবং দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী সুনীতি দাস জীবনীপাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী কমলা দাস সাধনাশ্রমে ২৲ দান করিয়াছেন।

বিগত ৩রা মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভ্রাতা ও ভগিনীগণের সহিত তাঁহাদের পিতামহীর আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ শাস্ত্রপাঠ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চন্দ জীবনীপাঠ ও প্রফুল্ল বাবু প্রার্থনা করেন।

বিগত ৮ই মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস কর্ত্তৃক তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা পরলোকগত মনোমোহন দাস গুপ্তের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। তিনিই আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং ভ্রাতার জীবনী পাঠ করেন। এই উপলক্ষে তিনি একশত টাকার একখানা সিটি কলেজ ডিবেঞ্চার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। তাহার সুদ হইতে প্রচার বিভাগে ২৲ ও বরিশাল সেবাসমিতিতে ৪৲ টাকা প্রদত্ত হইবে। ব্রাহ্মবালক স্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্রগণও উক্ত দিবস বিশেষ উপাসনার আয়োজন করেন। তাহাতে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২রা ফেব্রুয়ারী তেজপুর নগরীতে শ্রীমতী কিরণবালা বরকাকতি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরলোকগত যতীন্দ্রনাথ দত্তের আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। ভগিনী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্বন্ধে কিছু পাঠ ও প্রার্থনা করেন। ভাগিনেয় শ্রীমান প্রণবানন্দ স্বর্গীয় মাতুলের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। এই উপলক্ষে তেজপুর ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা ও উৎসবে বালকবালিকা-সম্মিলনে শিশুদিগকে জলযোগ করাইবার জন্য ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভ বিবাহ—বিগত ৮ই মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাসের পৌত্রী (শ্রীযুক্ত সুপ্রভাত দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা) কল্যাণীয়া ইন্দিরা ও বান্দা জিলার অন্তর্গত কারুই নিবাসী পরলোকগত রামলাল দাসের পুত্র শ্রীমান অযোধ্যানাথের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে সুপ্রভাত বাবু ১০৲ ও বর ২০৲ টাকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে দান করিয়াছেন।

বিগত ১৮ই ফাল্গুন গিরিডি নগরীতে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগের পঞ্চমকন্যা কল্যাণীয়া নীলিমা ও পাটনা নিবাসী শ্রীযুক্ত দামোদর পালের চতুর্থ পুত্র শ্রীমান মহিমানন্দের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা এই দম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ—গত ১৭ই ও ১৮ই ফাল্গুন হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের ত্রিষষ্টিতম সাম্বৎরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে—১৭ই অপরাহ্ণে নগর-সংকীর্ত্তন,—পরলোকগত শ্রীশচন্দ্র রায়ের বাটী হইতে আরম্ভ হয়। রাত্রে মন্দিরে উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন। ১৮ই প্রাতঃকালে উষাকীর্ত্তন। ৮॥০টায় সমাধিক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার দত্ত ও শ্রীমতী অশোকলতা দাস প্রার্থনা করেন। ৯॥০টায় মন্দিরে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র। মধ্যাহ্নে প্রীতি-ভোজন। অপরাহ্ণে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু

তেজপুর ব্রাহ্মসমাজ—তেজপুর ব্রাহ্মসমাজ নিম্নলিখিত প্রণালীতে শততম মাঘোৎসবের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন:—

৭ই মাঘ সন্ধ্যায় ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে উদ্বোধন ও মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস। ৮ই মাঘ সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বরকাকতির গৃহে উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস। ৯ই মাঘ সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস। ১০ই মাঘ অপরাহ্ণে মন্দিরে মহিলাদিগের উৎসব। শ্রীমতী কিরণবালা বরকাকতি প্রার্থনা ও পাঠ করেন। শ্রীমতী সুষমা দাস সঙ্গীত ও পাঠ করেন। সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা। ১১ই মাঘ পূর্ব্বাহ্ণে সঙ্গীত, কীর্ত্তন ও উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস; শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ বরকাকতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, প্রবন্ধ পাঠ ও প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় সঙ্গীত ও উপাসনা। ১২ই অপরাহ্ণে বালকবালিকা উৎসব। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত দাস প্রার্থনা করেন এবং তিনি ও জ্যোতিরিন্দ্র বাবু বালক বালিকাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। বালক বালিকারা সঙ্গীত ও আবৃত্তি করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। প্রায় ২৫০ শত বালক বালিকা ও তাহাদের জননীগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকলকে কমলালেবু ও মিষ্টি দেওয়া হইয়াছিল।

নারায়ণগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজ—নারায়ণগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাত্রিংশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে:—২১শে ফাল্গুন, সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন। কিছুকাল কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন উপাসনা করেন। ২২শে ফাল্গুন উষা কীর্ত্তন করিয়া সকলে মন্দিরে সমবেত হইলে শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্রের পরলোকগত পিতার স্মৃতি উপলক্ষে উপাসনা। একটী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। সাধারণ প্রার্থনার পর দীনবন্ধু বাবু "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থ হইতে কয়েকটি শ্লোক পাঠ করেন এবং আত্মার অমরত্ব বিষয়ে কিছু বলিয়া প্রার্থনা করেন। পরে মিষ্ট-জলযোগে এ বেলার কার্য্য শেষ হয়। ২৩শে ফাল্গুন প্রাতে একটি কীর্ত্তনের পর শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু উপাসনা করেন। তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের একটি উপদেশ পাঠ করেন। সায়ংকালে পুনরায় কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২৪শে ফাল্গুন, প্রাতে শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য একটি কীর্ত্তনের পর উপাসনা ও আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে মহিলা-উৎসব। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপর প্রীতি জলযোগে এ বেলার কার্য্য শেষ হয়। ৪ ঘটিকায় নগর-সংকীর্ত্তন। সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার পর গায়কদল নগরের দ্বারে দ্বারে প্রমত্তভাবে কীর্ত্তন করিয়া ৭টায় মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে একটি সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল "ধর্ম্মের উচ্চতম লক্ষ্য"। অবশেষে একটি সঙ্গীত হইয়া অদ্যকার কার্য্য শেষ হয়। ২৫শে ফাল্গুন, সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। প্রথমে সকলে মিলিত কণ্ঠে একটী কীর্ত্তন করিলে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের করেন। তৎপর প্রীতি-ভোজনান্তে এ বেলার কার্য্য শেষ হয়। অপরাহ্ণ ৩ঘটিকায় শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ সংক্ষিপ্ত উপাসনা, পাঠ, ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেন। সায়ংকালে কীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। অতঃপর শান্তি বাচন হইয়া উৎসবের কার্য্য শেষ হয়। অত্যন্ত নিরাশার মধ্যেও যে তিনি কিরূপ আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়া দেন এবার বিশেষভাবে তাহা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন।

বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের উনপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে:—১৫ই ফাল্গুন (অদ্য বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দিন) সন্ধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়। ১৬ই ফাল্গুন পূর্ব্বাহ্ণে উপাসনা। অপরাহ্ণে কথকতা। কথক—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়। ১৭ই ফাল্গুন পূর্ব্বাহ্ণে উপাসনা, অপরাহ্ণে বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়; বিষয়—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও যুগধর্ম্ম। ১৮ই ফাল্গুন, পূর্ব্বাহ্ণে

উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য, তৎপরে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক গীতার কতকগুলি শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা। অপরাহ্নে—বক্তৃতা; বক্তা—শ্রীমতী অবন্তী ভট্টাচার্য্য। বিষয়—নবযুগের আশা।

উৎসব—বিগত ১৪ই মার্চ্চ কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সপ্তষষ্টিতম উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে:—প্রাতে ৮॥টায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; ১০॥টায় নবনির্ম্মিত যোগেন্দ্রমোহিনী-সেবাশ্রমগৃহে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করেন। প্রার্থনান্তে স্বর্গীয়া যোগেন্দ্রমোহিনী দেবীর স্বামী শ্রীযুক্ত বরদাদাস বসু উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন। দ্বিপ্রহরে প্রীতিভোজন হয়। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বিষ্ণুপুরাণ হইতে কিছু পাঠ করেন ও প্রার্থনা করেন; তৎপরে সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসুর গৃহ-প্রাঙ্গণে সংকীর্ত্তন হয়। শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে কীর্ত্তন পরিচালনা করেন।

প্রাপ্তি-স্বীকার—দাতব্য বিভাগের সম্পাদক নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছেন (জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর, ১৯২৯)—শ্রীমতী সুবালা আচার্য্য (পূর্ব্ব বৎসরের বাবদ) ৫৲, শ্রীযুক্ত অময়কুমার হালদার (কন্যার বার্ষিক শ্রাদ্ধে) ২৲, শ্রীযুক্ত শ্রীপতিনাথ দত্ত (পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে) ২৲, কুমারী নীলিমা দত্ত (ভগিনীর আদ্য শ্রাদ্ধে) ৫৲, শ্রীমতী সুনীতিবালা ঘোষ (পতির বার্ষিক শ্রাদ্ধে) ২৲, শ্রীমতী প্রতিভা ঘোষ (বাবু ত্রৈলোক্য নাথ দেবের শ্রাদ্ধে) ৫৲, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মল্লিক (পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে) ২৲, সেভিংস্ ব্যাঙ্কের সুদ ১৪৵২, (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অফিস হইতে—সরলা মহলানবীশ ফণ্ড ৩।০, হিমাংশুবালা গুহ ফণ্ড ৩।০, কালীপ্রসন্ন বসু ফণ্ড ৩।০, সহসঙ্গী ফণ্ড ৯৲, কানাইলাল সেন ফণ্ড ৩৫৲, অভয়াচরণ মল্লিক ফণ্ড ৩।০, অমিয়বালা গুহ ফণ্ড ৩।০, মুক্তকেশী ফণ্ড ৩।০, মোহিতকুমার দত্ত ফণ্ড ১০।০ প্রশান্ত গুহ ফণ্ড ৩।০, অনাথা-গোলোকচন্দ্র বসু ফণ্ড ১০।০, কামিনীকুমার দত্ত ফণ্ড ৭, রামরূপ তেওয়ারী ফণ্ড ৭৲, ইচ্ছাময়ী ফণ্ড ৪৵০, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্র ১৲, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সেন ৩৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাস ৵৯, বাবু গগনচন্দ্র হোম ৫৲, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ ১৲, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী ২৲, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার ২৲, শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র বসুর পুত্র-কন্যাগণ ৩৲, শ্রীমতী সত্যবতী দত্ত ১৲, শ্রীযুক্ত দামোদর পাল ২০৲ শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র গুহ ২৲, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু ২৲, শ্রীমতী প্রেমলতা রায় ১৲, শ্রীযুক্ত সরোজকুমার সেন ১৲, শ্রীমতী সুশীলা বসু ৩৲, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ৫৲, পরলোকগত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রগণ ৫৲, শ্রীযুক্ত কে সি ঘোষ ১০৲ শ্রীমতী বসন্তকুমারী সিংহ ২৲, শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার দত্ত ২৲, কুমারী সুখময়ী লাহিড়ি ১০৲, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখার্জ্জি ২৲, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ চৌধুরী ১৲, শ্রীমতী আশালতা চাটার্জ্জি ২৲, শ্রীযুক্ত শান্তিপ্রিয় দেব ২৲, ও শ্রীযুক্ত ভবতারণ দত্ত ২৲) মোট ২৩৪৶১১।

শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডার—এ পর্য্যন্ত শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডারে প্রায় ৪৬,০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সাধনাশ্রমের সংশ্রবে যে চারিতালা বাড়ী ও রাস্তার ধারে মন্দিরের পার্শ্বে যে এক তালা ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাতে প্রায় ৬৫,০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এবং প্রেসের জন্য যে ঘর প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার ভিত্তি গাঁথিতে প্রায় ৬০০০৲ টাকা লাগিয়াছে। এই গৃহনির্ম্মাণ করিতে এবং একতালার উপর আরও দুই তালা উঠাইতে প্রায় ৫০,০০০৲ টাকা আবশ্যক হইবে। এ সকল কার্য্য অচিরে সম্পন্ন করা একান্ত আবশ্যক। অর্থাভাবে এতদিন কার্য্য বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। শীঘ্রই পুনরায় কার্য্য আরম্ভ না করিলে চলিতেছে না। চাঁদাদাতাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্মৃতিভাণ্ডারের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, ২১০।৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট, এই ঠিকানায় স্ব স্ব চাঁদা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

মহিলাদিগের নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডার—মহিলাদিগের নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডারের সম্পাদিকা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্ত স্বীকার করিতেছেন:—(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর) শ্রীমতী মোহিনী গুপ্ত ১৲, শ্রীমতী বনফুল সিংহ ১২৲, শ্রীমতী যজ্ঞেশ্বরী মজুমদার ২৲, মিসেস প্যারীলাল মিত্র ৫৲, মোট ২০৲।

ভ্রম সংশোধন—বিগত সংখ্যার ২৫৬ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমের ১৫শ ছত্রে "এস এম্‌" স্থলে "এম্ এম্‌" হইবে এবং পরের ছত্রে ১০০৲ পরে "সাধনাশ্রমে ৫০৲" যোগ করিতে হইবে।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৮ই চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি এ।